সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৩২৫

কার্ত্তিক—চৈত্র।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা ছয় আনা।

'সবুজ পত্র' কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইকলী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদাপ্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

(১৩২৫, কার্ত্তিক—চৈত্র)

বৈশাখ, ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মুক্তি।

——○❋○——

ডাক্তারে যা বলে বলুক্ না কো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ঐ জান্‌লা দুটো,—গায়ে লাগুক্ হাওয়া।
ওষুধ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া!
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে!
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ;
কত রকম কবিরাজী, কতই মুষ্টিযোগ,
একটু মাত্র অসাবধানেই বিষম কর্ম্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই ত ঘরে পরে,
সবাই আমায় বল্লে, লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি!
এ সংসারে এসেছিলেম ন' বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে

দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা,
একটুখানি ভাব্‌ব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা-হোক্ একটা-কিছু,
সে কথাটা বুঝ্‌ব কখন, দেখ্‌ব কখন ভেবে আগু পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চল্‌চে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা,
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই ত আমি যে কি, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কি অর্থে যে ভরা!
শুনি নাই ত মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্চে সেই চাকাটা—ঐ যে থাম্‌ল যেন;
থামুক্ তবে! আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম্ম-দোলায় দোল্;

হেঁকেছিল, "খোল্‌রে দুয়ার খোল্‌!"
সে যে কখন আস্‌ত যেত জান্‌তে পেতেম না যে।
হয় ত মনের মাঝে
সঙ্গোপনে দিত নাড়া; হয় ত ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত; হয় ত বাজ্‌ত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয় ত পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আস্‌তে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যা-বেলায়
পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ খেলায়।
থাক্‌ সে কথা!
আজ্‌কে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌চে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেচে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।

বাইশ বছর ধরে'
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।

দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেচে, আরো কাট্‌ত আরো বাঁচলে পরে !
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি ;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা !
আজ্‌কে কখন মোর
কাট্‌ল বাঁধন-ডোর !
জনম মরণ এক হয়েচে ঐ যে অকূল বিরাট মোহনায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়,
ভাঁড়ার-ঘরের দেওয়াল যত
একটু ফেনার মত।
এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় পড়ে থাক্‌ !
মরণ বাসরঘরে আমায় যে দিয়েচে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু !
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্ণিমেষে।

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার করে দাও কালের পারাবার!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষ।

(মানসী মূর্ত্তি)

——:*:——

যে দিন জলধি-গর্ভ হ'তে ভারতভূমি আপনার মস্তক উত্তোলন কর্‌লেন সে দিন বুঝি অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষে দেবতারা সহর্ষে আনন্দ-ধ্বনি করে' তার আবাহন করেছিলেন—আকাশ পথে দিব্যাঙ্গনারা বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে থেমে গিয়ে তাঁদের আনন্দ-পুলকিত আঁখি নত করে' একবার চেয়ে দেখেছিলেন—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ রক্ষ শূন্যপথে সব মিলিত হ'য়ে কৌতূহলোদ্দীপ্ত-চিত্তে জোড়-করে এ ধরিত্রীর পানে চেয়ে প্রণত হয়েছিল। সে দিন ঊর্দ্ধে অধঃ, পূর্ব্বে পশ্চিমে ঘোষিত হ'য়ে গিয়েছিল যে এই ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের এক মহালীলা সংঘটিত হবে।

* * * * *

তারপর কে জানে কতযুগ ধরে' লোকচক্ষুর অন্তরালে জগৎ-জননী ভারতভূমি, আপনার অন্তর বাহির অতুল ঐশ্বর্য্যে ভরে' তুলেছিলেন—আপনার লোভাতুর সন্তানদিগকে আপনার বুকে ভুলিয়ে আন্‌বার জন্যে। পদতলে তাঁর সফেন-তরঙ্গ পাগল সিন্ধুর অতল তলে কোটি কোটি শুক্তি-হৃদয় মুক্তায় মুক্তায় ভরে' উঠ্‌ল—খনিতে খনিতে কত মণি

মাণিক্য লালসাময় জ্যোতি বিকীরণ করে' চক্ মক্ করে' উঠ্‌ল—কল-নাদিনী গঙ্গা, সিন্ধু, কাবেরীর তীরে তীরে স্নিগ্ধ-শ্যামল বৃক্ষ-তল সুস্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় ভরে গেল—বসুমতী আপনার বুক চিরে অনন্ত স্নেহরসে অভিষিক্ত অপর্য্যাপ্ত অন্নদান কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

* * * * *

তারপর কে জানে কোন সুদূর অতীতের একদিন, কোন্ এক চিরতুষারাবৃত, চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশে জগত-জননী ভারত মাতার প্রথম আহ্বান গিয়ে পৌঁছিল। মানুষের স্মৃতির পটে বিলুপ্ত-প্রায় সেই অভিযান-কাহিনী কে জানে? কে জানে কত মরুর নিষ্ঠুর বক্ষের উপর দিয়ে, কত কত পর্ব্বত মালার দুরারোহ অভ্র-চুম্বিত চূড়া অতিক্রম করে', কত গহনঘন কান্তারে গোপন পথ খুঁজে খুঁজে, কত বৎসর পরে এই কল-নাদিনী নদী-সিক্ত ছায়া-স্নিগ্ধ জগন্মাতার শ্যামল-বুকে নিবিড় নীল আকাশের তলে পৌঁছে গিয়েছিল, মানব সভ্যতার সেই প্রথম পুরোহিতের দল—উন্নতশির, প্রশস্তললাট, বিশালবক্ষ, তেজো-পুঞ্জ দৃষ্টি, সরল সবল কলেবর। মানব সভ্যতার প্রথম পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বেশে জগন্মাতার বুকে এই বিশ্বমানবের মহালীলার প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌ল।

* * * * *

আজ আমি আমার মানস নয়নে দেখ্‌তে পাই যে সেই চিরতুষারা-বৃত চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশ ছেড়ে যে দিন সেই সিন্ধুতীরে তাঁদের চোখের

সাম্‌নে পূর্ব্ব-দিগন্ত কনক রাগে রঞ্জিত করে', জবাকুসুম-সংকাশ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধীরে ধীরে দিক-চক্রবালের নীচ থেকে আপনাকে তুল্‌লেন, সে দিন কি এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাঁদের চিত্ত মন প্রাণ সব ভরে' উঠেছিল। সেই মহাদ্যুতির করস্পর্শে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হ'ল। মানুষের মনের অন্ধকার দূর হবার সূত্রপাত হ'ল সে দিন, বিশ্বমানব ইতিহাসের সে এক জ্যোতির্মণ্ডিত চিরস্মরণীয় দিন।

* * * * *

হিন্দুর সেই একদিন গিয়েছে যে দিন পঞ্চনদতীর-ভূমে বনে বনে তাপস-কবির আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সাম গান শুনে তরু লতা মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ত—বৃক্ষে বল্লরিতে ফুল ফুটে উঠ্‌ত। সেই ছায়া-সুনিবিড় বনে বনে সারা দ্বিপ্রহর আর মধুপ-গুঞ্জনের বিরাম নেই—বনকপোতের প্রাণ-উদাস করা ডাকের আর অন্ত নেই—বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্রপুঞ্জে মর্ম্মর ধ্বনি তুলে সর্ সর্ করে' বাতাসের আনাগোনার আর বিরতি নেই ;—সেই বনভবনে শান্তি-সমাকুল পর্ণকুটীরে কত কত ঋষি এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌বার জন্যে ধ্যান-নিরত। হিন্দুর জীবনের ইতিহাসে সেই একদিন গিয়েছে।

* * * * *

ধীরে ধীরে—ধীরে ধীরে মানুষ আপনাকে চিন্‌ল—আপনার অধিকার বুঝ্‌ল। আনন্দে বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় তাদের সকল হৃদয় ভরে' উঠ্‌ল। তাদের কণ্ঠ-সঙ্গীত পঞ্চনদের তীরে তীরে ছায়া সুনিবিড়

বনে বনে অনন্ত আকাশকে মুখরিত পুলকিত আকুলিত করে' তুল্‌ল। আপন প্রাণের অদম্য আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌লে। অম্ন আপনাকে বহু করলেন—প্রজা বহু হ'ল। পল্লী প্রতিষ্ঠা হ'ল—নগর নগরী বিনির্ম্মিত হ'ল—রাজ্য গঠিত হ'ল—সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'ল। মানুষ আত্মবলে আপনাকে জয়যুক্ত করে' ভগবানকে সার্থক করে' তুল্‌ল।

* * * * *

তারপর কত যুগ ধরে' এই জগন্মাতার বুকের উপর একে একে কত লীলা হ'য়ে গেল—কত জ্ঞানশক্তি—ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত মহত্ব গৌরব—কত ঘাত প্রতিঘাত, শান্তি সংগ্রাম—কত রক্তস্রোত কত প্রীতি ধারার ভিতর দিয়ে দিয়ে, বসুন্ধরা তাঁর সন্তানদিগকে নিয়ে চল্‌লেন—হিন্দুর সে-জীবনের কাহিনী আজ মানবের স্মৃতিতে বিলুপ্ত-প্রায়।

* * * * *

অনন্ত অতীতের মসীময় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীপ্রভাতে, ইতিহাস যখন বিস্মৃতির করাল-কবল হ'তে মানুষের লীলাধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে উষার ক্ষীণ আলোকে লেখনী হস্তে বদ্ধপরিকর হ'ল—তখনও সেই সুদূর অতীতের আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে আলেখ্য লিখিত হ'ল তাতে দেখি তখনও হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারপর ধীরে ধীরে দিনে দিনে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আলেখ্য-রাজি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল—তখনও

হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারি একদিন—আজ মনে পড়ে—আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নরনারী একপ্রাণে অশোকের ছত্র-পতাকা-তলে সমবেত হয়েছিল। সে দিন দিকে দিকে ভারতের বাণী বহন করে' লোক্ ছুট্‌ল। উত্তুঙ্গ ভূধর তাদের গতি রোধ কর্‌তে পার্‌ল না। অকূল পরাবারের উত্তাল তরঙ্গ-মালা তাদের পথ করে' দিলে। অমৃতের সন্ধান পেয়ে সে দিনের হিন্দুরা সে-অমৃত নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে ফির্‌ল।

*   *   *   *   *

তারপর তেম্‌নি আর একদিন উজ্জয়িনীর কনক-পুরীতে জগন্মাতা হিন্দুর সভ্যতার যে এক অভ্রভেদী মন্দির গড়ে' তুলেছিলেন—ঐশ্বর্য্য গৌরব, জ্ঞান, শক্তি দিয়ে ভরে' তুলেছিলেন—সে কাহিনী আজও হিন্দুর মনে সহস্র নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে স্বর্ণরেখার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। আজ আমি মানস-নয়নে দেখ্‌তে পাই—সেই সুবর্ণপুরী উজ্জয়িনী—সেই উজ্জয়িনীর পথে পথে নরনারী কলহাস্যে গতিলাস্যে নির্ভীক উন্নতশিরে বিচরণ কর্‌ছে—পথ-পাশে পাশে সহস্র বিপণিতে পণ্যরাজির আর অন্ত নেই—সে-দিন বাতাসে বাতাসে ক্ষুব্ধ হাহাকারের পরিবর্ত্তে আনন্দোচ্ছ্বসিত কলহাস্য—আকাশে আকাশে খিন্ন দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্ত্তে তৃপ্তির সুখান্বিত হিল্লোল—মানুষের অন্তরে অন্তরে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে, অনন্ত দুরাশা, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবার শক্তি। মানস-নয়নে আমি দেখ্‌তে পাই—সে দিন উজ্জয়িনীর অসংখ্য চতুষ্পাঠীতে কত কত দিক দেশ হ'তে কত নরনারী এসে জগন্মাতা-

চরণে শিষ্য বেশে তাঁর অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে দু'এক খানি রত্ন নিয়ে আপনাকে ধন্য মনে কর্‌ছে—নগর নগরীতে সে দিন উৎসবের আর শেষ নেই—পল্লীতে পল্লীতে শিশুদের কলরবের আর শ্রান্তি নেই—শস্য-শ্যামল সহস্র পল্লীর পাশে পাশে অগণ্য নদীতে নদীতে কল কল ছল ছল হাস্যের আর বিরতি নেই। স্বর্ণ-সিংহাসনে হিন্দু সম্রাট স্বর্ণ ছত্র তলে স্বর্ণ দণ্ড করে, দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করছেন—রাজসভা হিন্দুর জ্ঞানে শক্তিতে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে অলঙ্কৃত—রাজভাণ্ডার মুক্তহস্ত—ধরিত্রীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে সমুজ্জ্বল। সে দিনের ছবি আমি মানস-নয়নে দেখি আর কোথা হতে দুই বিন্দু অশ্রুজলে আমার আঁখিপাত সিক্ত হ'য়ে ওঠে।

* * * * *

তারপর আরও একদিন—শুধু একদিন কেন!—আরও কতদিন—কত বর্ষ—কত শতাব্দী—এই জগন্মাতার বুকে হিন্দু জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে, ভক্তিতে, কর্ম্মে, ভোগে আপনাকে সার্থক করে' তুলেছিল। সেই অতীতকালে তরঙ্গোচ্ছাসিত অকূল পারাবারের বুকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতে শুভ্র পাল তুলে হিন্দুর অর্ণবতরণী কত কত পণ্য-সম্ভার জ্ঞান-সম্ভার নিয়ে দিগন্তের পরপারে কত কত দেশে ছুট্‌ল—কত কত দেশ হ'তে অর্ণবযান সপ্তসিন্ধু পার হয়ে, কত কত ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত কত ভক্তি প্রীতি নিয়ে হিন্দুর বন্দরে বন্দরে এসে লাগ্‌ল। কত যুগ ধরে হিন্দু এক হাতে শক্তি আরেক হাতে প্রেম—একদিকে কর্ম্ম আর একদিকে জ্ঞান—একদিকে ঐশ্বর্য্য আর একদিকে মুক্তি নিয়ে,

আপনাকে জান্‌ল ও বিশ্ববাসীকে জানাল। তারপর ধীরে ধীরে হিন্দুর লীলার দিন ফুরিয়ে এল। জগন্মাতার দ্বিতীয় আহ্বান কোন্ এক নবান জাতির অন্তরে গিয়ে বাজ্‌ল।

* * * * *

হিন্দুকুশের পরপারে একি গুঞ্জন-ধ্বনি আজ শুনি! যবনিকার অন্তরাল হ'তে কত লক্ষ লোকের উৎসাহ-কলরব—প্রাণের হুঙ্কার আজ হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে', মৃদু গুঞ্জনের মতো এ-পারের আকাশ বাতাসকে চঞ্চল কর্‌ল। কাণ পাত—ঐ কি শোনা যায়—প্রবল কোলাহলের মধ্য হতে মাঝে মাঝে প্রবলতর হুঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে—"লায় লা হায় লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা"! গহণ তিমিরাবৃত নিশীথের ব্যত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সিন্ধুর উর্ম্মিমালার মতো কোন্ নবীন জাতি আজ অদম্য প্রাণের বেগে আপনাকে আর আপনার মধ্যে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌ছে না। তাকে বেরুতে হবে—বেরুতে হবে আজ আকুল স্রোতস্বিনীর মতো—হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে'—কানন কান্তার, পল্লী, নগরী, মরু, গিরি ভাসিয়ে নিয়ে—আপনারই প্রাণের বেগে—গতির আনন্দে—আনন্দের আতিশয্যে। ধীরে ধীরে গুঞ্জন-ধ্বনি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'ল—আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট—তারপর একদিন হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে'—অর্দ্ধচন্দ্র-আঁকা বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িয়ে—উন্মুক্ত-কৃপাণ লক্ষ লোক—জগত-পিতার নাম হুঙ্কার কর্‌তে কর্‌তে সিন্ধুর তীরে তীরে শার্দ্দলের মতো দেখা দিল। কৃপাণে কৃপাণে সংঘাত হ'ল—শূলে শূলে সংঘর্ষ হ'ল—

অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলিতে মেদিনী আচ্ছন্ন হ'ল—বিজয়ীর বিজয় হুঙ্কারে বিজিতের নিরাশা-চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রপীড়িত হ'ল। মানব-শোণিতে ধরণী রঞ্জিত!—নদনদীর লোহিতাক্ত কলেবরে—হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত। মানব-সভ্যতার দ্বিতীয় পুরোহিত ক্ষত্রিয় বেশে জগন্মাতার বুকে বিশ্বমানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

* * * * *

তারপর সপ্ত শতাব্দী ধরে' এই দুই মহাজাতি বিরোধে মিলনে, শান্তিতে সংগ্রামে, ভয়ে ভক্তিতে পরস্পর পরস্পরের কাছে আপনাকে পরিচিত করতে করতে চল্‌ল—পরস্পর পরস্পরকে জয় করতে করতে চল্‌ল। তাই এই সপ্ত শতাব্দী ধরে' কখনও মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যে দিগ দিগন্তে বজ্রশিখা ছড়িয়ে গেল—মেদিনী কম্পমান হল—দেবালয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিতে মিশেয়ে গেল—মানব রুধিরে বসুন্ধরা রঞ্জিত হ'ল;—আবার কখনও বরাভয়করা জগতজননীর প্রশান্ত হাস্যে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বনে বনে ফুল ফুট্‌ল—বিহঙ্গ কাকলীতে কাননভূমি মুখরিত হ'ল—দিগন্তপ্রসারী শ্যামাঙ্গিনীর বুকে বুকে শ্যামশস্য আপনার মায়া বিছিয়ে দিল—শান্তির প্রলেপে যত ব্যথা সব মুছে গেল। ধীরে ধীরে মন্দিরের পাশে পাশে মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হল—হিন্দুর অন্তরে অন্তরে মুসলমান ফকিরের জন্য আসন পাতা হ'ল। ধীরে ধীরে এই দুই মহাজাতি—হিন্দু মুসলমান—পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌ল। বুঝ্‌ল তারা যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে তাদের বিরাট ঐক্য—বুঝ্‌ল তারা

যে সর্ব্ব প্রথমে তারা মানুষ—আর মানুষ মানুষের কাছে যা চায় সেটা সংগ্রামের মধ্যে নেই—অবজ্ঞার মধ্যে নেই—বিচ্ছেদের মধ্যে নেই, আছে সেটা প্রীতির মধ্যে— মিলনের মধ্যে—শান্তির মধ্যে, মানুষের বিরোধ সে দু'দিনের—মানুষের প্রেম সে অনন্ত। যারা একদিন উদ্ধত-হৃদয়ে উন্মুক্ত কৃপান নিয়ে জয় করতে এলো তারা ধীরে ধীরে পরাজয় মানল—যারা একদিন শত্রুর বেশে জগন্মাতার বুকে তাণ্ডব-নৃত্য করলে তাদেকে আর একদিন অনন্তস্নেহে অভিষিক্ত করে' জগন্মাতা আপনার সন্তান করে' নিলেন।

* * * * *

সহসা আজ সিন্ধুর কল কল ছল ছল দ্বিগুনতর হ'য়ে উঠ্‌ল কেন! সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিন্দু মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল পশ্চিম-দিক চক্রবালে পারাবার-বুক তরণীতে তরণীতে ছেয়ে গেছে। পালে পালে প্রভঞ্জনের হাওয়া তাদের, ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষীর মতো সাঁ সাঁ করে' ছুটিয়ে চলেছে—হিমাদ্রি সমান তরঙ্গের বক্ষ বিদীর্ণ করে' করে'—শুভ্র ফেন-পুঞ্জে-পুঞ্জে বারিধি-হৃদয় আচ্ছাদিত করে' করে' ছুটে আস্‌ছে সহস্র তরণী তাদেরি পানে। ধীরে ধীরে কখন গোধূলী আপনার স্বর্ণাঞ্চল খানি টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের গায়ে মিশিয়ে গেল—ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী এসে দিবসের শেষরশ্মি রেখাটুকু আপনার অসিত অঞ্চলে মুছে নিলেন—তখন সেই আধআলো আধঅন্ধকারের মাঝে সহস্র তরণী এসে তটে লাগ্‌ল। হিন্দু মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল সেই সহস্র তরণীতে এক নবীন মনুষ্য—শ্বেতবর্ণ—নীলচক্ষু—পিঙ্গলকেশ কৌতুহলোদ্দীপ্ত তারা জিজ্ঞেস করল—"তোমরা কে?"

"আমরা বণিক।"

"তোমাদের পণ্য সম্ভার কি?"

"পণ্য আমাদের নূতন প্রাণের নবীন উৎসাহ—তরুণ হৃদয়ের অনন্ত দুর্নিবার আশা আকাঙ্খা—তপ্ত রক্তস্রোত-প্রবাহিত ধমণীর দুরন্ত কর্ম্ম-পিপাসা—ধরিত্রীর সন্তান আমরা—সপ্তসিন্দুর মানস-পুত্র আমরা।"

হিন্দু মুসলমান বল্‌লে—"তোমাদের পণ্য আমরা জানি না। তাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এ জগন্মাতার দেশ—সবার অবারিত দ্বার। এসো—তোমারও স্থানের অভাব হবে না।" বিদেশী বণিক তার পণ্য সম্ভার নিয়ে কূলে অবতরণ কর্‌ল। মানব-সভ্যতার তৃতীয় পুরোহিত বৈশ্যবেশে এ জগন্মাতার কূলে বিশ্বমানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌ল।

* * * * *

তারপর যখন রজনী প্রভাত হল তখন সেই বিদেশী বণিকের একদল চমৎকৃত হ'য়ে দেখ্‌চে যে তাদের অজ্ঞাতসারে—কখন তাদের লোহার তূলাদণ্ড সোনার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে।

* * * * *

এখন এই যে তিন মহাজাতি—এই যে হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান —এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন মহাজাতিকে মন্থন করে' কত হলাহলের পর কবে কোন্ অমৃত উঠ্‌বে তা কে জানে? তবে অমৃত যে একদিন উঠ্‌বেই সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নব-বিদ্যালয়।

—:o:—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু—

ক্যাটালগ ঘাঁটা যাঁদের অভ্যাস আছে, তাঁরাই জানেন্ যে এমন সব বই আছে যার নাম পড়েই তা পড়্তে লোভ হয়। আপনি আমাকে যে ফরাসী বইখানি পাঠিয়েছেন, সেখানি হচ্ছে ঐ জাতের। "নব-বিদ্যালয়", এই নাম পড়েই, এই বইয়ে অনেক নূতন সত্যের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার আশা আমার মনে জেগে উঠল ; এবং শুনে সুখী হবেন যে, বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে সে আশায় আমি নিরাশ হই নি। আমাদের দেশের স্কুলকলেজের প্রতি আমরা অনেকেই যে অসন্তুষ্ট—তার প্রমাণ ত আমাদের লেখায় বক্তৃতায় নিত্যই পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলকলেজে আমাদের ছেলেরা যে মানুষ হচ্ছে না, এ কথা ত ঘরে বাইরে দু'বেলা শুন্‌তে পাই ; কিন্তু কি কর্‌লে যে তা হবে, সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা বড় বেশি লোকের মাথায় নেই। তা যদি থাক্‌ত, তাহলে আমাদের এমন কথা শুন্‌তে হ'ত না যে, ইংরাজি পড়েই বাঙালীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। এর পর ছেলেদের স্কুলকলেজ ছাড়িয়ে আবার পাঠশালা ও টোলে পাঠাবার প্রস্তাব দেশহিতৈষী লোকেরা যে করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ প্রস্তাব

খুব পেট্রিয়টিক হতে পারে, কিন্তু মোটেই কাজের নয়; কেননা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার একমাত্র উপায় যে পশ্চাৎপদ হওয়া, এ বিশ্বাস যাঁদের আছে—তাঁরাও সে বিশ্বাস অনুসারে নিজেরা কাজ করতে প্রস্তুত নন্। সভা-সমিতিতে স্কুলকলেজের উপর ঝাল ঝেড়ে আমরা নিজেদের ছেলেদের আবার সেই স্কুলকলেজেই পাঠাই। ফল কথা এই যে, যে ভাবে শিক্ষা চল্‌ছে সে ভাবে তা চলা উচিত নয়—এ কথা বলায় ততক্ষণ কোনই লাভ নেই, যতক্ষণ না কি করে তা চালানো উচিত, সে কথা আমরা বল্‌তে পারি। সে কথা যে আমরা বল্‌তে পারি নে, তার কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ তেমনি উদাসীন।

(২)

ইউরোপেও আজকাল সে দেশের সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট। সেই অসন্তোষের ফলে বেলজিয়ম, জর্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে গুটি-কয়েক নব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই বইখানিতে এর মধ্যে একটি স্কুলের শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতির আমূল বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এতে যা আছে তা মামুলি স্কুলের আনাড়ি সমালোচনা নয়। আসলে এতে সরকারি শিক্ষার এক বর্ণও সমালোচনা নেই। গ্রন্থকার স্বয়ং একটি নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টা এবং সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শিক্ষকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, তাঁর স্কুলের উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে মুখে যে-সকল কথা বলেছেন, সেই সকল কথা একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্রন্থকারের একটু পরিচয় দিই। ইনি ছিলেন বেলজিয়ামের নব-ইউনিভারসিটির একজন অধ্যাপক। এঁর নাম Faria de Vasconcellos; শিক্ষাই এঁর ধর্ম্ম, শিক্ষাই এঁর কর্ম্ম, এবং স্বজাতির শিক্ষার উন্নতি-কল্পেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রফেসার ফারিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামে ব্রিজ নামক গ্রামে তাঁর এই নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। জর্ম্মাণরা বেলজিয়াম অধিকার করবার পর এ স্কুল বন্ধ হয়, এবং প্রফেসার ফারিয়া জেনেভায় নির্ব্বাসিত হন। তাঁর অপরাধ, তিনি বিশ্বমানবের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, এবং সেই বিশ্বাসের উপরেই তিনি তাঁর নব-শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলেন। তাঁর মতে—এই যুগযুগান্তরের সভ্যতার ফলে মানুষ তার আদিম পশুত্ব হতে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছে, এবং তাঁর দৃঢ় ধারণা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মারামারি কাটাকাটির মূলে যা আছে তা মানবধর্ম্ম নয়—পশুপ্রবৃত্তি। মানুষের অন্তরে তার আদিম হিংস্রতা আজও লুপ্ত হয় নি—শুধু সুপ্ত হয়ে রয়েছে। যে শিক্ষার বলে মানুষের ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়, সে শিক্ষার ফলে মানুষের আদিম পশুত্ব জেগে ওঠে, এবং nationalism প্রভৃতি কথার সাহায্যে ছেলেদের অন্তরে সেই সুপ্ত ব্যাঘ্রকেই জাগ্রত করে তোলা হয়; সুতরাং শিক্ষার মন্দির থেকে ও-সকল শব্দ বহিষ্কৃত করে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁর স্কুলের ছেলেদের মনে তিনি বিদেশী ও বিজাতির প্রতি মৈত্রীর ভাব উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন; তার ফলে তিনি বলেন—তারা মানুষ হয়েছে, অথচ কাপুরুষ হয় নি। প্রমাণ, শত্রুর আক্রমণ থেকে স্বজাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর স্কুলের বড়ছেলেরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। নিজে পশু না হলে যে, পশুর

বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায় না—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, যদিচ অনেক বুদ্ধিমান লোকের মত তাই। বেলজিয়ামের উপর জর্ম্মাণী যে নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড আঘাত করেছে, তাতে প্রফেসার ফারিয়ার উক্ত বিশ্বাস ঘা খেয়েছে—কিন্তু ভাঙ্গা দূরে যাক্, টলেও নি। যে সময়ে জর্ম্মাণরা সমগ্র বেলজিয়ামকে পদদলিত পীড়িত ও বিধ্বস্ত কর্‌ছিল, সেই সময়ে তিনি জেনেভা-সহরে এই কথা বলেন—

"এ দুর্দ্দিনেও মানবসভ্যতার প্রতি আমাদের আস্থা এবং শ্রদ্ধা সমান অটল রয়েছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে,—ব্যক্তির উপরে, জাতির উপরেও, মানবাত্মা বলে একটি পদার্থ আছে। এই যুদ্ধের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও বীভৎস অত্যাচারেও মানুষের আত্মার প্রদীপ কখনও নির্ব্বাপিত হবে না; সে অক্ষয় প্রদীপের চিরবর্দ্ধমান শিখা যুগের পর যুগে যত ঊর্দ্ধে আরোহণ করবে, বিশ্বমানবের জীবনের পথ তত আলোকিত হয়ে উঠবে"।

এর পর বোধহয় এ কথা স্পষ্ট করে বলবার দরকার নেই যে, প্রফেসার ফারিয়া একজন ঘোর Idealist; কিন্তু তার থেকে যদি কেউ মনে করেন যে তিনি একজন খেয়ালি লোক, এবং তাঁর স্কুল হচ্ছে একটি খামখেয়ালি ব্যাপার,—তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল কর্‌বেন। এই ছোট্ট বইখানির ভিতর তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিক্ষা জিনিসটে তিনি কবির চোখ দিয়েও দেখেন নি, দার্শনিকের চোখে দিয়েও নয়। সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগই এই যে, সে পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক নয়,—ও হচ্ছে আসলে একটি আন্দাজি ব্যাপার। প্রচলিত শিক্ষা, শিশু ও বালকের শরীর মন ও

চরিত্রের সম্যক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই, সে-শিক্ষার রীতি হচ্ছে মনোজগতের অন্ধকারে ঢিল মারা। যে সত্য প্রমাণিত ও পরীক্ষিত, সেই সত্যের উপরেই তিনি তাঁর নব-শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্কুলে ছেলেদের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হত, কিন্তু ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া হত না। প্রফেসার ফারিয়া পাতায় পাতায় মানবাত্মার উল্লেখ করেছেন; কিন্তু মানবাত্মা বল্‌তে তিনি বোঝেন—মানুষের সেই ব্যবহারিক আত্মা, যার পরিচয় পাওয়া যায় পৃথিবীর দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, আর্টে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। তদতিরিক্ত অপর আত্মার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব; সে আত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ বিশ্বাস তিনি করেন্ যে, সে বস্তুকে শিক্ষা দেওয়া—আর যারই হোক্—তাঁর সাধ্য নয়। অর্থাৎ reality-র জ্ঞানের সাহায্যে দেহে মনে ও চরিত্রে সুস্থ সবল সক্রিয় ও সক্ষম মানুষ গড়ে তোলাই হচ্ছে তাঁর ideal, এবং একমাত্র এই ideal-এরই তিনি ভক্ত। এবং এই ধর্ম্মের সাধনপদ্ধতিই হচ্ছে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি।

(৩)

ইমারত গাঁথ্‌তে হলে মানুষের পক্ষে সব আগে তার গোড়াপত্তন করা আবশ্যক, এবং তার জন্য চাই জায়গা বাছা। প্রফেসার ফারিয়ার মতে যিনি একটি নব-বিদ্যালয় স্থাপন করতে চান্, তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ঐ জায়গা বাছাই করা। এই সহজ কথাটা যে মানুষে প্রায়ই ভুলে যায়, তার পরিচয় ত আমরা নিত্যই পাই। আমরা যেখানে

একটু ফাঁক পাই, সেইখানেই স্কুল বসিয়ে দিই। গাছ পোঁতবার সময়ও আমরা এর চাইতে ঢের বেশি সতর্ক হই; যেন গাছের জীবন মানুষের জীবনের চাইতে বেশি মূল্যবান।

প্রফেসার ফারিয়ার শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র এই যে, স্কুলের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে পল্লীগ্রাম, সহর নয়। সহর নামক ইঁটের পর্ব্বতের গুহায় আজন্ম বাস করে' মানবসন্তান যে, দেহ মন ও চরিত্রে পূর্ণ-শ্রী পূর্ণ-শক্তি লাভ করবার সুযোগ পায় না,—এ কথা আমরা ষোল-আনা মানলেও অনেকে এক কড়াও মানেন্ না। খোলা আকাশের তলায় পরিষ্কার আলো ও বাতাসের মধ্যে বাস করাই যে ছোট ছেলের শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও মনের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এ কথা বুঝতে যাঁদের দেরি লাগে, তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তাঁরা কি স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁদের ছেলেদের খনির গর্ভে মানুষ হতে দিতে স্বীকৃত হবেন,—হোক্ না সে খনি বিজুলি বাতিতে আলোকিত আর বিজুলি পাখায় ব্যজনিত? ছোট ছেলের পক্ষে সহর একটি কারাগার মাত্র, সে কারাগারে আমরা যে তাদের বন্ধ করে রাখ্তে কুণ্ঠিত হই নে, তার কারণ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি হচ্ছে আসলে জেলের পদ্ধতি। সচরাচর স্কুল যে জেলখানার আদর্শেই গঠিত হয়, এ দুয়ের সাদৃশ্যের প্রতি নজর দিলে সকলেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এই জেলখানা থেকে ছেলেদের উদ্ধার করবার মানসেই ইউরোপে এই সব নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাধীনতাই হচ্ছে এই সব স্কুলের মূলমন্ত্র; কেননা এদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই মহা সত্যের আবিষ্কার করেছেন যে, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই মানুষ তার মনুষ্যত্ব লাভ করে, অর্থাৎ ঐ অবস্থাতেই তার দেহ মন ও চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়; এবং বলা

বাহুল্য যে, ছোট ছেলেও মানুষ,—কেননা বৃদ্ধত্ব ও মানুষ্যত্ব এক বস্তু নয়। স্বচ্ছন্দে চলবার ফেরবার দৌড়বার লাফাবার জন্য ছেলেদের পক্ষে যে মাঠ চাই, এ কথা যে আজকাল অনেকেই মানেন্ তার প্রমাণ, সহুরে স্কুলও খেলার মাঠের জন্য লালায়িত। ছেলেরা কিন্তু শুধু জমির উপর ছুটোছুটি করেই সন্তুষ্ট থাকে না, তারা গাছে চড়্‌তে চায়, জলে নাম্‌তে চায়। একমাত্র স্থলচর হয়ে তাদের সুখ নেই, মাঝে মাঝে খেচর ও জলচর হতে পারলেই তারা আনন্দে থাকে। এ স্বাধীনতা তাদের দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সহরের খেলার মাঠে তারা সাঁতারও কাটতে পারে না, ডালেও চড়্‌তে পারে না। সুতরাং স্কুল সেই জায়গাতেই হওয়া উচিত যেখানে মাঠ আছে, গাছ আছে, জল আছে।

আমরা সকলেই জানি যে, মানবজাতি তার শৈশবে প্রকৃতির কোলেই লালিতপালিত হয়েছে; সুতরাং মানব-শিশুর পক্ষে প্রকৃতির কোলেই মানুষ হওয়া স্বাভাবিক;—কেননা যাঁরা ছোট ছেলের মনের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, আদিম মানবের সঙ্গে তাদের প্রকৃতির একটা মজ্জাগত মিল আছে। মানবজাতি যেমন প্রকৃতির সঙ্গে কারবার করে', যুগের পর যুগ ধরে, দেখে এবং ঠেকে শিখে সভ্য হয়েছে; শিশুকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষ হতে হবে; এই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টাদের মত। প্রকৃতির হাত ধরে এবং প্রকৃতিকে হাতে ধরেই মানুষের মন যে সজ্ঞান এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে, এই বিশ্বাসের বলেই নব-বিদ্যালয়ের নব-শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়েছে। যখন মানসিক শিক্ষার অধ্যায়ে এসে পড়্‌ব, তখন সে পদ্ধতির নূতনত্ব ও সার্থকতার পরিচয় দেব। এস্থলে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট

হবে যে, শিক্ষার এই নব-পন্থীদের মতে সহরে স্কুলে তাঁদের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং স্কুলের স্বস্থান হচ্ছে সহরের বাইরে।

স্কুলের আস্তানা সহরের বাইরে হলেও বহুদূরে হওয়া উচিত নয়—এই হচ্ছে প্রফেসার ফারিয়ার মত। তাঁর স্কুল ছিল ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের রেলের পথ। স্কুল যে একটি বড় সহরের এক ঘণ্টার রেলপথের বাইরে হওয়া উচিত নয়—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়মত। এ অবশ্য একটি নূতন কথা,—সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর কি বক্তব্য আছে শোনা যাক্‌। তিনি বলেন্‌—

"লোকালয়ের বাইরে স্কুল স্থাপনা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা আমাদের ছেলেদের একটা বড় সহরের সংস্পর্শ থেকে একেবারে দূরে রাখ্‌তে চাই;—কিম্বা রাজধানী নামক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মানুষের হৃদয়মনের শিক্ষার জন্য যে অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রয়েছে, টল্‌ষ্টয়ের মত তা প্রত্যাখ্যান কর্‌তে চাই। এ কথাটা আমি খুব স্পষ্ট করে খুব উঁচু গলায় বল্‌তে চাই যে, এই প্রকৃতির কোলে ফিরে আসার অর্থ আমাদের কাছে এ নয় যে, আমরা বনবাসের কোনরূপ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কিম্বা দৈবী-শক্তিতে বিশ্বাস করি। সেরকম অদ্ভূত বিশ্বাস যে আমাদের নেই—এ কথাটা পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক, কেননা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, এমন লোক ঢের আছেন যাঁদের ধারণা যে আমাদের নব-বিদ্যালয়ের প্রধান গুণই এই যে, আমরা সহরের সয়তানের বেড়াজাল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি। লোকালয়-বহির্ভূত মাঠের মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার সুফল যে কি, তা পূর্ব্বেই বলেছি; কিন্তু সহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবার সুফল থেকেও আমরা ছেলেদের বঞ্চিত কর্‌তে চাই নে।"

আমাদের ভাষায় বল্‌তে হ'লে, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ যে একই আশ্রম, প্রফেসার ফারিয়া এ কথা মানেন্ না। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংসার থেকে পালাতে শেখানো নয়, তার জন্য তাকে প্রস্তুত করা। প্রথম আশ্রমের সার্থকতা হচ্ছে মানুষকে তার দ্বিতীয় আশ্রমের উপযোগী করায়। স্কুল সন্ন্যাসীর আশ্রমও নয়, ভিক্ষুর মঠও নয়। এঁদের মতে বিদ্যালয় হচ্ছে সংসার-রঙ্গালয়ের নেপথ্যশালা। জীবন নাটকের অভিনয় সকলকেই ক'র্‌তে হবে, সে নাটক ট্রাজেডিই হোক্ আর কমেডিই হোক; সেই অভিনয় ভাল করে' সুন্দর করে' কর্‌তে শেখানোটাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—সুতরাং সে শিক্ষাশালা প্রথমে নেপথ্যেই রাখা দরকার। শিক্ষানবিশীর যুগে সামাজিক জীবনের যবনিকার অন্তরালে যাবার এও একটা কারণ।

এখন দেখা যাক্, সহরের সঙ্গে স্কুলের সম্পর্কটা নিকট হওয়ায় ছেলেদের কি লাভ। মানুষের যুগযুগান্তরের জ্ঞানকর্ম্মের ফল প্রতি দেশে বড় বড় সহরেই সঞ্চিত রয়েছে; তারপর যে উপাদানের সাহায্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম বৃদ্ধি লাভ করে, সে উপাদানও ঐ বড় বড় সহরেই সংগৃহীত হয়। একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা দরকার। এই নব-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে বস্তু,—বই নয়। নব-বিদ্যালয়ে বইয়ের শিক্ষা ছেলেদের বস্তুজ্ঞানের অনুসরণ করে। এই কারণেই Museum, Zoo, Botanical Gardens প্রভৃতিতে নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের ঘন ঘন যাতায়াত করতে হয়, এবং বলা বাহুল্য এ সব জিনিস বড় সহরেই থাকে—পাড়াগাঁয়ে থাকে না। তারপর নব-শিক্ষকের দল, ছেলেদের ভাল ছবি দেখানো এবং কনসার্ট শোনানো তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং সহৃদয়তার অনুশীলনের জন্য একান্ত

প্রয়োজন মনে করেন, এবং উঁচুদরের ছবি দেখতে হলে, উঁচুদরের গানবাজনা শুনতে হলে, সহর ব্যতীত গত্যন্তর নেই। দেশের বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতা শোনাও এঁদের মতে শিক্ষার একটি প্রধান উপায়। ছেলেরা বড় হলে যে-সামাজিক জীবনে প্রবেশ করবে, সেই সামাজিক জীবনের সকল উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়ে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না। সংক্ষেপে, প্রফেসার ফারিয়ার বক্তব্য এই যে,—একদিকে যেমন সামাজিক জীবনের যত কিছু কদর্য্যতা ও হীনতা সহরে পুঞ্জীভূত হয়েছে, অপর দিকে তেমনি সে জীবনের যত কিছু সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব ঐ সহরেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সুতরাং সহরের পাপ ও কদর্য্যতা থেকে ছেলেদের দূরে রাখবার জন্য ছেলে-দের সহরের বাইরে রাখা যেমন দরকার; সভ্যতার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করবার জন্য ছেলেদের সহরের সন্নিকটে রাখাও তেমনি দরকার।

আর এক কথা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, স্বাধীনতাই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের মুলমন্ত্র। তাই এ শ্রেণীর স্কুলের শাসনতন্ত্র হচ্ছে স্বায়ত্ত শাসন। স্কুলের শাসন সংরক্ষণ সবই ছেলেদের হাতে,—এমন কি ছেলেদের পঞ্চায়তে মাষ্টারদের কোনই স্থান নেই। প্রফেসার ফারিয়া এই ছাত্রশাসনতন্ত্রের লম্বা বর্ণনা করেছেন। সে সব কথা বারান্তরে বল্‌ব। এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলা দরকার যে, স্বায়ত্ত শাসন বজায় রাখবার জন্য স্কুলের পক্ষে সহরের কাছ ঘেঁসে থাকা দরকার। কেনাকাটি হাটবাজার ত ছেলেদেরই করতে হয়—তা ছাড়া দরকার পড়লে উকীলের পরামর্শ, এঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নেওয়া প্রভৃতি প্রাপ্ত

বয়স্ক লোকদের কাজও ছেলেদেরই কর্‌তে হয়। সহরের বিরাট কর্ম্মজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, এবেলা ওবেলা তাদের সহরে যাতায়াত কর্‌তে হয়। স্কুলের বিষয়কর্ম্মের ভার ছেলেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদের স্বাবলম্বন শেখানো।

(৪)

এই নব-বিদ্যালয়ের আর একটি নিয়ম আছে, যেটি আমার কাছে ভারি নূতন লাগল। এ স্কুল অবশ্য বোর্ডিং স্কুল, কিন্তু তা হলেও এ স্কুলে সস্ত্রীক হেডমাষ্টার ছাড়া অপর কোনও মাষ্টারকে থাকবার স্থান দেওয়া হয় না। এর প্রথম কারণ, এ স্কুল পরিবারের আদর্শে গড়া। ছেলেরা এ স্কুলে যথার্থই গুরুগৃহে বাস করে, গুরু এবং গুরু-পত্নীই তাদের পিতৃমাতৃস্থানীয়। সংসারে আমরা যেমন এক পরিবারের ভিতর আর এক পরিবারকে স্থান দিতে স্বতঃই নারাজ—কেননা ও দুয়ে ভাল করে খাপ খাওয়ান যায় না; তেমনি এই নব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা একের বেশী গুরুকে সেখানে স্থান দিতে নারাজ—কেননা, এই পারিবারিক স্কুলে নানা গুরুকে একত্র রাখলে তাদের পরস্পরকে খাপ খাওয়ানো যায় না। প্রফেসার ফারিয়া বলেন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি এই নিয়ম কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন। একাধিক মাষ্টারকে একান্নবর্ত্তী করবার ফলে দুটি একটি নব-বিদ্যালয় ভেঙ্গে গেছে। অনেক সন্ন্যাসীতে যে গাজন নষ্ট হয়—এ হচ্ছে তাঁর কাছে পরীক্ষিত সত্য। তাঁর বিশ্বাস পাঁচটি মাষ্টারকে একত্র রাখলে তাঁদের ভিতর দলাদলির সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ বিষয়ে

ভাললোক মন্দলোকের কোন কথা নেই। মানুষ যতই ভাল হোক না, তার ধাত বলে একটা জিনিস আছে—এবং অনেক স্থলে মতে মিললেও, পাঁচজনের ধাতে মেলে না। এবং পাঁচজনে যত কাছাকাছি যত ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকে, তাদের পরস্পরের ধাতু-বৈষম্য তত ফুটে ওঠে। প্রফেসার ফারিয়া বলেন—যে ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষ প্রকাশ্ত-বিরোধে না দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন অবস্থায়ই থাকে এবং প্রচ্ছন্ন বিষের মত তা অলক্ষিতে স্থূলদেহকে জর্জ্জরিত করে। এই কারণে স্বয়ং প্রফেসার ফারিয়া ব্যতীত তাঁর স্কুলের সকল মাষ্টারই ব্র'সেল্‌সে বাস করতেন—অতএব ব্রাসেল্‌স্ হাতের গোড়ায় না থাক্‌লে এ স্কুল চলত না।

যদি বলেন, যে-গাঁয়ে স্কুল সেই গাঁয়েই মাষ্টারদের আলাদা বাসা করে দিলেই ত হত, ব্রাসেল্‌স্ পাঠাবার কি দরকার ছিল?—তার উত্তর, তাঁর নব-বিদ্যালয় ক্রোরপতির স্কুল নয়। এঁদের নব-শিক্ষা-পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য নব-বিদ্যালয়ে বহু মাষ্টার এবং অতি উঁচুদরের মাষ্টার চাই—কেননা প্রফেসার ফারিয়া বলেন, স্কুলের ভালমন্দ, যারা চালায় তাদেরই উপর নির্ভর করে, নিয়মাবলীর উপর নয়। তাঁর ৩৫টি ছেলের স্কুলে ১৭টি মাষ্টার ছিল, এবং এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে এক একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্কুলের তহবিলে লাখ দুলাখ টাকা না থাক্‌লে এ দরের মাষ্টারদের সব বাঁধা মাইনের চাকর করে রাখা যায় না। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাসেল্‌স্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হপ্তায় একদিন আধদিন এসে এঁরা ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে যেতেন। এ কাজ তাঁরা আহ্লাদের সঙ্গেই করতেন, কেননা সহরে ছদিন সকাল সন্ধ্যে কাজ করে একদিন গাছ-

পালা ফুলফলের দেশে গিয়ে দিনমান ছোট ছেলেদের নিয়ে কাটানতে এঁরা অতিশয় আনন্দ বোধ করতেন। এই পালায় পালায় পড়ানতে স্কুলের কোনই ক্ষতি হত না; কেননা নব-বিদ্যালয়ে এক-দিনে পাঁচ বিষয় পড়াবার নিয়ম নেই। একদিনে একটি, বড় জোর দুটি বিষয় পড়ানো হয়, তার বেশী নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে অবসর মত, এই নব-বিদ্যালয়ের সবিশেষ পরিচয় দেব।

রাঁচি
১০।১১।১৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

গুরু।

——:০:——

"অচলায়তন" নাটক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে, অনেকের এইরূপ ধারণা। এ দেশের দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় কিছুদিন ধরিয়া এ সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা চলিয়াছিল, তাহাতে লোকের এরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে নাট্যকলার আজও কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। বড় নাটক অভিনয় করিবার মত অভিনেতা দেশে দুর্লভ। উপযুক্ত দর্শকও সুলভ নয়। কাজেই নাটকের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারার যা প্রধান সহায়, অভিনয়, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত আছি। কাজেই সম্প্রতি অচলায়তনকে কিছু সংক্ষিপ্ত করিয়া 'বিচিত্রা' ক্লাবে "গুরু" নাম দিয়া অভিনয়ের যে উদ্যোগ হইতেছে, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায়—ইহার নাম "গুরু" হওয়াই উচিত—"অচলায়তন" ইহার negative দিকের নাম।

গুরু বলিলে কি বোঝায়—তাঁহার কর্ম্ম কি? তিনি বাহির হইতে যে কিছু আনিয়া দেন তাহা নহে, আমাদের মধ্যে যাহা অব্যক্ত হইয়া আছে তাহাকেই তিনি বাহির করিয়া আনেন। মানবের অন্তরে যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, গুরু নিজের প্রাণের অগ্নিশিখার স্পর্শে

তাহাকে প্রদীপ্ত করিয়া দেন। আমাদের মধ্যে যে অগ্নি নিস্তেজ হইয়া আছে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিবার জন্য, গুরুর প্রয়োজন।

চারিদিকের বস্তুপুঞ্জ আমাদের নীচের দিকে টানে। প্রাণ আপনার ভিতর আহুতি দিয়া 'টিস্থ' পুড়াইয়া শরীরকে উত্তপ্ত রাখিতেছে—নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তাহার অনবরত চেষ্টা, বহির্জ্জগতের যে একটি চাপ আছে, যাহার চেষ্টা তাহাকে বিধ্বস্ত করা, তাহার বিরুদ্ধে নিজেকে খাড়া রাখা। পৃথিবী আমাদের টানিতেছে শোয়াইয়া দিবার জন্য। আমরা যে খাড়া হইয়া আছি, চলিতেছি, সে প্রাণের জোরে। নিশ্চেষ্ট হওয়া কি না, সমস্ত জড়ের সহিত মিলিয়া যাওয়া।

জড়জগৎ বৃহৎ, আমরা ক্ষুদ্র। সুতরাং জড়ের সঙ্গে প্রাণের এই জোঝাজুঝি একান্ত কষ্টকর। যে প্রচণ্ড শক্তি নিশ্চেষ্টতার দিকে টানিতেছে তাহার কাছে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে বিশ্রাম পাই। মাটিতে শয়ন করি, তাহাতে আমাদের আরাম হয়।

প্রাণের ধর্ম্ম ইহার উণ্টা। প্রাণ আপনাকে স্বীয় শক্তির দ্বারা নিশ্চেষ্টতা হইতে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। শিখার ধর্ম্ম এ নহে যে একবার তাহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, আর সব হইয়া গেল; নিত্য নিয়তই তাহাকে চেষ্টার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে হয়, তাহার সেই চেষ্টাই আলোক, তাহাই জ্যোতিরূপে আমাদের কাছে প্রকাশমান। কেবলি পুড়িতেছে, চলিতেছে, বাড়িতেছে, উঠিতেছে—বিপুল জড়-জগতের মধ্য হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতেছে—এই প্রকাণ্ড উদ্যম, ইহাই প্রাণ।

এই যুদ্ধে প্রাণ এক একবার পরাভবের দিকে যায়। আগুনও জ্বলিতে জ্বলিতে বারবার পরাভবের দিকে যায়। যে ব্যক্তি তাহার উপরকার

ছাই ঝরাইয়া দেয়, সে ত নূতন কিছু দেয় না, সে ভিতরের আগুনকে বাহির করিয়া আনে মাত্র। আত্মার প্রাণশক্তি যখন আরামের ছাই চাপা পড়ে, তখন সেই আরামকে দূর করিবার জন্য আসেন গুরু। ইন্ধন আপনাকে জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য যদি চেষ্টা না করে, তবে তা নিবিয়া যায়। নিবিয়া যাওয়াটাই সহজ অবস্থা, আরামের অবস্থা।

গুরু মানুষই হউন, আর দেবতাই হউন, ঘা দিয়া দুঃখ দিয়া, আমাদের ভিতরকার যে তেজ ম্লান হইয়া আসিতেছিল তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেন। আধ্যাত্মিক প্রদীপটি যাহাদের অন্তরে ম্লান হইয়া যাইতেছিল, তাহারা সেই গুরুর অপেক্ষা, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে করিতে ছিল—যিনি খোঁচাদিয়া, আঘাত করিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া তোলেন।

চেষ্টার অভাবই জড়তা, প্রাণ মানুষের ভিতরের স্বতঃচেষ্টা। কিন্তু সব বিষয়ে, নব নব চেষ্টার সাহায্যে যদি প্রাণকে টিঁকিয়া থাকিতে হয়, তাতে ব্যাপার বড় কঠিন হয়। আমাদের প্রতিদিনই যদি খড়কুটা দিয়া ঘর তৈয়ারি করিতে হইত, শয়ন করিতে হইলে তুলা ধুনিয়া তোষক প্রস্তুত করিতে হইত, তৃষ্ণা পাইলেই কূপ খনন করিতে হইত, তাহা হইলে অবশ্য মনে হইতে পারিত, প্রাণের ক্রিয়া খুব প্রবলভাবে চলিতেছে। কিন্তু এ-অবস্থা চালতে পারে না। প্রাণের ধর্ম্ম নিয়ত চলা কিন্তু আমাদের শক্তি পরিমিত বলিয়া সে শক্তিকে আমাদের বাঁচাইয়া চলিতে হয়। পলিতা যদি আগাগোড়া জ্বলে তবে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। প্রদীপ ততটুকুই জ্বলে যাহাতে আলো হয়, যাহা না জ্বলিলে তাহার চলে না। প্রাণ তেমনিই ব্যবস্থার দ্বারা শক্তির অতিব্যয় নিবারণ করে।

এমনি করিয়া সমাজে প্রথা জিনিসটির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক-বার আমাদের যদি ভাবিতে হইত, দেখা হইলে গুরুজনদের সঙ্গে কি ব্যবহার করিব— শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কোনও দিন ডিগবাজী খাইলাম কোনও দিন বা জিহ্বা বাহির করিলাম—তবে বড়ই মুস্কিল হইত। তাই বাঁধা নিয়ম হইল প্রণাম করা। মানুষ বাড়ী তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দেয়, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখলের জন্য। শক্তির অপব্যয় নিবারণের জন্য প্রাণকে এইরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে, অর্থাৎ সামাজিক কল গড়িতে হইয়াছে।

সামাজিক বিষয়ে যত কিছু তর্ক সে হইতেছে—জড়ের সহিত কারবারে, কলবস্তুকে যতটা স্বীকার করিয়াছি, তাহার পরিমাণ উচিত কি না, এই লইয়া। আপনার ভিতর হইতে যে চেষ্টা, প্রাণ, সেই চেষ্টাকে তুমি কত দূর মানিবে, এই লইয়া তর্ক। প্রাণকে যদি বড় জায়গাতেও ঘুম পাড়াইয়া রাখি, সকল জায়গাতেই যদি বাঁধা নিয়মে চলি, তবে চলাই হয় না। যে জাতি সুদূর অতীতের লোকাচার, দেশাচার, মনু পরাশর, এইসকলের উপর সব বিষয়ের বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় তামসিক হইয়া যায়, তাহার অধঃপতন কে ঠেকাইবে!

আমাদের সব বাঁধা, এমন কি ধর্ম্ম এবং আচারও বাঁধা হইয়া গিয়াছে। আমরা নিজে যাহা কিছু করিতে পারিতাম, তাহার বরাত দেওয়া রহিল, সংহিতা স্মৃতির উপর। আমার চলায় প্রয়োজন নাই —এক জায়গায় ঘানির মত ঘোরাই হইল আমার চলা! নিয়ম যখন অতিরিক্ত হইয়া উঠে, তখন প্রাণের সার্থকতা চলিয়া যায়। মানুষ তখন ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের মত হইয়া উঠে। সে যখন জড়ের সহিত,

আপনার আশপাশের সহিত, বনিবনাও করিয়া চলিতে চায়, তখন তাহার চলার পথে বাধা আসে।

গুরু আপনার প্রচুর প্রাণশক্তি লইয়া আসেন, এই বাধা দূর করিয়া দিবার জন্য।

অতএব "অচলায়তনের" অর্থ সুস্পষ্ট। ইতিপূর্ব্বের "রাজা" নাটকে ব্যক্তিবিশেষের কথা ছিল—"সুদর্শনা" কি করিয়া অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। "অচলায়তন" সমাজের কথা, অনেকের কথা।

এইখানেই সমস্যা। পরস্পরের সহিত পরস্পরের যোগ যেখানে বিচিত্র সেখানে প্রত্যেকের জন্য নূতন করিয়া ভাবা সম্ভব নহে। মানুষের প্রয়োজন বশতঃই মানুষকে সামাজিক কল তৈয়ারি করিতে হইয়াছে।

আমাদের সুবিধা হয় বলিয়া যদি প্রাণের সব কাজের ভার কলের উপর দিই, তাহা হইলে যাহার কাজ দাসত্ব করা, সে হয় প্রভু। ইতিহাসে দেখা যায় রোমকেরা যখন তাহাদের দাসদের উপর সব কাজের বরাত দিতে লাগিল, তখন তাহারা তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বড় বড় সমাজের পতন এমন করিয়াই হয়। সমাজের যখন অবনতি হয় তখন সে কল অর্থাৎ organisation-এর উপর সব বরাত দেয়। তাহার তেজ যত মরে, বল যতই কমে, সে ততই কলের উপর বরাত দিয়া নিজের শক্তি বাঁচাইতে চায়। হয়ত ভারতবর্ষও এই কাজ করিয়াছে। যতই তাহার দুর্গতি ঘনাইয়া আসিয়াছে, ততই কলের উপর বরাত দিয়া প্রাণশক্তিকে সে নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিবার দিকেই প্রাণের উত্তম, এবং তাহাতেই তাহার আত্মরক্ষা। ছোট ছেলে চেঁচাইবে, কাঁদিবে, দৌড়াইবে, এ তাহার পক্ষে ভাল। কিন্তু ধাত্রীর পক্ষে ইহা বিষম অসুবিধা জনক। ধাত্রী সেইজন্য কখন কখনও আফিম খাওয়াইয়া ছেলেকে ঝিমাইয়া রাখে। যাহারা পরের ভার লয়, ইহাতে তাহাদের খুবই সুবিধা। সমাজের ধাত্রী দেখে, যেখানে প্রাণ প্রবল, সেখানে নিয়ম শাসনের ব্যতিক্রম ঘটে। কাজেই তাহাদের কসিয়া বাঁধিয়া, কিম্বা আফিমের ড্যালা খাওয়াইয়া নিস্তেজ করিয়া রাখিতে তাহার চেষ্টা হয়। বৌদ্ধ যুগের সময় হয়ত এদেশে প্রাণের একটু চাঞ্চল্য আসিয়াছিল—তাহার পর আমাদের রঘুনন্দনের দল সমাজকে আচারের বড় একটি আফিমের ড্যালা খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কোনও বিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু উত্তর শিয়রে শুইবে না ; পশ্চিমে বসিবে না ইত্যাদি। আমাদের দুর্গতির হয়ত এ এক কারণ। অথবা হয়ত পোলিটিক্যাল কারণে আমরা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলাম—এবং ক্লান্ত মানুষকে শোয়ান সহজ ; যে সবল, যাহার তেজ আছে, তাহাকে পাড়িয়া ফেলা সহজ নহে। তাই রঘুনন্দনের দল যখন চিন্তা না করা, দ্বিধা না করার মশারিঘেরা বিছানা করিয়া দিলেন, তখন শুইয়া পড়িলাম। হয় প্রাণ আপনিই নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া ইহা ঘটিল, নচেৎ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে কমানো দরকার মনে করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ হইল।

গুরুর কাজ হইতেছে, কল যত আরাম দিক্, তাহার হাত হইতে মানুষকে উদ্ধার করা। তিনি জানেন, সচেতন প্রাণই বল, জড়ের কাছে সে যেখানে জয়ী, সেইখানেই তাহার সার্থকতা, তাই যথার্থ গুরু

বিপ্লবকে বহন করিয়া আসেন। লোকে তাঁহাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে মনে করে বাঁধা মন্ত্র যিনি কানে দেন, তিনিই গুরু। কিন্তু মানবের গুরু রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া, বিপ্লবের বাহনে আসেন—তিনি সেই কথা বলিতে আসেন যাহা আমরা সহজে মানিব না, শুনিব না। গুরু আসা গুরুতর ব্যাপার। বিধাতা যখন আমাদের প্রার্থনা শোনেন "যদ্ভদ্রং তন্নয়াসুব" যা ভদ্র তাই দাও—তখন তিনি দুই হাতে মশাল লইয়া আসেন—বড় ভয়ানক সে কাল! যিনি বলিয়াছেন "যুগে যুগে সম্ভবামি" তিনি যখন আসেন, তখন দেশে দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়, সেদিন দারুণ দুঃখের দিন! তাঁহারও অপমানের দুঃখের শেষ নাই। যখন আরামে আছি, তখন যে আরাম ভাঙ্গিতে আসে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতেই হয়।

প্রাণ নিজেকে আঁকড়াইয়া থাকে—'মমি'র সঙ্গে যে বীজ ছিল, ৩।৪ হাজার বৎসর পরেও অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িবামাত্র তাহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল! মানুষের ভিতর যে প্রাণশক্তি আছে তাহাও সহজে মরিতে চায় না। বাঁধা নিয়মের দাসত্ব করিতে করিতে, বিশ্বের সহিত অব্যবহিত ভাবে আনন্দের যে যোগ, তাহা পাইবার ব্যাকুলতা সমাজের অন্তরে মরিয়া যায়—তবুও তাহার মধ্যে এক একজন থাকিয়া যায়, প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের প্রাণকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করিবার ব্যথা যাহাদের কিছুতে মরে না। 'পঞ্চক সেই ব্যক্তি—যাহার প্রাণ মরিয়াও মরিতে চাহে না, চতুর্দ্দিক হইতে পিষ্ট হইয়াও যে বাঁচিয়া থাকে। "অচলায়তন" তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—মন্ত্র আওড়াইতে গিয়া তাহার মুখ হইতে গান বাহির হইয়া পড়ে।

সমাজে যখন এই শ্রেণীর দুই একটি মানুষ দেখা দেয় তখনই বুঝিতে হইবে, গুরুর আগমনের পথ প্রস্তুত হইতেছে। দেশে যখন, এমন সকল লোক উঠিতে থাকেন যাঁহারা বলেন "আমি বাঁধা মত মানিব না, কিন্তু আমার ভিতর যে বিচার বুদ্ধি আছে তাহাকে মানিব" তখন বুঝিতে হইবে গুরু অসিহস্তে আসিতেছেন—দশের চিত্তের চাঞ্চল্য, প্রাণের বেদনা, তাহারই আভাস দেয়। হঠাৎ একটা স্থলে দরজা খোলে, প্রাণবায়ুর স্পর্শে সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে দোদুল্যমান হইতে থাকে। ক্রমে গুরু আসেন।

গ্রীষ্মে সব শুকাইয়া গিয়াছে। নিজের ভিতর হইতে জোগাইবার রস আর নাই—সব তলানিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। তখন সমস্ত বিশ্ব ব্যাকুল হইয়া বলিতে থাকে 'এস' 'এস'! অমনি গুরু আসেন তাঁহার বজ্র লইয়া, বিদ্যুৎ লইয়া। সরসতায় তিনি আকাশ ভরিয়া দেন। যাহারা মরিয়াছিল তাহারা বাঁচিয়া ওঠে, পীতবর্ণ শ্যামল হইয়া ওঠে, জরা নবীন যৌবনে পরিণত হয়। এই ঘটনা মানুষের জীবনের মধ্যেও দেখিতে পাই। সমাজ যখন কল, ধর্ম্ম যখন আচার-মাত্র, তখন সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন গুরু। প্রাচীর নীচের—চিত্ত আকাশ ভরিয়া যখন পূর্ণতার ঋতু আসেন, তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে, তাহার ত কোনও সীমা নাই!

লোহার দরজায় ঘা দিতে দিতে মনে হয়, বৃথা এই চেষ্টা। রুদ্ধ দরজাকে মুষ্টি আঘাত করিয়া হস্ত শুধু রক্তাক্ত হইতে থাকে। চেষ্টা অবশ্য জীবনের একটা লক্ষণ। কিন্তু এখানে ঠেলিয়া, ওখানে ভাঙিয়া কিছু করা বড় শক্ত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বড়, তাঁহারা গলা ভাঙিয়া মরিলেন, কিন্তু দরজা একটু ফাঁক করা আর হইয়া উঠিতেছে না। আকাশ

ভরা পূর্ণতা লইয়া গুরু আসুন—পড়ুক আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্র—সব এক মুহূর্ত্তে ঠিক হইয়া যাইবে। অনেক দিনের এই দুর্গ, মন ইহাকে মানিতে চায়, বুদ্ধিকে ইহা আচ্ছন্ন করে। পুনরাবৃত্তির পথে ঠুলি দেওয়া গরুর মত চলিয়াছি, এই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার কান্না কবে উঠিবে!

আমাদের জীবনে নিশ্চেষ্টতা সবদিক হইতে আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। প্রাণশক্তি কমিয়া আসিয়াছে, কাঁটা ফুটিলে তাহা যে বিষাক্ত ক্ষত হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গোড়ায় যে প্রাণশক্তিকে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, সেখানে যখন জোয়ার আসিবে তখনই সব সার্থক হইবে। মূলে, অধ্যাত্মিক জীবনে, প্রচুর প্রাণধারা বর্ষণ করিয়া গুরু আমাদের রক্ষা করিবেন। হাজার রূপ ধরিয়া তিনি আসিবেন। হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি বাস করিতেছেন—"বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা"—তিনি মহাত্মা, সকলের আত্মার মধ্যে তিনি কাজ করিতেছেন, সকল মনুষ্যের মধ্যে তিনি "নিবিষ্টঃ।" তিনি যখন আসেন তখন আত্মায় আত্মায় জাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হয়,—একাজ কোনও একজনের সাধ্য নহে। বসন্ত ঋতুর মত সব দিক দিয়া সকলকে তিনি পত্রপুষ্পে ভরিয়া দেন, বর্ষার মত সমস্ত তিনি প্লাবিত করিয়া দেন। ইহাই 'অচলায়তনের' বাণী।

শ্রীসন্তোষ চন্দ্র মজুমদার।

নববর্ষ।

——ঃ০ঃ——
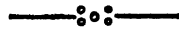
নূতনপন্থীদের বিরুদ্ধে পুরাতনপন্থীদের তরফ থেকে এই একটা প্রকাণ্ড অপবাদ ক্রমাগত আসে যে, তারা প্রাচীনের আদর জানে না; এ অপবাদ বড় কম অপবাদ নয়। প্রাচীনই ত সত্য, সেই ত আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এবং সেইই ত সৃষ্টির শেষদিন অবধি সমস্ত বাধাকে তফাতে ঠেলে দিয়ে সজোরে দাঁড়িয়ে থাকবে। এত বড় সত্য যস্মিন পক্ষে, তস্মিন পক্ষে জনার্দ্দন না থেকে যে যেতে পারে না, সে কথা নূতনপন্থীদের অবিদিত নেই। তবু তারা নূতনকে এত করে চায় কেন?—সকল অকাট্য যুক্তির সমস্ত আটক ভেঙ্গে নূতনত্বের বাণ যে আজ আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে গর্জ্জে উঠেছে,—সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্যে,—আর চোখের সুমুখে প্রতিদণ্ডে যে তার জলোচ্ছ্বাস মাটির বাঁধের প্রত্যেক পরমাণুকে কাঁপিয়ে তুলছে, একি তবে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড একটা?—না, তা নয়।

জগতে তারাই তত সংরক্ষণশীল, যারা নূতনকে যত বেশী করে আমল দেয়; আর তারাই সকলের চেয়ে পুরাতনকে চাইতে শিখেছে, যারা প্রতিক্ষণে তাদের সাদর অভ্যর্থনার রঙীণ নিশান আর দেবদারুর সবুজ পত্র সজ্জিত করে রেখেছে, নিত্যনূতনকে আদর করে গ্রহণ করবার জন্যে। হে নববর্ষ, প্রাচীনের উপাসক আমরা তাই তোমাকে সাদরে আহ্বান করছি—তুমি এস!

কোনও প্রাচীন ব্যক্তি ৯০ বৎসর বয়সে এমন একটা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন যার নাম তিনি জীবনে কখন শোনেন নি, এবং সেই একই কারণে সে রোগের ঔষধের কোন তল্লাস তিনি সমস্ত বৈদ্যশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পান নি। কোন আধুনিক ডাক্তার তাঁর জন্যে ইংরেজী ঔষধের ব্যবস্থা করায় তিনি বলেছিলেন, "বাপু হে! আজকালকার ওষুধগুলো দিয়ে আমার প্রাচীনত্ব নষ্ট কোরো না"; তাইতে আধুনিক ডাক্তারটি উত্তর করেন,—"মশাই, আপনার প্রাচীনত্ব যাতে আরো পাকা হতে পারে, অর্থাৎ আরও দশ বছর বেঁচে থেকে আপনি যাতে মরবার সময় বলে যেতে পারেন যে পুরো-পুরি century up করেছি, তারি বন্দোবস্ত করছি। আমার নতুন ওষুধ আপনার প্রাচীনত্বকে আরো প্রাচীন হবার অবসর দিচ্ছে মাত্র—নষ্ট করছে না।" আমরাও প্রাচীনপন্থীদের ডাক্তারবাবুর মত-করে ভরসা দিচ্ছি, তাঁদের পুরাতন যাতে আনাভি-শুভ্র-শ্মশ্রুরাজী পরিশোভিত হয়ে যুগ যুগ ধরে আপনাকে পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে পুরাতন হতে পুরাতনতর করে তুলতে পারে, তারি চেষ্টা করছি। আর সেইজন্যেই পুরাতনের রাজদরবারে নূতনের দূতকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এত ঘন ঘন পাঠান হচ্ছে; এতে পুরাতনের রাজত্ব দৃঢ় হয়ে উঠবে, তার শক্তি আরো অক্ষুণ্ণ হবে—এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের বলে গেছেন একটা "নতুন কিছু" করতে (অবশ্য ব্যঙ্গ করে)। এখানে "নতুন কিছু" অর্থে সৃষ্টিছাড়া কিছু, অর্থাৎ যা জগতের কোন-কিছুর সঙ্গে খাপ খায় না—একটা খাপছাড়া কিছু। আমাদের নূতন অবশ্য আদবেই তা নয়, বরং

আমার বোধ হয় এ জগতে কিছু যদি খাপছাড়া বদনামের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে আমাদেরই ঐ নূতন। সেই ত পুরাতনকে বর্ত্তমানের সঙ্গে তাল রেখে চলবার ক্রমাগত সাহায্য করে আসছে; সেই ত কালকের জগতকে আজকের জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে, হাত ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে; সেই ত তাকে প্রতিক্ষণে খাপছাড়া হতে দিচ্ছে না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আজও তাকে সৃষ্টিছাড়া হবার সমস্ত আশঙ্কা, সমস্ত সম্ভাবনার হাত হতে, সেই ত মা'র মত করে আগ্‌লে রেখে দিয়েছে। তাই আমরা আজ প্রাচীনের জীর্ণ দেউলের সর্ব্বোচ্চ পৈঠার উপর দাঁড়িয়ে নবীনকে সাদরে আহ্বান করছি, আমাদের প্রাচীনকে মহিমান্বিত করে তোলবার জন্যে। হে নবীন! তুমিই ত প্রাচীনের সমস্ত তালুক মুলুক আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে রক্ষা করে আসছো, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর মত। তুমিই ত প্রাচীনকে আজও নিঃস্ব হবার সমস্ত সম্ভাবনা হতে বাঁচিয়ে রেখেছ, তাই তোমার উপাসক আমরা নিজেদের সকলের চেয়ে সংরক্ষণবাদী বলে গর্ব্ব করে থাকি। তাই তোমাকে যারা ভালবাসে, তাদের আমরা সকলের চেয়ে প্রাচীন-ভক্ত বলে শ্রদ্ধা করি।

নবীনের ঐ সূক্ষ্ম গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে কত বড় প্রাচীনতার গাম্ভীর্য্য যে লুকিয়ে রয়েছে, তা যদি সকলে দেখতে পেতো, তাহলে নবীনের জন্যে ঘরে ঘরে উৎসব জেগে উঠতো, তার আগমনের পথ কুসুমাস্তৃত হয়ে উঠতো।

যা অপরিচিত তাইত নূতন, যাকে চিনতে যত বেশী দেরি হয় সে তত বেশী নূতন; আর পুরাতন সেই, যাকে দেখলেই চিনতে পারি। আজকের এই যুগে আমরা কি চিনিনা বেশী করে জাতিভেদ-বিদ্বেষকে

জাতিভেদ-প্রিয়তার চেয়ে? আমরা কি চিনিনা, বিধবাবিবাহকে একাদশী-তত্ত্বের গূঢ়তার চেয়ে? আমরা কি চিনিনা বঙ্কিম বাবুকে তর্কপঞ্চাননের মুণ্ডিতমস্তকপরিশোভিত বিশাল বপুর চেয়ে? এরাই কি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অর্গল একে একে খুলে দিয়ে একেবারে তার অন্তস্তলে অতি বড় পরিচিতের মত প্রবেশ করেনি? আর অন্যগুলো বাইরে রাজপথে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে নেড়ে একে একে ফিরে যাচ্ছে নাকি?—তবে পুরাতন কে? হে নবীন! তুমিই পুরাতন। তুমিই ত প্রতিক্ষণে যা-কিছু নূতন আছে তাকে আমাদের কাছে পুরাতন করে তুলছো; তুমিই ত যা-কিছু অপরিচিত তাকে পরিচিত করে তুলছো। হে নববর্ষ! তাই তোমাকে প্রাচীনের তরফ থেকে অভিনন্দন দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর। হে প্রাচীন! হে চিরন্তন! তোমার আগমনী তাই আজ আকুল কণ্ঠে গাইছি; তোমার পূজার অর্ঘ্য তাই এত ভক্তি এত শ্রদ্ধার সঙ্গে রচনা করছি—তুমি এস। তোমার আগমনে সমস্ত দেশ জেগে উঠুক,—তন্দ্রা টুটে, আলস্য অবসাদ জড়তা দূরে ঠেলে দিয়ে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

পত্র।

——:০:——

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু,—

তুমি যে আমার প্রিয়শিষ্য, লোকে বলে তার প্রধান কারণ—তোমার রূপ আছে। তোমার প্রতি আমার প্রীতির প্রধান কারণ ঐ না হলেও যে প্রথম কারণ, এ কথা অস্বীকার করা আমি মোটেই আবশ্যক মনে করিনে। আমি জীবনের অর্দ্ধেকের চাইতে বেশী পথ পার হয়ে এসেছি, এবং চোখ চেয়ে চলা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কিন্তু এত দিনেও পথিমধ্যে এ সত্যের আমি সাক্ষাৎ পাই নি যে, রূপের অভাবেই গুণের পরিচয়। রূপ যে একটা গুণ, এবং অসামান্য গুণ—এ কথা অস্বীকার করবার জন্য এত লোক যে কেন এত উৎসুক, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। রূপ হচ্ছে বিধাতার নিজের হাতের লেখা পরিচয়পত্র,—তা সে জড়েরই হোক, আর জীবেরই হোক। শুধু তাই নয়, ও পত্র হচ্ছে, ইংরাজিতে যাকে বলে খোলা-চিঠি। ভগবান বিশ্বমানবের চোখের সুমুখে তা ধরে দিয়েছেন—সে সুপারিস অগ্রাহ্য করার ভিতর বিনয় নেই, বিচার নেই,—আছে শুধু হয় অন্ধতা নয় পরশ্রীকাতরতা।

দাঁড়াও, এ কথা শুনে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠো না। ভগবান মানুষকে যা দিয়েছেন, তার যথেষ্ট মর্য্যাদা থাকলেও—মানুষ নিজে যা

দিতে পারে, মানুষের কাছে তার মূল্য ঢের বেশী। রূপ শুধু পূর্ব্ব-রাগের জন্ম দেয়, কিন্তু যে সব কারণে সে রাগ অনুরাগে পরিণত হয়, তার সংখ্যা অসংখ্য; কেননা এ ক্ষেত্রে মানুষের প্রবৃত্তির চাইতে তার প্রকৃতি প্রবল। প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তের, প্রকৃতি চিরদিনের। তুমি যে আমার প্রিয়শিষ্য, তার বিশেষ কারণ, তুমি একাধারে আমার শিষ্য ও গুরু। কথাটা একটু নতুন শোনাচ্ছে। কিন্তু তা বলে কি করা যাবে? কথাটা যে সত্য! সত্যকথা ত চিরদিনই নতুন শোনায়। সত্যের ধর্ম্মই ত এই যে, তা কখনও পুরোণো হয় না, কিন্তু মানুষকে তা যুগে যুগে নতুন করে চিন্‌তে হয়। এই নিয়েই ত যত মুস্কিল। সে যাই হো'ক্, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে মনের কারবারে পরস্পরের আদান প্রদানের সম্বন্ধ, এ ব্যাপার এতই প্রত্যক্ষ যে, তা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। গুরু যদি হন শুধু বক্তা, আর শিষ্য শুধু শ্রোতা—তাহলে পৃথিবীতে গ্রামোফোনের তুল্য আর দ্বিতীয় গুরু নেই। যদি পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে যেখানে গুরু কালা আর শিষ্য বোবা, তাহলে আর যিনিই হন, তুমি আমি সে দেশের লোক নই। কে কার কাছ থেকে মনের খোরাক কতটা আদায় কর্‌তে পারে, এই নিয়ে যেখানে পরস্পরের রেষারেষি জেগে ওঠে, সেইখানেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ পাকা। তুমি তর্ক করে, প্রতিবাদ করে, আপত্তি জানিয়ে, উপদেশ দিয়ে আমাকে অস্থির করে তোলো,—এই গুণেই ত তুমি আমার প্রিয়শিষ্য।

তুমি আমাকে প্রবন্ধ লেখা থেকে ক্ষান্ত হতে অনুরোধ করেছ। এ অনুরোধ আমি আদেশ হিসেবে শিরোধার্য্য কর্‌ছি। আমার মনেও কিছুকাল হতে প্রবন্ধের প্রতি বিরতি জন্মেছে। তার কারণ

প্রবন্ধ জিনিসটে সাহিত্য কিনা, এই নিয়ে আমি এদানিক মাথা বকাচ্ছিলুম, কিন্তু কোনও একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি; এমন সময়ে তোমার একটি কথায় আমার সকল দ্বিধা দূর করে দিলে। তুমি লিখেছ—"প্রবন্ধ স্ত্রীলোকে পড়ে না, পড়্‌তে চায় না, পড়্‌তে পারে না এবং পড়্‌লে কাতর হয়ে পড়ে।"

এ কথা যে সত্য, তা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই। প্রবন্ধ জিনিসটি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ছাঁচে ঢালাই করা; এবং ইউক্লিড আর যারই হন্—স্ত্রীলোকের প্রিয় লেখক নন। ও-জাতির কাছে আসল বস্তুই হচ্ছে Q. E. D.—তার প্রমাণ-প্রয়োগ যেমন অবান্তর, তেমনি বিরক্তিকর। ভাল কথা, ইউক্লিড সম্বন্ধে সেদিন কোন্ একখানা বইয়ে একটা কথা পড়ছিলুম, যা শুনে তুমি না হেসে থাক্‌তে পার্‌বে না। ও ভদ্রলোক স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে থাক্‌তেন! এর কারণ শুন্‌লে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ইউক্লিড ছিলেন মেগারার অধিবাসী। তখন মেগারার সঙ্গে আথেন্সের ঘোর শত্রুতা চলছিল। মেগারার লোকের আথেন্সে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, সে নিষেধ অমান্য করে কেউ আথেন্সে দেখা দিলে তার প্রাণদণ্ড হত। ইউক্লিড কিন্তু নিজের প্রাণের চাইতে তাঁর গুরু সক্রেটিসের মুখের কথা এত বেশী বহুমূল্য মনে কর্‌তেন, যে তিনি মেয়ে সেজে রাত্রিযোগে আথেন্সে যাতায়াত কর্‌তেন। তাঁর রূপের গুণে তাঁর ছদ্মবেশ কখনও ধরা পড়ে নি। এমন অভিসারিকার কথা এ দেশে কেউ কখন পড়েছে, না শুনেছে? এর পর তাঁর মন থেকে যে ঐ সব ভীষণ প্রতিজ্ঞা বেরবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ইউক্লিড নারীবেশই ধারণ করুন আর যাই করুন, যে লেখার ভিতর ইউক্লিডের রূপ আছে, তা মেয়ে-

ভোলানো লেখা নয়। অতএব দাঁড়াল এই যে, প্রবন্ধের স্থান—সাহিত্যের না হোক—বাংলা সাহিত্যের বাইরে। তুমি একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছ, সে হচ্ছে এই যে, আমার প্রবন্ধ এদেশের অনেক পুরুষেও "পড়ে না, পড়্‌তে চায় না, পড়্‌তে পারে না, এবং পড়্‌লে কাতর হয়ে পড়ে"।

এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ কার জন্য লেখা? তার সন্ধান আমি সম্প্রতি পেয়েছি।

কোনও সমালোচক লিখেছেন যে, আমার হাত থেকে যা বেরয় তা হচ্ছে সব "চক্‌চকে খেলনা"। অর্থাৎ আমার লেখা আসলে ছেলে ভোলানো। এই সমালোচনাই প্রমাণ যে আমার লেখা সার্থক হয়েছে—কেননা বাংলাদেশে আমার লেখার খোদ্দেরের অভাব হবে না।

সে যাই হো'ক, তোমার কথায় প্রবন্ধ লেখায় না হয় খতম দিলুম—তারপর কি লিখব? কবিতা? গদ্যের অসি ছেড়ে পদ্যের বাঁশি ধরব? সাহিত্যের স্কুলে এরকম ডবল-প্রমোশান পেতে কার না লোভ হয়, কিন্তু এ বয়েসেও ও-লোভ যে সম্বরণ কর্‌তে না শিখেছে, তার হাত থেকে—অসি বাঁশী ত বড় জিনিস—কলমও কেড়ে নেওয়া উচিত! পঞ্চাশ বৎসরের লোককেও যে ধরে বেঁধে অসিধারী করা যায়, তার প্রমান ত আজ নানাদেশে পাওয়া-যাচ্ছে। কিন্তু Conscription-এর সাহায্যে মানুষকে যে বংশীধারী করা যায়, এর প্রমাণ আজও মেলে নি। এর কারণ হিংসা করবার ক্ষমতা বুড়োহাড়েও থাকে, কিন্তু আনন্দ দেবার শক্তি যৌবনেরই সহোদর।

দেখো, কে কি লিখবে তার চেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে কে কি পড়বে। তুমি কি পড়ে এই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবে, সে বিষয়ে আমার

পরামর্শ চেয়েছে। আমি বলি, যে লেখার রূপ নেই তা তুমি পড়োনা, হোক না সে লেখা ওজনে ভারি। তুমি যদি রচনার রূপ উপভোগ কর্‌তে শেখো, তাহলেই তুমি মনোজগতে মুক্তপুরুষ হয়ে যাবে। চণ্ডীদাস বলেছেন—

"রজকিণীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়"

তাঁর কথা অবলম্বন করে' আমি বল্‌ছি যে, যে রূপের ভিতর কামগন্ধ নেই, সে রূপের সন্ধান শুধু আর্টে পাওয়া যায়। অবশ্য এ স্থলে "কাম" শব্দ তার কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝলে চল্‌বে না। যে রূপ মানুষের কামনার বহির্ভূত, সেই রূপ যে চিনতে শিখেছে, একমাত্র সে-ই রসের স্বরূপের সাক্ষাৎ পায়। বলা বাহুল্য একই লেখা এক-জনের কাছে কামগন্ধে ভুরভুর কর্‌তে পারে, কিন্তু আর একজনের কাছে তার ভিতর কামের নামগন্ধও না থাক্‌তে পারে। সেটা নির্ভর করে কার মন কোথায় আছে তার উপর—কামলোকে না রূপলোকে?

কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা যে রকম সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে করে কি লিখব কি পড়ব তার চেয়ে ঢের বেশী ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, দেশে আর লেখাপড়া করা চল্‌বে কিনা? এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, দেশে যখন মহামারি দেখা দেয়, তখন লোকে পুজো সরস্বতীর করে না, করে রক্ষাকালীর; অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার মানুষে সহজ উপায় বার করেছে—মৃত্যুরই উপাসনা করা। আত্মরক্ষার এ প্রচেষ্টা নিরর্থক বলে' কোনও লাভ নেই, কেননা, এ চেষ্টার মূলে যা আছে তা হচ্ছে মানুষের প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞা নয়,—বিচলিত হৃদয়।

আজ আমাদের পশ্চিম আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে। যে সমরানল সমগ্র ইউরোপে ও অর্দ্ধেক এসিয়াতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে; সে আগুন শুন্‌ছি আমাদের ঘরেও লাগবার সম্ভাবনা; এবং সে সম্ভাবনাও সুদূর নয়, কেননা যে যুগে বাস্প আর বিদ্যুৎ হয়েছে মানুষের বাহন, সে যুগে 'দূর' শব্দের কোনও জানা শোনা মানে নেই। এ সকল দুর্নিমিত্ত দেখে আমরা সকলেই ভীত না হয়ে পড়ি, ত্রস্ত হয়ে উঠেছি। তাদৃশ ভীত না হবার কারণ, আমরা আমাদের চিরকেলে অভ্যাসবশত সাপকে লতা বলে' মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, যদিচ আমরা সকলেই জানি, লতা বল্‌লেও সাপ সাপই থাকে এবং তার কামড়ে মানুষ মরে। আর জর্ম্মাণি যে সে সাপ নয়, একেবারে অজগর।

এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য তা বলে দেবার ভার রইল, আমাদের পলিটিকাল নেতাদের হাতে। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে" এ কথা যদি সত্য হয়—এবং এ কথা যে সত্য তা এক পলিটিসিয়ান ছাড়া আর কে অস্বীকার কর্‌বে—তাহলে দেশের লোককে তাদের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হতে, আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। কেননা সাহিত্যের কাজ, কাউকে কর্ত্তব্য শেখানো নয়, সকলকে আনন্দ দেওয়া।

এ পর্য্যন্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। তারপর প্রশ্ন ওঠে এ অবস্থায় সরস্বতীর সেবকদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য। প্রথমেই মনে হয় এ সমস্যার সহজ মীমাংসা হচ্ছে সাহিত্যের দোকানপাট তুলে দেওয়া। এই আসন্ন বিপদের দিনে আমরা লিখতে পারি, কিন্তু সে লেখা পড়বে কে? কিন্তু দোয়াত কলমের সংস্রব না হয় আমরা ত্যাগ করলুম, তাই বলে কি দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে পুঁথির

সংস্পর্শ ত্যাগ করা সঙ্গত হবে? ঝড় বলো, ভূমিকম্প বলো, বন্যা বলো, এ সব ব্যাপার অতি ভীষণ হলেও ক্ষণস্থায়ী, আর সাহিত্য অতি সুকুমার হলেও চিরস্থায়ী। সুতরাং দুর্দ্দিনেও তা অপরিহার্য্য। তবে সুদিনের সাহিত্য ও দুর্দ্দিনের সাহিত্য অবশ্য এক নয়।

গেটে বলেন, দেশে যখন মহামারি উপস্থিত হয় তখন লোকের পড়া উচিত টনিক সাহিত্য। এ উপদেশ যখন গেটের তখন, আমাদের সকলকে তা মাথা পেতে নিতে হবে। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে "টনিক" বিশেষণের সার্থকতা কি তা আন্দাজ কর্‌তে পারলেও দুকথায় বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে কোন্ সাহিত্য যে টনিক নয়, সে কথা বলা তেমন শক্ত নয়।

প্রথমত আমাদের চল্‌তি সাহিত্যের কথা ধরা যাক্। যে সাহিত্যের দিনে দুবার জন্ম হয়, সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আর বক্তৃতার মঞ্চে, আর যার নাম পলিটিকাল সাহিত্য, তা অবশ্য মোটেই টনিক নয়। সে সাহিত্যের যে রস, তা আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে রস মিশ্র এবং লোকে বলে তা বিলেতি। করুণ রসের "সোডার" সঙ্গে বীররসের "আসিড" মিশিয়ে তা তৈরি কর্‌তে হয়। তাই পলিটিকাল সাহিত্য প্রথমত আপাদমস্তক ফেনিল, তার পর সে সাহিত্য উথলে ওঠে অথচ তার ভিতর তাপ নেই, ফোঁস ফোঁস করে অথচ তার ভিতর প্রাণ নেই। সে সাহিত্য যে এতটা লোকপ্রিয় তার কারণ, ও ফেন গলাধঃকরণ করবার সময়, ভোক্তার ভিতরটা ক্ষণিকের জন্য চিন্‌চিন্ করে' ওঠে, আর সে মনে করে জিনিসটা ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্দ্ধক। বলা বাহুল্য ও ধারণা একটা ভ্রান্তি মাত্র। অথচ আমাদের রাজনীতি, দেশের মনের অগ্নিমান্দ্যের জন্য

কোনও টনিক অদ্যাবধি তৈরি করতে পারে নি। ও সাহিত্যের যা কিছু হেরফের সে শুধু ঐ দুই বস্তুর মাত্রা নিয়ে। আমাদের পলিটি-ক্সের যে দুদল হয়েছে তার কারণ এদের এক দলের সাহিত্যে সোডার ভাগ বেশী, আর এক দলের সাহিত্যে আসিডের।

আজকের দিনে এ সাহিত্য যে রূপধারণ করেছে তাতে মানুষকে চাঙ্গা করা দূরে থাক, দ্বিগুণ দমিয়ে দেয়। এই রক্ত-সন্ধ্যার করাল আলোকে আমাদের সকল অক্ষমতা, সকল দৈন্য, আরও বেশী করে ফুটে উঠছে। অমনি আমাদের পলিটিকাল সাহিত্য, আমাদের দুরবস্থার ছবি নৈরাশ্যের কালীতে এঁকে সকলের চোখের সুমুখে ধরে দিচ্ছে। আমাদের ইতিহাস যদি অন্যরূপ হত তাহলে আমরা যে অন্যরূপ হতে পারতুম, এই কথাটা নানাসুরে নানাছাঁদে বলা হচ্ছে,—কিন্তু আমরা অন্যরূপ হলে যে আমাদের ইতিহাস অন্যরূপ হতে পারত, এমন কি এখনও হতে পারে, এ কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। ইতিহাস যে মানুষ গড়ে তা আমরা সকলেই জানি,—কিন্তু আমাদের এটাও জানা উচিত যে মানুষেও ইতিহাস গড়ে। এ সত্য যদি আমরা উপেক্ষা না করতুম, তাহলে ইতিহাস আমাদের গড়্‌ত না, আমরা ইতিহাস গড়তুম। মানুষের জীবন কতক অংশে অদৃষ্ট ও কতক অংশে পুরুষকারের অধীন। যে সাহিত্য পুরুষকারের গুণ গায় তাই টনিক, আর যা অদৃষ্টের দোষ দেয় তাই আণ্টি-টনিক।

সুতরাং টনিক সাহিত্যের সন্ধানে আমাদের বর্ত্তমানের দৈনিক সাহিত্যের বাইরে যেতে হবে। এবং আমরা ভারতবর্ষের অতীতের যত দূরদেশে যাব, তত বেশী টনিক সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাব।

বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই, কিন্তু সে

সাহিত্যের যে দুটি একটি বাণী আমার কানে এসে পৌঁচেছে তার তুল্য টনিক কথা ভূভারতে আর নেই। গায়ত্রী মন্ত্রের মত, আত্মার বল-কারক মন্ত্র বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। ওর ভিতর কোনও রূপ ভিক্ষা, প্রার্থনা, দরবার, কিম্বা আবদারের নামমাত্র নেই। মানুষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বরেণ্য বস্তু যে আলোক, বাইরের এবং ভিতরের, এ সত্য যদি আমরা বিস্মৃত না হতুম তাহলে আমাদের এ দুর্দ্দশা হত না।

তার পর প্রাচীন যুগের আগাগোড়া সংস্কৃত সাহিত্য টনিক, তা সে ধর্ম্মশাস্ত্রই হোক্ আর মোক্ষশাস্ত্রই হোক্। গীতা যে, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দেয় না—তা সকলেই জানেন। মনুও যে দেন না, তার পরিচয় মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখতে পাবেন। সেকালে যিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌তেন তাঁর মহাপ্রস্থানের দুঃসাহিসকতার কথা কল্পনা করতেও আমাদের রোমাঞ্চ হয়। এমন কি, সংস্কৃত কামশাস্ত্রে যে কামের চর্চ্চার কথা আছে তা কর্‌তে পারে শুধু সেই লোক—যার হৃদয় পাষাণে আর দেহ ইস্পাতে গড়া। ও সাহিত্য অবশ্য টনিক নয়, একেবারে বিষবড়ি!

হয়ত অনেকে বলবেন, এ সব শাস্ত্র সাহিত্যই নয়। তথাস্তু। অতঃপর সাহিত্যেই আসা যাক্। মহাভারত যে টনিক এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই।

রামায়ণ অবশ্য মহাভারতের সমশ্রেণীর কাব্য নয়। এ কাব্য আর্য্য-সভ্যতার সঙ্গে অনার্য্য সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী। এই সংঘর্ষে অবশ্য আর্য্যসভ্যতাই জয়ী হয়েছিল, কিন্তু এ কাব্যের অন্তরে উত্তরাপথের টনিক সভ্যতার সঙ্গে দক্ষিণাপথের অটনিক সভ্যতার স্পর্শের প্রথম

পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই সূত্রে sentimentalism প্রবেশ লাভ করে।

ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে যথার্থ কাব্যের রাজ্যে এলেও আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই যে—সংস্কৃত কাব্য যত প্রাচীন তত টনিক, এবং যত অর্ব্বাচীন তত অস্বাস্থ্যকর। ভাসের নাটকের সঙ্গে জয়দেবের পদাবলীর তুলনা কর্‌লে এ সত্য সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিমধ্যের ইতিহাস এই অধঃপতনের ইতিহাস। যুগের পর যুগে তার দুর্ব্বলতা যে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, একই শ্রেণীর পূর্ব্বাপর কাব্যের তুলনা কর্‌লে তার প্রমাণ অসংখ্য পাওয়া যায়। শকুন্তলার রসের সঙ্গে উত্তররাম চরিতের রসের সেই প্রভেদ, হৃদয়ের রক্তের সঙ্গে চোখের জলের যে প্রভেদ। অমরুশতক মকরধ্বজ কি না জানি নে—কিন্তু ভর্তৃহরির শতকের প্রতি শ্লোক যে strychnine-এর পিল তাতে আর সন্দেহ নেই। এক কথায় মন্দাকিনীর জল টনিক, ভোগবতীর নয়। আর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন কাব্যের সঙ্গে অর্ব্বাচীন কাব্যের সেই প্রভেদ, মন্দাকিনীর সঙ্গে ভোগবতীর যে প্রভেদ।

আমার কথা ভুল বুঝোনা। আমি এ কথা বল্‌তে চাইনে যে, যে লেখা টনিক নয় তা সাহিত্য নয়। তাহলে ত বাংলা ভাষার বারো আনা লেখা সাহিত্যের বাইরে পড়ে যায়। আমার বক্তব্য এই যে, যে সাহিত্য টনিক নয়—মহামারীর প্রকোপের ভিতর তার পঠন পাঠন সমীচীন নয়; অবশ্য যদি গেটের মত আমরা মান্য করি।

আমি নিজে যে ও মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি নে, তার প্রমাণ, যুদ্ধের নাম শোনবামাত্রই, প্রথম কথা যা আমার মনে পড়ে গেল, সে হচ্ছে

অহিংসা পরম ধর্ম্ম। এই যে মানব সভ্যতার শেষ কথা তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডেও আমার এ বিশ্বাস টলাতে পারে নি, কেননা এ ব্যাপার এই সত্যেরই প্রমাণ দিচ্ছে যে, মানুষ আজও তার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে নি। নর সংস্কৃত-বানর কিম্বা বানর নরের অপভ্রংশ এ নিয়ে জীবতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে আজও তর্ক চল্‌ছে। তাত্ত্বিক ও তার্কিকদের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই, মানুষেও মর্কটে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত যথেষ্ট মিল আছে। মর্কটের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কি না জানি নে— কিন্তু মানুষের ভিতর যে মর্কটত্ব আছে তা অস্বীকার করবার জো নেই। মানুষে মানুষে যা প্রভেদ, সে হচ্ছে প্রধানত এই মনুষ্যত্ব ও মর্কটত্বের অনুপাত নিয়ে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এ হচ্ছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বাণী, অতএব আমাদের অন্তর্নিহিত মর্কট সে বাণীকে অবজ্ঞা করে' উপহাস করে' বলে, ও হচ্ছে দুর্ব্বলের ধর্ম্ম।

এ অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণ, যে যুগে ভারতবর্ষ এই ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেছিল সেই হচ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব শক্তির যুগ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে কলায়, সাম্রাজ্যে ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের কৃতিত্বের আর তুলনা নেই। তার কারণ, শুধু রণক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকলক্ষেত্রে যারা বীর তারা ছাড়া আর কেউ ও ধর্ম্ম যথার্থ গ্রহণ ও পালন করতে পারে না। কেননা ও ধর্ম্ম অনুসরণ করবার ভিতর যে বীরত্ব, তা ক্ষণিকের নয় চিরজীবনের। সে বার্য্যের অন্তরে অগাধ করুণা আর অটল ধৈর্য্য সমান থাকা চাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে বীরের ধর্ম্ম, সে জ্ঞান আদি বৌদ্ধদের পূর্ণমাত্রায় ছিল সেইজন্যে তাঁদের কথা-সাহিত্যের নাম "অবদান" অর্থাৎ বীর কাহিনী।

এ সাহিত্য আমি পূর্ব্বে কখনও শ্রদ্ধাভরে পড়ি নি,—কেননা জাতকমালার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় থেকে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে ও হচ্ছে ছোটছেলের সাহিত্য। কিন্তু সেই জাতকমালা সে দিন আবার পড়্‌তে গিয়ে তার ভিতর এক মহাবস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, সে হচ্ছে মানুষের আত্মনির্ভরতার মহত্ব। বৌদ্ধযুগ যে শক্তির যুগ, তার কারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মানুষকে তার আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে শিখিয়েছিল। শাক্যসিংহ যে, মানুষের হাতেগড়া মানুষের পায়ের বেড়ি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তাদের হাতের কড়া ও খুলে দিয়েছিলেন—তাঁর ধর্ম্মপুত্রেরা দেবতার কাছেও হাতজোড় কর্‌তেন না। তাঁদের চিরনির্ভর স্থল ছিল, নিজের ধর্ম্মবল ও নিজের কর্ম্মবল। তুমি ভাব্‌ছ আমি আজ কি একটা খেয়ালের মাথায় বৌদ্ধদের আকাশে তুলে দিচ্ছি। এ সব যে আমার কল্পনা নয় তার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে সংক্ষেপে সুপারগ জাতকের গল্পটি বলছি।

পুরাকালে ভারতবর্ষে একটি মহাসত্ব পরমনিপুণমতি নৌ-সারথি ছিলেন। তাঁর যাত্রাসিদ্ধির গুণে লোকসমাজে তিনি সুপারগ নামে প্রসিদ্ধ হন। কোনও এক সময়ে সুবর্ণভূমির বণিকগণ সাগরপারে যাবার সংকল্প করে সুপারগের দ্বারস্থ হন। বার্দ্ধক্যবশত তখন তাঁর দেহ জরাশিথিল হয়ে পড়েছিল, দৃষ্টিক্ষীণ হয়ে এসেছিল, স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়েছিল, বলে' প্রথমে তিনি মহাসমুদ্র যাত্রা করতে স্বীকৃত হন নি ; নিজের জীবনের ভয়ে নয়, যাত্রীর বিপদ আশঙ্কা করে। বণিকগণের নির্বন্ধাতিশয্য অতিক্রম কর্‌তে না পেরে অবশেষে তিনি ভরুকচ্ছ হতে মহাসমুদ্র যাত্রা কর্‌লেন। দিনটা ভালয় ভালয় কেটে গেল, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সে ঝড়ের বর্ণনা এত সুন্দর

যে তা অনুবাদ করবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন কিন্তু এখন তার সময় নেই। সে বর্ণনা তুমি জাতকমালায় পড়ে দেখো। এই ঝড়ের মধ্যে সাংযাত্রিকেরা কে কি করলেন শোনো—

"নিজ নিজ সত্বগুণ অনুসারে কেউ বা ত্রাসদীন হয়ে পড়্‌ল, কেউ বা বিষাদমূক, কেউ বা স্বদেবতার নিকট প্রাণ যাচ্ঞা করতে লাগল, কেউ বা ধীরভাবে অবস্থিতি করতে লাগল, কেউ বা প্রতিকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হল।"

তখন যারা ভয়বিষাদে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল সুপারগ তাদের সম্বোধন করে বল্‌লেন—

"যারা মহাসমুদ্রে অবতরণ করে তাদের কাছে এইরূপ ঔৎপাতিকক্ষোভ পরিক্লেশ মোটেই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নয়;—অতএব তোমরা বৃথা বিষাদকে আশ্রয় করো না। বিষাদ, বিপদের প্রতিকারবিধি নয়—সুতরাং দীনচেতা হওয়ায় কোনও লাভ নেই। যারা ধীর কেবলমাত্র তারাই কার্য্যউদ্ধারে দক্ষ, কেন না তারা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা কৃচ্ছ্র অবস্থা হতে উদ্ধারলাভ করে। তোমরা সকলে বিষাদ দৈন্য পরিহার করে এ বিপদ হতে যাতে উদ্ধার পাওয়া যায় সেই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করো। যে প্রাজ্ঞ তার ধৈর্য্যজ্বলিত তেজ সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভে অগ্রহস্ত।

ঝড় কিন্তু উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল শেষে যখন সকলে প্রাণের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হল তখন সাংযাত্রিকেরা

"কেউ বা রোদন করতে লাগল, কেউ বা কখন বিলাপ, কখন চিৎকার করতে লাগল, কেউ বা ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে জড় পদার্থের মত অবস্থিতি করতে লাগল, কেউ বা ভয়কাতরচিত্তে ইন্দ্রকে প্রণাম করতে লাগল, কেউ বা আদিত্যকে কেউ বা বসুকে কেউ বা বায়ুকে কেউ বা সমুদ্রকে। কেউ বা মন্ত্র জপ করতে প্রবৃত্ত হ'ল, অপর অনেকে বিচিত্র আকারে বিধিমত প্রকারে

দেবীকে প্রণাম করতে লাগল। কেউ বা সুপারগের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে আক্ষেপ করতে লাগল।"

এই ব্যাপার দেখে সুপারগ সাংযাত্রিকদের সম্বোধন করে বললেন "তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য ধরে থাকো উদ্ধারের একটী উপায়ের কথা আমার মনে হয়েছে।" এই বলে তিনি দক্ষিণ জানু নৌকাবক্ষে স্থাপন করে নৌকাকে প্রণাম করে এই শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

"আমি আমার আত্মাকে যতই স্মরণ করছি, ততই আমার স্মরণ হচ্ছে যে যত দিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি কখনও প্রাণীহিংসার চিন্তাও মনের মধ্যে স্থান দিই নি। এই সত্যবাক্যবলে ও আমার সেই পুণ্যের বলে এই নৌকা বড়বার মুখহতে প্রতিনিবৃত্ত হউক।

অমনি বায়ুর বেগ মন্দীভূত হল, নৌকা বড়বার মুখ হতে প্রতি-নিবৃত্ত হয়ে, মহাসমুদ্রের বক্ষে, নির্ম্মল আকাশে রাজহংসীর মত শোভা পেতে লাগল।

সাহিত্য এর চাইতে আর কত বেশী টনিক হতে পারে? এই যুদ্ধের ঝড় যদি ভারতবর্ষের ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলে ভারতবাসীদের অবস্থা যে ঐ সাংযাত্রিকদের মতই হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমাদের কপালে অমন সুপারগ মিলবে কি না? আজ এইখানেই শেষ করি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

২৬শে এপ্রিল ১৯১৮

বীরবল।

দেশের কথা।

—:*:—

গত বৎসরের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে, মণ্টেগু সাহেবের ভারতবর্ষে পদার্পণ। তাঁর আগমনে, আমাদের পলিটিকাল আত্মা যে কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অতিমাত্র চঞ্চলতায় ও মুখরতায়। কিন্তু আজ যখন সোরগোল মাতামাতি অনেকটা কমে এসেছে, তখন একটু ধীরভাবে ভেবে দেখা যাক্ ব্যাপারটা হ'ল কি।

মণ্টেগু সাহেব এসেছিলেন বোধহয় আমাদের পলিটিকাল জ্ঞান এগজামিন কর্‌বার জন্যে। তিনি আমাদের কাছে থেকে তাঁর প্রশ্নের লিখিত জবাব আর মুখের জবাব, দুইই নিয়েছেন। শুন্‌তে পাই vivaতে আমাদের অধিকাংশ নেতাই একদম ফেল করেছেন—কিন্তু লিখিত জবাবে সকলেই ফাষ্টক্লাস পাস করেছেন। Problem কষতে আমাদের তুল্য আর কে আছে?—তা সে জ্যামিতিরই হোক্ আর রাজনীতিরই হোক্। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এ পরীক্ষার জবাবগুলি সব যদি একত্র করে ছাপানো যায়, তাহলে এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, যা পড়ে আমরা চিরজীবন হাস্‌তে পার্‌ব; এক কথায় ও গ্রন্থ হবে নব-ভারতবর্ষের নবকথা সরিৎসাগর।

সে যাই হোক, মণ্টেগু সাহেবের আগমনের একটা মস্ত সুফল ফলেছে। আমরা আমাদের পলিটিকাল দাবীর আরজি প্রস্তুত কর্‌তে

বাধ্য হবার দরুণ, আমাদের নিতান্ত অস্পষ্ট পলিটিকাল মনোভাবকে স্পষ্ট কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। এ একটি মহালাভ। আমরা আজ সকলেই জানি যে, আমাদের পলিটিক্সের নানা দলের কে কি চান্‌। এর ভিতর থেকে একটি খুব মোটা সত্য বেরিয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে—স্বরাজ শব্দের অর্থ বাংলা একভাবে বোঝে, আর বাকি ভারতবর্ষ আর একভাবে বোঝে;—অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে অন্য প্রদেশের পলিটিকাল নেতারা স্ব স্ব প্রদেশের যথার্থ মুখপাত্র। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাকি ভারতবাসীদের এ বিষয়ে মনের অমিল এতটা বেশী যে, এ অমিলের মুল কোথায় তা একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বরাজ হচ্ছে ইংরাজি self-governmentএর ভাষায় অনুবাদ, অতএব-home-rule এরও অনুবাদ—কেন না ও দুই একই বস্তু, তফাৎ যা তা ভাষায়। একটির ভাষা সাধু, আর একটির অসাধু। এ কথা শুনে অবশ্য ও দুই দলই প্রতিবাদ করে উঠবেন। তাঁরা বলবেন, ও দুই সমাসের আভিধানিক অর্থ এক হলেও, ব্যঞ্জনার প্রভেদ ঢের। কিন্তু এ দুই পক্ষের প্রতি নজর দিলেই দেখা যায় যে উভয়ের প্রভেদ, ব্যঞ্জনার নয়—ব্যক্তির। তথাপি স্বরাজ অর্থে যে ভারতবর্ষের নানাদেশে, নানাদলে, নানালোকে নানা বস্তু বোঝে, তার দেদার দলিল মণ্টেগু সাহেবের সেরেস্তায় পাওয়া যাবে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আমাদের প্রতি দলের পকেটে এক একটি নিজস্ব মনগড়া স্বরাজ আছে; অথবা সকলের মুখে ও পদ থাক্‌লেও, কারও মনে ও পদার্থ নেই। বোধহয় এই কারণে শেষটা গত কংগ্রেসে সকল প্রদেশের সকল নেতা এক হয়ে কংগ্রেস-লীগের মুসাবিদা গ্রাহ্য করেছেন। এ কথা ত সবাই জানেন। কিন্তু এ কথা হয়ত সবাই জানেন না যে,

এ ব্যাপারে একমাত্র প্রতিবাদী হয়েছিল বাংলা। কংগ্রেসের গ্রীনরুমে যাঁদের প্রবেশাধিকার আছে তাঁরাই জানেন যে, সেখানে কোনও বাঙ্গালী, কংগ্রেস-লীগের দুহাতে গড়া স্বরাজ মাথা পেতে নিতে পারেন নি ; কেননা তা গ্রাহ্য করে নেবার কোনও বৈধ কারণ নেই। স্বরাজের প্রথম আরজি বড়লাট সভার উনিশ জন দেশীসভ্য দস্তখত করে ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। সে আরজি অবশ্য একটা খসড়া বই আর কিছুই নয়, কেননা সে আরজি রাতারাতি তৈরি কর্‌তে হয়েছিল, সবদিক ভেবেচিন্তে একটা পাকা দলিল তৈরি করবার তাঁদের অবসর ছিল না ; অন্ততঃ এই ত তাঁদের কৈফিয়ৎ। সেই খসড়াই একটু আধটু বদলসদল করে নিয়ে কংগ্রেস-লীগ আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং এ দুয়ের প্রভেদ যা, তা উনিশ বিশ। অথচ কংগ্রেস এই জিনিসই শিরোধার্য্য করে নিলেন, ; শুধু তাই নয়, আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে এমনটি আর হয় নি, হবে না, হতে পারে না।

এই সূত্রে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক রাজনৈতিক দর্শনের একটি নূতন তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের উচ্চমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঝাড়া একঘণ্টা ধরে আমাদের মনে এই কথা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে,—মানুষে যখন তার বাসগৃহ তৈরি করে, তখন সে গৃহ ভিৎ থেকে গেঁথে তুল্‌তে হয় ; কিন্তু কোনও জাতি যখন তার বাসগৃহ তৈরি কর্‌তে চায়, তখন সে গৃহ ছাদ থেকে গেঁথে নামাতে হয়। আমাদের পলিটিকাল আশা গোড়াতে অত উচ্চ না হলেও ক্ষতি নেই। অপর কোনও ক্ষেত্রে অপর কোনও ব্যক্তি এ রকম কথা বল্‌লে আমরা তা রসিকতা মনে করতে পারতুম। কিন্তু এ রসিকতা নয়—এ হচ্ছে সেকেলে পলিটিক্‌সের একটা মোটা কথা ;

এর অর্থ হচ্ছে শাসনতন্ত্র জাতির পক্ষে নিজে গড়ে তোলবার জিনিস নয়, কিন্তু উপর থেকে তার মাথায় চাপিয়ে দেবার জিনিস।

রাজনীতির এ আদর্শ বাঙ্গালী গ্রাহ্য করতে পারে না কেননা না তা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাঙ্গালীর কাছে ন্যাসনালিজমের অর্থ হচ্ছে জাতির স্বধর্ম্মের চর্চ্চা, এবং সেই শাসনতন্ত্রই ঈপ্সিত ও বরণীয়, যার অন্তরে একটি বিশেষ জাতির স্বধর্ম্ম পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠবার পূর্ণ অবসর পায়। অতএব প্রতি দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যই তার ন্যাসনালিজমের অটল ভিত্তি। দেশের মত বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জাতির মতি বলে একটি জিনিস আছে। এক একটা জাতির মনের এক একটা বিশেষ গতি আছে; এবং সে গতির এক একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে। বাঙ্গালী জাতির মতির পরিচয়, রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলার যত মহাপুরুষদের কথায় ও কাজে পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থ আমাদের কাছে কেবলমাত্র রাজনীতিগত নয়—কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী উদার, ঢের বেশী ব্যাপক। আমরা জীবনে ও মনে সমান মুক্তির প্রয়াসী। তাই আমাদের রাজনীতি আমাদের জীবনবেদের বহির্ভূত নয়, অন্তর্ভূত,—এবং একাংশ মাত্র। বাঙ্গালীদের কাছে একটা বিশেষরকম শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের কৃতার্থতার লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ আপোষ মীমাংসা করে, জোড়াতাড়া দিয়ে, যে স্বরাজের আদর্শ খাড়া করলেন, তাতে প্রতি প্রদেশের প্রতি জাতির স্ব-বস্তুটি চাপা পড়ে গেল।

এতে পলিটিকাল বুদ্ধিরই যে কি পরিচয় দেওয়া হল, তাও বোঝা কঠিন। এ সত্যও কি সুস্পষ্ট নয় যে, গোটা ভারতবর্ষের যুক্ত-স্বরাজ্য প্রতি প্রদেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত

হবে, এবং অন্য কোনও উপায়ে হবে না। অথচ বাংলার সকল নেতাই ঐ অদ্ভুত রায়ে সায় দিলেন ও সই দিলেন। এর পরেও লোকে বলে বাঙ্গালীর disciplineএর জ্ঞান নেই। বাঙ্গালী নেতারা অপর প্রদেশের নেতাদের দ্বারা যত সহজে নীত হন, এমন আর কেউ হয় না। বাঙ্গালীর আশার কথা এই যে, তারা জাতি হিসাবে সহজে কারও দ্বারা নীত হয় না।

আমার বিশ্বাস আমার এ কথায় সকল বাঙ্গালীই সায় দেবেন যে, আমাদের ঘর আমরা নিজহাতে নীচে থেকেই গেঁথে তুল্‌তে চাই, উপর থেকে গেঁথে নামাতে চাই নে। আশা করি, আমাদের নেতারা এই সত্য মনে রাখবেন যে, যেখানে গোড়ায় মিল নেই, সেখানে গোঁজা মিলন দিয়ে কোনও লাভ নেই, শেষটা ভুগতেই হবে। নিজের ideal ভ্রষ্ট হলেই মানুষের সকল কার্য্য নষ্ট হয়, কেননা ideal-এর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তার আত্মশক্তি হারায়।

(২)

আমি আগে এক সময় বলেছি যে, আমাদের স্বরাজ লাভের কথা শুধু ঘরের কথা নয়—বাইরেরও কথা, এবং তা যতটা না ঘরের কথা তার চাইতে ঢের বেশী বাইরের কথা। দেখা যাক্ এ কথাটা সত্য কি না।

যে স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী আজ লালায়িত সে স্বরাজ যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত হবে—এ কথা ত সর্ব্ববাদীসম্মত। এ ছাড়া অপর কোনরূপ স্বরাজের আমরা কল্পনাও

কর‍্তে পারি নে ; যদি কেউ পারেন, তাহলে তাঁর কল্পনাশক্তি কোনরূপ জ্ঞানের দ্বারা সংযত বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত নয়। যাঁর কাছে স্বরাজ্য ও স্বপ্নরাজ্য একই বস্তু তাঁর সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের উপরেই নির্ভর কর‍্বে, এবং সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই নির্ভর কর‍্ছে। এক কথায়, পৃথিবী জুড়ে যে মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে—আমরা এই তিন চার বছর ধরে তারই একটি ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক অভিনয় করে আস্‌ছি, এবং সেই নাটকের যবনিকা না পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অভিনয়ের সার্থকতা আমরা টের পাব না।

এই মহানাটকের শেষাঙ্ক এই দেশে অভিনীত হবারও শুনছি একটা সম্ভাবনা ঘটেছে। সুতরাং এ যুদ্ধের ভিতরকার কথাটা আবার তোলা যাক্।

গত চল্লিশ বৎসরের জর্ম্মাণ মতিগতির সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব লাভ করাই হচ্ছে Imperial Germany-র রাজনীতির উদ্দেশ্য, এবং তার রণনীতি হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। বর্ত্তমান জর্ম্মাণ দর্শন এই রাজনীতির উত্তরসাধক, এবং জর্ম্মাণ বিজ্ঞান এই রণনীতির ক্রীতদাস। এক কথায়, এ যুদ্ধ সকল জাতির ন্যাসনলিজ্‌মের বিরুদ্ধে জর্ম্মাণ ইম্পিরিয়া-লিজমের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যদি জর্ম্মাণা জয়লাভ করে, তাহলে পৃথিবী হতে ন্যাসনলজিমের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাবে, এবং যে স্বরাজের দিকে আমরা দেশসুদ্ধ লোক হাত বাড়িয়েছি, এবং যা আশু আমাদের হাতে আসবার সম্ভাবনা আছে তা গন্ধর্ব্বপুরীর মত এক নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এ কথা আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি

বলে,—আমার মতে আমাদের সকলকে সকলরকম দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ করে স্বদেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একমাত্র কামনার বলে স্বরাজ লাভ করা যায় না,—তার পিছনে থাকা চাই জাতির মহৎ কর্ম্মফল। আমাদের শাস্ত্রে বলে, স্বর্গরাজ্যের ভোগের মেয়াদ—মানুষের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যের উপর নির্ভর করে। স্বরাজলাভ আর স্বদেশরক্ষা যে একই বস্তুর এ পিঠ ও পিঠ, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; তবে তার কোনটি সদর আর কোনটি মফঃস্বল, এই নিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি মতভেদ আছে। এর কোনটি আগে কোনটি পরে, এই নিয়ে আমাদের পলিটিকাল দলে এমন একটা তর্ক বেধেছে, যার ফলে ভ্রাতৃবিরোধ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, গুরুশিষ্যে মনান্তর প্রভৃতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে। বীজ আগে না বৃক্ষ আগে, তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল, এ সব ন্যায়ের তর্কে যে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না, এমন কথা আমি বলি নে। ওরও সময় আছে, কিন্তু আজকের দিন সে সময় নয়। কাল হয়ত আমাদের জাতীয় শক্তির পরিচয় দিতে হবে, এবং সে পরীক্ষার জন্য আজ আমাদের, অন্ততঃ মনে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

১লা মে ১৯১৮।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৯

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বাঙ্গালীর শিক্ষা।

——:*:——

(১)

কলিকাতার বিশ্ববিত্থালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য সরকারী কমিশন বসিয়াছে। সাগরপার হইতে গুণী জ্ঞানী সভ্যেরা আসিয়া মন্ত্রণা সভায় বসিয়াছেন। লর্ডকর্জ্জনের তৈরী কাঠামের উপর আমাদের বিশ্ব-বিত্থালয়ের বর্ত্তমান মূর্ত্তিটী, অনেকটা যাঁর নিজের হাতে গড়া, সাগরের এ পারের লোক হইলেও ঐ সভায় তাঁহাকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এবং দুই কোটী বাঙ্গালী মুসলমানের স্বার্থের হিসাবে কোন ভুলচুক না হয়, তাহার দৃষ্টির জন্য আলিগড় হইতে উচ্চ গণিতজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিত সভাসদ হইয়া আসিয়াছেন। আশা ও আশঙ্কায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন অনেকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগে বাঙ্গালীর শিক্ষার দু' একটা মোটা সমস্যার আলোচনা করা যাক্।

কি প্রাচীন কি আধুনিক সমস্ত সভ্য সমাজেই শিক্ষা ব্যাপারটী লইয়া নানা রকম সমস্যা উঠিয়াছে। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, আর সে লক্ষ্যে পৌঁছিবার সুব্যবস্থাই বা কি এ দুই বিষয়েই যথেষ্ট মত ভেদ আছে। এবং দুইটী রাশিই যদি অব্যবস্থিত হয়, তবে তাহাদের সমবায়ে কেমন জটিল বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়, তাহা গণিতের সাহায্য ব্যতীতও সহজেই বোঝা যায়। আর এ বিষয়ে মতভেদও অতি

স্বাভাবিক; বরং মতের প্রকার ভেদ কিছু কম হইলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। একে তো শিক্ষা জিনিসটী, তা তার প্রণালী সে রকমই হোক, অনেকটাই অজান! মাটিতে বীজ ছড়াইয়া ফসলের আশায় বসিয়া থাকার মত। কোন জমিতে যে কেমন বীজে কোন ফল ফলিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। যে পথে চলিয়া বৈদ্য চিকিৎসক হয় বসিয়া নিন্দুক লোকে রটায়, সেই ঠেকিয়া শেখার পথটা এখানে অনেকটা সঙ্কীর্ণ, কেননা এক জমিতে দুইবার বীজ বুনিবার উপায় নাই। এবং শিক্ষার তত্ত্ব ও শিষ্যের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর পুঁথি ও পাণ্ডিত্য থাকা স্বত্বেও, যে-মন লইয়া শিক্ষককে কাজ করিতে হয়, কোনও বৈজ্ঞানিক আচার্য্যের যন্ত্রের মধ্যে তাহা ধরা দেয় না। সমস্ত মনস্তত্বই সাধারণ মনের তত্ব, অর্থাৎ যে মন কল্পনায় আছে কিন্তু বস্তুগত্যা নাই। আর শিক্ষকের কারবার হইল বিশেষ মনকে লইয়া, যাহা এই নিয়মের জগতে প্রায় খাপছাড়া অনিয়ম, যাহার বিকাশ ও বিকারের রীতি দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় গুহাস্থিত ও দুর্জ্ঞেয়। সেই জন্য দেখা যায় অতি-অবৈজ্ঞানিক সেকেলে ধরণের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়াও মানুষের মন বিকশিত হইয়া ওঠে, আবার অত্যন্ত টাট্‌কা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ইহার 'সনাতন জড়তায়' ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কোনও প্রণালীরিই ফলটা প্রবর্ত্তকের আশানুযায়ী বা নিন্দুকের ভবিষ্যৎ বাণীর অনুরূপ পুরাপুরি রকমে ফলে না। সুতরাং শিক্ষার প্রণালী লইয়া তর্কে কোনও পক্ষেরই একবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। কেননা ফলের কষ্টিপাথরে প্রণালীকে কষিয়া এমন কিছু দেখান যায় না, যাহাতে তার্কিককে নিরুত্তর করিতে পারা যায়।

(২)

তারপর শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে একটা নিত্য চিরস্থির অংশ হয়তো বা আছে। কিন্তু চিরকালই নানা নৈমিত্তিক লক্ষ্য, কখনও জীবন যুদ্ধের টাট্‌কা রক্তে রঙ্গিন হইয়া, কখনও বা কেবল অস্থিরতার চাঞ্চল্যেই মানুষের দৃষ্টিকে তাদের দিকেই টানিয়া রাখিয়াছে। কখনও সমাজ, কখনও রাষ্ট্র, কখনও ধন, কখনও শক্তি, কখনও বাক-পটুতা, কখনও বা কেবল জীবিকা, শিক্ষার একমাত্র অন্তত প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মানুষে প্রচার করিয়াছে। এবং ইহাদের কোনটিই মানুষের কাছে তাচ্ছিল্যের সামগ্রী না হওয়াতে সকলের দাবীই মানুষ উপস্থিতমত মাথা নোয়াইয়া স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তর্কেও কোন পক্ষেরই একবারে অজয় পত্র লিখিয়া দিবার মত, পরাজিত হইবার আশঙ্কা নাই।

কিন্তু এ সকল তত্ত্ব ও তর্ক সব দেশের ও সব কালের সাধারণ সমস্যা, বাঙ্গলা-মাসিকের পণ্ডিতদিগের ভাষায় 'বিশ্ব সমস্যা'। পণ্ডিতগণের উপরেই ইহাদের নিরাসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার দুই একটা বিশেষ সমস্যার আলোচনা শুরু করা যাউক্।

(৩)

বাঙ্গলা দেশের স্কুল কলেজে হালে যে শিক্ষা চলিতেছে, সে সম্বন্ধে একটা বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। সকল পক্ষই বলিতেছেন এ শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা নয়; যেমনটী হওয়া উচিত এ শিক্ষা তেমন শিক্ষা নয়। কিন্তু অসন্তোষ সাধারণ হইলেও অসন্তুষ্টির মূল এক

নয়। আর সেই ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতেই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী লইয়া নানা মতভেদের শাখা, কখনও পাতা কখনও কাঁটা মেলিতেছে।

এ দেশের শিক্ষা লইয়া যাহারা চিন্তা করেন এবং চিন্তা না করিলেও কথা বলেন তাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবল পক্ষ হইলেন দেশশাসক আমলাতন্ত্রের সভ্যেরা, এবং তাঁহাদেরি জ্ঞাতি কুটুম্ব ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দানের দরবারে, স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায়, নিজেদের ভোজের মজলিসে আমাদের শিক্ষার গলদ যে কোথায় তা বেশ স্পষ্ট কথাতেই ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন এই যে, বাঙ্গালীর ছেলেরা সেক্সপীয়র মিণ্টন পড়িতেছে, বার্ক মিল মুখস্থ করিতেছে, লিবিগ ফ্যারাডের তত্ত্ব ঘাঁটিতেছে, এসব একবারে নিরর্থক ও নিষ্ফল। এসব ছেলেরা ত স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া ওকালতি ডাক্তারির বাজারে ভিড় করিবে, না হয় মুন্‌সেফী ডিপুটীগিরির উমেদারীতে ফিরিবে, আর অধিকাংশই সরকারী ও সওদাগরী আফিসের কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হইবে। ইহাদের জন্য এ শিক্ষা কেন? ধান কলাই যার লক্ষ্য সে কেন গোলাপের কেয়ারীতে পরিশ্রম করে? অর্থাৎ দেশব্যাপী ব্যবহার ও বাণিজ্যের যে কল চলিতেছে, তার চাকা গুলিকে স্বচ্ছন্দে ও বিনা বাধায় চালাইয়া লইবার মত মজুর, মিস্ত্রী, বড় জোর ফোরম্যান মিকানিকের উপযোগী যে শিক্ষা, তাহাই হইল বাঙ্গালীর যথেষ্ট এবং যথার্থ শিক্ষা। ইহার জন্য 'থ্যাম্‌সন্ য়্যাগ্‌নিষ্টেশের' সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের অনুশীলন প্রয়োজন হয় না; বড় সাহেবের মনঃপুত চল্‌তি ইংরেজিতে কাজের চিঠি মুসবিদা করিতে জানাটাই

বেশী দরকার। আর সেই পত্র রচনায় মিল্টনের ভাষা কোনও সাহায্য ত করেই না, বরং বিদেশীকে বিপথেই লইয়া যায়। সুতরাং আমাদের স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষা যেমন অনুপযোগী তেমনি ফাল্‌তো। আর শিক্ষার এই বাহুল্যটা যদি কেবল নিষ্ফলই হইত তবুও সে এক রকম ছিল। কিন্তু ইহার কিছু ফলও ফলে, এবং আশঙ্কার কথা এই যে ফলটা সমস্তই কুফল। পশ্চিমের সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শণ ইতিহাস মুখস্থ করিয়া পূব দেশের লোকদের মাথা ঠিক থাকে না। পশ্চিম যে পশ্চিম এবং পূব যে পূব এই সাধারণ জ্ঞানটাও লোপ হয়। এবং যে সকল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বকথা পশ্চিমের পণ্ডিতেরা পশ্চিম দেশের জন্যই প্রচার করিয়াছেন এই অত্যন্ত পূব দেশেও এরা হাতে কলমে সে গুলির প্রয়োগ দেখিতে চায়। এই সকল তত্ত্ব কথায় 'মানুষ' শব্দের অর্থ যে পশ্চিম দেশীয় শ্বেত-বর্ণের মানুষ এ সহজ কথাটা ইহারা বুঝিতে পারে না। যতই কেন জিয়গ্রাফি মুখস্থ করুক না ল্যাটিচুড লঙ্গিচুডের জ্ঞানটা ইহাদের কিছুতেই পাকা হয় না। ফলে নিজেদের অবস্থায় ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। এমন কি যে শাসকসম্প্রদায় এই দেড়শ বছর ধরিয়া নিশ্চল শান্তির মধ্যে পূর্ব্ব দেশের লোকদের পক্ষে যতটা সম্ভব ইহাদিগকে সেই উন্নতির পথে অতি সন্তর্পণে, সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের উপরেও ইহারা ক্ষণে ক্ষণে বিরাগের ভাব দেখায়; উন্নতির গতির মন্থরতায় অসহিষ্ণু হইয়া মনে করে ছাড়া পাইলে বুঝি আরও একটু দ্রুত চলিতে পারে। এবং শাসনের কলটা যে নিজেরা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া চালাইতেও বা পারে এমন কল্পনাও ইহাদের মনে আসিয়াছে। এমন কি কলটা এ রকম না

হইয়া অন্য রকম হইলেও একবারে অচল হয় না এমন কথাও ইহারা বলিতে সুরু করিয়াছে। এ সকলি যে বাহুল্য শিক্ষার বিস্তৃত ফল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

(৪)

দেশের লোক বলে, এবং বলিতে সাহস না করিলে মনে ভাবে, শিক্ষাটা যে কেবল বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়াই দিতে হইবে সেই বা কোন স্থিরসিদ্ধান্ত। বর্ত্তমানে আমরা ছোট কিন্তু ভবিষ্যতে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। শিক্ষাটা সেই ঈপ্সিত ভবিষ্যতের অনুকূল করিয়াই আরম্ভ হোক না। আর জীবিকার জন্য যে টুকু দরকার শিক্ষার পরিমাণ যে, ঠিক সেই টুকুই হইবে এ ব্যবস্থা ত অপর কোন দেশে দেখা যায় না। আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজের দেশে যে শিক্ষা পাইয়া আসেন, প্রাচীন গ্রীস রোমের সাহিত্য ইতিহাসই ত তাহার প্রধান উপকরণ। এদেশে যে কাজে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন হইতেছে সে কাজে ঐ শিক্ষা কতটা সাহায্য করে এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। আফিসের বাহিরেও কেরাণী কেরাণীই থাকিবে এত বড় দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া ত সহজ নয়!

প্রজার সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীদের এ দেশের উপযোগী শিক্ষার আদর্শের এই প্রভেদ, ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার প্রথম সমস্যা; যাকে বলা যায় শিক্ষার রাজনৈতিক সমস্যা। রাজপুরুষেরা দেখেন আমাদের বর্ত্তমান, আমরা ভাবি আমাদের ভবিষ্যৎ। তাঁরা চান সেই শিক্ষা যেটা বর্ত্তমান শাসনরীতি ও অন্যান্য নীতির অনুকূল। আমরা

কামনা করি এমন শিক্ষা যেটা ভবিষ্যৎকেই আমাদের নিকটে আনে। তাঁদের দৃষ্টি এক দিকে, আমাদের চোখ অন্য দিকে।

(৫)

আমাদের রাজপুরুষেরা যে আমাদের ভবিষ্যৎটাকে একবারে অস্বীকার করেন এমন কথা বলি না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করিতে হয় যে তাঁদের অনেকে আমাদের যে একটা ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে, যেটা বর্ত্তমানের চেয়ে অন্য রকম, হয়ত মহত্তর এবং বৃহত্তর, এ কথা প্রকাশ্যেই বলেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা বলেন সে ভবিষ্যৎ এতই সুদূর ভবিষ্যৎ যে তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও বুদ্ধিমান লোকই বর্ত্তমানের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যে ভবিষ্যৎ এখনও স্বপ্নলোকের কল্পনাতেই আছে, জাগ্রত লোকের বস্তু-জগতে তার স্থান নাই। অর্থাৎ যেটা পারমার্থিক ভাবে আছে, কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে নাই। সুতরাং তাকে কথায় স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাজে স্বীকার করা নির্বুদ্ধি ও অকেজো লোকের লক্ষণ।

শিক্ষার এই রাজনৈতিক সমস্যাটী অতি জটিল ও ব্যাপক। এবং এই ব্যাপক সমস্যা হইতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির ছোট, বড়, কঠিন, সুকঠিন নানা রকম সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং দিন দিন হইতেছে। ইহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের কথা বোঝেন না; আমরা তাঁদের কাজে আশঙ্কিত হইয়া উঠি। আমরা বলি আমাদের গরীব দেশ, শিক্ষাটা যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়সাধ্য করা হোক; তাঁরা ভাবেন সস্তা অর্থ যে খেলো ইহাদের সে জ্ঞান ত নাই। দেশে স্কুল কলেজ বাড়িতেছে, পড়ুয়া তার চেয়েও বাড়িতেছে;

আমরা উৎফুল্ল হইয়া ভাবি শিক্ষার বিস্তার হইতেছে; কর্ত্তৃপক্ষ শিহরিয়া বলেন এ সব ছেলে বাহির হইয়া করিবে কি, সরকারী ও সওদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি আর ত খালি নাই।

যা হোক এই রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার উপায় শিক্ষানীতির মধ্যে নাই। এ জটিলতার নিবৃত্তি শিক্ষাতত্ত্ববিদের এলাকার বাহিরে। দেশ বিদেশের পণ্ডিত একসঙ্গে করিলেও এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। কেননা এ সমস্যার মীমাংসা হইবে শিক্ষানীতি ক্ষেত্রের বাহিরে, রাজনীতির ক্ষেত্রে। সুতরাং আর পুঁথি না বাড়াইয়া সমস্যান্তরে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

(৬)

আমাদের শিক্ষার দ্বিতীয় সমস্যা হইল অন্নসমস্যা। দেশের অনেকে প্রচলিত শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে, সে শিক্ষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্ন সংস্থানের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়া ছেলেরা যেকয়টা চাকরী ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত হইয়া বাহির হয় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য, এবং ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুপাতে সে সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে অন্নাভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং বর্ত্তমানেই তাহার মূর্ত্তিটা যেমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেশের শিক্ষা যদি শিক্ষিতের এই অন্ন-সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে না পারে তবে তাহা ব্যর্থ শিক্ষা, যাহার পরিবর্ত্তন না হইলে দেশের মঙ্গল নাই।

বাঙ্গলা দেশের এই অন্নাভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমস্যা যে দিন দিন উৎকট হইয়া উঠিতেছে সেদিকে চক্ষু বুজিয়া কোনও লাভ নাই। এবং ইহার একটা ব্যবস্থা না হইলে যে জাতিরও মঙ্গল নাই তাহাও নিশ্চিত সত্য। ইংরেজ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার,—যাঁর একটা অভ্যাস ছিল সকলের জানা অত্যস্ত সাধারণ তথ্য হইতে গভীর তত্ত্ব কথার নিষ্কাশনের চেষ্টা করা,—তাঁর একখানি সুপরিচিত গ্রন্থের একটী অধ্যায়, তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, জীবের কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তার বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন; সুতরাং যে বিধিব্যবস্থা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে তাহার দাবী, যে সকল বিধিব্যবস্থা, তাহাকে আর সব কাজের উপযুক্ত করে, তাহাদের চেয়ে প্রবল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্নাভাব মোচনের ব্যবস্থা যে আর না করিলেই নয় এ কথা সমর্থনের জন্য জীববিদ্যার এই আদিতত্ত্বে যাইবার প্রয়োজন হয় না। আজ বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর ঘরে ঘরে দারিদ্র্য যে কেমন করিয়া জীবনকে ক্ষয় করিতেছে, স্বাস্থ্যকে বিদায় দিতেছে, দেহ মনের সমস্ত স্ফূর্ত্তি ও আনন্দকে পিষিয়া মারিতেছে, মনুষ্যত্বকে পাহাড় প্রমাণ ভারের নীচে চাপা দিতেছে, তাহা দেখিলে স্বয়ং মোহ মুদ্গরের কবিও অনর্থের অর্থ যে কি তাহা, নিত্য না হোক অন্তত মাঝে মাঝে, ভাবিয়া দেখিবার উপদেশ দিতেন।

কিন্তু আমাদের অন্নসমস্যা এমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন। অন্নসংগ্রহকে জাতির সমস্ত চেষ্টা ও প্রতিভার কেবল প্রথম নয় প্রধান লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যার একটা উত্তর খুঁজিবার প্রলোভন স্বাভাবিক। কিন্তু রোগনাশের উৎসাহে

রোগীর প্রাণান্ত ঠিক চিকিৎসা নয়, যদিও সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসার প্রবল সাফল্যে চিকিৎসিতের মৃত্যুসংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। বাঙ্গালীর এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কেবল অন্নে জীব বাঁচে কিন্তু জাতি বাঁচে না।

(৭)

অন্ন সংস্থানের নিক্তিতে ওজন করিয়া স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষাকে ঝুঁটা সাব্যস্তের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেননা প্রকৃত কথা এই যে ছাত্রের জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া এ শিক্ষার লক্ষ্যই নয় এবং হওয়া উচিত নয়। এ লক্ষ্য কি তাহা একবার 'সবুজপত্রে' আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির অধিকার নাই। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষা দেওয়া, ছাত্রকে শিক্ষিত করা। কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত অন্নে সকলেরই সমান প্রয়োজন। সুতরাং সমাজেও রাষ্ট্রে শিক্ষিতেরও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা চাই। এই শিক্ষিত শ্রেণীই হইল সমাজের মধ্যমণি, সমাজ বৃক্ষের অমৃত ফল। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে জাতির বর্ত্তমান প্রাণ-হীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের দেশের সমস্যা এই যে, শিক্ষিত শ্রেণীর অন্ন-সংগ্রহের পথ যথেষ্ট মুক্ত নাই। কেন নাই, সে আলোচনা নাই করিলাম। কিন্তু সমস্যা এ নয় যে, যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা শিষ্যের জীবিকা অর্জ্জনকেই লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইতেছে না।

প্রচলিত শিক্ষার যে সমালোচনার কথা বলিতেছি তার প্রধান কথা এই যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছেলেরা এমন শিক্ষা পাইতেছে না যাহাতে চাকুরী, ডাক্তারী, ওকালতির রুদ্ধপ্রায় সঙ্কীর্ণ গলিতে আর

ভীড় না করিয়া, শিল্প বাণিজ্যের প্রশস্ত রাজপথে অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইতে পারে। এই সমালোচনার মধ্যে যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সত্যের আড়ালে গোটা কয়েক বড় বড় মিথ্যা সব সময়েই উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তাহাদের তাড়াইতে না পারিলে এই সত্যের প্রকৃত চেহারাটা প্রকাশ হইবে না।

(৮)

প্রথম, বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিল্প বাণিজ্যের যে শিক্ষা দিবে তাহা তার সাধারণ সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্ত্তে নয়; ঐ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেদের জন্যই বিশেষ শিক্ষা। যাঁরা মনে করেন প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা হাতের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করিলেই দেশের দারিদ্র্য সমস্যার মীমাংসা হইবে, তাঁদের সরল বিশ্বাসে অবশ্য মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের শিল্প বাণিজ্য বিষয়টা কি, তাহার অস্পষ্ট ধারণাও তাঁদের আছে কি না তাহাতেও সন্দেহ না করিয়া উপায় থাকে না। যে সব জাতি দেশের শিল্প বাণিজ্যকে দেশের উচ্চ শিক্ষা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিয়াছিল, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র চালান যায় ভাবিয়াছিল, আজ পৃথিবীর শিল্প বাণিজ্যের দৌড়ে তারা যে দিন দিন পিছাইয়াই পড়িতেছে তাহা ত আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। দেশের উচ্চ শিক্ষাকে সংকীর্ণ করিয়া শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলার কল্পনা, আহার বন্ধ করিয়া কেবল কুস্তিতে শরীর গড়ার চেষ্টার মতই ভয়ানক।

(৯)

আচার্য্য হেলম্‌হোল্‌ৎস একবার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান করে, সে সত্য ঘরকন্নার কাজে লাগিবে কিনা সে চিন্তা তার নয়। আজ জার্ম্মাণিতে কি সুর বাজিতেছে জানিনা। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, জ্ঞানের এই নিষ্কাম সাধনা বন্ধ হইলে ক্রুপের কারখানাও বেশী দিন খোলা থাকিবে না। আর যে শিল্প বাণিজ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না দেশের উচ্চ শিক্ষিতকেও তাহাতেই রত করান, এই পৃথিবী জোড়া প্রতিযোগিতার যুগে, সমাজ নীতির কথা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র ধন বিজ্ঞানের চোখও যে কত বড় অপব্যয়; তাহাতে যে অন্নসমস্যার সমাধান না হইয়া কেবল জটিলতার বৃদ্ধিই হয়, তাহা অল্প চিন্তাতেও বোঝা যায়। শোনা যায় অবস্থা বিশেষে বাঘও নাকি ধান খায়। কিন্তু সেটা ব্যাঘ্র সমাজের সে খুব উৎসাহের কারণ তাহা প্রবাদও বলে না। মনু ব্রাহ্মণের যে বৈশ্য বৃত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা আপদ্ধর্ম্ম আনন্দের কারণ নয়। বাঙ্গলাদেশের যে মুষ্টিমেয় লোক এখন উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছে তারও অর্দ্ধেককে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনা, দেশে শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় নয়। সে পথ হইল দেশের উচ্চ শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত করিয়া, এ যুগের শিল্প বাণিজ্যের যে বিশেষ শিক্ষা, যাহা কেবল উচ্চ শিক্ষিতের পক্ষেই সম্ভব, দেশে তাহার ব্যবস্থা করা।

(১০)

দ্বিতীয় কথা কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেলেদের পুঁথিগত এমন কি ল্যাবরাটারীতে পরীক্ষাগত শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই

বাঙ্গলাদেশ দেখিতে দেখিতে শিল্পশালায় ও বাণিজ্যাগারে ভরিয়া উঠিবে এমন দুরাশার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু সে শিক্ষাকে সফল করিবার উপায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে নাই। সে শিক্ষার সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে দেশের লোকের, হয়ত বা দেশের রাজার উদ্যম বা নিশ্চেষ্টতার উপর। বাঙ্গলার অন্ন সমস্যার জন্য দায়ী তার প্রচলিত শিক্ষা নয়; এবং কেবল শিক্ষার বদল ঘটাইয়া সে সমস্যার পুরণও সম্ভব নয়। বেশ মনে আছে যখন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বি, এস্, সি' পড়াইবার প্রথম আয়োজন হয় তখন অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে আর ভাবনা নাই। এই সব বিজ্ঞানে-কৃতবিদ্য ছেলেরা দেশে বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নাভাবের একটা কিনারা করিবে। আজ 'এম্, এস, সি; বি এল্' এ বাঙ্গলার সব উকীল লাইব্রেরী ভর্ত্তি হইয়া উঠিল! ছেলেরা বিজ্ঞান শিখিল বটে, কিন্তু সে শিক্ষাকে দেশের সমাজ ও দেশের রাষ্ট্র কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারিল না।

তারপর শেষ কথা কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কথা, তা এই। উচ্চ শিক্ষায় যার অধিকার আছে তাকে সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করার অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্র কাহারও নাই। এখানে উচ্চ শিক্ষিতের জীবিকা উপার্জ্জনের পথে বিঘ্নবাহুল্যের কথা তোলা নিষ্ফল, কেননা জীবিকার অধিকারের চেয়ে এ অধিকারের দাবী কিছু কম নয়। কাজেই সে পথের মাপে উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছামত প্রসার বা সংকোচ ঘটান চলে না। কথা এই, আর কোনও ফল বা নিষ্ফলতার প্রমাণে উচ্চ শিক্ষার বিচার হয় না; ঐ শিক্ষাই সে শিক্ষার চরম ফল। কেরাণীরও উচ্চশিক্ষা বিফল নয়, যদিও কেরাণীগিরিতে তা কাজে

লাগে না। কারখানার মালিকেরও সে শিক্ষা অনাবশ্যক নয়, যদিও তার অভাবে টাকা উপার্জ্জনের কোনো অসুবিধা হয় না। জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ, এ শিক্ষার অধিকারী কত লোকের সে জন্ম দিতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাফল্যের পরীক্ষা কত বেশী সংখ্যক অধিকারীর কাছে সে শিক্ষা সহজ লভ্য হয়। মানুষের জন্যই জীবিকা, জীবিকার জন্য মানুষ নয়। জীবিকার মাপে উচ্চ শিক্ষাকে কাটিয়া খাটো করার প্রস্তাব বিছানার মাপে শরীরকে ছাঁটার প্রস্তাবের মতই সুবুদ্ধির পরিচায়ক! তা যত উচ্চ রাজকর্ম্মচারীই সে প্রস্তাব করুন না কেন, আর যত বড় পণ্ডিতই তার সমর্থন করুন না কেন।

(১১)

শিক্ষামন্দিরের বাহিরে আমাদের দেশে শিক্ষা লইয়া যে সব সমস্যা তার কতক কতক দেখা গেল। এইবার বহিরাঙ্গন পার হইয়া মন্দিরের ভিতরে আসা যাক্।

বর্ত্তমানের প্রচলিত শিক্ষাকে যখন কেবল শিক্ষার মাপেই ওজন করি, কেবল জ্ঞান, ভাব ও রুচির আলোতেই তাকে পরখ করি, তখনও দেখি এ শিক্ষায় আমরা কেহই সন্তুষ্ট নই; এবং এখানেও অসন্তোষের কারণ এক নয় ভিন্ন ভিন্ন।

দেশে একদল আছেন যাঁরা হালে চলতি শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে তাঁরা যখন স্কুল কলেজে পড়িতেন তখন শিক্ষাটা যে রকম পাকা হইত এখনকার ছেলেদের শিক্ষা সে রকম হইতেছে না। দুই শিক্ষার তফাত কোথায়, এবং বর্ত্তমানের শিক্ষা কোনখানে কাঁচা

তাহার অনুসন্ধান করিলে, কথার হেরফের বাদে যাহা বাহির হইয়া পড়ে তাহা এই ;—

পূর্ব্বকার দিনে ইংরেজি, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষাটা যেমন পাকা রকমের হইত এখনকার ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা তার কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। তখন শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শব্দ শিখিবার জন্য অভিধান মুখস্থ করিত, 'গ্রামার' 'ইডিয়ামে' নিভু্ল হইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিত, 'ষ্টাইল' দোরস্ত করিবার জন্য বেন্‌জন্‌সন হইতে স্যামুয়েল জন্‌সন্ পর্য্যন্ত কারো লেখাই কণ্ঠস্থ করিতে বাকী রাখিত না। আর ফলও ফলিত চেষ্টার অনুরূপ। এই সব কৃতবিদ্য লোকের মুখের ইংরেজি শুনিয়া বড় বড় সাহেবদেরও চমক লাগিত; নাম না দিয়া খবরের কাগজে লেখা বাহির করিলে বাঙ্গালীর লেখা না সাহেবের লেখা এ লইয়া তর্ক উঠিত। আর আজ দুই ছত্র নিভু্ল ইংরেজি লিখিতে বি এ পাশ ছেলে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠে। শিক্ষার অবনতি আর বলে কাকে!

উঁচুদরের ইংরেজি শেখাই উচ্চশিক্ষা কি না এ প্রশ্ন তোলা অবশ্য নিরর্থক। কেননা সে সম্বন্ধে এঁদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই। তবে খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে এদের মধ্যে কেহ কেহ সংশয়ীদের একবারে নিরুত্তর করিবার জন্য এই শিক্ষার দুই একটা অবান্তর মাহাত্ম্যও কীর্ত্তণ করেন। তাঁরা বলেন আমাদের বর্ত্তমানে যা কিছু উন্নতি তার মূলই ত ঐ ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, এবং ঐ ভাষাই হইল বিচ্ছিন ভারতবর্ষের ঐক্যসূত্র। কিন্তু ইহার পরেই কোন ইংরেজি ইতিহাস আগাগোড়া মুখস্থের উপর বক্তার বর্ত্তমান পাণ্ডিত্য খ্যাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, এমনি গম্ভীরভাবে সে কথার সুরু হয়

যে আমাদের বর্ত্তমান উন্নতির অর্থ তাঁদের মত পণ্ডিত লোকের আবির্ভাব না আর ও কিছু, এবং ভারতবর্ষের ঐক্য ইংরেজি 'ইডিয়ামের' ঠিক কতটা বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, অথবা কোনো কোনো বৈদিক যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণের মত হ্রস্বদীর্ঘের বিন্দুমাত্র গোল ঘটিলেই সর্ব্বনাশ, সে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আর সাহসই হয় না।

আমাদের দেশের ঠিক এই দলটিই বাঙ্গালীর স্কুল কলেজে বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা দিবার প্রস্তাবে একবারে চম্‌কিয়া উঠিয়াছেন। চম্‌কাই-বারই কথা! শিক্ষার অর্থই হইল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা; তাকেই যদি খর্ব্ব করা যায় তবে শিক্ষার আর বাকী থাকে কি? কেননা সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, দর্শণ বল, বিজ্ঞান বল, সবই হইল উপলক্ষ্য। যেমন কথাচ্ছলে নীতি শিক্ষা, এও তেমনি নানা ছলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা। নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া ভিন্ন পথের মোহে বাড়ীর কথাটাই আর কার ভুল হয়! এঁদের মধ্যে যাঁরা কলেজের অধ্যাপক তাঁরা আরও কঠিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কুপারের কবিতার সৌন্দর্য্য, কি অ্যাডিশনের রসিকতার রস তাঁরা বাঙ্গলা ভাষায় ছেলেদের বুঝাইবেন কেমন করিয়া? সমস্যা গুরুতর। যে সব পুঁথিতে ঐ সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ ও রসিকতার ব্যাখ্যা আছে সেগুলিও যে ইংরেজি ভাষাতেই লেখা! আর এ কথাও ঠিক অনেক ইংরেজ লেখকের কবিত্ব ও রসিকতা আমরা ভক্তিভরে গলাধঃকরণ করিতেছি, মাতৃভাষার শাদা চোখে দেখিলে যে ভক্তি নাও টিকিতে পারে। প্রমাণ, য়ুরোপ মহাদেশের লোকেরা, যাঁরা ভাষা শিখিবার উপায় স্বরূপে নহে, সাহিত্য হিসাবেই ইংরেজি সাহিত্য পড়েন তাঁরা হয়ত সে সব লেখকের নামও শোনেন নাই। এমন কি খোদ ইংলণ্ডেই

তাঁদের অনেকে অচল হইয়া উঠিলেন। আমাদের নিষ্ঠা কিন্তু অটল।

যাক্ এই পরিবর্ত্তনভীরু অতীতপন্থীদের কথা ছাড়িয়া দেই। এঁরা নিজেদের ইংরেজি জ্ঞানের যতই বড়াই করুন না কেন, গত শতাব্দীর প্রথমে যাঁরা এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন এঁরা তাঁদেরি বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সংস্করণ। সংস্কৃত পড়িলেই চিত্তে জড়তা আসে, আর ইংরেজি শিখিলেই মন স্বাধীন হয়। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠি বর্ষ বয়সে এ উপকথা বাঙ্গলা দেশের বালককেও বিশ্বাস করান কঠিন।

(১২)

বাঙ্গলা দেশের স্কুল কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষায় বাঙ্গালী যে আর, সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, তাহার মূলে অতীত নয় ভবিষ্যৎ। আগেকার দিনের ইংরেজি শিক্ষার পাকা গাঁথনির সঙ্গে তুলনা হালের শিক্ষার উপর আমাদের বিরক্তির কারণ নয়। কারণ হইল বর্ত্তমান পৃথিবীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাব, কলার রাজ্যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর শক্তি ও কৃতিত্বের যে একটী ছবি কতক অস্পষ্ট কতক স্পষ্ট হইয়া এ যুগের বাঙ্গালীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে শক্তির উদ্বোধনে ও কৃতিত্বের সহায়তায় দেশের প্রচলিত শিক্ষার সামর্থ্যের অভাব। বর্ত্তমানের উপর আমাদের সমস্ত বিরাগেরই মূল এইখানে। যা কিছু এই ভবিষ্যতের প্রতিকূল তা আমাদের অসহ্য। যাহা এর অনুকূল নয় তাহা আমাদের চোখে মূল্যহীন। বিশুদ্ধ ইংরেজির অনর্গল বক্তৃতায় বড় সাহেবের চমক লাগাইবার লোভ আমরা এক রকম

ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমরা ভাবিতেছি সেইদিনের কথা যেদিন বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গালী কি ভাবে এবং লেখে তাহার খবর না রাখিলে বড় সাহেবের দেশের বড় পণ্ডিতেরও চলিবে না। বাহিরের লোকের কাণে এ কথা নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন গর্ব্বের মত শুনাইবে। কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইহাই অন্তরের কথা এবং সেই কারণেই বাঙ্গালীর শিক্ষার প্রধান কথা।

(১৩)

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীল মোহরে যাঁরা advancement of learning 'জ্ঞানের প্রসার' ছাপ বসাইয়া ছিলেন advancement কথাটার কি অর্থ তাঁদের মনে ছিল বলা কঠিন। অবশ্য আমরা জানি বেকনের যে পুঁথির নাম হইতে কথাটি লওয়া, সে পুঁথির প্রতিপাদ্য হইল, কেমন করিয়া নূতন জ্ঞানের আবিষ্কারে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার হয়। কিন্তু এও জানি যে পশ্চিমের অনেক কথা পূব দেশে আসিলে অর্থের বদল হয়। সুতরাং অসম্ভব নয় যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীলমোহরে ঐ কথাটার আদি অভিপ্রেত অর্থ, জ্ঞানের 'প্রসার' নয় জ্ঞানের 'প্রচার'। জ্ঞানের সীমা বিস্তার নয়, পূর্ব্বদেশের অন্ধকারে পশ্চিমের আলোক বিস্তার। সে যাই হোক এ কথা নিশ্চয় যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল কলেজে যে শিক্ষা আরম্ভ হইল তাহার একমাত্র লক্ষ্য ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের বার্ত্তা দেশের মধ্যে প্রচার করা; বাঙ্গালীকে এই নূতন সাহিত্য ও নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করা। এই জ্ঞান ও বিদ্যা পরের হাত হইতে লওয়াই যে চরম সার্থকতা নয়,

ইহাকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে ইহাকে বহন করিতে জানিতে হয়, ইহাকে সৃষ্টি করিতে না জানিলে যে ইহাকে আপনও করা যায় না এ কথা তখন বাঙ্গালীর মনে হয় নাই; মনে হইবার কথাও নয়। সে দিন ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে আসিয়াছিল দেবতার দানের মত। আমরা ভাবিয়াছিলাম ইহাকে স্বীকার করিয়া ঘরে তোলার নামই অমৃতত্বের অধিকার। এ যে স্বর্গের মন্দাকিনী নয় পাতালের ভোগবতী, ইহাকে যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, আর যে মাটি খুঁড়িতে না জানে ইহা যে তার কাছে অমৃত নয়, কেবলই তোলা জল, কখনও ঘোলা কখনও কিছু নির্ম্মল, সে কথা বুঝিবার তখনও সময় হয় নাই। তাই যে শিক্ষার লক্ষই হইল অন্যের আবিষ্কৃত জ্ঞান, অন্যের সৃষ্ট রস, অন্যের আহৃত বিদ্যা কেবলি নিশ্চেষ্ট ভাবে গ্রহণ করান, তাহাকেও আমরা পরম সমাদরে সমস্ত মন দিয়া বরণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে এ শিক্ষাতেও বাঙ্গালীর মন বেশী দিন নিশ্চেষ্ট থাকিল না। আমাদের মনের যে অংশটা পূর্ব্ব হইতেই সচল ছিল, সেই ভাষা ও সাহিত্যের দিক, এই নূতন শিক্ষা ও ভাবের স্পর্শে নব বসন্তের সাড়া দিল। নব-যুগের অভিনব ভাব প্রকাশের উপযোগী শক্তিশালী, সৌন্দর্য্যময় ভাষা আমরা গড়িয়া তুলিলাম। বাঙ্গলার নবীন সাহিত্য আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও পুষ্ট করিতে লাগিল। তবুও এই সাহিত্যকে পরীক্ষা করিলেই নূতন শিক্ষা প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল হাতে হাতে ধরা পড়ে। দেখা যায় কাব্য ও রসসাহিত্যবাদে এ সাহিত্যের বেশীর ভাগই অনুবাদ ও সঙ্কলনের সাহিত্য। যে তৈরী ভাব ও চিন্তা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর কাছে আসিয়াছে তাহাকেই বাঙ্গলা পোষাকে দেশের কাছে

দাঁড় করান মাত্র। আমাদের সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরাও য়ুরোপীয় জ্ঞানে বিজ্ঞানের অতি সাধারণকথা ইংরেজি পুঁথি হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। সে যুগই ছিল প্রচারের যুগ। বঙ্কিমের 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের' কথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের এই সব অতি সাধারণ কথার সংগ্রহও বাঙ্গালী সেদিন 'বিষ বৃক্ষের' লেখনীর অযোগ্য মনে করে নাই।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম যুগে যে অতি-মানুষ-বাঙ্গালী, প্রাচ্য সভ্যতার শিখরে দাঁড়াইয়া মোহহীন চক্ষুতে পশ্চিমের সভ্যতাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিজের জাতির সম্পর্কে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর তাঁর কোথায় লোভ ছিল তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে লর্ড আম্‌হার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাতে দুইটী কথা খুব সুস্পষ্ট। প্রথম বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখান নাই। দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে তাঁহার লক্ষ্য ছিল বাঙ্গালীর বুদ্ধির ধারাকে এমন পথে প্রবাহিত করান যাতে জ্ঞানের ভূমি সরস ও উর্ব্বর হয়। দ্বিতীয়ত তিনি চাহিয়াছিলেন য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের বৃক্ষটীকে শিকড়শুদ্ধ দেশের মাটিতে রোপণ করিতে ('planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe') যেখানে আমাদের মনের রসে ও রৌদ্রে, এ দেশেই সে গাছে নব কিশলয় দেখা দিবে, নূতন ফুলে ও নূতন ফলে মানুষের সভ্যতার শোভা ও সম্পদ বাড়াইবে। কিন্তু যে ইংরেজি শিক্ষা দেশে আরম্ভ হইল তাহা রামমোহনের ঈপ্সিত

শিক্ষা নয়। ইহার লক্ষ্য য়ুরোপের জ্ঞানের বৃক্ষ এদেশে রোপণ করা নয়; সেদেশ হইতে কিছু ফুল, ফল, পাতা আনিয়া এদেশের লোকের চোখের সম্মুখে ধরা। যাহাতে ঘর সাজান যায়, কিন্তু বাগান করা চলে না। আর সে ঘরের সজ্জাও নিত্য নূতন ধার করিয়া আনিতে হয়, কেননা জ্ঞানের তোলা ফুল পাতাও এক রাত্রিতেই বাসি হইয়া যায়।

(১৪)

এ পত্রের পর একশ বছর অতীত হইতে চলিল। আজ বাঙ্গালী অন্তরের মধ্যে নিঃসন্দেহ অনুভব করিতেছি রাজা রামমোহন স্বজাতির মানসিক শক্তিতে যে বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন তাহা অত্যুক্তি নয়। আজ সাহিত্যে, চিন্তায়, বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর সৃষ্টির বিশ্ব মানবের সভ্যতার সভায় স্থান পাইতেছে, এবং আমরা বুঝিতেছি ইহা কেবল সাফল্যের সূচনা মাত্র। এই সামান্য সফলতার প্রারম্ভকে বৃহৎ পরিণতির দিকে লইয়া যাইবার শক্তি এ জাতির মধ্যে আছে। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন এ শক্তিকে পূর্ণ ভাবে জাগাইয়া তোলা। ইহাকে সংহত করিয়া সৃষ্টির পথে, মুক্তির দিকে ছাড়িয়া দেওয়া। ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার বিশেষ উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত কাজ।

আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্যাও এই খানেই। আজ বাঙ্গালীর প্রয়োজন সেই শিক্ষায় যাতে জাতির বুদ্ধি ও প্রতিভা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। নিজের প্রাণে সেই প্রাণের স্পর্শ পায়, যার সঞ্জীবনী রস মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া নিত্য নূতন ফলপুষ্পে তার দেহকে মণ্ডিত করিতেছে।

কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চলিতেছে সেই প্রথম কালের প্রাচীন শিক্ষা, প্রাণের সঙ্গে যার কোনও সম্বন্ধ নাই, কাঠের মূর্ত্তি লইয়াই যার কারবার।

বাঙ্গালীর মনের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া জ্ঞানের রাজ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যার লক্ষ্য নয়, যার উদ্দেশ্য হইল বাঙ্গালীকে ঘরে বসাইয়া জ্ঞান রাজ্যের, ছাপা ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখা। আজ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাকশালায় অন্ন পাকের আগুনের প্রয়োজন, কিন্তু তার হাতে কেবল আছে টিনের কৌটার তৈরীখাবার পরিবেশনের সরঞ্জাম।

স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলাই ভাল এখনকার দিনে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য রাজার দেশ হইতে যে সব অধ্যাপকের আমদানী হইতেছে তাঁহারা এ যুগে বাঙ্গলা দেশে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা দিবার অধিকারী নহেন। তাহার সহজ কারণ য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের যথার্থ যোগ নাই। কেন না য়ুরোপের চিন্তার রাজ্যে তাঁরা কেহ ভাবুক নহেন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কেহ কর্ম্মী নহেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার ফেরিওয়ালাকেও গুরুর আসনে বসাইয়া যে দিন আমরা ফল পাইয়াছি সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। দেশী বা বিদেশী আজ বাঙ্গালীর আচার্য্য হইবার কেবল তাঁরই অধিকার, চিন্তার রাজ্যে যিনি নূতন ভাবনা ভাবিতে পারেন, জ্ঞানের আকাশে নূতন আলো যাঁর চোখে পড়ে। এই আচার্য্যদের সাহায্যেই আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকে সফল ও সজীব করিবার একমাত্র উপায়। ইহার অভাবে বড় বাড়ী, ভাল আসবাব, এমন কি বহুমূল্য যন্ত্রপাতি সকলি বৃথা। আর এইটী ঘটিলে

সকল অভাবের মধ্যেও আমাদের শিক্ষারও প্রাণ ও শক্তিলাভে বিলম্ব ঘটিবে না।

নূতন সৃষ্টির বেদনার পুলকে বাঙ্গালীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে কলায়, সাহিত্যে বিজ্ঞানে নূতন রস, নূতন ভাব, নূতন জ্ঞানের দিকে তার চিত্ত উন্মুখ। এই নব জাগ্রত সৃষ্টিরশক্তিকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার যাহা সহায় সেই শিক্ষাই এ যুগে বাঙ্গালীর প্রকৃত শিক্ষা। পরের পণ্যে মহাজনী আমরা অনেক দিন করিলাম। এখন শিল্পশালার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কি শিল্প বাণিজ্যে, কি ভাবে চিন্তায় দোকানদারী করিয়া তৃপ্তির দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। বৃহৎকে আমরা বরণ করিয়াছি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। স্বল্পতুষ্টির প্রবল প্রলোভন হইতে মানবসভ্যতার বিধাতা বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

বিবাহের পণ।*

——০※০——

আজকাল মস্ত একটা সোরগোলের তর্কের বিষয় হচ্ছে, বিবাহের পণ। যেখানে সেখানে যার তার মুখে শোনা যায় যে, সমাজে যতগুলি কুরীতি ও কুসংস্কার আছে সবগুলি মিলে আমাদের ততটা সর্ব্বনাশ করে না যতটা করে এই এক বিবাহের পণ। গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, নভেলে, সব রকম সাহিত্যেই এ বিষয় নিয়ে খুব একটা আলোচনা চল্‌ছে; রঙ্গমঞ্চের মার্ফতেও লোকের মনটাকে সু-রাহায় আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে; আর যেই থেকে থেকে দুই একটী কুমারী পরিধেয় সাড়ীর সঙ্গে কেরোসিন তৈল এবং অগ্নির সংযোগ করে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হচ্ছেন, অম্নি এক একটা তুমুল হৈঃ চৈঃ উঠ্‌ছে এবং এমন কি সেই হিড়িকে দু' চারটী উৎসাহী যুবক কাগজে স্বাক্ষর ক'রে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হচ্ছেন যে তাঁরা বিবাহে পণ নেবেন না। কিন্তু এত লেখালেখির ফল যে কি হচ্ছে তা আমিও জানি, আর সব বাঙ্গালীরাও জানেন। বিবাহে পণ নেওয়া আমরা সকলেই বলি মন্দ কাজ, কিন্তু প্রতি-কারের চেষ্টাটা আমার মনে হয় যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মত।

---

* এ বিষয়ে গত কার্ত্তিকের "উপাসনা" পত্রিকায় একটি অতি জোরাল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। প্রবন্ধের নাম, "একটি ভাববার কথা"। লেখক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত। এত সাদা কথা এত সিধে ভাবে বলবার ক্ষমতা মাসিকপত্র লেখকদের মধ্যে নিত্য দেখা যায় না।

সম্পাদক।

বিবাহের সময় কেন যে পণের কথা ওঠে তা অনেকেই ভেবে দেখেন না, মনে করেন যে দেশের শিক্ষিত যুবকেরা একটু সৎসাহস প্রদর্শন ক'রে যেমন তেমন পাঁচপেঁচে রকমের মেয়েদের, শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা সুন্দরী কি কুৎসিতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না ক'রে, কেবল হাত পা আস্ত আছে এইটুকুমাত্র দেখে, বিবাহ কর্‌লেই এই উৎপাত থেকে দেশটা মুক্ত হবে। মেয়ের বাপেরা এবং অপুত্রকেরা বুঝতেই পারেন না যে, ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখে এত নীচপ্রবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে কেন, যে তাদের এবং তাদের বন্ধুবর্গের কুলে-শীলে উৎকৃষ্টা মেয়েদের বিবাহ কর্ত্তে ইতস্তত: করে। অনেকে আবার কল্পনার চক্ষে অতীতের সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে কেবল এই বলে আক্ষেপ করেন যে "আহা সেকালে আমাদের বাপ পিতামহের আমলে কোনই হাঙ্গামা ছিলনা, বিয়েতে জোর ৫১৲ পণ ছিল, তাও বরের কুলের উচ্চতা অনুসারে দেওয়া হত—আজকাল কুলের খোঁজে কাজ নাই, দাও কেবল টাকা আর টাকা।" অধিকন্তু কাগজে সহিকরা ছেলেদের কামড় আরও বিষাক্ত—তাঁরা পণ নেন না বটে কিন্তু এত বেশী খুঁতখুঁতে মন নিয়ে আসরে নামেন যে, হয় মেয়েদের ডানাকাটা পরী হতে হবে, তাতেও বোধ হয় কুলাবে না—কিম্বা তাদের অভি-ভাবকদের ঐশ্বর্য্যের বাতাসটা এ রকম বওয়া উচিত যে বর যেন কেবলমাত্র ঘ্রাণ দ্বারা অনুমান কর্ত্তে পারেন যে, এস্থলে দরকশাকশি না করেও, যা চাওয়া যেতে পারে তার অপেক্ষা বেশী পাবেন। অতএব সকলেরি ভাবা উচিত যে এ কু-প্রথা আমাদের দেশে কেন এল এবং এর প্রতিকারই বা কি।

সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ ; এমন কি সকল বিষয়ে আদর্শ-যুগ। সে যুগে

কোনও কষ্ট ছিল না, সুতরাং সে যুগের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্ ; কিন্তু এই যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এ প্রথার তত টা চল ছিল না তার কারণ কি ? যতদূর আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ দুইটি— প্রথম খাদ্যদ্রব্যের প্রচুরতা, দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ। সেকালে বিবাহের সময় স্বামীকে ভাব্‌তে হত না যে সে স্ত্রীপুত্রাদিকে খাওয়াবে কি করে, আর কন্যার পিতাকেও ভাব্‌তে হত না যে জামাতা যদি উপার্জ্জন না করেন তা হলে পুত্রা আর পৌত্রাদির খাওয়াবার কি ব্যবস্থা হবে। খাওয়া পরার অভাব না থাকায় সহজেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত হবার সুযোগ উপস্থিত হ'ল; এবং বালকবালিকা-বিবাহ চলিত হওয়ার দরুণ বর অপেক্ষা বরের ঘরের খবরের আবশ্যকতা বেশী হ'ল এবং বরের বিদ্যা অপেক্ষা স্বাস্থ্যটা বেশী লক্ষ্যের বিষয় হ'ল। জাতিকুল মাপ-কাটি হওয়াতে সমাজে বর কন্যার দর ছেলে মেয়ে হিসাবে সমান ছিল— বিবাহের বাজারে ছেলে ব'লে বরের বিশেষ একটা মূল্য ছিল না এবং কন্যার বিবাহ দিয়ে স্বচ্ছন্দে তাকে ও তার ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার সামর্থ্য থাকার জন্য, কন্যার পিতার নিকট কন্যার জন্ম পাপের ভোগ বলে মনে হত না। ছেলেবেলাতে ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়ে গেল, তারপর যার কপালে যে ছেলে যেমন কৃতী হল। কারও স্বামী বা মূর্খ হ'ল, কারও স্বামী বা পণ্ডিতাগ্রগণ্য হ'ল। কোনও কালে কোনও দেশের স্ত্রীপুরুষের সংখ্যায় যে বিশেষ বৈষম্য আছে তা মনে করা ভুল—হয়ত বিশেষ কারণবশতঃ সাময়িক কিছু প্রভেদ থাক্‌তে পারে কিন্তু অচিরেই তা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্ততঃ আমার মনে হয় না, যে বাংলাদেশে এই সব অসুবিধার হেতু, ছেলেমেয়ের সংখ্যার বৈষম্য। বহুবিবাহ যখন প্রচলিত ছিল তখন স্ত্রীলোকের

সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যা অপেক্ষা দশ বিশগুণ বেশী ছিল না, এবং আজকাল যে, পাত্রের এত অভাব তা census রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যাবে যে এ মনে করা ভুল যে, পুরুষের সংখ্যা মেয়ের সংখ্যা অপেক্ষা কম। আজকাল যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই তার কারণ এ নয় যে বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের খুব উন্নতি হয়েছে, বরং তার কারণ এই যে অন্নসমস্যা এমন উৎকট হয়ে উঠেছে যে ছেলেদের কতকটা উপার্জ্জনের রাস্তায় এগিয়ে না দিয়ে বিবাহ দিতে বরের বাপও ইতস্ততঃ করেন এবং কন্যার পিতাও তেমন ছেলেকে সুপাত্র মনে করেন না। বাল্যবিবাহ ও জাতিকুলের কালে যতগুলি সুপাত্র ছিল ততগুলিই সুপাত্রী ছিল, সুতরাং বিবাহে কোনও গোল ছিল না। আজকাল পাত্রের সংখ্যার অল্পতা না থাকলেও সুপাত্রের অত্যন্ত অভাব। আমাদের দেশের মেয়ের কোনও দাম বাড়ে নি, এমন কি বড়লোকের অশিক্ষিতা মেয়েও গরীবের শিক্ষিতা মেয়ের অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়া—অথচ পক্ষান্তরে কতকগুলি ছেলের, তাদের উপার্জ্জন ক্ষমতা অনুসারে বা উপাধির অল্পাধিক্য হিসাবে মূল্য বেড়েছে। সকল কন্যার পিতার ইচ্ছা যে এমন পাত্রে মেয়েকে দেন যে তা অন্ততঃ অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ না থাকে, কিন্তু দিনকাল দেখে এবং চাকুরী-ডাক্তারী ওকালতীগতপ্রাণ বাঙ্গালীদের অবস্থা দেখে তাঁরা কেবল্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপধারী ছেলেগুলিকেই সুপাত্র মনে করেন।

সব মেয়েরই বিবাহ দিতে হবে অথচ তাদের মধ্যে সমাজ এমন কোনও জিনিস দেখ্‌তে শেখেনি যাতে ক'রে একটী মেয়ে আর একটী মেয়ে অপেক্ষা বধূ হিসাবে অধিক বাঞ্ছনীয়া হয়। বেশী লেখাপড়া শেখা অনেক স্থলে দোষের মধ্যেই গণ্য হয়! রূপের অবশ্য একটু

দাম আছে কিন্তু তাও খুব বেশী নহে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিবাহযোগ্যা মেয়ে অনেক কিন্তু জামাতা কর্ত্তে পারা যায় এমন পাত্র কম। অতএব ঐ কয়টী সুপাত্রের জন্য মেয়ের বাপদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং তাঁরা নিজেরাই দাম বাড়িয়ে দেন। একজন উপাধিকারী পাত্রের সহিত যে কন্যার পিতা ৫০৲ মাহিনা পান তিনিও বিবাহ দিতে উৎসুক, যিনি ৫০০৲ পান তিনিও আগ্রহান্বিত আর যিনি হয়ত ৫০০০৲ রোজগার করেন তিনিও সুশিক্ষিত বলে তাকে জামাতারূপে পেতে ইচ্ছুক। ছেলে এ অবস্থায় নিলামে চড়ে; এবং এই তিন জনের ডাকাডাকিতে ছেলের দাম এত বেশী চড়ে যায় যে প্রথমোক্ত লোকের বসতবাটী বন্ধক পড়ে। একটু অনুধাবন করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, বরপণটা প্রত্যক্ষভাবে বরের বাপ স্পষ্টতঃ চাইলেও কন্যার পিতারাই জোর করে তাঁদিকে দেন। আমাদের দেশে যখন বিবাহ কোর্টশিপ করে হয় না, এবং যখন বরের পিতা বা অভিভাবক বধূ বাছাই করে থাকেন, আর মেয়েরা যখন সকলেই এক দরের, এমন অবস্থায় কোনও কারণ আছে কি, যে কন্যার পিতা যে টাকাটা জোর করে দিচ্ছেন তা কেন ফেলে দেওয়া হবে, বা বরের পিতা কেন একজন বড় কুটুম্ব কর্ব্বেন না? ব্যাপার এমন ত নয় যে ছেলের বিবাহ না দিয়ে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হচ্ছে, তবে তিনি নিজের মনোমত স্থানে বিবাহ দেবেন না কেন? এ অবস্থা যে-কোনও দেশের পক্ষে অতি দুর্ভাগ্যের অবস্থা বল্‌তে হবে যখন খাওয়াতে পার্ব্ব না মনে করে লোক বিবাহ করে না, এবং সন্তানাদি জন্মালে আরও কষ্ট বাড়বে মনে করে, লোকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তাতে বাধা দেয়। কিন্তু প্রায় দেশই যখন

এইরূপ দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট এবং ভারতবর্ষও যখন তা হতে মুক্ত নয় তখন বিবাহও যে অর্থনীতি দ্বারা শাসিত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? বিবাহের পর সন্তানাদি হলে তাদের কি খাওয়াব এবং তাদের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যয় কোথা হ'তে আসবে এই সব ভেবে ছেলের বাপ আর ছেলের বিবাহ অল্প বয়সে দেন না। এই মনে করে যে, পাশকরা জামাতা অন্ততঃ করে খেতে পারবে, কন্যার পিতার পাত্র সন্ধান করতে করতে কন্যার বালিকা অবস্থা উত্তীর্ণ হয় এবং পিতাও বিবাহের পর একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হন। এর প্রতিকার কিন্তু হাহুতাশ নয়, সভা সমিতি বক্তৃতা নয়, এমন কি ছেলের কিম্বা ছেলের বাপের "পণ চাহিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞাও নয়। শ্রীমতীরা আত্মহত্যা করে তাঁদের পিতাদের সম্পত্তি রক্ষা করেন বটে কিন্তু সামাজিক লাভ যে তাতে কতদূর হয় ঠিক বলা যায় না—প্রত্যুত আমার মনে হয় যে সাধারণ লোকেরা এই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাদের বাহবা দিয়ে এবং তাদের কার্য্যের অনুমোদন করে সমাজকে দুর্ব্বল করছেন এবং একটা নূতন প্রকারের সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করছেন। এরূপ স্থলে খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে তবে উপায় কি? যে কয়টী উপায় আমার নিকট সমীচীন মনে হয় তা এইখানে লিখছি।

১। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপের মূল্য কমানো। যতদিন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মার্কামারা লোকেরা অপরের অপেক্ষা সহজে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে ততদিন উপাধির দাম কন্যার পিতাকে নগদ গুণে দিতেই হবে। পাসের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমেছে বলে মনে হয়, এবং আজকাল অনেকে শুধু পাসকরার তুলনায় চাকুরে ছেলেকে বেশী পছন্দ করেন। আজকাল যে রকম চাকুরির বাজার তাতে পাসের দাম

ক্রমশঃ কম্‌বে। এর মূল্য দ্রুত কমাতে হ'লে উচ্চ শিক্ষার আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক। আশুবাবুর আমিলে যে বেশী ছেলে পাস হচ্ছিল তাতে দেশের অন্য কোনও উপকার হোক বা নাই হোক, শুধু পাস করা ছেলেই যে সুপাত্র এই ভুলধারনা অনেকটা দূর হচ্ছিল। যখন সকলে দেখ্‌বে যে অনেক পাস করা ছেলে উদরান্নের সংস্থানে অপারগ তখন লোকে উপার্জ্জনক্ষম ছেলেদেরই সুপাত্র মনে কর্‌বে—তা তারা যে কোনও সদুপায়েই উপার্জ্জন করুক না কেন। কতকগুলি লোক অবশ্য চিরকাল থাকবেন যাঁরা কেবল বিদ্যা দেখেই কন্যার বিবাহ দেবেন, কিন্তু সাধারণতঃ কন্যার পিতা এইটুকু দেখবেন যে এমন পাত্রে মেয়ে দিচ্ছেন যে তার অন্নবস্ত্রের কষ্ট না হয়।

২। প্রচুর সংখ্যায় উপার্জ্জনক্ষম সুপাত্রের সৃষ্টি এবং কেবলমাত্র কয়েকটী ব্যবসায়কে সম্মানের চক্ষে না দেখা। কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক ছেলেদের অবলম্বন কর্‌তে হবে, লোকেদের মন থেকে এ সব কার্য্যের হীনতা সম্বন্ধে যে ভুলধারণা আছে তাহা অপসৃত কর্‌তে হবে, এবং তাদের দেখাতে হবে যে এ সব কার্য্য যারা করে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেবলমাত্র পাসকরা ছেলে অপেক্ষা সহজে হয়। মোট কথা কন্যার পিতাদের জানতে হবে যে এ সব উপায়ে উপার্জ্জন-ক্ষম ছেলেরাও সুপাত্র।

৩। সুপাত্রীর সৃষ্টি। আজকাল মুড়ী মিছরির এক দর। কি রকমের শিক্ষা মেয়েদের দেওয়া উচিত তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যে কোনও শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হ'ক না কেন মেয়েদের সুশিক্ষিতা করা উচিত এবং সাধারণকেও এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যে ঐ সুশিক্ষিতা পাত্রীগুলি অপেক্ষাকৃত সুপাত্রী, অতএব

অধিকতর বাঞ্ছনীয়া। ছেলেদেরও পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তারা যেন এ জ্ঞান লাভ করে যে জীবন কৃতার্থ কর্ত্তে হ'লে ঐ শিক্ষিতা সুপাত্রীই লাভ কর্ত্তে হবে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হ'লে বিবাহের আগ্রহটা উভয় পক্ষের হবে এবং পাত্রের মূল্য নিয়ে যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর হবে। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন যে এক সুপাত্রেই রক্ষা নেই, আবার সুপাত্রী সৃষ্টি আর সুপাত্রীর জ্ঞান—এতে মেয়ের কেনা বেচা আরম্ভ হয়ে কুরীতিটা আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্বে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তা নয়, একটু ভেবে দেখলেই সকলে দেখ্‌তে পাবেন যে মেয়ের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দাম কম্‌বে।

আগ্রা ১৩ই মার্চ্চ ১৯১৮

শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী।

নবীন সাহিত্যিক।

—:০:—

"বয়সে বালক বচনে নয়
সে ছেলেকে মন্দ সকলে কয়"

সাহিত্যের আসরে ঠিক এ কথাটী না হলেও মাঝে মাঝে এবম্বিধ মন্তব্য শোনা গিয়ে থাকে। এবং পূর্ব্বপক্ষ এ মন্তব্যের নিরাসকল্পে বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনেকানেক সাহিত্যিকের নজির এনে হাজির করলেও সমালোচকের মন তাতে ভেজে না! বরং উল্টো বিপত্তিই দাঁড়ায়! কারণ, তত্তৎ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সব লেখক নাকি এক এক জন "অবতার" কাজেই তাঁদের পক্ষে যা "লীলাখেলা", সাধারণ সাহিত্যিকের পক্ষে তা নিশ্চয়ই দূষণীয়।

আমার মন কিন্তু এতে সায় দেয় না। সামাজিক সার্থকতা ওর যাই আর যতই থাক্ না, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস উক্ত শ্লোকাংশ নিতান্ত নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয়। বচন-বিন্যাসমাত্রকে সাহিত্য স্বজন, আর সাহিত্যকে সর্ব্বথা সামাজিক পদার্থ বলে ধরে নেওয়াতেই আমাদের ওরূপ ভুল হয়ে থাকে। সাহিত্য যদি স্থান, কাল এবং সমাজকে অতিক্রম করে' সুদূরকে সন্নিহিত করবার, অজানাকে প্রকাশ করবার, অবহেলিতকে অনুরঞ্জিত করবার সঙ্কেত না জানত; মানুষের ভবিষ্যতের আশার নীহারিকাকে যদি আকার দিতে না

পারত, শতেক পাকে তা যদি বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতার বজ্র-আঁটুনীতেই বাঁধা পড়ে থাক্‌ত—তবে তার যে বিশেষ আদর হতো সমাজে, এমন ত আমার বোধ হয় না! কারণ, ওরূপ বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের ত্রিবিদ্যা ত জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে ঘরে ঘরে কাগজে কলমে না হোক কায়মনোবাক্যে আবালবৃদ্ধবণিতা আমরা সবাই সাধন করে আস্‌ছি।

অভিজ্ঞতা সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সন্দেহ নেই;—কিন্তু অনুভূতিই হয়েছে সাহিত্যের প্রাণ। বেদমন্ত্রে যতক্ষণ না মৃৎ-প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, ততক্ষণ তা যেমন নিতান্ত জড়সমষ্টিমাত্র, তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্য-সৃজন-প্রয়াসও তেম্নি কথার কথা। অস্থি-সমাবেশপরিশূন্য জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়; কিন্তু চেতনালেশ-পরিহীন প্রাণীর কল্পনাও অসঙ্গত।

অধিকাংশ স্থলে সাহিত্যের সমালোচনার ছলে আমরা অভিজ্ঞতার মাপকাটীতে তার জড়-দেহটারই জরীপ করে থাকি; তারি ফলে, নির্ভুল সমালোচনাও অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে।

অনুভূতি পদার্থটী আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার সাথে কোনো আপেক্ষিক অনুপাত রক্ষা করে চলে না। তা' যদি চল্‌ত', তা' হ'লে সামাজিক উপন্যাস কেবল সমাজপতি মহাশয়দের হাত থেকে বেরুত; অবিনাশ বাবুও হয়ত "বার্ষিক উপন্যাস" লিখ্‌তেন না; আর, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন "রায় আর "রিপোর্ট" লিখেই কেটে যেত—অন্ততঃ রাণাপ্রতাপ, মেবার পতন, দুর্গাদাসের মত নাট্যসাহিত্য তাঁর অধিকারের অন্তর্ভূক্ত হতো না!

সাহিত্য বৈষয়িক-অভিজ্ঞতা-গত-প্রাণ নয় বলেই এ ক্ষেত্রে বয়সের বিচার নেই। "নবীন-সাহিত্যিক", "প্রবীন-সাহিত্যিক" আদি করে'

কথাগুলো নিতান্তই নিরর্থক। সাহিত্যে দাদা মশাই-এর লম্বাই চৌড়াই ও যেমন নিষিদ্ধ, খোকা বাবুর চাঁদ ধরাবার আব্দারও তেম্নি অচল! "অমৃতং বালভাষিতং" সাহিত্য-বিচারে এ কথা খাটে না। কারণ সাহিত্য ত "ভাষিত" হয় না। আর, "শতংবদ, একং মালিখ" এ যুগ্ম অনুজ্ঞার যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে আশা করি সবাই নিঃসন্দেহ!

সত্য এবং সতেজ অনুভূতির দ্বারা উদ্দীপ্ত না হ'লে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি কখনো স্বাভাবিক বা হৃদয়-গ্রাহী হতে পারে না! পঞ্চাশোর্দ্ধে তৃতীয় পক্ষে ষোড়ষীর পাণিপীড়ণ করে' অলঙ্কারের শিঞ্জিনীতে প্রীতির অভিনন্দনের অভাব দূর করবার প্রয়াস যেমন নিতান্তই পণ্ডশ্রম, অনুভূতির পরশ-মনির অভাবে অভিজ্ঞতার ইঁট পাট্‌কেল দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির আশাও ঠিক তেম্নি বিড়ম্বনা। এ বিড়ম্বনার অবতারণা যাঁরা করেন পাঠক-সাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের নয়। এবং উক্ত আনাড়ি সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ "আক্কেল দেবার" অভিপ্রায়েই সাহিত্য সৃষ্টির নামে তাঁরা নিত্য নূতন "সাহিত্য-পাঠ" রচনা করে থাকেন। পরের অজ্ঞতাকে অবশ্য স্বীকার্য্য, আর নিজের বুদ্ধিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে' নিয়েই তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্র-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেন। ফলে, তাঁদের অনায়ত দৃষ্টির সম্মুখে সাহিত্যের প্রসার স্বতঃই ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে।

"শিক্ষা" জিনিসটা অত্যন্ত দরকারী—তাতে আর সন্দেহ কি? দেশ যাতে সুশিক্ষিত হয়; দেশের লোকের মতি-গতি রীতি-নীতি যাতে বিপথগামী না হ'তে পারে; দেশের স্ত্রীপুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই যাতে স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্য পালনে উন্মুখ হয়ে ওঠে; এককথায়, দেশের যেখানে যেমনটী হওয়া উচিত সেখানে ঠিক তেমনটী যাতে

গড়ে ওঠে, আর যেখানে যা নিষিদ্ধ হওয়া দরকার, সেখান থেকে তা উঠে যায় যাতে, এমন-তর শিক্ষার সূত্রপাত এবং অনুষ্ঠান যে, দেশের মনিষিগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত—এ কথা সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু মানুষের অভাব এত বহুবিধ, প্রতিভা এত বহুমুখী আর প্রকৃতি এতই বিচিত্র যে দেশের সমুদয় সাহিত্য প্রচেষ্টাই যে সেই একই সাধারণ সূত্রের অনুবর্ত্তী হবে—এমন আশা করাও সমীচীন হবে না।

সাহিত্য আর সমাজে ত' গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নয়। সাহিত্য রসিকের সাথে সমপ্রাণতা স্থাপনাই হয়েছে সাহিত্যিকের চিরদিনের লক্ষ্য। নিবিড় আলিঙ্গনে পাঠকের প্রাণে প্রাণে অনুভূতির আনন্দ এবং সম-বেদনার আবেগ ছড়িয়ে দেওয়াই ত' সাহিত্যিকের কাজ। যে নব চেতনার উৎস সাহিত্যিকের প্রাণে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে, ভাষার সহায়তায় তাকে দিকে দিকে দেশে দেশে প্রেরণই হয়েছে সাহিত্যিকের সাধনা। যে ভাবনায় সাহিত্যিক বিভোর তা অপরের পক্ষে অভাবনীয় নয়, অচিন্ত্যও নয়; এমন কি অনেকের কাছে অননুভূত পূর্ব্বও না হ'তে পারে!—এই ভরসাই ত সাহিত্যিককে মুখর করে তোলে! নিজের অনুভূতিকে পরের কাছে যাচাই করবারও যে একটা আগ্রহ আছে! সেই আগ্রহের ঐকান্তিকতাতেই ত' সাহিত্য-সাধকের মানস-মূর্ত্তি তার লেখার ভিতরে বিকশিত হয়ে ওঠে। লেখক সেখানে গুরু নয়, উপদেষ্টা নয়—সখা! লেখক আর পাঠক উভয়েই সেখানে সাহিত্য-সেবী। লেখক আর পাঠকের এই যে ঐক্যবিধান এই খানেই সাহিত্যের সার্থকতা! সাহিত্য থেকে যদি কখনো সমাজের কোন "উপকার" হয় তা' হলে তা' এই পথেই আসবে! তার

অগ্রদূত হবে—আর আগমনী গাইবে তারাই যারা চির-নবীন চির-কিশোর। আর যারা এর ঘাঁটি আগ্‌লে রাখ্‌বে—হোক না তারা প্রবীণ হোক না তারা বিজ্ঞ—কিন্তু সাহিত্যিক তারা আদৌ নয়।

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

পত্র।

——:০:——

শ্রীমান চিরকিশোর—

কল্যাণীয়েষু।

একটা খবরের মত খবর দিয়ে এ চিঠিটে সুরু কর্‌তে পারছি নে, কেননা দেশ বিদেশের সংবাদ পত্র ঘেঁটে এমন কোনও সংবাদ খুঁজে পেলুম না, যাতে করে মানুষের পিলে চম্‌কে দেওয়া যায়। তারপর জনরবের কলরবও অনেকটা নীরব হয়ে এসেছে। গেলবার তোমাকে যখন চিঠি লিখি, তখন একটি বিজুলি-বার্ত্তার ধাক্কায়, দেশের সুস্থ শরীর অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল; এবং সে ব্যস্ততার ছোঁয়াচ যে আমার গায়েও লেগেছিল, তার পরিচয় ত ঐ পত্রেই পেয়েছ। সুস্থ শরীরে কে আর টনিকের খোঁজে ফেরে?

কিন্তু শুনে সুখী হবে যে, নব ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী, এই কলিকাতা মহানগরীতে আমরা সবাই আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছি। এ সহরে একটা হুজুগ নিয়ে লোকে বেশী দিন কাটাতে পারে না, আমাদের নিত্য নতুন গুজব চাই। আপাততঃ নতুন গুজবের অভাবে, আমরা সকলে সুবোধছেলের মত নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করেছি। রাজনীতিকেরা মন দিয়েছেন অর্থসংগ্রহে আর আমরা সাহিত্যিকেরা, বাক্য সংগ্রহে। এর কারণ ভারতবর্ষের বায়ুকোণে

যে ঝড়ো-মেঘ দেখা দিয়েছিল, তা এক নিমেষে কেটে গেছে। এ মেঘ যে কেটে যাবে, তা আমাদের বোঝা উচিত ছিল, কেননা "মানুষ আমরা নহিত মেষ"। আমরা যে তা বুঝিনি তার কারণ আমরা কবির কথাকে গানের দরবারে আদর করি—প্রাণের কারবারে আমল দিই নে।

সে যাই হোক্ এখন জানা যাচ্ছে যে, এ দেশের উপর জর্ম্মাণ বাটপাড়ির কথাটা হচ্ছে একেবারে উদ্ভট। কিম্বদন্তির ভিতর যতটুকু ইতিহাস থাকে ওগুজবের ভিতর তার বেশী আর কিছু নেই। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের এই নীল আকাশে ঐ লাল মেঘের ইন্দ্রজাল রচনা করবার কি দরকার ছিল। ঘরপোড়া-গরু সিঁদুরেমেঘ দেখলে যে ভয় পায়—এ প্রবাদ কি ইংরেজিতে নেই? তবে লাভের মধ্যে এই যে, এই ধাক্কায় আমাদের মনটা একটা বড় রকম ঝাঁকুনি খেয়েছে এবং আশা করি সেই সঙ্গে কতকটা সচেতনও হয়েছে।

অতঃপর শুন্‌ছি এ যুদ্ধের হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার ভারতবর্ষের বায়ুকোণে নয়—ফ্রান্সের ঈশানকোণেই হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী খুব সম্ভবতঃ খাট্‌বে। ইউরোপের অনেক বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহের যাহয় একটা হেস্তনেস্ত ইতিপূর্ব্বে বহুবার ঐ কোণেই হয়ে গেছে। এযুদ্ধ এতটা অপূর্ব্ব যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধের নজির, অনেকের মতে এক্ষেত্রে খাটবে না। বিশেষতঃ এই যখন পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। এযুদ্ধের আকার যে বিপুল, তা ত সকলেই জানে এবং অনেকে বলে এর উদ্দেশ্যও অতুল। এ লড়াই মাটির উপরে হলেও মাটির জন্য নয়। স্থূলদৃষ্টিতে এ ব্যাপার দেহের সঙ্গে দেহের সংঘর্ষ বলে বোধ হলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে এ হচ্ছে আত্মার সঙ্গে আত্মার লড়াই।

আত্মার জয় যে দেহের জয়ের উপর নির্ভর করে এ সংস্কার অবশ্য আমাদের নেই। আমাদের ধারণা দেহের পরাজয়েই আত্মার জয়। কিন্তু জর্ম্মাণরা উল্টো বোঝে। এই দেহাত্মবাদীদের মতে বাহুবলই আত্মবল। তাই তোপের মুখ দিয়ে তারা তাদের culture প্রচার করতে চায়। এ দেশের আর্য্য-সমাজের আমিষের দল নিজেদের বলেন, culture party কিন্তু নিরামিষের দল তাঁদের বলেন vulture party। ইউরোপের আর্য্য-সমাজেও জর্ম্মাণরা হচ্ছে নিজেদের মতে culture-এর দল, এবং অপরের মতে vulture-এর দল। জর্ম্মাণ-ইগল যে মহা-শকুন, এ দম্ভ জর্ম্মাণরাও করে থাকেন। অতএব এ যুদ্ধ যে, জর্ম্মাণীর culture ওরফে vulture-এর বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের আত্মরক্ষার যুদ্ধ, এ কথা মেনে নিতে কোনই আপত্তি নেই। তবে এ যুদ্ধ মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই যে মানুষের শেষ যুদ্ধ—এরূপ অনুমান করবার কোনও কারণ নেই। এ যুদ্ধের ফলে যদি বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সত্ত্বসাব্যস্ত হয়ে যায়, তারপর আর একটা যুদ্ধ হবে, বিশ্বমানবের সাম্যের সত্ত্বসাব্যস্তের জন্য—তারপর আর একটা যুদ্ধ হবে বিশ্বমানবের মৈত্রির জন্য। সেইটে হবে শেষ যুদ্ধ, কেননা তারপর পৃথিবীতে যুদ্ধ করবার আর কোনও লোক থাকবে না। এবং সেই সুযোগে বুদ্ধদেবের শেষ অবতার ভগবান মৈত্রেয় ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। থিওজফিষ্টরা যে ঘোষণা করছেন যে, তিনি ইতিমধ্যে দক্ষিণ-মথুরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে এখন গোকুলে বাড়ছেন—সে সুসমাচার মোটেই বিশ্বাস্য নয়।

তুমি ভাব্‌ছ যে আমি নেহাৎ বাজে বক্‌ছি। অবশ্য তাই করছি। এ যুদ্ধের নাম মুখে আনবা মাত্র, মানুষে যে বেজায় বাজে বক্‌তে আরম্ভ

করে, তার এক লাইব্রেরী প্রমাণ আমি যেখানে বলো, সেই সাহিত্যের আদালতে দাখিল করে দিতে পারি। তার দেদার দলিল আমার ঘরেই মজুত আছে। যদি জিজ্ঞাসা করো, এই সব বাজে বকুনি পয়সা খরচ করে সংগ্রহ করবার প্রয়োজন কি? বল্‌ছি। ইতিহাস মাত্রেই যে উপন্যাস এবং উপন্যাস মাত্রেই যে ইতিহাস এ আমার চিরকেলে বিশ্বাস। এবং এ বিশ্বাসের অন্ততঃ প্রথম পদটা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, আমাদের চোখের সুমুখে, দিনের পর দিন, ইতিহাস যে কি পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে তারি প্রমাণ জড় করছি। এত খেলাপ এজাহার মানুষে বোধ হয় আদালতেও দেয় না। তবে বৈজ্ঞানিক-ইতিহাস যে কাঁঠালের আমসত্ত সে জ্ঞান এক বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর সকলেরই আছে। এতেই বাঁচাও। জর্ম্মাণ দেশে Treitsche যে এত লোকমান্য এবং তাঁর ইতিহাস যে এত লোকপ্রিয়, তার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন জন্মকালা। কারও কথা তাঁর কাণে ঢোকে নি বলে তাঁর কথা জর্ম্মাণির সকলের কাণে ঢুকেছে। শুধু ঢোকে নি, কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে, আকুল করে জর্ম্মাণের প্রাণ। তিনি যদি fact-এর বড় একটা ধার ধারতেন তাহলে কি তিনি অমন ইতিহাস রচনা করতে পারতেন?

দেখ্‌তে পাচ্ছ এক কথা থেকে আর এক কথায় গিয়ে পড়্‌লুম। চিঠি লেখার দোষই এই যে, তা লিখ্‌তে লিখ্‌তে লেখার খেঁই হারিয়ে যায়। আমি যা বল্‌তে চেয়েছিলুম সে হচ্ছে এই যে, এযুদ্ধ যে ক্ষেত্রেই পঞ্চত্ব পাক্‌, অতীতে ইউরোপের অনেক যুদ্ধেরই ঐ ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর সীমান্ত প্রদেশেই গোর হয়েছে। সেকালের যুদ্ধ জমির জন্য করা হত বলে' সেকালের ইতিহাস জিওগ্রাফীর উপরেই গড়ে

উঠেছে। অন্ততঃ পোনেরো'শ বছর ধরে ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর ঐ মধ্যদেশ নিয়ে কত জাতি যে কত লড়াই করেছে তার আর লেখাজোখা নেই। ঐ প্রদেশ মানুষের এত রক্ত পান করেছে যে ওদেশে যে আঙ্গুর ফলে তার মদের রং আজও লাল; আর সে মদ উদরস্থ কর্‌লেই মানুষের মাথায় খুন চড়ে যায়। ইউরোপের মধ্যযুগে এই মধ্যদেশে জাতিতে জাতিতে যে কি রক্তারক্তি করেছে তার বিপর্য্যয় কাহিনী মধ্যযুগের যে কোন ইতিহাসে দেখ্‌তে পাবে। সে বিবরণ এত কুটিল আর এত জটিল যে তাকে সরল করবার ক্ষমতা আমার নেই। যুগ যুগ ধরে মানুষে মানুষে এই কোস্তাকুস্তির কারণ কি? ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর বিচ্ছেদের একটি সরল রেখা বার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ তারা কাগজে কলমে নয় ঢাল তলোয়ারে, যার সমাধান করবার এ যাবৎ বৃথা চেষ্টা করেছে, সে হচ্ছে একটি জ্যামিতির সমস্যা। এর থেকে স্পস্টই প্রমাণ হয় যে সংসারের কোন সমস্যার সরল মীমাংসা করবার চেষ্টা থেকেই যত মারাত্মক জটিলতার উদ্ভব হয়। আর মানুষ যে সরল পথ খোঁজে তার জন্য দায়ী তিনি, যিনি মানুষকে সরল রেখার সন্ধান দিয়েছেন, অর্থাৎ ইউক্লিড।

ভাল কথা ইউক্লিডের নাম করতেই মনে পড়ে গেল যে, ইউক্লিডের রচনার রূপ নেই একথা বলায়, আমার জনৈক অতি নিরীহ বন্ধু মহা রাগান্বিত হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন যে, যে-রূপের ভিতর কাম-গন্ধের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই, সে রূপের সাক্ষাৎ একমাত্র জ্যামিতির ভিতরেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য আমার বন্ধুটি হচ্ছেন একজন পাকা জ্যামিতিক। "জ্যামিতিক" শব্দটি কলাপের ব্যাকরণে সুসিদ্ধ হয় কি না জানি নে, কিন্তু আলাপের ব্যাকরণে তা প্রসিদ্ধ হয়েছে।

অতএব ওশব্দটি প্রবন্ধে না চল্লেও, পত্রে চলে। অন্ততঃ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, জ্যামিতিক শব্দ বাংলাভাষায় না থাক্‌লেও জ্যামিতিক লোক বাংলাদেশে ঢের আছে, এমন কি শিশুদের মধ্যেও ওদলের অভাব নেই। ত্রিশমাস বয়েসের আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র, এই মিনিট খানেক আগে, আমার সোণার ঘড়িটি নিয়ে মেজের উপরে ঘড়ি পেতে, বৃত্তকে চতুষ্কোন করবার চেষ্টা করছিল; আমি বাধা না দিলে, সে সমস্যার সে যে অতি সহজেই সমাধান কর্‌ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া থেকে তাকে নিরস্ত করায় সে যে কেঁদে পাড়া মাথায় কর্‌ছে তাতেও তার দোষ দেওয়া যায় না। ছোট ছেলেদের স্বভাবই এই যে তাদের কোনও স্বভাব নেই। তারা বড়দের যা কর্‌তে দেখে তাই কর্‌তে শেখে। আমরা যখন ভারতবর্ষের যেখানে যা কিছু গোল আছে তাকে চৌকোষ কর্‌তে উদ্যত হই, আর আমাদের গুরুজনেরা সে কার্য্যে বাধা দেন, তখন আমরা কান্না ছাড়া আর কি করি।

আমার জ্যামিতিক বন্ধুকে আমি এই কারণে মান্য করি যে তিনি, কোন কিছুরই আকার বদলাতে চান না। আকারের উপরে তাঁর ভক্তি এত নৈসর্গিক যে তিনি মনে করেন যে, দ্রব্যের গুণ তার আকারের উপরেই নির্ভর করে। রসগোল্লার সঙ্গে জিবে-গজার স্বাদের পার্থক্যের একমাত্র কারণ যে, প্রথমটির আকার জ্যামিতির এবং দ্বিতীয়টির Conic-section-এর অন্তর্ভূর্ত, তাঁর একথা অবশ্য আমি মানিনে। কিন্তু একথা আমি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে তিনি এক বিষয়ে আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে বিজ্ঞান নয়,—আর্ট, এ জ্ঞান আমি তাঁর প্রসাদে লাভ করেছি। এ

কথা শুনে লোকে চাই কি হাসতেও পারে, অতএব দেখা যাক্ এর স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে।

আমরা সকলেই জানি, আর্ট হচ্ছে সেই বস্তু যা প্রকৃতির হাতে নেই এবং যা মানুষে নিজের মন ও নিজের হাত, এ দুয়ের সহযোগে গড়ে তোলে। ইউক্লিড যা সব নিয়ে কারবার করেন তার কোন মূর্ত্তিই প্রকৃতির রাজ্যে কুত্রাপি কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। যে সরল রেখা হচ্ছে তাঁর শাস্ত্রের অর্দ্ধেক সম্বল, সে রেখা—এ বিশ্বে কোথায়ও নেই; আর এ পৃথিবীতে যেখানে ওরেখার সাক্ষাৎ পাবে সেখানেই বুঝতে হবে যে তা মানুষের হাতে গড়া। তারপর ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পৃথিবীতে নানা আকারের থাক্‌লেও সম-ত্রিকোণ সম-চতুষ্কোণ প্রভৃতি প্রকৃতির ভাণ্ডারে আদপে নেই। ওসব আকার মানুষে আগে কল্পনা করে' তারপরে রচনা করেছে। প্রকৃতি যা অসম্পূর্ণ রেখেছেন তাকে সম্পূর্ণ করাই মানুষের আসল কাজ। পৃথিবীতে যা আছে সে সব হচ্ছে আগাগোড়া বিষম। আর ইউক্লিড যেসব ত্রিকোণ চতুষ্কোণের মর্ম্মোদ্ধার করেছেন, সে সব হয় সম, নয় অসম, কিন্তু একটিও বিষম নয়। বিজ্ঞান খোঁজে fact অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ, কিন্তু আর্ট চায় তার সুরূপ। সুতরাং যা কুটিল, আর্ট তাকে সরল করে নেয়, যা বিষম তাকে সুষম করে নেয়—যা বিবাদী তাকে সম্বাদী, অনুবাদী করে নেয়; এক কথায় সকল বিরোধের সমন্বয় করে', তার সামঞ্জস্য ঘটায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে শুধু আমি নই সবাই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে ইউক্লিডের জ্যামিতি, আথেন্সের পার্থিননের মত, ফিডিয়াসের ভিনাসের মত একটি অপূর্ব্ব ও অবিনশ্বর work of art। প্রত্যুদাহরণের দ্বারা এর আর একটি প্রমাণ দিচ্ছি। হালে ইউক্লিড ভেঙ্গে

এক রকম বৈজ্ঞানিক জ্যামিতি তৈরি করা হয়েছে। সে জ্যামিতি দেখলে যে, ভদ্র-সন্তানের গায়ে জ্বর আসে, তার কারণ তাতে মাল ঢের বেশী থাক্‌তে পারে কিন্তু গড়ন মোটেই নেই। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা গর্দ্দভের কাছে সেতু হতে পারে, কিন্তু মানুষের কাছে তা পিরামিডেরই মানসী-মূর্ত্তি এবং তা আর্ট হিসেবে পিরামিডের মতই উচ্চ।

আর এক কথা ইউক্লিডের জ্যামিতি যে গ্রীসের সকল আর্টের স্বগোত্র, তার কারণ সে-সকল আর্টের ভিতরেও জ্যামিতি আছে। পার্থিননের সকল রেখাই সরল রেখা এবং তা আকারে চতুষ্কোণ এবং তার সকল ভূষণ ত্রিকোণ, অবশ্য সম-ত্রিকোণ আর অসম ত্রিকোণ, বিষম নয়। গ্রীকদের এ জ্ঞান ছিল যে আকাশই বস্তুকে রূপ দেয় তাই গ্রীসের স্থাপত্যে, রেখা ও রেখার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ আছে অর্থাৎ আকাশের স্থান আছে। মানুষের বঙ্কুর দেহটাকে যতটা সরল রেখার কাছাকাছি আনা যায় গ্রীক-ভাস্করেরা তা কর্‌তে ত্রুটি করেন নি। গ্রীসের Statue-এর দেহকে সত্যসত্যই দেহযষ্ঠি বলা যায়। আমাদের দেশের ভাস্কর্য্যে দেহের যে অঙ্গ উন্নত তাকে আরও উন্নত করা হয়েছে আর যে অঙ্গ অবনত তাকে আরও অবনত করা হয়েছে। অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক জাতিভেদ অস্বাভাবিক রকম ফুটিয়ে তোলা ও পিটিয়ে ফেলা হয়েছে। উঁচু-নীচুর জ্ঞান আমাদের তুল্য আর কোন জাতের আছে? গ্রীসের ভাস্কর্য্যের পদ্ধতি ঠিক এর উল্টো। সে দেশের শিল্পীরা দেহের সুষমা ও সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ করবার জন্য যা অসম তাকে সম করে তুলেছে আর যা বিষম তাকে অসম করেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাম্য ও মৈত্রের উপরেই যে দেহের সৌন্দর্য্য

নির্ভর করে এ সন্ধান তারা জানত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের আর্ট অবশ্য গ্রীসের পথেও চলেনি, ভারতবর্ষের পথেও নয়। এ যুগের শিল্পীদের Motto হচ্ছে যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং। অর্থাৎ তাঁরা আর্টকে বস্তুতন্ত্র করতে গিয়ে নিজেরা হয়ে পড়েছেন অপদার্থ যন্ত্র।

ইউক্লিডের জ্যামিতিকে যে, লোকে একনজরে আর্ট বলে চিনতে পারে না, তার কারণ অপর সকল আর্টের উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি, আর তাঁর আর্টের উপাদান আকাশ। ইউক্লিডের হাতে যা ধরা পড়েছে সে সব হচ্ছে ত্রিদল চতুর্দল আকাশকুসুম। সুতরাং তাঁর রচনা শুধু আর্ট নয়, চরম আর্ট। তিনি যে, ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বৃত্ত প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেছেন—তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসীমকে সসীম করা। ঐ সব ত্রিভুজ চতুর্ভুজের ভিতর অসীম আকাশ এমন নিখুঁত ভাবে সসীম হয়ে রয়েছে যে তার একটি বিন্দু নড়চড় করলে তার রূপের সর্ব্বনাশ হয়।

জ্যামিতিকে আর্ট বলায় আমি ওবস্তুকে খেলো করছি নে। মানুষে কেন যে আর্টকে, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির নীচে আসন দিতে এত ব্যস্ত তার রহস্য আমি আজও উদ্ধার করতে পারিনি। এব্যাপার আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য, কেননা মানুষের ব্যবহারে দেখতে পাই যে, যে বিজ্ঞান দর্শনের ভিতর আর্ট আছে, সেই বিজ্ঞান দর্শনই মানুষকে মুগ্ধ করে। প্লোটার দর্শন যে আগাগোড়া আর্ট তা দর্শনজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তাঁর আর্ট আবার ইউক্লিডের সহোদর। প্লোটার prototypes সব চিদাকাশের মন্দার পারিজাত বই আর কিছুই নয়। একটা স্বদেশী উদাহরণও নেওয়া যাক্। শঙ্করের দর্শন যে দেশে বিদেশে এত মান্য পেয়েছে তার একমাত্র কারণ, তার আর্ট। যে গুণে কালিদাসের কবিতা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সেই একই গুণে শঙ্করের

দর্শন, সংস্কৃত দর্শন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে সে গুণের নাম হচ্ছে প্রসাদ গুণ। বলা বাহুল্য স্বচ্ছতা হচ্ছে আর্টের সৃষ্টি। পৃথিবীর সকল জিনিষই অপরিষ্কার, মানুষ নিজের মন ও নিজের হাত এই দুয়ের সহযোগে যা অপরিষ্কার তা পরিষ্কার করে নেয়—সেই পরিষ্কৃত পদার্থের নামই স্বচ্ছ। কিন্তু চিন্তার ধারা স্বচ্ছ হলেই যে গভীর হতে হবে এমন কোনই কথা নেই। বরং সচরাচর দেখ্‌তে পাই লোকের বিশ্বাস যে, যে-বস্তু যত ঘোলা তা তত গভীর। মানুষে হেগেলের চিন্তাকে যে এত গভীর মনে করে, তার প্রধান কারণ সে চিন্তার ধারা আগাগোড়া কাদাগেলা।

যে মনোভাব থেকে মানুষে রঙকে স্বচ্ছ করে, সেই একই মনোভাব থেকে মানুষে রেখাকে সরল করে। সুতরাং রচনার ভিতর যেখানে স্বচ্ছতা আছে সেখানে ঋজুতার সাক্ষাৎ পাবার আশা করা যায়। শঙ্কর এ বিষয়ে আমাদের নিরাশ করেন না। তাঁর মনও জ্যামিতির ছাঁচে ঢালা। তাঁর চিন্তা একটা সরল রেখা ধরে চলে বলে' তার সঙ্গে সঙ্গে চলা এত সহজ। এ চলার যা আনন্দ সে হচ্ছে পুরোপুরি আর্ট উপভোগ করবার আনন্দ। তাঁর অনুগামী হয়ে আমরা কি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কি অতীন্দ্রিয় কোনরূপ জ্ঞানের পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইনে। প্রথমত তিনি এই বহুরূপী বিশ্বকে মায়া বলে, অর্থাৎ তার রূপ বাদ দিয়ে জিনিসটিকে বেজায় স্বচ্ছ করে নিয়েছেন। তারপর তাঁর যুক্তি একটা সরলরেখা ধরে শেষটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যার স্থিতি আছে অথচ ব্যাপ্তি নেই অর্থাৎ বিন্দুতে। শঙ্করভাষ্যের প্রধান গুণ যে তার আর্ট, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে ভাষ্যের সঙ্গে উপনিষদের তুলনা করলে। উপনিষদে যা আছে সে হচ্ছে নিছক poetry, অর্থাৎ তার

সীমারেখাও স্পষ্ট নয় তার বর্ণও স্বচ্ছ নয়। অনন্তের ছায়ায় তা আবছায়া। অসীমের দেশে তার সীমারেখা বিলিন। এক কথায়, উপনিষদ্ ইংরেজিতে যাকে বলে রোমাণ্টিক আর তার ভাষ্য ক্লাসিক। আর এ দুয়ের মূল প্রভেদটা এই যে, ক্লাসিক-সাহিত্য রেখাবদ্ধ আর রোমাণ্টিক-সাহিত্য বর্ণবিদ্ধ, অর্থাৎ ক্লাসিক-সাহিত্য জ্যামিতির অন্তর্ভূত, আর রোমাণ্টিক তার অতিরিক্ত। এই কারণে হৃদয়াবেগ চিরকালই রোমাণ্টিক এবং আর্ট চিরকালই ক্লাসিক। এ দুয়ের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ বিপরীত। Poetry-র উদ্দেশ্য সসীমকে অসীম করা, আর আর্টের উদ্দেশ্য অসীমকে সসীম করা। মানুষে অবশ্য চিরকাল এই দুইকে মেলাতে চেষ্টা করে আসৃছে, এবং এই দুয়ের মিলনে যা জন্মলাভ করে—তাই হচ্ছে যথার্থ কাব্য। তবে কোনও কবির তুলিতে রেখা ফোটে ভাল আর কোনও কবির তুলিতে রঙ, কাব্যে কাব্যে এই যা প্রভেদ। এর পর এ কথা নিশ্চিন্তমনে বলা যায় যে, দর্শন বিজ্ঞানের স্থান কবিতা ও আর্টের উপরে নয়, কেননা বিজ্ঞান যে কনিষ্ঠ-আর্ট এবং দর্শন যে বৃদ্ধ-কবিতা—এ সত্য যদি প্রমাণ করতে না পেরে থাকি ত এতক্ষণ মিছে বকলুম কেন?

কোথা থেকে সুরু করেছিলুম আর কোথায় এসে পড়লুম? যুদ্ধ থেকে একেবারে কবিত্বে। এ পত্রে আমার লেখা যে সরলরেখায় চলেছে—তা বলতে পারিনে, তবে এর গোড়ার সঙ্গে আগা যে জোর করেও মেলানো যায় না তা নয়। গোড়ায় বলেছি যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে আত্মার সঙ্গে আত্মার যুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আত্মা অর্থে জাতীয় আত্মা বুঝতে হবে। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ হচ্ছে বিকৃত জর্ম্মাণ-রোমাণ্টিক আত্মার সঙ্গে প্রকৃত ল্যাটিন-ক্লাসিক আত্মার

লড়াই। ক্লাসিক ফ্রান্স তার সীমান্ত রেখা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে—রোমাণ্টিক জর্ম্মাণি তার নিজের সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা করছে। শুধু দেশের সীমা নয়, জর্ম্মাণী ইতিমধ্যেই নীতির সীমা, লজিকের সীমা, সামাজিকতার সীমা, এক কথায় সভ্যতার সকল সীমা হুঙ্কার ছেড়ে এক লম্ফে অতিক্রম করেছে। জর্ম্মাণীর জাতীয়-আত্মাকে ঠেলেঠুলে এখন যদি তার স্বদেহে অর্থাৎ স্বদেশে পোরা না যায় তাহলে পৃথিবীতে সভ্যতা বলে আর কোনও জিনিস থাকবে না। কেননা সভ্যতা হচ্ছে মানুষের জীবন ধারণের আর্ট—অতএব তা বাইরের ও ভিতরের নানাবিধ সীমারেখায় আবদ্ধ। সভ্যতা জিনিসটেই ক্লাসিক এবং ইউরোপের ল্যাটিন জাতিই তার যথার্থ উত্তরাধিকারী। আশা করি তারা সে অন্বয়াগত সম্পত্তি বর্ব্বরতার হাত থেকে এ যাত্রা রক্ষা করতে পারবে। ও বস্তু রক্ষা করবার অন্তত প্রাণপণ চেষ্টা করা যে সভ্য-সমাজের কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। ছেলেবেলায় সংস্কৃত ক্লাসিকে পড়েছি যে হর্ষবর্দ্ধন—"হূনান্ হন্তুং প্রতিচ্যাং দিশিং জগাম"। হর্ষচরিতের ঐ একটি টুকরোই আমার মনে আছে—কেননা সে বয়েসেও বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার ঐ অভিযানের জীবন্ত ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠেছিল এবং আজও তার রঙ জ্বলে যায়নি। বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াটাই সভ্যতার সব চেয়ে সুন্দর দেহভঙ্গি।

জানি, এ সব কথা শুনে লোকে বলবে—"বীরবলের কথা ছেড়ে দাও—ও ত মার্কামারা ফরাসি-ভক্ত।" এ খ্যাতি প্রত্যাখ্যান করতে আমি কিছুমাত্র ব্যগ্র নই। লোকে বলে আমার শরীরে ভক্তির লেশ নেই, অতএব আমার ফরাসি-ভক্তির খ্যাতি, "খোস খবরের ঝুঁটোও

ভাল" হিসেবে গ্রাহ্য। খাঁটি কথা এই যে, ফরাসীদের প্রতি আমার ভক্তি নেই—প্রীতি আছে, তার কারণ ফরাসীরা দেবতা নয় মানুষ। মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়ার চাইতে আর বড় কৃতীত্ব নেই, কেননা তা হওয়া ভারি শক্ত। জর্ম্মাণরা মানুষ না হয়ে অতিমানুষ হতে গিয়েই অমানুষ হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক্, আমার কথা তুমি ভুল বুঝো না। আমি রোমাণ্টিক মনোভাবকে বর্ব্বরতা বলছি নে। ক্লাসিক মন রেখাপাত করে, রোমাণ্টিক মন তার অন্তরে বর্ণ বিন্যাস করে। এর প্রথমটির ভিতর দ্বিতীয়টি অনুপ্রবিষ্ট না হলে, কি সমাজ কি সাহিত্য কিছুই ঐশ্বর্য্য লাভ করে না। তবে এ কথা ভুললে চল্‌বে না যে, শুধু রেখায় ছবি আঁকা যায়, শুধু রঙে যায় না। অতএব সুস্থ মনের প্রথম কাজ হচ্ছে কাঠাম গড়া ও খাড়া রাখা। সুবুদ্ধি কাঠাম তৈরি করে সুহৃদয় তার ভিতর রঙ ভরে দেয়। কিন্তু যে হৃদয়াবেগ আর্টের হাতে গড়া সুঠাম কাঠাম ভেঙ্গে ফেলতে চায়,সেই হৃদয়াবেগই বর্ব্বর, কেননা তা অন্ধ। আজকের দিনে জর্ম্মাণির জাতীয়-আত্মা রূপান্ধতার এত প্রবল প্রমাণ দিচ্ছে যে, সে আত্মাকে আর্টিষ্টিক অর্থাৎ সভ্য বলা অসম্ভব। রোমাণ্টিক আত্মা বিপথে গেলেই তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়—আর ও মনোভাবের উদ্ভ্রান্ত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে। রোমাণ্টিক আত্মার ছোটবার খোলা রাস্তা হচ্ছে, উপরের দিকে—আশে পাশে নয়। তার চোখ আকাশ ছেড়ে মাটির উপর পড়লেই সে স্থলে আগুণ জ্বলে। সে যাই হোক্, আমার জ্যামিতিক বন্ধু বলেন যে, ইউক্লিডের জ্ঞান থাকলে জর্ম্মাণরা সমস্ত পৃথিবীকে জর্ম্মাণীর অন্তর্ভূত করবার চেষ্টা করত না, কেননা ও চেষ্টা হচ্ছে একটা বিরাট বৃত্তকে একটা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করবার চেষ্টা।

ঢের বাজে বকেছি, এইখানেই দাঁড়ি টানা যাক, নইলে আমার বাচালতা পত্র ব্যবহারের সকল সীমা লঙ্ঘন করবে। এ লেখায় এত ফাঁক থেকে গেল যে, তোমার বুদ্ধির ছুরি, এর গায়ে যেখানে খুসি অনায়াসে চালাতে পারবে। তবে বুদ্ধির ছুরি না চালিয়ে যদি এ পত্রের গায়ে বুদ্ধির আলো ফেলো—তাহলে হয়ত দেখতে পাবে এর এক আধটা ফাঁক দিয়ে এক আধটা সত্য উঁকিঝুঁকি মারছে।

২৬শে মে ১৯১৮ বীরবল।

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

——০*০——

[সম্প্রতি Lonis Chadourne নামক জনৈক ফরাসি লেখক, ফরাসি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের Gardener-এর একটি অতি সুন্দর সমালোচনা লিখেছেন। সে প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ জুন মাসের Modern Review-য়ে প্রকাশিত হবে। সমালোচক একস্থলে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়েসের কবিতার ভিতর, despair এবং resignation-এর সুর আদপেই নেই। সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে "মানসী" পড়ে, আমি রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখি তাতে এই কথা ছিল, যে মানসীর মধ্যে একটা despair এবং resignation-এর সুর আছে। সে পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন—সেখানি আজ প্রকাশ করছি, এই বিশ্বাসে যে এ বিষয়ে কবির নিজের মুখের কথার একটা বিশেষ মূল্য আছে। দ্বিতীয় পত্রে প্রথম পত্রের জের চলে এসেছে বলে, এই সঙ্গে সেখানিও প্রকাশ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

ভাই প্রমথ!

এই খানিকক্ষণ হল তোমার চিঠি পেলুম। সেদিন কলকাতার চিঠিতে তোমার কন্‌ভোকেশনে উপস্থিতির খবর পেয়ে আমি ঠাওরে-ছিলুম তবে বুঝি তুমি এখনো কলকাতায় আছ এবং আমার পত্রখণ্ড তোমাদের হরিপুরের মাঠে মারা গেল। কিন্তু তোমার চিঠিতে জানা গেল, আমার চিঠি রক্ষে পেয়েছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেখানকার মাঠে

বাঘ ববাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলো মারা পড়চে। আমি এখানে আমার সাম্‌নের এই সবকটা জান্‌লা খুলে দিয়ে, এখানকার দুপুরের রৌদ্রে বড় বড় গাছওয়ালা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে পাড়াগাঁয়ের অনতিব্যস্ত লোক চলাচলের প্রতি, অনিমেষ নেত্র নিহিত রেখে এমনি অন্যমনস্ক উড়ো উড়ো ভাবে থাকি যে, একটু মনঃসংযোগ করে একটা ভদ্ররকম প্রমাণসই চিঠি যে লিখ্‌ব তার সামর্থ্য নেই। এই ক্ষুদ্রায়তন কাগজে দুটো চারটে অসংলগ্ন কথা লিখে কোনমতে সাঙ্গ করে দিতে হয়। এখানকার বাতাসে এবং বাহ্যদৃশ্যে এমন একটা আলস্য, ঔদাস্য, বৈরাগ্য অথচ এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আমার মন, কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে আছে কি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু বুঝ্‌তে পারচি নে। মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা Despair এবং Resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাব্‌ছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মনসম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই Despair এবং Resignation-এর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে। আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে

বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কি ভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো—তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে Objectively দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। নিজের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চেষ্টা করা দুরাশা—কারণ আমার প্রতি-মুহূর্ত্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান, যে, মোটের উপরে আমি যে কি তা দেখ্‌তে পাইনে। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য কখনো গর্ব্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমাণটা পাইনে। আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন—কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়, তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পূর্ব্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখ্‌তে পার। Bashkirtseff-এর Journal আমিও পড়ছি—মন্দ লাগ্‌চে না কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে। এর থেকে মাঝে মাঝে অনেকগুলো কথা মনে আসে—কিন্তু যেটুকু স্থান অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে আর সে সকল উত্থাপন করা যেতে পারে না—অতএব আজ বিদায়।

২৯ জানুয়ারি ১৮৯৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাই প্রমথ!

হঠাৎ আজ প্রাতঃকালে আমার দক্ষিণ কাঁধে বাতের মত হয়েছে—মাথা এবং হাত নাড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে—এবং পৃষ্ঠদেশ যাকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফেলে রেখেছি—যাকে চক্ষেও দেখিনে—বহু পরিশ্রমের পর চৌকিতে ঠেসান দেবার সময় ব্যতীত, যার অস্তিত্ব কখনো অনুভব করা যায় না সেই সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠদেশই আপনাকে চেতনা রাজ্যের একাধিপতি করে রেখেছে। তোমাকে এই যে ক' লাইন চিঠি লিখলুম এর মধ্যে অনেক মুখভঙ্গী এবং আর্ত্তনাদ অব্যক্ত ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। বর্ত্তমান এই ব্যাধিটার তুলনায় মানসীর সমস্ত ঔদাস্য এবং নৈরাশ্য অত্যন্ত মিথ্যা এবং নিতান্ত সৌখীন বলে মনে হচ্চে। পিঠ এবং কাঁধকে হৃদয় এবং আত্মার চেয়ে অনেক বেশী মনে হচ্চে। অতএব আজ মানসীসম্বন্ধে ঠিক সমালোচনাটা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্য-কথা—বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না—এক ঘটি জল চায়, কি আধখানা বেল চায়, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে পারে না, আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা কর্‌চি। জানি, সত্য একে নিতান্ত অসন্তোষজনক, তার উপরে আবার রূঢ়ভাবে মানব-মনের মুখের উপর সর্ব্বদা জবাব করে—তাই ধ্যানভরে কল্পনা-সিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্চে—কল্পনার কাছ থেকেও পুরো ফল পাওয়া যায় না কিন্তু সত্যের চেয়ে সে ঢের বেশী আজ্ঞা-বহ। তাই জন্যেই সাধ যায় "সত্য যদি হত কল্পনা"—আমি দুটো

যদি এক করতে পারতুম! অর্থাৎ আমি যদি ঈশ্বর হতে পারতুম! মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই—কেউ বা বলচে, আছে বলে বহির্জ্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্চে—কেউ বা জানে, নেই—তাই আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসেই অর্দ্ধ-নিরাশ্বাস ভাবে কল্পনা পুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করচে। একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে, সে artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছিন্ন পত্র।

কর্ম্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণ প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দ্দিকেই থাকে ঘিরে ;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে,
পায়না আলো, পায়না বাতাস, পায়না ফাঁকা, পায়না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেচে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে ;
বৃহৎ সর্ব্বনাশে
হারিয়ে ছিলেম বিশ্বজগৎ খানি।
নীল আকাশের সোণার বাণী
সকাল সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছতনা মোর বাতায়ন দ্বারে।
ঋতুর পরে আস্ত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে,
আমার আঙিনাতে
আন্ত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।

অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কি যে সে ক্রন্দন
জান্‌ব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সঙ্গোপনে বহন করে' কর্ম্মরথে
সমারোহে চল্‌তেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।

তিন্‌টে চার্‌টে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়্‌তে হ'ত নকল সিংহনাদ;
বীড্‌ন্ কুঞ্জে মীটিং হ'লে আমি হতেম বক্তা;
রিপোর্ট লিখ্‌তে হত তক্তা তক্তা;
যুদ্ধ হ'ত সেনেট সিণ্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিন রাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বল্‌ত, "কর্‌চ কি এ?
মারা যাবে শেষে"!
আমি বল্‌তেম হেসে,
"কি করি ভাই, খাট্‌তে কি হয় সাধে?
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কি করি তার উপায় বল্‌তে পারো"?
বিশ্বকর্ম্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সে দিন তখন দু' তিন রাত্রি ধরে
গত সনের রিপোর্ট খানা লিখেছি খুব জোরে।
বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
হপ্তা তিনেক মর্‌তে হবে ভোট্ কুড়োতে ভারি।
শীতের দিনে যেমন পত্র ভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা সার,
আমার হ'ল তেম্‌নি দশা ;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিইনে কথা কাণে,
আবার যদি খবর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া ত থাক্ পরে"।

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হ'ল পাড়া,
আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখী ছাড়া ;
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চল্‌চে উঠে নেবে,
নাইক দাঁড়ি কমা,
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।

আর হ'ল না পড়া,
মনে হ'ল কোন বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
চিঠি খানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা তিনেক গেল ডুবে।
'সূর্য্য ওঠে পশ্চিমে কি পূবে,
সেই কথাটাই ভুলে গেচি, চল্‌চি এমন চোটে।
এমন সময় ভোটে
আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার কর্‌লে অধিকার ;
তাহার পরে খালি
কাগজ পত্রে চল্‌ল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়্‌ল হাতে,
সেটা নিয়ে কি কর্‌ব তাই ভাব্‌চি বসে আরাম কেদারাতে ;
এমন সময় হঠাৎ দখিন পবন ভরে
ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রো এসে পড়্‌ল আমার কোলের পরে।
অন্য মনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়্‌ল চোখে, "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে" ?
মনু ? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই ?
অম্‌নি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভরে',
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।

সেই ত আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনি ঝিনি।
সেই ত আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেচে পথহারা;
সেই ত আমার শিশুকালের শিউলি ফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে;
সেই ত আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অম্‌নি ওদের বাড়ীর পানে ছোটা।

ওরি সঙ্গে সুরু হ'ত দিনের প্রথম খেলা;
মনে পড়ে, পিঠের পরে চুল্‌টি মেলা
সেই আনন্দ মূর্ত্তি খানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি।
অসীম ধৈর্য্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
সকল কথায় মান্‌ত মস্ত হার।
উঠে গাছের আগ্‌ডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি করে,'
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
ভুল্‌তে পারি কি সে?
মনে পড়ে নীরব ব্যাথা তার,
বাবার কাছে যখন খেতেম মার;

ফেলেচে সে কত চোখের জল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজ্‌ত কত ছল।
আরো কিছু বড় হ'লে
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া বলে'।
নামতাটা তার কেবল যেত বেধে,
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠ্‌ত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরাজি বই দেখে'
ভাবৃত মনে গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাৎ সোজা।

হেন কালে হঠাৎ সে-বার,
দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনুর বাবার বাধ্‌ল মকর্দ্দমা,
কেউ কাহারে কর্‌লে না আর ক্ষমা।
দুয়ার মোদের বন্ধ হল,
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
হঠাৎ এল কোন দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জ্জন,
মোর প্রতিমার হল' বিসর্জ্জন।

দেখা শোনা ঘুচল যখন, এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুন্‌তে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠ্‌ল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যা-তারার মত;
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়!
প্রেমের শিখা জ্বল্‌ল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।
কত বছর গেল চলে'
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হ'লে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ী কিনেছে কোন পাটের কুঠিয়াল,
হ'ল অনেক কাল।
বিয়ে করে মনুর স্বামী
কোন দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।

সেই মনু আজ এত কালের অজ্ঞাতবাস টুটে,
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে?
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি? ক্ষতি সে কি? সে কি অত্যাচার?
কেবল কি তার বাল্য সখার কাছে
হৃদয় ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে?
ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে, খুঁজে পাব নাকি?

মন্থরে কি গেছ ভুলে ?
এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটী ফোঁটা চোখের জলের মত !
কত চিঠির জবাব লিখ্‌ব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বল্‌বে বহ্নিশিখা
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আষাঢ়, ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

নব-বিদ্যালয়।

—:০:—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু।

(৫)

আজ আমি শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে নব-বিদ্যালয়ের প্রকরণ-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। আগে থাক্‌তেই বলে রাখি—এ পত্রে মূলের চাইতে টীকাভাষ্য ঢের বেশী হবে, কেননা শরীরের কথাটা এদেশে শুধু বিদ্যালয়ের কথা নয়—লোকালয়েরও কথা। ছেলেবেলায় যে ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি, তাঁর ওষুধের প্রতি শিশির গায়ে, একালের অনেক ওষুধের শিশির গায়ে যেমন বড় বড় লাল হরফে poison ছাপানো থাকে, তেমনি বড় আর তেমনি লাল হরফে ছাপানো থাক্‌ত, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। এ বচন শাস্ত্রীয় কি উদ্ভট তা জানিনে, কিন্তু ঐ ক'টি কথা আমার মনের মধ্যে একেবারে লাল কালিতে ছেপে গিয়েছে,—তার কারণ দশ থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত, এই চার বৎসর ধরে ঐ বাক্যটি আমার চোখের সুমুখে প্রতিনিয়ত ছিল।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—এ ধর্ম্মজ্ঞান আজ দেশসুদ্ধ লোকের মনে জন্মেছে। তবে উক্ত ধর্ম্মের সাধন-পদ্ধতি যে কি, সে

বিষয়ে আমাদের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। নিত্যনিয়মিত ওষুধ খাওয়া যে বলাধানের সদুপায় নয়—এ সম্বন্ধে বোধহয় এক ঔষধ-বিক্রেতা ছাড়া আর সকলেই একমত। কিন্তু সদুপায়টা যে কি, তা জানবার জন্য শারীর-বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজন। আমি কিঞ্চিৎ বিশেষণটি ইচ্ছে করেই লাগিয়েছি, কেননা এক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের মূল্য বিজ্ঞানের চাইতে নিতান্ত কম নয়।

নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে, আজকালকার ভাষায় যাকে বলে দেহের অনুশীলন—তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করা।

সৌন্দর্য্য জিনিষটে যে শক্তির উপর নির্ভর করে, এ বিষয়ে সকল প্রাচীন সভ্যতাই একমত। রূপ—তা সে দেহেরই হোক্ আর মনেরই হোক্, ভাবেরই হোক্ আর ভাষারই হোক্,—আকারের উপরেই যে নির্ভর করে, এবং আকারের সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব যে স্বাস্থ্য ও বলের উপরেই নির্ভর করে, এই হচ্ছে ক্লাসিক মত।

দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই যে দেহচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য—এ-কথা এ-কালেও বোধহয় বেশীর ভাগ লোক স্বীকার করেন। অতএব সে উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় কি, এই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সমস্যা। কেননা এ পৃথিবীতে দেহই হচ্ছে প্রাণের ভিত্তি।

নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে, এর সর্ব্বপ্রধান উপায় হচ্ছে ছেলেদের স্নান আহার নিদ্রার একটা সুব্যবস্থা করা। প্রথমে ঘুমের কথাটাই ধরা যাক্।

নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের নয় থেকে এগারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত একটানা ঘুমতে দেওয়া হয়। তাঁদের মতে এর কম হলে ছেলেদের স্বাস্থ্য

বজায় থাকে না। দিনে যদি ভাল করে জেগে থাক্‌তে হয়—তাহলে রাত্তিরে যে ভাল করে ঘুমনো দরকার, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষী দিতে পারি। রাত জেগে পড়ার ফলে ছেলেরা যে দেহমনে ঝিমিয়ে পড়ে, এই প্রত্যক্ষ সত্যকে অগ্রাহ্য না কর্‌লে—বাঙ্গালী জাতটা আমার বিশ্বাস এর চাইতে ঢের বেশী সজাগ হতে পারত।

তারপর নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের শোবার ঘরের দুয়োর-জানালা কখনও বন্ধ করা হয় না। এ বিষয়ে শীতগ্রীষ্মের কোনও তফাৎ নেই। আমাদের এই গরম দেশে আমরা শুধু দরজা-জানালা নয়—শার্শি পর্য্যন্ত এঁটে শুই; ঠাণ্ডা লাগবার আমাদের এতই ভয়। কিন্তু রুদ্ধ-ঘরের বদ্ধ-বায়ুর ভিতর মানুষ হওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েদের বাল্যে সর্দ্দিকাশি কামাইও যায় না, কমও হয় না; তারপরে যৌবনে হয় তাদের ক্ষয়কাশ। বাংলাদেশের এই রাজধানীতে রাজযক্ষ্মার প্রতাপ—বিশেষতঃ মেয়েমহলে—যে দিনের পর দিন কিরকম বেড়ে চলেছে, তার সন্ধান যে-কোনও ডাক্তারকবিরাজের কাছে পাবেন। অবরোধ-প্রথায় যে মানুষের শ্বাসরোধ করে, তার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। আলোহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে শুধু মানুষ মারবার জন্য,—এরূপ বিশ্বাস করায় ভগবানের উপরেও সুবিচার করা হয় না, নিজের বুদ্ধিরও পরিচয় দেওয়া হয় না। দুয়োর বন্ধ করলেই যে মানুষে তার ভিতর বন্দী হয়—এ জ্ঞান থাক্‌লে, আমরা আমাদের বাসাগারকে কারাগার করে তুলতুম না। বাহিরকে বাহির করে রাখলেই ঘর হয়ে পড়ে কবর। দিবারাত্র খোলা হাওয়ার ভিতর বড় হলে, শরীর যে কত সুস্থ ও কত বলিষ্ঠ হয়, তার পরিচয় ঐ নব-বিদ্যালয়েই পাওয়া গেছে। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, তাঁর স্কুলের

ছেলেরা এক বৎসর দ্বার-মুক্ত ঘরে ঘুমতে অভ্যস্ত হবার ফলে, তাদের শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তি এতটা বেড়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে অনেকে, দেশ যখন বরফে জমে যায়, সে সময়ও রাত্তিরে সখ করে মাঠের ভিতর তাঁবু খাটিয়ে তার নীচে শোয়, এবং তাতে তাদের—নিউমোনিয়া ত বড় কথা—শ্লেষ্মাও প্রকুপিত হয় না। এ একটা কম বড় শিক্ষা নয়; কেননা সকলেই জানেন যে, অকাতরে শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তির নামই তিতীক্ষা। আর যাতে করে তিতীক্ষা আমাদের অঙ্গের ভূষণ হয়, তার জন্য ত সকলেই চীৎকার করছেন।

আর একটি কথা। নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের গ্রীষ্মকালে দিনে ঘুমতে দেওয়া হয়। সে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের "মা দিবাং স্বপ্সি" এ নিষেধ মেনে চল্‌তে হয় না। তার কর্ত্তৃপক্ষদের মতে ছেলেদের পক্ষে শুধু গ্রীষ্মকালে নয়, সকল কালেই, দিনে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নিতান্ত দরকার, নচেৎ বড় হলে তারা পুরোপুরি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অস্থিতত্ত্ব-বিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে, বারো চৌদ্দ বয়েসের আগে ছেলেদের পিঠের দাঁড়া মজবুত হয় না, সুতরাং সে বয়েসে দিনভর দেহের বোঝা বইতে হলে তাদের মেরু-দণ্ডটা বেঁকে যায়, নুয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোকের পৃষ্ঠদণ্ড যে ঋজু নয়, তা সভ্যসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই নজরে পড়ে। দেহের এরূপ বঙ্কিম ভঙ্গীটা সুদৃশ্য ত নয়ই, স্বাস্থ্যকরও নয়। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা পৃষ্ঠদণ্ডকে ঋজু করা এতই আবশ্যক মনে কর্‌তেন যে, তার জন্য তাঁদের হঠযোগের সব ভীষণ প্রক্রিয়া অভ্যাস কর্‌তে হ'ত। সময় থাক্‌তে দিনদুপুরে একটু শুয়ে নিলে যদি সেই সুফল লাভ করা যায়, তাহলে তা যে করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে আশা করি দ্বিমত নেই।

(৬)

নিদ্রার পরই ওঠে আহারের কথা। কথায় বলে—"আহারনিদ্রা" যত বাড়াও তত বাড়ে। এ কথার অর্থ—ও দুই কমানো সমান কর্ত্তব্য। নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা এর প্রথম অংশ গ্রাহ্য করেন, শেষ অংশ করেন না। তাঁদের মতে ছেলেরা যত ঘুমোয় ঘুমক, কিন্তু তাদের ভোজনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া কর্ত্তব্য। সভ্যসমাজের বেশীর ভাগ লোক যে মরে অতিভোজনের ফলে,—উপবাসে নয়,—এ জ্ঞান যদি সাধারণ লোকের থাক্‌ত, তাহলে পৃথিবীর রোগ শোক অনেকটা কমে আস্‌ত। আমাদের দেশে এ জ্ঞানের বিশেষ দরকার আছে, কেননা আমরা আর যাই হই, জাত হিসেবে মিতাহারী নই। ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের পেটের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর্য্য মুসলমান ও ইংরাজের, আর কিছু না হোক, আহার আমরা যুগপরম্পরায় উদরস্থ করেছি। কাঁচকলা সিদ্ধ আদি করে কোপ্তা কাবাব চপ কটলেট সবই আমাদের সমান ভক্ষ্য। পেটে খেলে পিঠে সয়, এ প্রবাদের জন্ম বাঙলাদেশে। অনেকে বলেন যে এতে বাঙালী জাতি তার assimilation-এর শক্তির পরিচয় দেয়; শুধু তাই নয়, যারা স্বদেশী ডাল রুটির সাহায্যে জীবন ধারণ করে, তাদের আমরা ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করি। আমাদের রসনা বিদেশী ভাষা যেরূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে, আমাদের উদর বিদেশী আহারও তদ্রূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে।

নানা প্রকারের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের রসাস্বাদন করায় সম্ভবত ক্ষতি নেই, কিন্তু তার পরিমাণ একটা সীমার ভিতর আবদ্ধ রাখা স্বাস্থ্যনীতির হিসেবে নিতান্ত প্রয়োজন। Assimilation-এর শক্তি তার প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায় না। জীর্ণ করবার শক্তির

চাইতে আমাদের ভোজন করবার প্রবৃত্তি ঢের বেশী হওয়ায়, বাঙালার যুবকদের হয় মন্দাগ্নি, আর প্রৌঢ়দের বহুমূত্র। বহু লোকের দেখ্‌তে পাই একটা ধারণা আছে যে, ও দুই রোগের দ্বারা বাঙালী তার চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সে ধারণা নিতান্তই ভুল। উদর ও মস্তিষ্ক এক অঙ্গ নয়, এবং এক প্রকৃতির অঙ্গ নয়। এর একটি নিরেট, আর একটি ফাঁপা; অতএব এ দুয়ের ক্ষুধাও এক নয়, খোরাকও এক নয়। এর অধমটির খোরাক কম জোগালে উত্তমটির শক্তি বাড়ে। আমার বিশ্বাস এই ঔদরিকতাই আমাদের সকল দুর্ব্বলতার মূল কারণ। আমরা জাতকে জাত যে এতটা স্ত্রী-শাসিত—সেও ঐ পেটের দায়ে। শুন্‌তে পাই অপর দেশের স্ত্রীলোকে পুরুষদের হৃদয় তুষ্ট করে তাদের পোষ মানায়—কিন্তু দেখ্‌তে পাই এদেশের স্ত্রীজাতি পুরুষদের উদর পুষ্ট করে তাদের বাগ মানায়। রন্ধনই এ দেশে দাম্পত্যের প্রধান বন্ধন। এই সব কারণে, আমার মতে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আহার-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা দরকার; এবং এ শিক্ষা স্কুল থেকে সুরু হওয়াই কর্ত্তব্য। বাল্যকালে অপরিমিত আহার কর্‌লে, যৌবনে দুষ্ট ক্ষুধাকে আর শিষ্ট করা যায় না।

দেশভেদে জাতির খাদ্যাখাদ্যের ভেদ হয়। সুতরাং বেলজিয়ামের স্কুলের আহারের ব্যবস্থা আমাদের স্কুলে নাও চল্‌তে পারে; তবে আমরা যখন সর্ব্বভূক, তখন এই কথাটা আমাদের জানা দরকার যে, নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের মাংসভক্ষণ নিষেধ। এ স্কুলে দুধ ঘি আটা, ফল মূল ও শাক্ সবজিই ছেলেদের প্রধান আহার।

(৭)

নব-বিদ্যালয়ে স্নান প্রাতঃকৃত্য এবং সায়ংকৃত্য। সেখানে ছেলেদের দিনে দুবার নাইতে হয়, সকালে ঘরে ও বিকালে পুকুরে। বারোমাস সকলের পক্ষে ঠাণ্ডা জলেরই ব্যবস্থা। গরম জল ওষুধের মত ডাক্তারের প্রিস্‌ক্রিপ্‌সান ব্যতীত কাউকে ব্যবহার কর্‌তে দেওয়া হয় না। সাঁতার-কাটার সুফলে এঁদের বিশ্বাস এত অগাধ যে, সকল ছেলেকেই সাঁতার শিখ্‌তে হয়, এবং নিত্যি অভ্যাস কর্‌তে হয়। এক সহুরে ছাড়া এদেশের আর সকল ছেলেদের অবগাহন-স্নান একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, সুতরাং এ বিষয়ে এঁদের কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই—একটা জিনিস ছাড়া; নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের নেয়ে উঠে গা মুছতে দেওয়া হয় না। রোদে হাওয়ায় তাদের গায়ের জল গায়েই শুকোয়। অর্থাৎ তাদের দেহ থেকে এক ভূতকে আর দুই ভূত দিয়ে তাড়ান হয়,—এতে নাকি সে দেহের পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে আসে। ছেলেরা যাতে করে পুরোদস্তুর sun-dried হয়, তার জন্য স্নানান্তে তাদের দিগম্বর অবস্থায় থাক্‌তে হয়, কেননা এ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশ্বাস যে, শরীরের কোন অঙ্গকেই অষ্টপ্রহর অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখা সঙ্গত নয়। এ কথাটার বিশেষ করে উল্লেখ করবার কারণ, সমাজ-দেহের অর্দ্ধাঙ্গকে অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখায় সে দেহ যে সুস্থ থাকে, এ বিশ্বাস কোন কোনও জাতের আছে। সেই সর্ব্বনেশে ধারণাকে দূর কর্‌তে হলে, আলোহাওয়ার গুণকীর্ত্তন ফাঁক পেলেই করা উচিত। ডোরকৌপীন ধারণ কর্‌লে রক্তমাংসের শরীর যে ইস্পাত হয়ে ওঠে, তার কারণ সে শরীরকে রোদে পুড়িয়ে জলে ডোবানো হয়।

(৮)

স্নান, আহার, নিদ্রা—এ সকলের কাজ হচ্ছে শরীর রক্ষা করা। শরীরকে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় করবার জন্য আরও পাঁচরকম উপায় অবলম্বন কর্‌তে হয়। সে সকল উপায় মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) খেলা।

(২) দৌড় ঝাঁপ (Sports)।

(৩) ব্যায়াম (Gymnastics)।

(৪) কাজ।

খেলা সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যে-শিশু যত খেলতে ভাল-বাসে, সে শিশু তত সুস্থ। সুতরাং তার খেলায় বাধা দেওয়ার অর্থ তার দেহমনের শক্তির স্ফূর্ত্তিতে বাধা দেওয়া। শিশুরা দেহের শক্তি ব্যয় করেই যে তা সুদসুদ্ধ আদায় করে, এ কথা দেহজ্ঞানী মাত্রেই জানেন। কিন্তু খেলে বেড়ালে মনেরও যে উপকার হয়, সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ নন। অথচ ওদিকে একটু মনোযোগ করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, খেলার ভিতর বুদ্ধি খেলাবার ঢের অবসর আছে। এমন একটা খেলার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—যা পৃথিবীর সকল দেশের সকল ছেলেরাই যুগ যুগ ধরে খেলে আস্‌ছে। লুকোচুরি খেলা হচ্ছে বিশ্ব-শিশুর নিত্য লীলা। বলা বাহুল্য এ খেলার প্রসাদে অনুসন্ধিৎসা গবেষণা, সমীক্ষা পরীক্ষা, দিক্‌দর্শন পরিদর্শন প্রভৃতি মহামূল্য চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারের জন্য এ ক'টি ছাড়া আর কোন্ চিৎশক্তির প্রয়োজন হয়?—সত্যকথা বল্‌তে, পৃথিবীর মহা মহা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা

সত্যের সঙ্গে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলছেন? ছেলেবেলায় ছেলেদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেলুলে, আমরা বড় হলে বিশ্বের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেলতে পারব। যাঁরা দর্শনবিজ্ঞানের ধার ধারেন না, তাঁদের পক্ষেও এ খেলায় অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক জীবনে মানুষে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলে? রাজায় প্রজায়, প্রভু ভৃত্যে, স্ত্রী পুরুষে চিরদিন ত ঐ খেলাই খেলে আসছে;—অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশুদের খেলায় বাধা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অকর্ত্তব্য। তারপর তাদের কোনরূপ খেলা শেখানোও শিক্ষকের কর্ত্তব্য নয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, শিশুদের খেলা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যায় যে, তারা নিত্য নতুন খেলা খেলে। তারা কল্পনা-রাজ্যের অধিবাসী বলে, এ বিষয়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি অসীম। তাদের কল্পনাকে তারা এবেলা ওবেলা খেলার রাজ্যে বাস্তব ক'রে তোলে। এতেই তাদের আর্টিষ্টিক শক্তির চরিতার্থতা। সুতরাং খেলার ক্ষেত্রে তাদের একেবারে ছেড়ে না দিলে আমরা যে তাদের শরীরকে জখম করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে ভোঁতা করি—আর্টিষ্টিক শক্তিকে চেপে দিই। এ সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ঃ—

উঠ শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ”

এই শ্লোকটি হতে “পাঠেতে” শব্দটি বহিষ্কৃত করে দিয়ে তার স্থলে “খেলায়” বসিয়ে দেওয়া সঙ্গত। ভোরের বেলায় শিশুরাও যদি সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড়ের প্রতি মনোনিবেশ করে, তাহলে কার জন্যই বা “পাখী সব করে রব” আর কিসের জন্যই বা

"কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল" ? রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে বলে কি শিক্ষকদেরও শিশুর পাল লয়ে যেতে হবে স্কুলে ? Analogy-র বলে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হলে যে উল্টো উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ—স্কুলেও পাঁচন চলে। নব-বিদ্যালয়ে সব রকমের গাছপালা আছে,—শুধু বেত নেই। সে যাই হোক্, ভগবানের সৃষ্টির সকল জিনিসের ভিতর যে একটা যোগাযোগ আছে—সে জ্ঞান আমরা হারালেও, শিশুরা হারায় না; তাই তারা আলো বাতাস পাখী ফুল সকলের সঙ্গে যোগ রেখেই আনন্দ পায়, আর সেই আনন্দই তাদের জীবনীশক্তিকে বিকশিত করে।

(৯)

এ ত গেল খেলার প্রথম অধ্যায়। শিশুর চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং তার খেলাও সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ।

বালকের খেলার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিশুর খেলা ব্যক্তি-গত, বালকের খেলা সামাজিক। শৈশব অতিক্রম করবার পর ছেলেদের মনে যখন সমাজের জ্ঞান জন্মায়—তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে খেলে। এ সব খেলার আগাগোড়া ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি হচ্ছে সব সামাজিক খেলা—অর্থাৎ দশে মিলে নিয়ম মেনে এ সব খেলা খেলতে হয়। এ সব খেলার প্রধান গুণ যে এতে ছেলেদের চরিত্রগঠনের সহায়তা করে। ব্যায়ামে শুধু শরীর গড়ে, কিন্তু এ শ্রেণীর খেলায় ছেলেদের মনে নীতির বীজ বুনে দেয়। এই শ্রেণীর খেলা হচ্ছে, নব-বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষার একটি

প্রধান অঙ্গ। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়ায় মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে একথা তাঁরা জোর করে বল্‌তে পারেন যে, নীতির উপদেশ দেওয়াটা যে শুধু ব্যর্থ তাই নয়, ছেলেদের পক্ষে তা বিশেষ ক্ষতিকর। ওতে শুধু একটা নতুন দুর্নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তার নাম হচ্ছে "নৈতিক জ্যাঠামি।" এঁদের মতে নৈতিক জীবনের মূলে আছে Collective sense,—অর্থাৎ সেই জ্ঞান, যার ফলে প্রতি লোক নিজেকে সমাজদেহের একটি অঙ্গ বলে মনে করে। এবং যে উপায়ে এই জ্ঞান, এই অনুভূতি বাড়ানো যেতে পারে, সেই উপায়ই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার যথার্থ উপায়;—বক্তৃতা নয়, নীতিপাঠ নয়, মারপিট নয়। এই সব খেলার ভিতর দিয়ে ছেলেরা নিয়মের মাহাত্ম্য বুঝতে শেখে, দশজনের সঙ্গে একাত্ম হতে শেখে, কার্য্য উদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছায় স্বার্থপরতা ত্যাগ কর্‌তে শেখে। অতএব ফুটবল প্রভৃতি খেলা সকল ছেলেরই শুধু দেহের নয়, আত্মার উন্নতি লাভের জন্য খেলা কর্ত্তব্য। আইন মুখস্থ করতে নয়, স্বেচ্ছায় মানতে শেখবার সূত্রপাত ঐ খেলার মাঠেই হয়।

(১০)

খেলার পর আসে দৌড়ঝাঁপ—ইংরাজিতে যাকে বলে sports। খেলার সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে, শরীরের এক একটি বিশেষ ক্রিয়ার এই উপায়ে অনুশীলন করা হয়। দৌড়নো লাফানো সকল খেলারই অঙ্গ, কিন্তু কি দৌড় কি লাফ কোনও খেলারই একমাত্র অথবা মুখ্য

কর্ম্ম নয়। খেলাতে দেহের সকল শক্তির একত্রে প্রয়োগ দরকার। কিন্তু sports-এর উদ্দেশ্য, দৌড়বার শক্তি লাফাবার শক্তি প্রভৃতিকে আলাদা করে নিয়ে, সেই শক্তিকে বিশেষ করে বাড়িয়ে তোলা। এতে শরীরের যে শুধু এক একটা বিশেষ ক্ষমতা বেড়ে ওঠে তাই নয়, এতে ছেলেদের সাহসও বাড়ে। এর শিক্ষা হচ্ছে দেহের শক্তির সীমা উত্তরোত্তর অতিক্রম করবার শিক্ষা। সুতরাং এ শিক্ষার ভিতর পদে পদে বিপদ আছে। এই বিপদকে উপেক্ষা কর্‌তে শেখবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সাহস আপনাহতেই বেড়ে যায়। সুতরাং sports ছেলেদের শরীর মন দুই একসঙ্গে গড়ে তোলে। নব-বিদ্যালয়ে চৌদ্দ বছরের নীচে ছেলেদের sports শিখতে দেওয়া হয় না। এ কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত, কেননা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের আর ত্বর সয় না—সে শিক্ষা শরীরেরই হোক্ আর মনেরই হোক্।

(১১)

সব শেষে আসে ব্যায়াম শিক্ষা। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে বলিষ্ঠ করা, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেহটাকে শক্তিশালী করা। একালের ব্যায়াম হচ্ছে পূরোমাত্রায় বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ তা দেহের বিশেষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেকালের ব্যায়াম অনেক স্থলে মারাত্মক হত—কেননা কোনও একটা বিশেষ অঙ্গের মাংস বাড়াতে এবং পেশি ফোলাতে গিয়ে, অনেক স্থলে সমস্ত দেহটাকে একেবারে জখম করে ফেলা হত। অবৈজ্ঞানিক

ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে, অনেকে লাভের মধ্যে হৃদ্‌রোগ শ্বাসরোগ প্রভৃতি অর্জ্জন করতেন। সমুদয়ের সঙ্গে অবয়বের যোগ যে কতটা ঘনিষ্ঠ, এবং সে যোগসূত্র যে প্রাণ—এই জ্ঞানের অভাববশতঃই পালোয়ানেরা হয় স্বল্পায়ু, আর বাজিকরেরা পঙ্গু। Horizontal Bar-য়ে পাক খেয়ে খেয়ে শরীর যে দড়ি পাকিয়ে যায়, আর Parallel Bar-য়ে পালায় পালায় "ফড়িং" ও "ময়ুর"-বৃত্তির সাধনা করে, তীরের মত শরীর যে ধনুকের মত হয়ে যায়, এ আমার চোখে দেখা। বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামের চর্চ্চায় অষ্টাবক্র হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। এ ব্যায়ামের প্রকরণপদ্ধতি সব Ling, Muller এবং Hebert-এর বইয়ে দেখতে পাবেন। সংক্ষেপে, যে ব্যায়ামকে Swedish Drill বলা হয়—সে হচ্ছে Ling-এর আবিষ্কৃত পদ্ধতি। Muller এবং Hebert তারই সংশোধিত সংস্করণ বার করেছেন। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—সুতরাং এ ক্ষেত্রে বেশী বাক্যব্যয় করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অনধিকারচর্চ্চা। তবে এই ব্যায়াম শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা আবশ্যক। নব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের মতে, এর শিক্ষক হওয়া উচিত ডাক্তার। প্রথমতঃ, এতে প্রাণায়াম আছে; আর গুরুর অসাক্ষাতে প্রাণায়াম করলে যে মুখে রক্ত ওঠে, তার প্রমাণ আমার জানত অনেক ভদ্রসন্তান যোগ অভ্যাস করতে গিয়ে পেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, এর ক্রিয়াগুলি নিতান্ত নীরস, কেননা এ খেলা নয়—পুরোদস্তুর শিক্ষা। নীরস বলে এ ব্যায়াম বিরক্তিকর হবার সম্ভাবনা, সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে এর প্রতি ক্রিয়ার সার্থকতা আগে থাকতে ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। হাত-পা পাগলের মত উল্টোপাল্টাভাবে কেন নাড়ছি, তার অর্থ বুঝলে

সে হাত পা মানুষে মনের খুসিতে নাড়ে। ব্যায়ামটা পুরোপুরি শরীরের শিক্ষা হলেও—ঐ সঙ্গে শরীর-বিজ্ঞানেরও মোটামুটি কথা নব-বিত্থালয়ের ছেলেরা শেখে। অধ্যাপক ফারিয়ার মতে খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ, ব্যায়াম, প্রাণায়াম সবই খালি গায়ে করা কর্ত্তব্য। এর সার্থকতা যে কি, তা আমি বল্‌তে পারিনে, ডাক্তারে বল্‌তে পারেন। তবে এ গরম দেশে দেহমুক্ত কর্‌লে আমরা যে মুক্তিলাভ করি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

(১২)

ছেলেদের হাতের কাজ শেখানো যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ, এই হচ্ছে একালের শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকদের একটা পাকা মত। নব-বিত্থালয়ে ছেলেদের মূর্ত্তি গড়্‌তে, নক্সা আঁক্‌তে, বই বাঁধতে, বেত বুন্‌তে, কামার কুমোর ও ছুতোরের কাজ কর্‌তে শেখানো হয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেদের কামার কুমোর ছুতোর প্রভৃতি বানানো নয়। তাঁর মতে এ সব শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সক্ষম ও সক্রিয় করা। কর্ম্মের প্রবৃত্তি ছোট ছেলের দেহ ও মনে অতিমাত্রায় থাকে। তারা একটা কিছু না করে, দু'দণ্ড স্থির থাক্‌তে পারে না। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সুপথে চালানো শিক্ষকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এ সব কাজে হাত দিয়ে ছেলেরা যে শুধু আনন্দ পায় তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা যে হস্তকৌশল লাভ করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার যথেষ্ট প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব কাজের চর্চ্চায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ চর্চ্চা হয়।

এর ফলে তাদের নিরীক্ষণ করবার শক্তি, তুলনা করবার শক্তি, কল্পনা শক্তি, গড়বার শক্তি, রূপজ্ঞান, আকারের জ্ঞান, পরিমাণের জ্ঞান, মাত্রার জ্ঞান, সংখ্যার জ্ঞান, পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, শিশুদের অবশ্য ও সব কাজ শেখানো যায় না, সুতরাং তাদের কাদা দিয়ে আল বাঁধতে, ঘর তৈরি করতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। সে ঘর তারা ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গবে ও গড়বে—কেননা শিশুমাত্রেই অব্যবস্থিতচিত্ত। এ চিত্তকে ব্যবস্থিত করবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ, তেমনি ক্ষতিকর, কেননা এই সব বিরোধী মনোভাবের সংঘর্ষেই তাদের আত্মার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। যাঁরা ছোট-ছেলেদের এই ধুলোমাটির সংস্রব হতে আলগোছ করে, ভদ্রলোক করতে চান, অধ্যাপক ফারিয়া তাঁদের একটা সত্য স্মরণ রাখতে বলেন। সে হচ্ছে এই যে, এ পৃথিবীতে মাটি আর জল হচ্ছে ছোট ছেলের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। সুতরাং তাদের জল না ছুঁতে দিলে, ধুলো না নাড়তে দিলে, ও দুয়ে মিলিয়ে কাদা না করতে দিলে, প্রিয়বস্তুর বিরহে তারা শরীর-মনে শুকিয়ে যায়। এ স্থলে বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এ পৃথিবীতে মাটি ও জলের চাইতে মহামূল্য বস্তু আর কি আছে? মানুষের সকল কর্ম্মের মূল উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি আর অপ্, সুতরাং শিশুরা এ পৃথিবীতে এসে প্রথমে তারই পরিচয় লাভ করতে ব্রতী হয়। ঐখান থেকেই তাদের জীবনব্রত-উদযাপনের সুরু হয়।

(১৩)

নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের কৃষিকর্ম্মও শেখানো হয়। মানুষের আদিম কর্ম্মক্ষেত্র, কৃষকের ক্ষেত্র,—শিল্প-জীবির কারখানা নয়। সুতরাং

ছেলেদের কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্‌তে হলে, তাদের অল্প-বিস্তর কৃষিকর্ম্ম শেখানোও দরকার। লাঙ্গল চষলে, কোদাল পাড়্‌লে শরীর যে বলিষ্ঠ হয়, সে কথা বলা বাহুল্য; সুতরাং এ অধ্যবসায়ে মন ও চরিত্রের কি উপকার হয়, সংক্ষেপে তারই উল্লেখ করছি।

কারখানায় আমরা জড়-পদার্থ নিয়ে কারবার করি, কিন্তু মাঠে আমাদের সজীব পদার্থের সঙ্গে কারবার কর্‌তে হয়। বীজ বোনা থেকে ধান পাকা পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটা জীবনের অভিনয় চলে। জীব-তত্ত্বের প্রথম অধ্যায় মানুষে ঐ শস্য-ক্ষেত্রেই পাঠ কর্‌তে পারে। এই সূত্রে আমরা যে জীবনের ক্রমবিকাশের জ্ঞানলাভ করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে সে জীবন যে আমরা রক্ষা কর্‌তে পারি, সংশোধিত কর্‌তে পারি, পরিবর্দ্ধিত কর্‌তে পারি, সে জ্ঞানও লাভ করি; এক কথায় এই সূত্রে আমরা আত্মজ্ঞানও লাভ করি।

তার পর মাঠে কাজ কর্‌বার দরুণ, ছেলেরা নানা গাছপালা ফুল ফল কীট পতঙ্গ জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে। শুধু তাদের আকৃতি নয়, তাদের প্রকৃতিরও পরিচয় পায়। এই উপায়ে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিনের পর দিন পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই তাদের কেতাবি বিজ্ঞানের শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গাছপালা জীবজন্তুর সঙ্গে যে ছেলের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে—বটানি, জুওলজির কথা তার কাছে আর শুধু বইয়ের কথা নয়—জীবনের কথা।

কৃষি-কর্ম্মের আর একটি মহৎ ফল এই যে, ছেলেরা হাতেকলমে ও-কাজ কর্‌লে বড় বয়েসে কৃষি-জীবিদের প্রতি আর অবজ্ঞা করে না। অলস ভদ্রসন্তানেরা নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের যে অবজ্ঞার চোখে দেখে, তার প্রধান কারণ যে, কৃষিকার্য্যের ভিতর যে কি মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব

আছে, সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে ছেলে ও-কাজ নিজে হাতে কর্‌তে চেষ্টা করেছে, সে ছেলে চিরজীবন কৃষি-জীবিদের মনে মনে শ্রদ্ধা কর্‌বে। সামাজিক হিসেবে এও একটা কম লাভ নয়। আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে শরীর ছেড়ে মনের শিক্ষার নবপদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা যাবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দু-দু-বার।

——:o:——

ছেলেবেলায় খিড়কী পুকুরের ঘাটের পাশে পাঁশগাদায় যে সব কচুগাছ জন্মাত তারি কচিপাতা ছিঁড়ে পুকুরের জলে চুবিয়ে নিয়ে যখন দেখতুম তার উপরে জলের দাগ একটুও ধরেনি তখন ভারী আনন্দ হোতো; কিন্তু বিবাহিত-জীবনের পানাপুকুরের মধ্যে মনটাকে দু-দুবার চুবিয়ে ধরেও আজ এই ৬০ বৎসর বয়সে তাকে ডেঙ্গায় তুলে নিয়ে যখন দেখি তার উপরে উক্ত জীবনের একটুও দাগ লেগে নেই, তখন ঠিক ছেলেবেলাকার মত আনন্দ হয় কিনা বলতে পারি না।

আমার বয়স আজ ৬০ কি তার চেয়েও দু এক বছর বেশী হবে কিন্তু এখনও আমি নিজেকে যুবা বলে মনে করি। এই কথা আমি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে বলেছিলুম, তিনি ত হেসেই খুন, তারপর হাসির বেগটা একটু থামলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ কেমন করে হতে পারে?" এই কি করে হতে পারার জবাব দেওয়াটাই শক্ত। আজও পাঠককে যে এর জবাব দিতে পারবো বলে ত মনে হয় না তবে গল্পটী শেষ অবধি পড়ে তাঁরা যদি আপনা হতে এর জবাব পেয়ে যান ত ভালই—নচেৎ নাচার।

আমার প্রথমবার বিবাহ হয় গ্রামের মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হরকালিবাবুর প্রথমা কন্যা নীরদাসুন্দরীর সঙ্গে। ছেলে-বেলা থেকেই বিবাহ না করাটার উপর আমার কেমন একটা ঝোঁক

ছিল আর এই ঝোঁকটার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে পারা যায় ত সে আমাদের গ্রাম্য-ইংরেজী স্কুলের নব্য-হেডমাষ্টার মশাই রমেশ বাবুকে। তিনি উক্ত জিনিসটার উপর কেন যে এত খড়্গহস্ত ছিলেন তা তিনিই জানতেন, তবে এর অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলতেন তা থেকে এইটুকু বোঝা যেতো যে তাঁর মতে ও-জিনিসটা মানুষের স্বাধীনতার মূলে খুব জবর গোচের একটা ঘা দেয় আর সেই ঘা মানুষের পা দুটোকে একবারে জন্মের মত খোঁড়া করে দেয়— তার চলবার শক্তি একবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কথাটা আর কারুর মনের উপর ছাপ কাটতে পেরিছিল কিনা জানি না তবে আমার মনের উপর যে একবারে কোঁদাই কেটে দিয়েছিল সে কথা জোর করেই বলতে পারি। যখন নিজের স্বাধীনতাকে বাঁচাবার জন্যে তার চারিদিকে নানারূপ সংকল্পের পরিখা ও প্রাকার তৈরি করছি সেই সময় দিগ্বিজয়ী বীরের মত মা তাঁর সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে একবারে সিংহদ্বারের সুমুখে এসে হাজির।

এই কথা নিয়ে মার সঙ্গে প্রায়ই আমার গোল বাধতো কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষই ডিক্রী পায় নি। সেদিনও মার সঙ্গে আমার ঐ একই কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছিল মাঝখানে হঠাৎ আমি বলে উঠলুম, "দেখ মা, আমি যখন বলেছি বিয়ে করব না তখন কখনই করব না তা তুমি কাঁদ কাট আর যাই করনা কেন।"

এই ব্যাপারের কিছুদিন পর একদিন বৈকালে বাইরে বেরুবার জন্যে কাপড় ছাড়ছি এমন সময় বাবা এসে হাজির—"দেখ নিরু আজ আর বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই হরকালি বাবুরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

বাবা ছিলেন সেই দলের লোক যারা যুক্তির চাইতে জিদ্‌কেই বড় আসন দেয়। জিদ্ জিনিষটা তবেই নাকি দাঁড়াতে পারে যদি তার বিপক্ষতাচরণ করবার মত জিনিস সে পায়—নইলে তার অস্তিত্বই যে থাকে না। কিন্তু এটা ত আর কেউ আশা করতে পারে না যে পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসটাই তাঁদের মতের সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে ঘুসোঘুসি করবে, কাজেই জিদ্‌কে তার কাজ করবার অবসর দোবার জন্যে এই সব লোককে অনেক সময় করতে হয় কিনা, যেখানে নিজের মতের সঙ্গে পরের মতের মিল রয়েছে সেখানে পরের মতকে না উল্টোতে পেরে নিজের মতকেই ধাঁ করে উল্টে নিয়ে জিদ্‌কে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

আমার বিবাহের জন্যে বাবার কোন দিন একটুও গা দেখিনি বরং বরাবর এলাকাড়াই লক্ষ্য করে এসেছি, আজ হঠাৎ আমার বিয়ের জন্যে তাঁর মাথাব্যথা দেখে আমি প্রথমটা কিছু অবাক হয়ে গেছলুম কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলুম মারই জয় হোলো; আমার অত সতর্কতা সত্ত্বেও দুর্গের কোন্ এক গুপ্তদ্বার আবিষ্কার করে ফেলে বিজয়ী বীর যেদিন সত্য সত্যই আমার দুর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভ করলে, সেদিন তার হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমি দ্বিতীয় উপায় দেখলুম না।

আমরা যেটাকে চাই না সেটার সম্বন্ধে বেশী চিন্তাও করি না আর আমরা যেটাকে নিয়ে বেশী চিন্তা করি না—সেটার আবির্ভাব যত নূতনত্ব, যত মোহ এনে দেয়; আমরা আগে থেকেই যেটাকে মনে মনে এঁচে রেখে দিই তার আবির্ভাব ততটা মোহ বা ততটা নূতনত্ব এনে দিতে পারে না। আমি বিবাহ করব

না বলেই হোক বা যে কারণেই হোক স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মনে মনে কোনদিন বিশেষ কোন ধারণা আনবার চেষ্টা করিনি, যা নাকি শতকরা নিরেনব্বই জন করে থাকে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে। তাই একটি ১১ বৎসরের সুগোল, সুন্দর ছোট মেয়ে তার পা-ভরা আল্‌তা আর সিঁতে-ভরা সিঁদুর নিয়ে আমার একলা শোয়া খাটের একটি ধারে সমস্ত দেহটা কাপড়ে আর লজ্জায় ঢেকে নিয়ে যেদিন প্রথম শয়ন করতে এল, সেদিন সমস্ত দেহটা কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল একটা অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত পুলকভরে।

আমার বিবাহের মধ্যে একটুখানি নূতনত্ব ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, বাবা কন্যাপক্ষের কাছ থেকে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নি। লোকে এ সম্বন্ধে কিছু বল্লেই তিনি বলতেন "দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ টাকার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।" পাড়ার লোকে কিন্তু বাবার উপর অত্যন্ত চটে উঠেছিল—তাঁদের মতে এ কাজটা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল কেননা এতে করে পাত্রের বাজার নেবে যাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট।

সবের মধ্যে থেকেই মানুষ নিজের জন্যে খানিকটা সান্ত্বনা খুঁজে নেয়—তা না হলে সে বাঁচতে পারে না। যেখানে সত্যি সান্ত্বনা নেই সেখানেও তারা কোন না কোন উপায়ে একটা সান্ত্বনার খুঁটি খাড়া করে তোলে, তাকে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে, তা না হলে সে যে মুখ থুবড়ে পড়বে। আমিও তাই করলুম। এই এত বড় একটা সঙ্কল্পের বাঁধ যেদিন বাবারূপ ভাগ্য-দেবতার একটি তর্জ্জনী হেলনে নদীর বালুচরের মত ধস্‌ ভেঙ্গে পড়ল, সেদিন নৈরাশ্যের সেই দুকুলহারা অনন্ত জলরাশির মধ্যে সান্ত্বনার একটা তক্তা যদি খুঁজে

পাই তারি জন্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম; পেতে বেশী দেরী হোলো না; বিনাপণে বিবাহ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের দায়োদ্ধার—এই ত ভেসে যাবার মত তক্তা রয়েছে! আমি ডুবলুম না।

দরিদ্রের দায়োদ্ধার, এটা কম সান্ত্বনা নয়! এই চিন্তাটাকে জপমালা করে চোক কান বুজে বিয়ে করে ফেললুম। এতে ফল হোলো এই যে, স্ত্রী সম্বন্ধে মনে মনে কোন ছবি অাঁকতে গেলেই আমি সেই সব রং আর সেই সব রেখাগুলোই কেবল তার মুখে বিশেষ করে ফলিয়ে তুলতুম, যেগুলো তার মনের কৃতজ্ঞতাকেই কেবল মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারে—আর কোন ভাবকে নয়। সে যে চিরকাল আমার কাছে কেনা হয়ে থাকবে, আর তার বাপের প্রতি আমাদের দয়ার কথা ভেবে আমাকে দেবতার মত করে পুজা করবে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে, স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে গেলেই এই কথাটাই প্রথমে মনের মধ্যে বেজে উঠতো। এমনি ধারণা নিয়ে নীরদাকে ঘরে এনে তুললুম, আর অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে তার সঙ্গে এমন ভাবে মিশতে লাগলুম, যাতে তার এই ধ্যান-মাধুরী কোন দিন না ভেঙ্গে যেতে পারে। আমার প্রত্যেক ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা ভাব থাকতো যা নাকি কেবল তার মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার যে অংশটা আছে তাকেই নাড়া দিতে পারে—আর কিছুকেই নয়।

নীরদা মেয়েটি যে কেমন তা ঠিক করে বলা শক্ত, তবে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় তার মধ্যে নিজস্ব বলে কিছু ছিল না বা তাকে নিজস্ব কিছু সঞ্চয় করতে দেওয়া হয় নি, তার বাপের বাড়ীর তরফ থেকে। বাপের বাড়ীর পক্ষে এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই। মেয়েদের যদি কোন একটা দিক থেকে

গোড়ে তোলা হয় তাহলে ত আর ভাঙ্গবার জো থাকে না, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তাদের নিজেকে ভেঙ্গে একবারে চুরমার করে ফেলবার দরকার হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তাদের যদি কেবল তাগাড় আর ইট্ সুরকীর মত বেতৈরী অবস্থাতে ফেলে রাখা হয় তাহলে সে-গুলোকে এক করে নিয়ে তাদের দিয়ে নূতন ইমারত বেশ সহজে তৈরী করে তুলতে পারা যায়, শ্বশুরবাড়ীর ইঞ্জিনিয়ারের নির্দ্দেশ মত। মোট কথা আাম তাকে গড়ে তোলবার মত বেতৈরী অবস্থাতেই পেয়েছিলাম আর তৈরী করতেও কসুর করি নি।

আমার দেবতা হবার সাধ, সে খুব মিটিয়েছিল তার কৃতজ্ঞতার অঞ্জলী ক্রমাগতক তার উপকারকের চরণে উৎসর্গ করে।

পুতুল নাচের পুতুলগুলো যেমন তাদের হাত পা ততক্ষণই নাড়তে পারে যতক্ষণ পিছন থেকে একজন সে গুলোকে নড়িয়ে দেয়, নীরদার জীবনটা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। তার নিজের ইচ্ছা বলে কোন বালাই ছিল না—আমার সম্বন্ধেও নয়।

আমার বোধ হয়, যৌবন তার নিজের গুরুভারে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে খোঁজে এমন একজনকে যার উপর নিজের দায়িত্বের বোঝা খানিকটা চাপিয়ে দিয়ে সে নিজে কতক হাল্কা হতে পারে—তা না হলে সে নিজের চাপে নিজেই মাটির সঙ্গে বসে যাবে যে।

দেবতা হবার সাধ যেদিন মিটলো তার নূতনত্বের চটক্ যে-দিন গিল্টিকরা মরা সোণার মত দিন দিন ম্লান হয়ে আসতে লাগলো সে-দিন বুঝলুম সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে আমার পাণ-দোষটা ধরেছিল। আমার বোধ হয় মানুষের প্রবৃত্তিগুলো এমন ভাবে সাজান থাকে যে

একটা অন্যগুলোর পথ আট্‌কে রেখে দেয়, কাজেই একটা যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে ত অন্য যে-গুলো তাকে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলোও টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়। যেদিন প্রথম সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল সেদিন থেকে এইটেই আমি বরাবর লক্ষ করে আসছি যে একে একে অনেকগুলো সংযমই তার সঙ্গে আলগা হয়ে আসছে।

আমি যে মদ খেতে সুরু করেছি এ কথাটা বাবা এবং মা'র কাছে যথাসম্ভব লুকোবার চেষ্টা করতুম কিন্তু নীরদার কাছে কোন দিন সাবধান হই নি বা সাবধান হবার কোন দরকার বোধ করি নি। এতে যে তার কিছু মনে করবার আছে একথা কোন দিন মনেই আসে নি। হাজার হোক্ আমি স্বামী আর সে স্ত্রী।

লোকে কথায় বলে অন্যায় কখন চাপা থাকে না—আমার অন্যায়ও বেশী দিন চাপা রইল না—পাড়াময় কানাঘুসো হয়ে গেল!

সে-দিন সন্ধ্যার সময় কি একটা কাজে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলুম, বারান্দা থেকে শুন্‌তে পেলুম ঘরের ভিতর ওবাড়ীর টেপী নীরদাকে বল্‌ছে—

"তা তুই যদি এতদিন টের পেয়েছিস ত বারণ করিস নি কেন? ধন্যি মেয়ে যা হোক তুই।"

"তা নাকি আবার বারণ করা যায়।"

"কেন যায় না, আমরা হলে ত বকে ঝোকে অস্থাথ্য করতুম আর তুই বারণ করতে পারবি নি।"

"না তা পারবো না।"

"সে কি রে, তা না হলে দিন দিন যে বেড়ে উঠবে।"

"তা কি করবো ? আমার কোন কথা বলা কি উচিত ? আমি মেয়ে মানুষ ভালমন্দ কি বুঝি বল।"

"মদ খাওয়াটা ভাল কি মন্দ তা তুই বুঝিস নে ; এ নূতন কথা বটে।"

কি জানি কেন নীরদার কথাগুলো সে-দিন তত ভাল লাগলো না। যেটাকে এতদিন খাঁটী ভক্তির সুর বলে মনে হোতো, আজ কি জানি কেন তার মধ্যে নিরপেক্ষতার সুর মিশ্র হয়ে রয়েছে বলে কানে বাজতে লাগলো।

এই ঘটনার কিছু দিন পর এক দিন কোন দরকারে সুরেশবাবুদের বাড়ীতে তাঁকে ডাকতে গেছি—ইনি আমাদের ওখানের একজন পুরাণো উকিল। ইনিই আমাকে সুরাদেবীর মন্দিরের স্বর্ণদ্বার দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন। সুরেশবাবুদের বাড়ীতে প্রবেশ করেই উঠান থেকে শুনতে পেলুম সুরেশবাবুর স্ত্রী তীব্র-স্বরে বলছেন—"দেখ অমন করে যদি চলাঢলি কর ত আমি সংসার করতে পারবো না ; ভেবে দেখ দেখি কি ছিলে আর কি হয়েছ ; লোকে তোমাকে কত ভাল বলত, কত সুখ্যাতি করত আর এখন কি হয়েছ। তারপর মেয়েটা দিন দিন কলা গাছের মত বেড়ে উঠছে সেটা কি চোখ মেলে একবার দেখেছ। সংসারের খরচ দিন দিন কত বেড়ে উঠছে সে খবরটা কি রাখ ? অমন করে নবাবি করলে শেষকালে ছেলেগুলোর হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যে।"

এক একটা লোক থাকে তাদের গলা বেশ মিঠে কিন্তু আগাগোড়া বে-সুরা। এই সব লোকের গান ততক্ষণই ভাল লাগে যতক্ষণ না কোন যন্ত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেওয়া হয়। নীরদার ব্যবহারের

মধ্যে মিষ্টতা ছিল বটে কিন্তু তার মধ্যে সুর ছিল না আদবেই, তাই আজ যখন সুরেশবাবুর স্ত্রীর এই সুরে-বসান যন্ত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিলুম তখন তা খাপছাড়া বলে মনে হতে লাগলো। কথাগুলো তীব্র বটে কিন্তু কেমন সুর রয়েছে, কেমন রেশওয়ালা আর নীরদার সেদিনকার কথাগুলো নরম বটে কিন্তু কত বেসুরা কত ফাঁফা। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অভাবের বেদনা বেজে উঠলো। এইটেকেই যে আমি খুঁজে আসছি। এইটেকেই যৌবন যে তার সুদৃঢ় বাহু দুটোকে বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে বেড়িয়েছে এতদিন ধরে, আর এইটেকে পায় নি বলেই যে তার যত অবসাদ যত বৈরাগ্য।

বাড়ী ফিরলুম—রাত্রে নীরদা এসে যখন তার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি দখল করে শুলো তখন মধ্যের ব্যাবধানটা চোখের সুমুখে সহসা যেন যোজন-ব্যাপী হয়ে দাঁড়ালো। এ যে অনেক দূরের জিনিস, এ যে দু'কুল হারা নদীর পরপারের ঝাপসা গাছপালা; ঘাটে তরীও ত নেই যে সেগুলোকে নিকটের জিনিস করে নিই।—আবেগ ভরে ডাকলুম—"নীরদা"।

সেই দূর থেকে—অনেক দূর থেকে এলোমেলো বাতাসে ভাসা আবছা উত্তর "কেন"?

"কেন নয় নীরদা আরো বড় করে উত্তর দাও।"

নীরদা নীরব।

"আমি মদ খেয়েছি, তুমি বকবে না নীরদা!"

"কেন বোকবো?"

"কেন বোকবে?" তোমার স্বামী উচ্ছন্নয় যাবে আর তুমি তাকে

বোকবে না, তাকে বারণ করবে না, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে না? কথা কও না যে!"

"আমি কি বলবো?".

আমার কান্না পেতে লাগলো কোন কথা বল্‌লুম না—বুঝলুম আর ফেরাবার উপায় নেই। নিজেই আমি তাকে দূর করে দিয়েছি নিজেই আমি তার এবং আমার মাঝখানে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে তুলেছি যা ডিঙ্গিয়ে আসার মত ক্ষমতা তার আদবেই নেই।

এমনি করে এই দূরের জিনিষটিকে কাছে আনবার ব্যর্থ চেষ্টার বিড়ম্বনার ফাঁক দিয়ে আরও দশ বার বৎসর গলে চলে গেল। তারপর কি জানি কার ইসারায় এই দূরের জিনিসটি সহসা একদিন এত দূরে চলে গেল যে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর খুজে পাওয়া গেল না।

নীরদা চলে যেতে সমস্ত শরীরটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলুম কোন খানটায় সে তার অভাব রেখে গেছে। বুকে হাত দিলুম; না সেখানে ত কোন নূতন অভাব নেই; মাথায় হাত দিলুম—সেখানেও তাই, কিন্তু পায়ে হাত দিতে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল; এই খানেই যে সে তার সমস্ত অভাব রেখে গেছে। পা-টেপবার লোকের অভাবই ত সে তার চলে যাবার পথের মধ্যে রেখে গেছে। বুকে হাত বুলোবার অভাব পূরণ করবার জন্যে সে আসে নি, তাই সেখানটার আভাব আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনিই রয়ে গেছে একটুও এদিক ওদিক হয়নি।

আমার জীবনে এই প্রথম যৌবনারম্ভ। এই প্রথম যৌবন তার রত্নসিংহাসন বুকের মাঝখানে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে কোথা হতে ধূপ ধুনা জ্বলে উঠলো এক জনকে বরণ করে নেবার জন্যে সেই মসনদের কিংখাপের উপর।

বলতে ভুলে গেছি—ইতিমধ্যে বাবা স্বর্গারোহণ করেছেন।

মা আবার নূতন করে কনের সন্ধান আরম্ভ করে দিলেন তাঁর ৫০ বৎসরের তরুণ ছেলেটির জন্য, আর তাঁর ৫০ বৎসরের তরুণ ছেলেটি চুপ করে থেকে তার সম্মতি জানিয়ে দিলে তরুণ ছেলেটিরই মত করে।

ফুলশয্যার রাত্রেই ষোড়শী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি আমাকে ভালবাস।" কথাটা বড়ই অসংলগ্ন হয়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু আমি নাচার। কমলা উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ"!

দিন কাটতে লাগলো; এবার মনে মনে স্থির করেছিলুম পা-টাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে রাখবো, যাতে এবার আর সে পা দেখতে না পায় কিন্তু এটা তখন বুদ্ধিতে আসে নি যে, পা বাদ দিলেও বুক ছাড়া অন্য আরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যার উপর মানুষ খুব স্বচ্ছন্দে চড়ে বসতে পারে। কমলা পা দেখতে পায় নি সন্দেহ নেই কিন্তু সে বুকও দেখতে পায় নি, সে দেখে ফেলেছিল কেবল পাকাচুলে ভরা গোল মাথাটা আর সেই-খানেই সে তার চিরদিনের আসন খানি টেনে নিয়ে গিয়ে খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়ে দিয়েছিল। এক কথায় দোজ-পক্ষের পরিবার যেমন হয়ে থাকে কমলা তার চেয়ে একটু কমও হয় নি একটু বেশীও হয় নি।

নেশা করার দরুণ পায়ের তরফ থেকে নীরদা কোন কথা বলতে সাহসই করে নি আর মাথার তরফ থেকে কমলা যা বলেছিল তার বিষ তার নিজের রাজত্ব থেকে আরম্ভ করে নীরদার রাজত্ব পর্য্যন্ত চারিয়ে গেছ্‌লো। কিছু-না-বলার ভিতর দিয়ে নীরদা নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—আর কমলা যা বলেছিল তার তীব্রতা আমাকেই দূর করে দিয়েছিল তার কাছ থেকে, বড়লোকের দরোয়ানের মত করে।

এমনি করে এই চড়া মনিবের হাতে আমাকে ১০টি বৎসর পুরা-দমে থাকতে হয়েছিল নীরবে সমস্ত সহ্য করে। তারপর সেও একদিন চলে গেল অভাব রেখে দিয়ে মাথার উপরটাতে। সেখানটা সত্য সত্যই তার অভাবে বড় খালি খালি ঠেকতে লাগলো। অনেক দিন কয়েদের মধ্যে থেকে হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে কয়েদীর যে অবস্থা হয় এও অনেকটা সেই রকম।

আজও যৌবনের রত্নসিংহাসন তেমনি করেই খালি হয়ে পড়ে রয়েছে দেবীর অভাবে। ধূপ ধূনা দিনের পর দিন কেবল ছাই হয়েই মরছে সিংহাসনের চারিদিকে তার কুণ্ডলিকৃত সুগন্ধী ধূমরাশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে। ঘণ্টা বাজছে, আরতী-প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। পুষ্প-সম্ভার পুষ্পপাত্রে উন্মুখ হয়ে রয়েছে কার চরণ স্পর্শের মানসে।

পায়ের সেবা আমার হয়ে গেছে—মাথার সেবাও মন্দ হয় নি কিন্তু বুকের সেবা আজও বাকী রয়েছে। হুকুম করবার সাধ আমার মিটেছে; হুকুম তামিল করবার সখও পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু আব্দার শোনবার সাধ আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

কালো-মেয়ে।

——:০:——

মর্‌চে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুক্‌নো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে' ক্রমে
বয়স উঠ্‌চে জমে'।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণিহাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবস রাত্রি কালো মেয়েটিরে।

সাম্‌নে বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি "মেস্‌"-এ ;
বহুকষ্টে শেষে
কালেজেতে পার হয়েচি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন করে' এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে ?
দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েচি আধ্‌-পেটা।

ভিক্ষা করা সেটা
সইত না এক্‌-বারে,
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাৎ পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভর্ত্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবী,
মনে ছিল ধন মানের রুদ্ধ ঘরের সোণার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।
আজ্‌কে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।

মনে হচ্চে ময়না পাখীর খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায়;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্‌ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা?
কোথায় মুক্ত অরণ্যানি, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরী?
এ কি বাঁধন রাখ্‌ল আমায় ঘেরি?

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোসে শুয়ে পড়ি ধপাস্‌ করে'।

হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে,—
মর্‌চে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী।
মনে হয় যে রোদের পরে বৃষ্টিভরা থম্‌কে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরাণ জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।

আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা ;—
ও যেন জুঁই ফুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরণখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখী,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।
রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্"-এ।

সকাল সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা' ছিল মনে।

ঐ যে ওদের কালো-মেয়ে নন্দরাণী
যেমনতর ওর ঐ ভাঙা জান্‌লাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী;
তেম্‌নি আমার বাঁশের বাঁশি আপনা-ভোলা,
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জান্‌লা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠ্‌ল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র্যাক্‌টিকাল।

——:*:——

ইংরেজি লেখকের বইতেই পড়েছি যে ইংরেজ ideaকে অবিশ্বাস করে থাকে—"The philosopher proceeds from the abstract to the concrete. The Englishman starts with the concrete and may or, more probably, may not arrive at the abstract.........he mistrusts education. For education teaches how to think in general and that isn't what he wants or believes in.........Hence his contempt and even indignation for individuals or nations who are moved by ideas. He cannot endure the profession that a man is moved by high motives ....The words "hypocrite" "humbug" "sentimentalist" spring readily to his lips.........for intellect he has little use, except so for as it issues in practical results. He will forgive a man for being intelligent if he makes a fortune but hardly otherwise"—অর্থাৎ ইংরেজরা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে, প্র্যাক্‌টিকাল জাত। দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত সহবাসের ফলে practical এবং efficient হবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জেগে উঠেছে। যদি ভীষণ কাজের

লোক হওয়াটা আমাদের একেবারে আদর্শ না হয়ে উঠ্‌ত তা হলে ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না—কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে কাজ সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহটা তার স্বাভাবিক মাত্রা একেবারে পেরিয়ে গেছে। ইংরেজের কাছ থেকে কাজের অনেক গুণগান শুনে শুনে এবং অকেজো বলে অনেক খোঁটা খেয়ে খেয়ে ঐ কাজের লোক হওয়াটাই আমরা আমাদের চরম আদর্শ বলে ধরে নিয়েছি।

কিছু দিন পূর্ব্বে শিক্ষা-কমিশন যখন এদেশের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের মতামত চেয়েছিলেন তখন শিক্ষার আদর্শ অর্থাৎ জাতীয় আদর্শ যে কি হওয়া উচিত, সে বিষয় আমাদের চিন্তা করতে হয়েছিল। এ কথা গোপন করা অসম্ভব যে তাতে আমরা বেশ একটু বিপন্ন বোধ করেছিলুম, কারণ বহুকাল ধরে অন্ন ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না করাতে, চিন্তা করাটা আমাদের অনভ্যাস হয়ে পড়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় বই নির্ব্বাচন করেন, আমরা সে গুলো দাগ দিয়ে, নোট লিখিয়ে মুখস্থের জন্য তৈরী করে দি। Shakespeare সম্বন্ধে Dowden কি চিন্তা করেন, Raleigh কি বলেন, Hazlitt কি বলেন, আবার আমাদের "An Experienced Professor"ই বা কি লেখেন, এই সব দেখে শুনে যা হোক একটা নোট লেখাই। Cowper পড়াই—Sofa কবিতার বিশেষত্ব কি তা বোঝাই, John Gilpin-এর রসিকতা সম্বন্ধে এমন একটা নোট দি যা মুখস্থ করতে গিয়ে ছেলেদের মন করুণরসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। তারপরে মাসকাবারে মাইনে নিয়ে মেয়ের বিয়ের দেনার সুদটা শোধ করবার চেষ্টা করি। এমনি করে দেশের শিক্ষাকে বহন করে আমরা চলি—এর মধ্যে হঠাৎ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে Shakespeare

পড়াও কেন, Cowper পড়ে লাভ কি তখন ভেবে কুল পাই নে। তবু মনে একটা ক্ষীণ আশা থাকে যে পুরোনো নোট দেখলে Cowper's place in the English literature সম্বন্ধে একটা কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি কোন অস্বাভাবিক কৌতুহলী ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে শিক্ষার প্রয়োজন কি শিক্ষার আদর্শই বা কি, তখন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরোয় "প্রকৃত শিক্ষা যে কি মূল্যবান বস্তু তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, শিক্ষাই মানুষকে নিম্ন-প্রাণীদের সহিত পৃথক করাইয়া দেয় ইহা চোরে চুরি করিতে পারে না" ইত্যাদি। ছাত্রদের প্রবন্ধ সংশোধন করতে গিয়ে এ কথাটা এতবার বলেছি যে ও-কথাটা না বলে থাকা একটু কষ্টকর। কিন্তু শিক্ষা-কমিশনের মর্জ্জির কথা বলা যায় না তাঁরা হয়ত ঠিক এ রকম উত্তর চান নি এই সন্দেহে আমরা অন্য উত্তর দেওয়াই স্থির করলুম।

নিজেদের শিক্ষার কথা স্মরণ করে শিক্ষার উপর আমাদের কোনই শ্রদ্ধা ছিল না, তা ছাড়া দেখেছি যে শিক্ষার ফলে আর যাই হোক সকলের ভাগ্যে গাড়িঘোড়া চড়া চলে না। অতএব বল্লুম—আর কিচ্ছু নয়, আমাদের দেশে এই কাব্য সাহিত্য দর্শন, abstract science, প্রভৃতি যা পড়ান হচ্ছিল তা বন্ধ করে দাও, ওতে কোন লাভই হয় না। এই সমস্ত স্কুল কলেজ উঠিয়ে দিয়ে কেবল technical college কর এবং সবাইকে জোর করে techenical science শেখাও দেশ খেয়ে বাঁচবে; কলকাতার বাড়ীওয়ালার তাগাদা সহ্য করতে হবে না এবং মেয়ে বিয়ে দিতে কষ্ট পাবে না। যাঁরা এই রকম উত্তর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বৈদান্তিক, দার্শনিক, সাহিত্যের অধ্যাপক, নীতিশিক্ষার উৎসাহী এবং মোটামুটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আছেন।

অধ্যাপকেরা শিক্ষার বিষয় যে দেশের ঠিক মনোভাবই প্রকাশ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

যেদিন ইয়োরোপ বাষ্প-দৈত্যটাকে বশ করবার মন্ত্র লাভ কর্‌লে, সেদিন এসিয়া পড়্‌ল একদম পিছিয়ে। আর ইয়োরোপের বাণিজ্য-তরীতে নীলসাগর ভরে গেল, দেশ দেশান্তর থেকে মণি মুক্তা সঞ্চয় করে ইয়োরোপের অধিবাসীরা তাদের মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করলে। তার শতঘ্নী কামান, তার দ্রব্য সম্ভার, তার রণতরী, তার আত্মশ্লাঘা, তার অসীম প্রতাপ আমাদের চমক লাগিয়ে দিল। আমরা ভাবলুম ইয়োরোপ যখন বাণিজ্য-লব্ধ অর্থ দ্বারা বড় হয়েছে অতএব আমরা যদি বড় হতে চাই তবে আমাদেরও ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে—ও ভিন্ন উপায় নাই। অতএব দূর করে দাও তোমার সাহিত্য, তোমার কাব্য, তোমার দর্শন। যাতে করে আমরা জাতকে জাত কামার কি তাঁতি হয়ে উঠতে পারি তাই কর।

এমনি করেই ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের মনকে বিগড়ে দিচ্ছে। খবরের কাগজে বক্তৃতায় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আমাদের গর্ব্বের ত অন্ত নেই অথচ দেখি ভবিষ্যৎ আদর্শ স্থির করবার বেলায় সবাই বলেন রেখে দাও তোমার আধ্যাত্মিকতা, ওই করেই ত এই হয়েছে, এখন কি করে একদিন সমস্ত পৃথিবীর সকল বাজার আমরা একচেটে করব সেই কথা ভাব। সবাই বলছি দেশের লোককে কাজের লোক করে তুলতে হবে। এই ত দেখতে পাচ্ছি ব্যবসা শেখাবার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় নূতন আয়োজন করা স্থির করেছে। এই অর্থের প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্ত ব্যবসার প্রয়োজনকে আমি অবহেলা করছি না কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি পাট কেনাবেচার কৌশল শেখা উচ্চ শিক্ষার

একটা অঙ্গ না কি? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে তিসির ও ভুসির কিরূপ চাহিদা (demand) তাই জানা কি মনুষ্যত্ব লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন? আধ্যাত্মিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবেন খেতেই যদি না পেলে তবে বাঁচবে কি করে—আমি বলব খাওয়াটা আমি ভুলছি না এবং মানুষের পক্ষে ওটা ভোলাও সহজ নয়, কিন্তু যেটা ভোলা সহজ সেটা হচ্ছে এই যে আহার্য্য সঞ্চয়টাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়।

বহুদিন হতে ইংরেজী শিখে আসছি এবং Shakespeare, Burke পড়ছি, হঠাৎ উপদেশ শুনলুম যে ওসব পড়া, সময়ের অপব্যয় মাত্র, ওতে কাজের কোন সুবিধাই হয় না। তার চেয়ে ইংরেজী বিশুদ্ধ ভাবে বলতে শিখলে চাকরী প্রভৃতির সুবিধা হত। অমনি দেখলুম সিনেটে প্রস্তাব হয়েছে যে, ইংরেজী বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য একটা ডিপ্লোমা দেওয়া হোক। সিণ্ডিকেট এই উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন এমন করে অনুভব করলেন এবং সাধারণ লোক-দের এ বিষয়ে এত অযোগ্য মনে করলেন যে, তাঁরা নিয়ম করলেন, গ্র্যাজুয়েট ভিন্ন অপর কেউ এ পরীক্ষা দিতে পারবে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বোধ করি এই বিশ্বাস যে, Photo বলতেই কোথায় accent দিতে হয় আর Photography বলতেই বা কোথায় দিতে হয়, এটা যে একটা বিশেষ বিদ্যা কেবল তা নয়—এ বিদ্যা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে কথা এই যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্ত্তাব্যক্তি এ পরীক্ষা দিয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত না করেন তবে খুব সম্ভবত দেশের লোক ও ডিপ্লোমায় মোহিত হবে না, কারণ ইংরাজি ভাষায় জবান-দুরস্ত করবার দিকে মানুষের মন আর নেই।

কিছুদিন হ'ল আমরা যখন প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভাবতে সুরু করেছিলাম তখন মনে করেছিলাম যে, দেশের লোককে খানিকটে chemistry botany, শিখিয়ে দিলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল culture নয় agriculture। কিন্তু মানুষ কি কেবল ফসল-উৎপাদনের ও কাপড়-তৈরীর কল? মানুষের মনুষ্যত্ব কি এতই সুলভ যে, তা লাভের জন্য কোন চেষ্টারই প্রয়োজন নেই। আজ অনেক দিন ধরে ইয়োরোপে প্রাথমিক শিক্ষা চলে এসেছে কিন্তু দেখা গেল তাতে বিশেষ কোন ফল হল না। এবং এ বিষয়ে সে দেশের দু একজন লেখকের লেখায় অসন্তোষও প্রকাশ পেয়েছে।

বিলাতের ও আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে তফাৎ আছে তা অনেকেই জানেন—ইংলণ্ডের জনসাধারণের একটা প্রিয় গান হচ্ছে—"Let's all go down the Strand and have a bannana"; কলা পৃথিবীর অবশ্য সকল দেশের লোকেই খায় এবং আমরা সম্ভবত বেশীই খাই, কিন্তু তাই বলে এদেশের নিরক্ষরেরাও ওব্যাপারটাকে সঙ্গীতের বিষয় করে তোলে নি। এই যে আমাদের নিরক্ষরদের মনের একটু স্বাভাবিক উচ্চতা, ও আভিজাত্য আছে তার কারণ কি? অথচ দেখতে পাই যে, বিলিতি কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে সব আলু কফি উৎপাদন করে তা উৎপাদন করা আমাদের দেশের কৃষকের অসাধ্য। তার কারণ এই যে, যদিও ভারতবর্ষের কৃষক জানেনা যে, কোন জমিতে কোন সার দিতে হয়, তারা জানে যে অযোধ্যা নগরে রামচন্দ্র একদিন পিতৃসত্য পালন করবার জন্যে রাজমুকুট ত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন—রাবণের

অশোক বনে বন্দিনী সীতার কাহিনীও তারা শুনেছে—রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের শৌর্য্য তাদের কাছে কাহিনী মাত্র নয়—তাঁদের স্মৃতি অলক্ষ্যে তাদের মনকে যুগপৎ কোমল ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই এত যে পঙ্কিলতা তবু হরিসংকীর্ত্তনে লোক জোটে; যাত্রাগানে, ধ্রুব-উপাখ্যান ভালই লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই হোক আর প্রাথমিক শিক্ষাই হোক ব্যবসার সঙ্কীর্ণ আদর্শে শিক্ষাকে ছোট করে দিলে, দেশের মঙ্গল হবে না, কারণ তাতে দেশের মন ক্রমশ ইতর হয়ে পড়বে।

কাজের একটা ভীষণ আদর্শ চোখের সামনে রাখাতে যে কেবল শিক্ষার আদর্শকে ছোট করে দিয়েছি তা নয়—বাংলাদেশের মনে সকল ব্যাপারেই একটা আক্ষেপ উঠেছে যে, এখানে লেখক পাওয়া যায়, কবি ত খুবই সুলভ, বক্তা সবাই, কিন্তু যাকে বলে practical, business-man তা পাওয়া সহজ নয়। আক্ষেপ করে এই কথা বলি যে, এই যে এত বড় স্বদেশীর ঢেউটা এল,—কি হল তাতে? আর দেখ দেখি বোম্বাই, মিল বসিয়ে কেমন লাভ করছে, বাঙ্গালী বক্তৃতা দিলে গান গাইলে, বাস্ হয়ে গেল সব। এই সব লোক হয়ত একদিন এই বলে আক্ষেপ করবেন যে, সূর্য্যের আলো ধরে তাঁরা তাঁদের গার্হস্থ্যের চুলোটি জ্বালাতে পারছেন না।

এই practical efficiency প্রভৃতির মোহ যতদিন ধরেছে, ততদিন থেকে যেমন কাজের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে অমনি আফিসের উপর শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে। আফিস আমাদের মন হরণ করেছে কারণ আমরা ভাবি যে, ঐ আফিস করার গুণেই ইংরেজ এত বড়। অথচ এই efficiency-টাই বা কি? দশটা থেকে পাঁচটা

শাদা খাতা থেকে কালো খাতায় কখনও বা কাল কালীতে কখনও বা লাল কালীতে নকল করা এবং এইটেই খুব শৃঙ্খলার সহিত করার নামই ত efficiency, আর practical মানে যে কাজ করা কঠিন তাতে হাত না দেওয়া। কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যে বড় একথা স্বীকার করা কঠিন, তবুও দেখছি শিক্ষাগুণে efficiency-র আদর্শে আমরা ভারি মোহিত হয়েছি। Idealism নয়, Vision নয় efficiency এবং practical হওয়া আমাদের জাতীয় আদর্শ হয়ে উঠেছে। Idealism-কে আমরা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি—নেতাদের বলছি Idea দিয়ে কি হবে—Practical কিছু বলতে পার ত বল, লেখককে বলছি ম্যালেরিয়া কিসে দূর হয় সেই কথা লেখ, না হলে ছেড়ে দেও তোমার লেখনী। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ হতে, আফিস বড়। অধ্যাপক এবং কেরাণীর সংখ্যা প্রায় সমান। কলেজে দেখতে পাই আফিস সুচারুরূপে চালানই হচ্ছে অধ্যক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য। আফিসের বড়বাবু হওয়ার যোগ্যতাই সব চেয়ে বড় যোগ্যতা। রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখছি যে, যাঁরা বিশ ত্রিশ বৎসর নিপুণ ভাবে চেয়ার সাজিয়ে এসেছেন, চাঁদা আদায় করেছেন অথবা চাঁদোয়া খাটিয়েছেন, তাঁরা বলছেন তাঁরাই নেতা কারণ তাঁরা practical! কলেজেও প্রধান কেরাণীর প্রতাপ অধ্যক্ষের চেয়ে কম নয়।

স্কুলে Plain living and high thinking সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি—চাণক্য-শ্লোকে অর্থের অনর্থতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পেয়েছি এবং জাতীয় আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা শুনেছি, অথচ আমাদের মনে ভাবী-ভারতবর্ষের যে আদর্শ গড়ে

উঠেছে, সে হচ্ছে এমন একটা ভারতবর্ষ, যাতে শুধু কাপড় বোনা হচ্ছে, জুতো তৈরী হচ্ছে—চার পাঁচ তালা বাড়িতে, কলের চিমনীতে আকাশ ঢাকা যার সমস্ত দেহটা চা, পাটের বিজ্ঞাপনে একেবারে আবৃত—সাহিত্য দর্শন যেখানে নির্ব্বাসিত, অকেজো বিজ্ঞান যেখানে অপমানিত। আর দেশের লোক Stock Exchange ভিড় করে দিব্বি সুখে জীবনযাপন করছে, আর আমাদের ছেলেরা স্কুলে কলেজে শিখছে শুধু Type-writing আর Book-keeping !

কিন্তু উপবাসের দিনে যাই মনে করি না কেন, এ আদর্শ আমাদের দেশে চলবে না। যে আত্মা অজর অমর, যে আত্মা অমৃতের অধিকারী, তাকে বিনষ্ট করে মানুষকে একটা সস্তা জিনিষ উৎপাদনের কলে পরিণত করতে ভারতবর্ষ সজ্ঞানে কখনও রাজী হবে না। পৃথিবীর সমস্ত বাজার একচেটে করবার প্রলোভনও যদি দেখাও তবু একথা ভারতবর্ষের জাতীয় আত্মা কখনই স্বীকার করবে না যে, দেবতাদের মধ্যে কুবেরই বড়, আর জাতির মধ্যে বৈশ্যই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

সমুদ্রের ডাক।

——:*:——

সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটী প্রসব কর্‌লে তখন তাদের সেই এতদিনকার বিষাদঘেরা কুটীর খানি আনন্দের আলোতে হেসে উঠ্‌ল। সাগরের কিনারে তাদের কুটীর। আবহমান-কাল থেকেই ত নীলাম্বুরাশি উচ্ছ্বসিত—সৃষ্টি হতেই ত তার তরঙ্গমালা কল কল ছল ছল মুখর—আজও তাই। তবে সে তরঙ্গমালার কল কল ধ্বনিতে আজ এত আনন্দ-মদিরা ঢেলে দিলে কে? নীলাম্বুরাশির সে উচ্ছ্বাস আজ এত হাস্য-মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? কুটীরের আশে পাশে তালবৃক্ষের সারি। বাতাসে তালবৃন্ত থির্ থির্ করে কাঁপছে—কিন্তু তা আজ এত উল্লাস-যুক্ত হ'ল কোন্ মন্ত্রে? দক্ষিণা যখন তার সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব কর্‌ল তখন এমনি করে মৎসজীবীর সেই নির্জ্জন শান্ত অথচ বিষাদমাখা কুটীর খানি, আকাশ বাতাস দশদিক ভরে একেবারে হেসে উঠ্‌ল।

দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটি প্রসব কর্‌লে তখন শ্রীমন্তের হৃদয়খানি ভক্তিতে ভরে' উঠ্‌ল এবং তারই আলোক তার চক্ষু দুটিকে উদ্ভাসিত করে' তুল্‌ল। দেবতার দয়া তার অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে স্পর্শ করে' শ্রীমন্তের জীবনকে এক মুহূর্ত্তে কৃতার্থ করে' দিল। জোড়করে আকাশের পানে চেয়ে গদগদভাবে শ্রীমন্ত বল্‌ল—"দেখো ঠাকুর! আমার খোকাকে যেন বাঁচিয়ে রেখ—দেখো যেন আকাশের চাঁদ হাতে

দিয়ে আবার তা কেড়ে নিয়ো না।”—শ্রীমন্তের মুখে আর কথা সর্‌ল না —তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল—অন্তরের ভাব, ভাষা খুঁজে পেলে না!

যথাসময়ে অন্নপ্রাশনের সঙ্গে শিশুর নামকরণ হ'য়ে গেল। দেবতার দান বলে' তার নাম রাখা হ'ল 'প্রসাদ'। যেদিন শিশু প্রথম আধ আধ কথায় মা ও বাবা ডাক্‌তে শিখ্‌ল, সেদিন দক্ষিণা ও শ্রীমন্তের বুকের ভিতরটা আশায় আনন্দে কেঁপে উঠ্‌ল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখের সাম্‌নে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল। যে জগতে পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ে এত স্নেহ এত ভালবাসা—সে-জগতের ত কঠোর হবার অবসর নেই। যে সংসারে শিশু রয়েছে—তার আধ আধ কথা রয়েছে—কালো চোখের হাসিমাখা দৃষ্টি রয়েছে—সে সংসারের ত নির্ম্মম হবার সাহস নেই। শ্রীমন্তের মরুভূমির মতো সংসার এক মুহূর্ত্তে যেন মন্দাকিণীর প্রবাহে দ্রুমদল শোভিত হ'য়ে গেল। আর সে ক্লান্তি-নেই, দুঃখ নেই, দৈন্য নেই—আর সে ব্যর্থতা নেই। শিশুর আনন্দ-ময় স্পর্শে সমস্তই ধন্য ও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল।

প্রতিদিনের কাজগুলো যা এতদিন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণার কাঁধে ভূতের বোঝার মতো চেপে তাদের জীবনকে এখানে সেখানে নির্ম্মম ভাবে টেনে নিয়ে বেড়াত, সে-ভার শুধু একটী মাত্র শিশুর আবির্ভাবে একেবারে লঘু হ'য়ে গেল। শ্রীমন্ত যখন জাল কাঁধে নিয়ে মাছ মার্‌তে যায় তখন তার হৃদয়টা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই আজকাল নৃত্য কর্‌তে থাকে—শ্রীমন্ত তখন ভাবে যে এই দিনমানব্যাপী পরিশ্রমের যে পুরস্কার, সে-পুরস্কার এ পরিশ্রমের তুলনায় অনেক বেশী। সে-পুরস্কার একটি ক্ষুদ্র শিশুর স্পর্শ—একটি ক্ষুদ্র শিশুর মুখে বাবা-ডাক। দক্ষিণা যখন রন্ধনে যায় তখন আর সে তা যন্ত্রবৎ সম্পাদন

করে না। রন্ধনের প্রতি ব্যঞ্জনটি যে, একটি ক্ষুদ্র শিশুর আনন্দের সামগ্রী হবে! সমস্ত দিনটার দিকে চেয়ে দক্ষিণার আর তা মরুভূমি বলে' মনে হয় না। সমস্ত দিনমান যে সে অনেকগুলো স্নেহের কাজের অধিকারিণী। শিশুকে স্নান করান—আহার করান—ঘুম পাড়ান তা যে দক্ষিণাকেই করতে হবে। ধন্য ভগবান! যিনি শিশুকে অসহায় করে' এখানে এনেছেন। পিতামাতা একটি ক্ষুদ্র শিশুর কাছ থেকে যে কতখানি আনন্দ কুড়িয়ে নেয়--তা শিশুও বোঝে না আর পিতামাতাও জানে না!

প্রসাদ ধীরে ধীরে ছ' বছরে পড়্ল।

একদিন রাতে ঘরের ভিতরে অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় দক্ষিণা ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছিয়ে শয়ন করেছে। পাশে প্রসাদ। ভোরের মুখে দক্ষিণার ঘুম ভেঙে গেল। তখন একটি মাত্র কাক ডেকেছে—সমুদ্রের আর আকাশের যেখানে মিলন হয়েছে সেখানে কেবল একটি মাত্র রেখা শুভ্র হ'য়ে উঠেছে। শ্রীমন্ত তারও আগে জাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি উঠ্তে যাচ্ছে, হঠাৎ তার চোখ পড়ে' গেল প্রসাদের মুখের উপর। দক্ষিণার আর ওঠা হ'ল না। প্রসাদকে ত সে এমন কোন দিন দেখে নি! নিদ্রিত শিশুর হাত দুটো সন্তর্পনে তার বুকের ওপর ন্যস্ত। চোখ দুটো ফুলের পাঁপড়ির মতো নিমীলিত। আর ঠোঁট্ দুখানিতে একটী মৃদু—অতি মৃদু হাসির রেখা। দক্ষিণা কি প্রসাদকে আর কোন দিন নিদ্রিত অবস্থায় দেখে নি?—দেখেছে; কিন্তু সে-প্রসাদে আর এ-প্রসাদে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। আর কি কোন দিন সে প্রসাদকে হাস্তে দেখে নি?—দেখেছে; কিন্তু সে হাসিতে আর আজকার এই

নিদ্রিত শিশুর মৃদু হাসি টুকুতে যে কি প্রভেদ তা দক্ষিণা বল্‌তে পারে না—কিন্তু সে-হাসি আর এ-হাসি এক নয়। এ কি দক্ষিণার পুত্র—না কোন দেবশিশু! এ কি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র পিতা মাতার স্নেহাবদ্ধ সন্তান—না অনন্ত আকাশের কোন জীব! এ কি মর্ত্ত্যের মানুষ—না স্বর্গের দেবতা! দক্ষিণার কেমন ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি ডাক্‌ল—"প্রসাদ, প্রসাদ।"

দক্ষিণার ডাকে যখন প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল তখন সে চারদিকে চেয়ে যেন প্রথম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ল না, তারপর হঠাৎ তার মাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' বল্‌ল—"জানিস্ মা ভারি একটা মজার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

দক্ষিণা শিশুকে বক্ষে চেপে তার দুই গালে হাত বুলিয়ে বুঝ্‌ল এ তারই প্রসাদ বটে—জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—"কি স্বপ্ন বাবা?"

"ভারি মজার স্বপ্ন মা! সে কি যেন কেমন—একদিন যেন আমি খেল্‌ছিলাম—সেখানে সবাই আছে মা—নরু অনঙ্গ বৈকোণ্ঠো শশী তারক—সবাই। হঠাৎ দেখি কেউ নেই! একলা আমি খালি দাঁড়িয়ে আছি—আর আমার সাম্‌নে মা খালি নীল—আর নীল—আর নীল! আর সেখানে থেকে কে যেন খালি ডাক্‌ছে—'প্রসাদ প্রসাদ', আমি উত্তর দিতে যাই আর পারি না—হাঁট্‌তে যাই হাঁট্‌তেই পারি না। আচ্ছা স্বপ্নে এ রকম হয় কেন মা? হাঁট্‌তে গেলে হাঁট্‌তে পারি না—কথা বল্‌তে পারি না?"

"কি জানি বাবা কেমন করে' বল্‌ব স্বপ্নে কেন ওরকম হয়।"

"তারপর আরও কত যেন কি—সব আমার মনেই নেই। কত যেন সুন্দর সুন্দর দেশ—কত ঘর বাড়ী—ফুল ফল—কত যেন কি।

সে এমন সুন্দর—সব বুঝি পরীদের দেশ—পরীদের দেশ কোথায় মা ?"

"কি জানি বাবা তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না। তারা থাকে আকাশে—আকাশে আকাশেই ঘুরে বেড়ায়—তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না।"

প্রসাদ সন্দেহাকুল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল। শিশুর চোখে পড়্‌ল শুধুই আকাশ—অনন্ত শূন্য—আর কিছুই না। শিশু একটু ম্রিয়মান হ'ল। হায় পরীদের দেশ কোথায় তা কেউই জানে না!

সে-দিন রাত্রিতে ভীষণ তুফান উঠ্‌ল। কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল—থেকে থেকে বিদ্যুৎ তাদের গায়ে দাঁত বসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। দিগন্তের পার থেকে সাঁ সাঁ করে' বাতাস ছুট্‌ল—সেই বাতাসের নাড়া খেয়ে লক্ষ্য ঢেউ যেন লক্ষ নিদ্রিত অজগরের মতো জেগে উঠে, তাদের লক্ষ্য ক্রুদ্ধ ফণা তুলে বেলাভূমে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। অর্দ্ধপ্রহর রাত থাক্‌তে জল ঝড় থেমে গিয়ে, প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ কর্‌ল। দক্ষিণার যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন পূর্ব্বদিকে ক্ষীণ উষার আলো দেখা দিয়েছে—আঁধার তখনো গাছে গাছে, তাদের ডাল পালার পাশে পাশে, ঘর বাড়ীর কোণে কোণে আশ্রয় খুঁজে আরোও কিছুকাল থাক্‌বার প্রয়াস পাচ্ছিল। দক্ষিণা উঠে ছড়া দিয়ে উঠান ঝাঁট দিল। তখন চারদিক বেশ ফর্‌সা হয়ে এসেছে। দক্ষিণা গিয়ে প্রসাদকে ডেকে তুল্‌ল—বল্‌ল—"কাল রাতে ঝড় হ'য়ে গিয়েছে—চল্, ঝিনুক কুড়ুতে যাবি নে?" প্রতি ঝড়ের শেষে সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে যে-সব মরা

ঝিনুক ইত্যাদি বেলা-ভূমে পড়ে' থাকৃত দক্ষিণা তা কুড়িয়ে বেশ দু' পয়সা উপায় করৃত। কখনও কখনও বা দু' একটা বড় শঙ্খ বা কড়িও মিলে যেত। তা অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা বেশ দাম দিয়ে কিনে নিত। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি প্রসাদকে কাপড় পরিয়ে দিল। তারপর কুটীরের দরজাটি টেনে দিয়ে মাতা এবং পুত্রে বের হ'য়ে পড়্ল।

ছোট বড় নানা রঙের নানান্ আকৃতির ঝিনুকে যখন দক্ষিণার ঝাঁকাটী পূর্ণ হ'য়ে উঠ্ল তখন সমুদ্রগর্ভস্থিত সূর্য্যের ক্রুদ্ধ রশ্মিগুলো পূর্ব্বদিগন্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘমালা তীরের মতো ভেদ করে', উর্দ্ধে নীলিমায় আপনাদের ছড়িয়ে দিয়েছে। ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে তারা সমুদ্রের ধারে ধারে অনেকদূর গিয়ে পড়েছিল। ফিরবার পথও সেই সমুদ্রের ধারে ধারে। দক্ষিণা বাম কাঁকালে ঝিনুকপূর্ণ ঝাঁকাটী বহন করে', দক্ষিণ হস্তে প্রসাদের ক্ষুদ্র হস্তটী ধারণ করে' ছেলের সঙ্গে গল্প করৃতে করৃতে বাড়ী ফিরে চল্ল।

মাতা পুত্রে কথোপকথন করতে করৃতে চল্ছিল আর শিশুর চঞ্চল চোখ দুটী এদিক সেদিক ফিরছিল। একবার প্রসাদ সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখে, তারপর বলে উঠ্ল—"দেখ্ দেখ্ মা কেমন একখানা জাহাজ কতদূর দিয়ে ছুটে চলেছে"—কিন্তু পরক্ষণেই তার উত্তোলিত অঙ্গুলি দাঁত দিয়ে কাম্ড়ে ধরে' একেবারে দাঁড়িয়ে গেল—শিশু যেন কি স্মরণ করৃবার চেষ্টা করৃতে লাগ্ল। সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে' উঠ্ল—"মা জানিস!"

দক্ষিণাও প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—বল্ল—"কি বাবা?"

"সেই যে সে-দিনকার স্বপ্ন।"

"হাঁ বাবা"

"খালি নীল—আর নীল—আর নীল!"

"হাঁ বাবা"

শিশু তার ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সমুদ্রের দিকে প্রসার করে' বল্‌ল—"সে যেন ঐ রকম মা।"

"ছি ছি বাবা স্বপ্ন সব মিথ্যে।—স্বপ্নের কথা মনে করে' রাখ্‌তে নেই।"

দক্ষিণা প্রসাদকে টেনে নিয়ে গৃহ-অভিমুখে অগ্রসর হ'ল। শিশুও অন্যমনস্ক ভাবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। সে মনে ভাব্‌লে হায়! স্বপ্ন সব মিথ্যে এমন মজার জিনিসগুলো মিথ্যে হয় কেন? এই ভেবে সে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হ'ল।

সে দিন বেলা এগারটা বেজে গিয়েছে। গ্রামের উপকণ্ঠে যে মস্ত ছাতিম গাছটা ছাতার মতো ডাল বিস্তার করে' পাতা বিছিয়ে দিব্যি ছায়া করে' দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে তখনকার মতো খেলা ধুলো সাঙ্গ করে' ছেলেরা যে যার মতো গৃহে ফিরেছে। কিন্তু প্রসাদের আর সেদিন দেখা নেই। দক্ষিণা রান্না শেষ করে' তেলের বাটী নিয়ে প্রসাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল। ধীরে ধীরে যখন উঠানের কোণের ডালিম গাছটার ছায়া তার গায় গায় মিশে গেল অথচ প্রসাদ ফির্‌ল না তখন দক্ষিণা তার খোঁজে চল্‌ল। দক্ষিণা সহজেই মনে কর্‌ল যে প্রসাদ হয়ত আর কোন বালকের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়েছে। কিন্তু যখন সমস্ত প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে প্রসাদের খোঁজ মিল্‌ল না তখন তার মার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু দক্ষিণা আবার মনে কর্‌ল যে হয়ত প্রসাদ এতক্ষণ ঘরে ফিরেছে।

এই মনে করে' দক্ষিণা দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ল। না,—কুটীরের দ্বার তেম্‌নি রুদ্ধ। কেউ কোথাও নেই। আশে পাশে কোন খানে প্রসাদ থাক্‌তে পারে মনে করে' দক্ষিণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌ল "প্রসাদ প্রসাদ", কোন উত্তর নেই। প্রসাদ ফেরে নি।

ত্রস্তপদে দক্ষিণা আবার বাটী থেকে বহির্গত হ'ল। আবার পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌তে লাগ্‌ল। কোথাও প্রসাদ নেই। এমনি করে' যখন দক্ষিণা চতুর্থবার গৃহ থেকে গৃহান্তরে কেঁদে কেঁদে প্রসাদের খোঁজ করে' বেড়াচ্ছিল তখন একটি ছোটছেলে দক্ষিণাকে বল্‌ল যে, প্রসাদ খেলার মাঝখানে ছাতিমতলা থেকে চলে' গিয়েছিল—আর তার যদ্দূর মনে পড়ে তাতে সে প্রসাদকে ছাতিমতলা থেকে যে পথটা সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' তাকে যেতে দেখেছে। দক্ষিণা মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করে' দেবতার কাছে নানা মানত কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল। ছাতিমতলায় এসে দেখ্‌ল সে স্থান জনশূন্য। দক্ষিণা সেখান থেকে যে-পথ সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' চল্‌ল। কিছুকালের মধ্যে দক্ষিণা সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে এসে সে ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল।

দক্ষিণা দেখ্‌ল সমুদ্রের ধারে একখানে বন্যঝাউ আর নারিকেল গাছে একটা কুঞ্জের মতো সৃষ্ট হয়েছে—আর সেখানে প্রসাদ একটি ঝাউয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে' একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-উদ্দীপ্ত-আকাশ সমুদ্রকে একটা অতি মনোরম চোখজুড়ান নীল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। গত রাত্রির ঝঞ্ঝা-তাড়িত ঊর্ম্মিমালা এখনও যেন তাদের তাল সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারে নি—তাই

তখনও তারা গর্জ্জে' গর্জ্জে' বেলাভূমে এসে প্রতিহত হ'য়ে ফিরছিল। আর তারই উপকূলে ছায়া-সুনিবিড় কুঞ্জতলে ক্ষুদ্র শিশু আপনার ক্ষুদ্র দুটী হাতে ক্ষুদ্র দুটী হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে বসে তাই দেখছিল; শিশু পলকহীন—নির্ব্বাক—নিস্তব্ধ!

দক্ষিণা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'য়ে প্রসাদকে কি ভৎর্সনা কর্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রসাদ মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌ল, তারপর মাকে দেখে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর্‌ল ও উত্তেজিত ভাবে বল্‌লে—"মা মা শুন্‌ছিস্ কি মা?"

শিশুকণ্ঠের মা-ডাকে মাতার মনের ক্রোধ মুহূর্ত্তে চোখের জলে পরিণত হয়ে গেল। দক্ষিণা প্রসাদকে বক্ষে তুলে নিয়ে মুখচুম্বন করে' জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কি বাবা?"

প্রসাদ তেম্‌নি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌ল—"ঐ শোন্ শোন্ মা সমুদ্র কেবলি ডাক্‌ছে—'প্রসাদ প্রসাদ।' শুনিস্ না কি মা তুই?"

শিশুর কথা শুনে দক্ষিণার বুক দুর্‌দুর্ করে' কেঁপে উঠ্‌ল। কোন্ অজ্ঞাত আশঙ্কার আশু সম্ভাবনায় তার চিত্ত মন প্রাণ খিন্ন হয়ে উঠ্‌ল। দক্ষিণা বল্‌ল—"ছিঃ বাবা পাগলামি করো না। সমুদ্র কি ডাক্‌তে পারে! ও যে ঢেউয়ের শব্দ।"

দক্ষিণা প্রসাদকে কোলে নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল।

এর পর থেকে সুযোগ পেলেই প্রসাদ সেই ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে বসে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকত। এই ক্ষুদ্র শিশুটী সমস্ত খেলাধূলা ফেলে, একা একা সমুদ্রের দিকে চেয়ে কি ভাবে তা কে জানে? সিন্ধুর ছলছলয়িত কলরোল সে ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরতে পরতে কোন্ ভাবের তরঙ্গ তুলে যায় তা কে বল্‌তে পারে? কে জানে

কোন্ রহস্যের যবনিকা ভেদ করে' কোন্ স্বপ্নের সন্ধানে শিশু তার কালো চোখের নির্ম্মল দৃষ্টি সীমাহীন দিগন্তে বদ্ধ করে' সিন্ধুকূলে বসে থাকে ? কেউ জানে না। শিশু কি জানে? কে জানে শিশু জানে কি না। কিন্তু তবুও শিশু যায়। একা একা—সমস্ত ছেড়ে খেলাধুলো হাসি-গল্প সমস্ত পরিত্যাগ করে' শিশু যায়, সেই ঝাউকুঞ্জ-তলে আপনাকে ভুলিয়ে দিতে—ভাসিয়ে দিতে—ডুবিয়ে দিতে। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণা যখন জান্‌ল যে, প্রসাদ খেলবার নামে প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের ধারে গিয়ে একা একা বসে' থাকে, তখন সে প্রসাদকে প্রথমে মিষ্টি কথায় তারপর ভৎ‍র্সনায় ও অবশেষে ভয়প্রদর্শনে সেখানে যেতে নিরস্ত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু যখন দেখ্‌ল কিছুতেই কিছু হ'ল না তখন দক্ষিণা হতাশ হয়ে শ্রীমন্তকে একে একে সব কথা বল্‌ল।

এর পর থেকে প্রসাদের বাহুমূল ও কণ্ঠদেশ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ঢোলোকাকৃতি নানা বর্ণের নানা রকমের কবজে ও তাবিজে ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কত জনের কত মন্ত্র ঔষধী ইত্যাদির ছড়াছড়ি হতে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রসাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ফাঁক পেলেই সে ঐ ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে একলা সমুদ্রের দিকে পলক-হীন নেত্রে চেয়ে থাকে—বুঝি কান পেতে কি শুন্‌তে থাকে। এই রকমে যখন কিছুতেই কিছু হল না—তখন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণা পরামর্শ কর্‌তে বস্‌ল। অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল যে, দক্ষিণা প্রসাদকে নিয়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাকবে। সে আত্মীয়ের বাড়ী সমুদ্রের উপকূল থেকে দশ ক্রোশ দূরে। আর শ্রীমন্ত মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে প্রসাদকে দেখে আস্‌বে। তারপর

একটি শুভদিন দেখে দক্ষিণা ও প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমন্ত সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে ছেলেকে রেখে তার নির্জ্জন কুটীরখানিতে ফিরে এল।

পৃথিবীর বুকে পুরোণো দাগ মিশিয়ে নতুন দাগ বসিয়ে দশ বছর কেটে গেল। শ্রীমন্ত যখন একদিন দক্ষিণা ও প্রসাদকে সেই আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে গেল তখন প্রসাদের ছেলেবেলার খেয়ালের কথা সবাই ভুলেছে—ভোলে নি শুধু দক্ষিণা। তাই দক্ষিণা যখন শ্রীমন্তকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিল—তখন দক্ষিণা যে নিতান্তই একটা পাগলী সেই কথাটাই শ্রীমন্ত তাকে বুঝিয়ে দিল। আরও বুঝিয়ে দিল যে শ্রীমন্তের এখন বয়েস হয়েছে—কবে পর-পারের ডাক আসুবে তার ঠিক নেই—প্রসাদকে পৈতৃক ব্যবসাটা ত শিখতে হবে—খাওয়া পরার উপায়টা ত কর্‌তে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই শুভদিন দেখে প্রসাদ ও দক্ষিণা শ্রীমন্তের সঙ্গে আবার তাদের সমুদ্রের ধারে কুঁড়ে ঘরটিতে ফিরে এল। দক্ষিণা হৃষ্ট হয়ে দেখ্‌ল যে সমুদ্র দেখে প্রসাদের কোনই ভাবান্তর হল না। তিন মাসের মধ্যে শ্রীমন্তের শিক্ষায় প্রসাদ একজন পাকা মাঝি হয়ে উঠ্‌ল—জাল টান্‌তে, দাঁড় ফেল্‌তে, পাল খাটাতে প্রসাদের সমকক্ষ আর কেউই সেই ধীবরপল্লীতে রইল না।

সেদিন বৈশাখী পুর্ণিমা। রাত্রির এমন রূপ আর কেউ কখনও দেখেনি। লক্ষ পরী বুঝি সেদিন আকাশপথে তাদের প্রিয়ের উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিল—আর তাদের লক্ষ পা থেকে বুঝি রূপোর স্বচ্ছ তরল রাগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল—তাদের লক্ষ হৃদয়ের প্রেমের অনুভব বুঝি আকাশে বাতাসে পৃথিবীর জলে স্থলে বিছিয়ে

যাচ্ছিল—তাদের দু'লক্ষ পায়ের নূপুরের "যে-গান কানে যায় না শোনা"—তাই বুঝি দিগন্তের গায়ে গায়ে মাতলামি করে ফিরছিল।

সেদিন রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ করে' যখন প্রসাদের কাঁধে জাল চাপিয়ে আপনার কাঁধে দাঁড়, পাল ও পাল তুলবার খুঁটিটা নিয়ে শ্রীমন্ত গৃহ থেকে বের হল তখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠে গেছে। তারা দুজনে সমুদ্রের কিনারে এসে তাদের তিন খণ্ড লম্বা পুরু তক্তায় বাঁধা ভেলাটা ডাঙ্গা থেকে জলে নামিয়ে দিল। তারপর পাল খাটাবার খুঁটিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে পাল খাটিয়ে দিল—ভেলা অনুকূল-বাতাসে তর্‌তরিয়ে দিগন্তের পানে যেন উড়ে গেল—ভেলার পিছন দিকটায় প্রসাদ বৈঠা হাতে তার মাথা ঠিক রাখ্‌তে লাগল আর তার আগায় বসে' শ্রীমন্ত জালটা গুছিয়ে রাখতে লাগল।

সেদিন সাগরে রূপোর ও রূপের বাণ ডেকেছিল। দুধের চাইতেও সাদা রূপোর পাত গায় জড়িয়ে রূপসী ঊর্ম্মিবালারা চিক্‌-চিক্‌ ঝিক্‌-ঝিক্‌ করছিল—খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তীরের গাছগুলো যখন ঝাপ্‌সা হয়ে এল তখন ভেলার পাল নামিয়ে নেওয়া হল। তারপর ভেলার পিছন দিকটায় বসে প্রসাদ একটু একটু করে বৈঠা মারতে লাগল আর গলুইয়ের কাছে স্তুপাকৃতি করা জালটা শ্রীমন্ত, ভাঁজ খুলে খুলে জলে নামিয়ে দিতে লাগল।

"জানিস্‌ প্রসাদ, পূর্ণিমে রাত্তিরে যেমন জালে গল্‌দা চিংড়ি পড়ে তেমন আর কখনও না। আর চাঁদ্‌নী রাত যদি মেঘলা মেঘলা হয় তবে কাঁকড়ার লেখাজোকা নেই।" শ্রীমন্ত জাল ফেল্‌তে ফেল্‌তে

অজস্র ব'কে যাচ্ছিল আর প্রসাদ তাই নির্ব্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছিল। "জানিস্ রে প্রসাদ সেই যেবার আমি তোর মাকে বিয়ে করলাম— সেই সেবার যে এই খালটাতে কোথা থেকে এক পাল হাঙ্গর এসে পড়ল—" "প্রসাদ প্রসাদ" প্রসাদের কানে এসে বাজল কে যেন ঠিক তার পিছন থেকে তাকে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ"। প্রসাদ চম্‌কে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। কই, কেউ ত নেই! প্রসাদের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রসাদের মনে পড়ে গেল একটা বহু দিনের কথা—বহুদিনের স্বপ্ন—বহুদিনের আকাঙ্খা। দশ বছর ধরে যার ওপরে বিস্মৃতির কালো পর্দা পড়েছিল তা এক মুহূর্ত্তে কোথায় সব ছিন্ন ভিন্ন করে' বেরিয়ে এলো মুক্ত স্পষ্ট উজ্জ্বল। প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে ফিরে দেখল। বৃদ্ধ তেমনি আপন মনে জাল ফেলছিল আর কত কালের কত কথা বলে' বলে' যাচ্ছিল। "প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ ফিরে চাইল। সহস্র সহস্র তরুণীর মতো অজস্র ঊর্ম্মিবালার কল কল ছল ছল হাসি—ঐ যে তারাই ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" চাঁদের আলোয় চিক্ মিক্ করে উঠে ঐ যে তাদের তরলিত তনু বিভঙ্গিত করে তাদের কমকণ্ঠে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে সহস্র কিশোরীর কলহাসির মতো, সহস্র রূপসীর রূপরাশির মতো মাদকতা ছড়িয়ে দিয়ে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" এ তাদের কিসের আমন্ত্রণ? কোথায় নেবে তারা? সিন্ধুর কোন্ অতল তলে? কোন্ রহস্য যবনিকার অন্তরালে? ঐ যে তরঙ্গটি ভেলার গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল সে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে লহরীটি বহুদূর হতে দৌড়ে এসে ভেলার কিনারে কিনারে লুটিয়ে গেল, সে ডাক্‌ল—"প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে

দেখল। বৃদ্ধ তেমনি তার দিকে পিঠ ফিরে জাল ফেলছিল। প্রসাদ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তার হাতের বৈঠাটী ভেলার ওপরে রেখে দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার দু' পা জলে নামিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভেলার কাঠ ধরে আপনাকে জলে নামিয়ে দিল। কোমর, বুক, কণ্ঠ, চিবুক, নাসিকা, চক্ষু, ললাট, মস্তক, মস্তকের কেশরাশি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দ্বিগুণ উৎসাহে লক্ষ লক্ষ ঊর্ম্মিবালারা চিক্-চিক্ ঝিক্-ঝিক্ করে উঠল—যেখানটায় সাগরের বুক চিরে প্রসাদের সমস্ত শরীরটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেখানটার উপর দিয়ে মহা ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল আর খিল্-খিল্ করে' হাসতে লাগল।

"বৈঠে ঠেলছিস্ না ক্যান্ রে প্রসাদ ?" যখন প্রসাদের কোন উত্তর মিল্‌ল না, তখন শ্রীমন্ত মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌ল—দেখ্‌ল শুধু শূন্য—প্রসাদ যেখানটায় বসে' ছিল সেখানটা শূন্য—সমস্ত ভেলাটাই শূন্য—শুধুই শ্রীমন্ত—আর কেউ নেই !

মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের হৃদয় থেকে একটা তপ্ত আগুনের ঝলক্ উঠে তার সমস্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। শ্রীমন্তের হাত থেকে জালের দড়ি খসে' পড়ল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়িয়ে সংজ্ঞালুপ্ত চোখ দুটো দিয়ে প্রসাদ যেখানটায় বসে ছিল সেখানটায় অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মর্ম্মভেদী চীৎকার করে একবার খালি "প্রসাদ" বলে ডেকে ভেলার উপরে পড়ে গেল। উত্তরে লক্ষ ঊর্ম্মিবালারা চাঁদের কিরণে চিক্-মিক্ করে' লক্ষ নিষ্ঠুরা তরুণীর মতো ভেলার আশে পাশে প্রতিহত হ'য়ে খিল্ খিল্ করে' হাস্‌তে লাগল আর কৌতুক করে' ডাকতে লাগল—"প্রসাদ প্রসাদ !"

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

INDIAN LITERATURE.

BY PRAMATHA CHAUDHURI.

[বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্র Manchester Guardian-য়ের সম্পাদকের অনুরোধে ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে আমি একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধটি সম্প্রতি উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। Manchester Guardian এদেশে দু-চারখানির বেশী আসে না, সুতরাং আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই সে প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ পান নি। তাঁদের দৃষ্টির জন্যই আমি সেই প্রবন্ধটি "সবুজ পত্রে" প্রকাশ করছি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংরাজি প্রবন্ধ বাংলা কাগজে ছাপানো কি সঙ্গত? তার উত্তর—আমার ইংরাজি লেখা, আমি নিজে বাংলায় অনুবাদ করতে পারিনে। বাংলায় লিখ্‌লে ও-প্রবন্ধ আমি অন্যরকম করে লিখতুম, সুতরাং ওটি অনুবাদ করতে বসলে আমার হাতে ওর চেহারা একেবারে বদলে যাবে। তা ছাড়া "সবুজ পত্রের" অধিকাংশ পাঠকই ইংরাজি ভাষার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত,—সম্ভবত বাংলার চাইতে বেশী পরিচিত,—সুতরাং সে পত্রের মধ্যে এ প্রবন্ধটি নির্ভয়ে প্রক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

INDIAN literature is the creation of the Hindu mind, and so to understand that literature it is necessary to have some knowledge of the thought and institutions of ancient India, as all the roots of our

social and spiritual life are deeply embedded in our past. The complete history of India has yet to be written, but its culture-history has been fully preserved in the pages of Sanskrit literature—a literature which is as vast as it is comprehensive, practically embracing the whole sphere of human thought and imagination.

The earliest chapter of our literature, known as the Vedas, is a collection of hymns addressed to gods—that is to say, personified forces of nature—which express the sentiments of joy and wonder, of reverence and awe born of the living contact of the human mind with the external universe. For freshness of feeling and vigour of expression, there is nothing in any literature which can be compared with these. In them we find also the earliest attempts of the human mind to lift the veil of phenomena and peer into the Reality which is the ultimate basis of all that exists. The Vedas have ever been looked upon by our people as the eternal source of their spiritual and social existence. One thing is certain, that these first words of India indicated the direction in which the Hindu mind was to move, and determined the character of the laws which were to give shape and form to Hindu society, as well as of the philosophy which was to mould Hindu psychology. If the earlier portion of the Vedas was a collection

of hymns, the later portion was a manual of rituals. The Shastras (codes of conduct) and the Vedanta, which represent the two opposite poles of the Hindu mind—the practical and the speculative,—were respectively evolved from the prose and the poetry of the Vedas.

THE SHASTRAS.

The teaching of the Shastras is, that laws were not made by any legislator, human or divine, but are self-existent, and as such are eternal and immutable; and that therefore man's duty consists in unquestioning submission to them. A virtuous life means nothing more nor less than a life consecrated to the performance of one's social duties. The dividing line between law and morals was not clearly drawn, and one ran into the other. Our people's social consciousness was broken in to this doctrine, and in the result, the willingness to subordinate one's individual self to the social self has become almost instinctive with us.

The Vedanta philosophy is the complete antithesis of this doctrine. It deliberately and completely turned its back on the social life of man, and set itself to solve the problem of the individual soul. "I and my Father are one," sums up the central doctrine of the Vedanta. According to this philosophy, man's salvation depends neither on work nor on faith; it

lies in the realisation of the truth that the human soul is one with the divine. He who realises the God in him is the only free man, and as such is above all social rules. The paradox that man is socially bound but spiritually free, dominated the classical mind of India; and the tragedy of Indian history consists in this utter divorce of life from thought.

This Vedic literature was a sealed book to the masses, the real people of India, and was open only to the ruling race, the Aryan conquerors, of whose genius it was the product. What really formed, or transformed, the psychology of the people at large, was the story of the lives of the Aryans of the heroic age, recorded in the two great epics of India, the Ramayana and the Mahabharata. These are tales of heroic deeds and noble endeavours, and the outstanding feature of the epic characters is their moral grandeur. These two epics also happen to be the unfailing source of all subsequent Sanskrit literature. Generation after generation of poets, dramatists, and story-tellers have drawn both their inspiration and their material from them. It is not necessary for me to dwell at length on later Sanskrit literature, because, in spite of all its high excellence, it has had little or no influence on either the form or the spirit of our modern literature. It could not influence life, because it was too far removed from life. We admire

it, but do not imitate it. It is urbane but conventional, elegant but stiff; it has form but no movement, it has colour but no warmth; in a word, it is as refined as it is bloodless. It seems that the spirit of the Shastras—the legal spirit—had taken possession of its soul, and crushed out its vitality. The latter-day products of Sanskrit literature show that the spirit of India stood in urgent need of thorough renovation.

II.

The invasion of the Mohammedans, which took place in the eleventh century A.D., gave the death-blow to the classical civilisation of India, and along with it to the decaying Sanskrit literature. Two hundred years did not pass before India saw the birth of a new literature—the vernacular literature. As its language shows, this literature was popular in its origin, and had, whether in spirit or form, little or no connection with the classical. The so-called Prakrit, or popular literature of the previous age was, however, even more artificial than the Sanskrit, and had nothing popular whatever about it. The new literature came out of a new religious movement, in which another side of the soul of our people is revealed—the emotional. During the course of ages Brahminic institutions had become so rigid and Brahminic thought so abstract, that they had practically ceased

to be human. On the other hand, the mind of the people had become intensely humanised by the influence of Buddhism, whose great teaching of infinite compassion for all sentiment creatures had sunk deep into the soul of the nation.

The simple doctrine of the fatherhood of God and the brotherhood of man, which the Mohammedans introduced into India, appears to have stirred the soul of the people to its depths, for we find that in the fourteenth century, in almost every part of India, religious reformers rose in protest against the empty formalism and the dry intellectualism of Brahminic orthodoxy. In this age. Vaishnavism, the oldest monotheistic creed of India, was revived throughout the length and breadth of the country. Neo-Vaishnavism, with its doctrines of a personal God, incarnation, divine grace, and salvation by faith, bears a close and striking resemblance to Christianity. As a romantic spiritual movement which set a new and supreme value on human emotions, it caused a simultaneous deepening and heightening of the emotional nature of our people. And the poets of this age poured out their emotions, social and religious, in language which is as simple as it is fervent.

III.

With the British conquest of India, there opens a new chapter of our psychology. In English litera-

ture our people discovered a new mental hemisphere, a new world of knowledge—the knowledge of the facts of this world,—and a dormant faculty of our soul awoke into life. What the German philosophers call the "will to know," suddenly manifested itself amongst our people in all its freshness and vigour. The Indian mind showed no hostility—not even the faintest—towards the message of science; on the contrary, our fathers displayed an extraordinary eagerness to acquire and spread the new learning which came from the West. The opening years of the nineteenth century thus saw the birth of a new literature, largely and deeply influenced by Western thought and Western feeling. The first half of the last century did not produce any permanent literature, because it was an experimental age—an age of text-books and translations. If we take the example of Bengal, we find that her period of literary apprenticeship came to an end with the close of the first century of British rule. The birth of this literature, which is at once modern and national, was synchronous with the assumption of the government of India by the Crown.

Our new literature is the expression of our new psychology, into the composition of which elements both European and Indian equally enter. I know of no process by which these can be separated, because

the human mind is not a chemical compound which admits of either quantitative or qualitative analysis. But we shall not go very far astray if we say that, what is modern in our literature has its root in modern Europe, and what is national in ancient India. Spiritually we all hark back to the Vedanta Philosophy, because Europe has not succeeded in robbing us of our sense of the Beyond. We welcome the science of modern Europe, but not its philosophy. We would sooner believe that all is spirit, than that all is matter. But we seek to modernise the ancient thought—that is to say, we would apply the doctrines of man's spiritual freedom to his social life. Europe has simply taught us to bridge the ancient gulf between Indian thought and Indian life.

Rabindranath Tagore incarnates in himself the whole spirit of the age, and in his works Europe can find all the heights and depths of our new psychology. But whilst European readers of his writings can easily recognise what is Western in thought and feeling therein, they fail to realise that his religious consciousness is inspired by the Vedanta, and that his lyrics are informed by the spirit of Vaishnava poetry. Our new literature at its best shows that in it the East and West have not only met, but have interpenetrated each other.

Manchester Guardian, March 28, 1918.

শ্রাবণ, ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২৭

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বই পড়া। *

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্ব্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হই। লোকে বলে আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানটা অবশ্য অত্যাচার শ্রোতাদের উপর করারই সামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্য' পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন "উদাসীন গ্রন্থকীট"। এর অর্থ, কোনও কোনও লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ছিল না। সে যাই হোক্, আমার আ-কৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে

* কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে ১৯১৮ সনের ১৯শে মে তারিখে পঠিত।

সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা আমার বিশ্বাস অসঙ্গত হবে না।

(২)

আজকের সভায় যে দু'চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে,—অর্থাৎ তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশী থাক্‌বে। এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্ব্বে হাজার বার কি বলা হয় নি? তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ্‌-অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেননা মানুষে এ কালে বই পড়ে না—পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্য সমাজ ভোরে উঠে করে দু'টি কাজ—এক চা-পান আর সংবাদপত্র পাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে "A cup that cheers but not inebriates"—অর্থাৎ চা-পান কর্‌লে নেশা হয় না অথচ ফূর্ত্তি হয়। চা-পান কর্‌লে নেশা না হোক্, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তারপর অতিরিক্ত চা পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়—অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চারদিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।

(৩)

কাব্যচর্চ্চা না করলে মানুষে জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনও সভ্যজাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি—এদেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশী লোক যত বেশী বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য,—এমন কথা বললে বোধহয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা কলহে দিন-যাপন করার চাইতে কাব্যচর্চ্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলকেই সংসার-বিষ-বৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে,—কিছুদিন পূর্ব্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি, লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলিনে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না, কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশী ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিক-দের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাসান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, "নাগরিক" বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত—একালে ইংরাজিতে যাকে man-about-town বলে। বাংলাভাষায় ওর কোনও নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

(৪)

যদি অনুমতি করেন ত এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এদেশে যেমন একদল ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর একদল ভোগী-পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক-ধর্ম্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার শুধু আত্মার নয় দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতি-নীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায়—কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন, অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য; বিশেষতঃ ও সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

“বাহিরের বাসগৃহেও অতি শুভ্র চাদরপাতা একটি শয্যা থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চ্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর, রাত্রিশেষ অনুলেপন, মাল্য, সিক্থকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপূটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক্, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগ-

দন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্ত্তিকা-সমুদ্গকঃ। এবং যে কোনও পুস্তক।”

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে—কেননা এর অনেক শব্দই বাংলাভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐ সকল অপরিচিত শব্দের বাচ্য পদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতি-শয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাটিয়া। এ খাটিয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না। তার মাথার গোড়ায় থাকত কূর্চ্চস্থান। কূর্চ্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনও অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরো-ভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ্চ। আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না। সুতরাং কূর্চ্চ হচ্ছে একপ্রকার ব্রাকেট। সেকালের এই বিলাসী সম্প্রদায়—আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না;—কিন্তু দেবতার ধার ষোল আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যাহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক্ ও সব কথা। এখন দেখা যাক্ বেদিকা বস্তুটি কি?—বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল। এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়। তিনি বলেন বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম—অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের

মালা। কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাঁদা নয়; কেননা তাঁরা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য্য বুঝতেন। সিক্‌থ্‌করণ্ডক হচ্ছে—মোমের কৌটা। সেকালে নাগরিকেরা, ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিস করে নিয়ে, তারপর তাতে আল্‌তা মাখতেন। সৌগন্ধিকপুটিকা হচ্ছে— ইংরাজিতে যাকে বলে powder-box। বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে—প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানী। তারপর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তি-সংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা। টীকাকার বলেন সে বীণা আবার "নিচোল-অবগুণ্ঠিতা"। বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ী। "শাড়ীপরা বীণা"র অবশ্য কোনও মানে নেই। নিচোল অর্থে গেলাপ। জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন "শীলয় নীল নিচোলং" তার অর্থ "নীলরঙের একটি ঘেরাটোপ পর"। ইংরাজি ভাষায় ওর তর্জ্জমা হচ্ছে—put on a dark blue cloak। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক্‌। তারপর পাই চিত্র-ফলক। সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্ত্তিকা সমুগকের অর্থ তুলি ও রঙ রাখবার বাক্স। তারপর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পার্‌বেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তারপর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেননা নাগরিকেরা আর যাই হ'ন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে

আর কোনও সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোন কোন ধনীলোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুন্‌তে পাই যে—

"এই সকল বীণাদিদ্রব্য সর্ব্বদা উপঘাতের অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তি নিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হবে।"

পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের আরও কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন—যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং, অর্থাৎ "যা হোক একটা বই",—তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে বই, আর যে কারণেই হো'ক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই:—'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দ্দেশ হইলেও, তখনকার যে-কোনও কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও,—ও দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে—কিন্তু কাউকে জোর করে সঙ্গীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনও অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ

অনুমান করা অসঙ্গত হবে। সে যাই হে'াক, টীকাকার বলেছেন "যে-সে বই নয়, তখনকার বই"; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরাজিতে বলে classics, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনও উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনরূপ সামাজিক দায় নেই। আর এক কথা। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্য সমাজেও দেখ্‌তে পাই যে, "এখনকার" বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাসানের একটি প্রধান অঙ্গ। Anatole France-এর টাট্‌কা বই পড়ি নি, এ কথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত Kipling-এর কোনও সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বল্‌তে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ Anatole France-এর লেখা যেমন সুপাঠ্য, Kipling-এর লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বল্‌ছিনে। বিলেতে একটি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব তিনি মাসে দশ বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হো'ক্‌, যা রটে তা কিছু বটেই ত। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন তিনি ছিলেন কত বড় লোক। এত বড় লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোরডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি?—Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই ত! ও সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি

এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলেন। তিনি বল্‌লেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়্‌বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য এ রকম ব্যক্তিকে এদেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল কর্‌তে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে তিনি যত বড় আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য কর্‌বে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এদেশে পূরাকালে culture জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি, সেকালে তাকে নাগরিক বল্‌ত। অপরপক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্য্যায়-শব্দ—ইংরাজিতে যাকে বলে synonyms.

(৫)

এর উত্তরে হয়ত অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চ্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করিনে, ও

চর্চ্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে "মাল্য চন্দন বনিতা" এ তিন একসঙ্গেই যায়, এবং ও তিনই ছিল এক পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের সামিল, বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখে সেকালের নাগরিক সমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন, এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার কর্‌তে হ'লে, সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্ত্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চ্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখ্‌তে চাই। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমত বর্ত্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই। আরও অনেক হওয়া চাই,—কিন্তু ও দুটি না হলে নয়।

যে সমাজে কাব্যচর্চ্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য—এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্ব্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর কিছু করে না। অপরপক্ষে যে সমাজের আয়েসীর দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু' কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশ ভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা-মূর্ত্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং

কোন সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয় ; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতীত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে, দেখতে পাওয়া যায় যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে কাব্যকলায় শিল্পে বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসী লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চ্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে মানুষকে ভাল করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হো'ক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে মানুষকে ভাল না করা যাক্, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চ্চা মানুষকে নীতিবান না করলেও রুচিবান করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

ধরে নেওয়া যাক সেকালের নাগরিক সমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখ্ত। তাঁরা যে হিসাবে ওষ্ঠে যাবক ধারণ করতেন সেই হিসাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম "বিদগ্ধ মুখমণ্ডনম্"। ওরকম নামকরণের ফলে কাব্য অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। সে যাই হোক্, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার সামিল ছিল না, এবং তাঁদের বৈদগ্ধ্য যে তাঁদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল "বিট"। এই বিটের একটি ছবি আমরা

মৃচ্ছকটিকে দেখ্‌তে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাস-ভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখ্‌লে ও কথা শুনলে তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে হাত নিসপিস করে, অপরপক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশী যে, তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করে' ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায়—দু'দণ্ড আলাপ কর্‌বার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জ্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে। এ সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক্ অলঙ্কৃত করে। এবং এ সকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চ্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এ সকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ সে কালের সভ্যতা ছিল aristocratic, আর এ কালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে democratic. সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার,—আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখ্‌তেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখ্‌তে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপ ভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা কর্‌লে এ প্রভেদ সকলেরি চোখে ধরা পড়্‌বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমাণ্টিক, অর্থাৎ তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশী। এর কারণ, এ যুগের কবিরা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন মুখপাত্রও নন, সুতরাং সে কবির মন নিজের মন,—লৌকিক মনও নয়, সামাজিক

মনও নয়। আর সেকালের কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতেন। সেকালের সামাজিকেরা কলাবিৎ ছিলেন বলে, সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকারের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কি বল্‌লেন, তার চাইতে কি ভাবে বল্‌লেন তার মর্য্যাদা ঢের বেশী। সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিষ্টিক হয়েছে, এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। এই সব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চা একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কেননা তার গুণে ক্লাসিক সাহিত্য অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

কাব্যে আর্টের মূল্য যে কত বড়, সে আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হব না, কেননা সে আলোচনা দু' কথায় শেষ করবার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি এ যুগের ডিমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবত মনে মনে হিংসাও করে,—বোধহয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। অথচ ডিমোক্রাসির এ সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা materialism-এর দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চ্চা আবশ্যক।

(৬)

বই পড়ার সখটা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সখ হলেও, আমি কাউকে সখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ

কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে সৌখীন নই—দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক সখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের দেশে জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব, অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্ম্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ কর্‌তে আজ প্রস্তুত নই, কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা—কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ কর্‌তে পারিনে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনও সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন সাহিত্যচর্চ্চা যে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনও নগদ বাজারদর নেই। এই কারণেই ডিমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডিমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান কর্‌তে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উল্টো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও, ইংরাজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডিমোক্রাসীর গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক,—স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার সুফল

সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা Law-report কেননা, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেননা তাতে ব্যবসায় কোনও সুসার নেই। নজির বা আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে—সেত জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না—তার যে কোনও মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডর নয়, এ সত্য ত প্রত্যক্ষ কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য নয় যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের শূন্য, সে জাতির ভাণ্ডার ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়—কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম নীতি অনুরাগ বিরাগ আশা নৈরাশ্য, তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য—এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মন-গঙ্গার তোলা জল—তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে—কেনন বইপড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চ্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্ম্মের চর্চ্চা চাই কি মন্দিরে করা চলে, দর্শনের চর্চ্চা গুহায়, নীতির চর্চ্চা ঘরে, এবং

বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাদুঘরে;—কিন্তু সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চ্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না—চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এ সব কথা যদি সত্য হয়—তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয় এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাঁসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুলকলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চম্‌কে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বল্‌ছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সম-রেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথায় আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্যমিথ্যার বিচার আপনারা কর্‌বেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেঁকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য কর্‌বেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি—এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহিতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জ্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন—মনোরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত কর্‌তে পারেন, তার জ্ঞান-পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন—এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে, সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জ্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে কর্‌তে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর না পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক্। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন—যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও বস্তু পেটে

গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিল্‌তে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে সুরু করে—তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন—"আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখো, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক" ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলাকওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষাপদ্ধতিটাও ঐ একই ধরণের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে infantile liver-য়ে গতাসু হচ্ছে—তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিষ্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

(৭)

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক্, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে একবস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার কর্‌তে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসীদেশে শিক্ষা-পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers;

অর্থাৎ যারা পাস কর্‌তে পারে নি, কিম্বা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে, সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্ম্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কিরকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবুও আমি জোর করে বল্‌তে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুলকলেজে শিক্ষার যে রীতি চল্‌ছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাষ্টার মহাশয়েরা নোট দেন, এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলি উগ্‌লে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগ্‌লানো দর্শকের কাছে তামাসা হলেও—বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলা-গুলির এক কণাও জীর্ণ কর্‌তে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোটনামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলা-গুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গীরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক্, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে এতে জাতির প্রাণশক্তি

বাড়্ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক ; কেননা আমাদের স্কুলকলেজ ছেলেদের স্ব-শিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়—স্ব-শিক্ষিত হবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষা-যন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে—তার আপনার বল্‌তে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষা পদ্ধতিও যাদের মনকে জখম কর্‌লেও একেবারে বধ কর্‌তে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুলকলেজের উপরে স্থান দেই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ-চিত্তে স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ পায় ; প্রতি লোক তার স্বীয়শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্ত্তমানে আমাদের যে অপকার কর্‌ছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাঁসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয় ; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাঁসপাতাল।

(৮)

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, "বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষতঃ প্রাচীন নজির দেখাবার কি

প্রয়োজন ছিল ? বই পড়া যে ভাল, তা কে না মানে ?” আমার উত্তর—সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমান ধর্ম্মে মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত—এক যারা কেতাবি, আরেক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পূর্ব্বদলভুক্ত নয়, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে—অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চ্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্ত্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্ম্মার দলেই ফেলে দিই। অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্ত্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না ; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরি কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্ত্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে, জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জ্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার

অর্থ হচ্ছে জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনও নীতির অনুসারেই তা কর্ত্তব্য হতে পারে না,—অর্থনীতিরও নয় ধর্ম্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়,—আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই, সে নির্জ্জীব—একথা যেমন সত্য; যে নির্জ্জীব, তারও যে আনন্দ নেই—সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জ্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উল্টো টান যে আমাদের টান্‌তে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চ্চার স্বপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানি না। সম্ভবত হই নি; কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডিমোক্রাটিক যুগে aristocratic সভ্যতার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙ্গালীর আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে Athens যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান

অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে democratic এবং aristocratic; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে democratic, এবং মানসিক জীবনে aristocratic,—সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনও বিচ্ছেদ নেই, বরং দু'য়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্ম্মীর দল যেমন একদিকে বাংলায় ডিমোক্রাসী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর একদিকে আমাদেরও পক্ষে মনের aristocracy গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্য-কলার চর্চ্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে, কাব্য-কলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্য-চর্চ্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক—এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সাহিত্যের জাতরক্ষা।

——:০:——

ভৌগলিক সীমানা আর যেখানেই থাক্ না কেন, তিনটী রাজ্যে কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে, ও রসের রাজ্যে। আর এই চিন্তা, ভাব ও রস—এ তিনটী হচ্ছে সাহিত্যের সম্পত্তি। সুতরাং এ কথা বল্‌লে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, সাহিত্য-সাম্রাজ্যের এমন কোন একটা বাঁধা "ফ্রন্‌টিয়ার" নেই, যেটা কোন দিনই ভাঙা চল্‌বে না।

কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে, ওটা একটা ডাহা বাজে কথা ও মিছে কথা। আর সেইজন্যে এই অনেকের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের জাতরক্ষার একটা হুজুগ বর্ত্তমানে তুলেছেন। কারণ বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য নাকি কালাপানিফের্ত্তা—ম্লেচ্ছভাবাপন্ন। এ সাহিত্যের কোঁচার নীচে দিয়ে নাকি প্যাণ্টালুনের পা বেরিয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে—জামার ভিতর থেকে নাকি নেক্‌টাই কলার উঁচু হয়ে উঠেছে বোঝা যাচ্ছে। বাঙালী কবি নাকি এমন সব কবিতা লিখছেন, যা' বিদেশীরা কোনরকম ভাষ্যের সাহায্য না নিয়েই সোজাসুজি বিনি মেহনতে বুঝ্‌তে পারছেন। সুতরাং এ কথা ত মান্‌তেই হবে যে, বাঙালী কবির কাব্য বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য নয়—সেটা হচ্ছে বিদেশী সাহিত্য। অতএব বাঙালী জাতির মঙ্গলের জন্য তার

সাহিত্যের জাতরক্ষার একটা ব্যবস্থা হওয়া নিতান্তই দরকার। ভারতবর্ষের মাটির এম্‌নি গুণ!

আমরা যে-সময়টায় বেঁচে আছি, সে সময়ের বাংলা-সাহিত্য বল্‌লে প্রথমত ও প্রধানত রবীন্দ্রনাথকেই বোঝায়—এ কথাটা বল্‌লে অনেকের আরামের ব্যাঘাত ঘট্‌বে জানি, কিন্তু আশা করি এটা মিথ্যা প্রলাপ নয়। এই রবীন্দ্রনাথের রচনা নাকি সব বিদেশী; কারণ তাঁর লেখা নাকি অতি সহজে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তা ইংরাজিরই অনুবাদ। সেদিন আমার এক বাংলাভাষাভিজ্ঞ জাপানী বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা অতি সহজে জাপানীতে অনুবাদ করা যায়—সুতরাং তাঁর লেখা যে জাপানী-সাহিত্যের অন্তর্গত, তার কোন ভুল নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার এক তামিল বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, (ইনিও বেশ বাংলা জানেন) বঙ্কিমের নভেলগুলো জলের মতো তামিলে অনুবাদ করা যায়। সুতরাং বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্য রচনা করেন নি—তিনি সেবা করেছেন আসলে তামিল-সাহিত্যের। অতএব এটা স্পষ্ট যে, বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য বলে' কোন পদার্থই নেই। তার কিছুটা ইংরেজি, কিছুটা জাপানী, কিছুটা তামিল—আর বাকীটা হিন্দি, মারাঠি, ফার্‌সী, ফরাসী, ইটালিয়ান ও রাশিয়ান মিশিয়ে। মধুসূদন যে খাঁটী জার্ম্মাণ ভাষায় মেঘনাদ-বধ রচনা করেছেন, সেটা ত আমরা সবাই জানি। আশ্চর্য্য আমাদের সাহিত্যিকদের শক্তি ও আত্ম-ত্যাগ! এতদিন ধরে' তাঁরা কায়-মন-প্রাণে পরের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গেলেন। আর অপূর্ব্ব আমরা 'রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কলে' নব সংস্করণ—জেগে থেকেও তাঁদের এ প্রতারণাটা ধর্‌তে

পারলেম না! তাঁরা সম্পদ দিয়ে গেলেন পরকে, আর শ্রদ্ধা নিয়ে গেলেন আমাদের। যাহোক্, এতদিনে সৎ-সমালোচকের দৃষ্টির গুণে তাঁদের এ প্রবঞ্চনাটা আজ ধরা পড়ে গেল—মন্দের ভাল! তাই আমরা আজ আমাদের সাহিত্যের জাতরক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হয়েছি—ভারতবর্ষের সনাতন মাটির এমনি গুণ! এখানে কিছুই নতুন হবার জোটি নেই!

কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, ভারতবর্ষের মাটী যতটা স্থিতিশীল, ভারতবাসীর মনটা ততটা নয়। আর যে জিনিসটা সাহিত্যিক গড়ে' তোলে, সেটা দেশের মাটি নয়—দশের মন। আর এই মন জিনিসটা গতিশীল। কিন্তু সে গতি নিরেট পাকা সড়কের মতো নয়—সেটা হচ্ছে তরল উজ্জ্বল স্রোতস্বিনীর মতো—কাজেই এ গতিতে ভাঙাগড়া আছে—আর যেখানে ভাঙাগড়া আছে সেখানেই পরিবর্ত্তন আছে—এক রূপ থেকে আর এক রূপে, এক ভাব থেকে আর এক ভাবে, এক সুর থেকে আর এক সুরে। আর যেহেতু সাহিত্য জিনিসটা জাতীয় মনের দর্পণস্বরূপ, সেজন্যে সেখানে যে যুগে যুগে জাতীয় মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব পড়বে, সেটা লজিকের পাতা না উল্‌টিয়েও বলা যায়; কেননা মনকে ফাঁকি দিয়ে আর যাই করা যাক—কাব্যও লেখা যায় না, সাহিত্যও গড়া যায় না।

সুতরাং দাঁড়াল এই যে, আমাদের সাহিত্যকে যদি একটা বিশিষ্ট ভাব বিশিষ্ট রূপ বিশিষ্ট সুরের মাঝে আবদ্ধ রাখতে চাই, তবে আমাদের জাতীয় মনটাকে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। সে মনে যেন নব নব ভাব, নব নব সুর, নব নব চিন্তা না জাগে; নবীন প্রাণের নব অনুরাগকে আমাদের অবজ্ঞার ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে শিখতে

হবে—নইলে আমাদের প্রাণ যে আমাদের মনকে ভুলিয়ে নিয়ে কোন্ পথে ছুট্‌বে তার বিন্দুমাত্র ঠিক নেই। আর প্রাণ ছাড়া মন নেই—যদি ও বা থাকে, সে মন জীবন্ত সাহিত্য গড়তে পারে না। কারণ সাহিত্যিকের প্রাণ দিয়েই তার সাহিত্য প্রাণবান্—মন জোগায় শুধু তার দেহ।

সুতরাং আমাদের পুরাতন সাহিত্যকে সনাতন করে' তুল্‌তে চাইলে প্রথমত আমাদের জাতীয় প্রাণটাকে নষ্ট করে' আমাদের সাহিত্যিক-দের প্রাণ-মরা হ'তে হবে। সাহিত্যিকরা প্রাণ-মরা হ'লে তাদের চারপাশে "সনাতন জড়তার" দেয়াল এক রাত্তিরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়াবে। আর সেই "সনাতন জড়তার" দেয়ালের মধ্যে সাহিত্যই বল আর যাই বল, সব সনাতন হ'য়ে উঠ্‌বে আপনাআপনি—তার জন্যে আর কাউকেই কিছু কর্‌তে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ মানুষের ভিতরে একটুও প্রাণ আছে, ততক্ষণ তা হবার উপায় নেই। প্রাণের একটা মহৎ দোষ এই যে, সে চল্‌তে চায়; কারণ এই চলাই তার সত্য—আর সেই জন্যে এই চলার মধ্য দিয়ে সে চারিদিকে আনন্দের বান ডাকিয়ে যায়। আর মানুষের যা কিছু সত্য সৃষ্টি—তার সাহিত্যিক জীবনেই হোক্ বা তার কর্ম্ম-জীবনেই হোক্, তার জন্ম এই আনন্দের মধ্যে। প্রাণের এম্‌নি একটা মহৎ দোষ আছে বলেই আমাদের দেশের যোগী ঋষিরা—অবশ্য "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগের"—প্রাণের উপরে এমন খড়্গহস্ত। তাঁরা প্রাণকে কায়দা করবার কত কত উপায় বের করেছেন; কারণ প্রাণ যতদিন আছে ততদিন নির্ব্বাণ নেই। কেননা প্রাণকে না মার্‌তে পার্‌লে জগৎটা নিরানন্দ হ'য়ে ওঠে না। আর জগৎটা নিরানন্দ হ'য়ে না উঠলে নির্ব্বাণেরও কোন মূল্য থাকে না।

কিন্তু প্রাণকে কৈবল্য পাইয়ে দেবার পথে একটি মস্ত বাধা সৃষ্টি করে' রেখেছেন স্বয়ং ভগবান। সেটি হচ্ছে জীবজগতের আত্মরক্ষার দুর্বার ইচ্ছা—instinct. এখন আমরা পুরাতনকে সনাতন করে' রাখতে পারব কি না, তা নির্ভর করবে মানুষের এই আত্মরক্ষার instinct এবং সাহিত্যের জাতরক্ষা অভিলাষী সমালোচকের বুদ্ধিবিচার—এ দুয়ের মধ্যে কে জয়ী হবে, তার উপরে। এ দু'য়ের মধ্যে যে সংগ্রাম—সে সংগ্রামের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ভয় নেই। প্রাণের জোরে বুদ্ধিকে একদিন উদার হ'য়ে উঠতেই হবে। তখন সে বুঝবে যে একটা জাতির প্রতিভা যে সাহিত্য গড়ে' তোলে, তাই তার জাতীয় সাহিত্য। নইলে শেক্সপীয়র শেলী ও 'শ' তিন জনের রচনাই ইংরেজী-সাহিত্য বলে' গ্রাহ্য হ'ত না। কারণ এঁদের তিন জনের মধ্যে যেটুকু মিল আছে সেটুকু হচ্ছে এই যে, তিন জনের রচনাই ইংরেজি ভাষায় লেখা। এ ছাড়া আর যদি কিছু মিল থাকে তবে বুদ্ধির চোখে দূরবীণ লাগিয়েও সে মিলটা ধরা যায় কি না সন্দেহ।

(২)

আসল কথা হচ্ছে এই যে, কোন জাতিরই জাতীয় সাহিত্যের জাত বলে' কোন বস্তু নেই, সুতরাং তা' রক্ষা করবারও কোন সমস্যা নেই। একটা জাতি যতদিন ধরে' বেঁচে থাকে, ততদিন ধরে' তার সাহিত্যই রচিত হ'তে হ'তে চলে। যুগে যুগে একটা জাতির মনের কথা প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের সুখ দুঃখ আবেগ আকাঙ্খার পরিবর্ত্তন নানা নৈসর্গিক ও

অনৈসর্গিক কারণে হ'তে হ'তে চলেছে—আর তার সাহিত্যে তারই ছাপ পড়্‌ছে। সুতরাং একটা জাতীর জীবনে বিশেষ কোন সন তারিখ পর্য্যন্ত দাগ দিয়ে বলা চলে না যে সেই পর্য্যন্ত তার সাহিত্য জাতীয়, তার পর যা'—তা' পরদেশী। "জাতীয় সাহিত্য" সম্বন্ধে আসল প্রশ্ন সেটা—"জাতীয় কি না?" তা নয়—কিন্তু—"সাহিত্য কি না?"—তাই। কারণ সব পদ্যই যেমন কাব্য নয়, তেমনি সব লেখাই সাহিত্য নয়। সুতরাং আজ আমাদের প্রশ্ন এ নয় যে, "আমাদের সাহিত্য জাত রক্ষা করে' চলেছে কি না?"—আমাদের প্রশ্ন এই যে "আমাদের জাতি সাহিত্য রচনা করে' চলেছে কি না?"

কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সাহিত্য কোন্ সন পর্য্যন্ত জাতীয়, তার একটা হিসেব নিকেশ এর মধ্যেই করে' ফেলেছেন। তাঁরা বল্‌তে সুরু করেছেন, যে বাংলা ভাষায় ফুল ফল আকাশ বাতাস চাঁদ চকোর দিয়ে যদি কোন কাব্য রচনা হয়, তবে সেটা হবে নিতান্ত বিদেশী; এবং বাঙ্গালী কবি যদি অনন্তের দিকে মুখ করে' বসে থাকেন, তবে তাঁর কাব্যে জাতীয়তার প্রাণান্ত হবে—কারণ অনন্তের আলো আর দিগন্তের বাতাসটা নাকি বাংলা ভাষার প্রাণে সয় না। অর্থাৎ এঁরা বল্‌তে চান যে, মানুষের মুখের ভাষা তার প্রাণের আশার চাইতে বড়—যেমন অনেকে বলে থাকেন যে মনুসংহিতার মূল মানুষের জীবনের গতি-ভঙ্গিমার চাইতে সত্য। আসল কথা হচ্ছে এই যে, অনন্তের আলো ও দিগন্তের বাতাস বাঙ্গালী কবির অন্তরে তার মোহিনী রূপ ফেলেছে কিনা—তা যদি ফেলে থাকে তবে বাংলা ভাষায় তা মোহন হ'য়ে ফুট্‌বেই। কারণ ভাষা মানুষের—মানুষ ভাষার নয়। মানুষই ভাষার জন্ম দিয়েছে আপনার আত্মার শক্তিতে—মানুষই শব্দে অর্থ দিয়েছে

আপনার তপঃ প্রভাবে—মানুষই অর্থকে মন্ত্রে পরিণত করেছে আপনার উগ্র তপস্যায়। ভাষা মানুষের জন্ম দেয় নি—তার প্রাণেরও না, মনেরও না, হৃদয়েরও না।

এই কথাটা আমাদের আজ ভাল করে বুঝতে হবে যে, যে-কোন যুগের চাইতে অনন্তকাল অনেক বড়—আর সে অনন্ত কালে মানুষের জীবনে কতরকম সম্ভব অসম্ভব ঘট্‌তে পারে তার পরিমাণ কেউ দিতে পারে না—তার অনুমান কেউ কর্‌তে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, যে কোন জাতি, যে-কোন সমাজ, যে-কোন নেশানের চাইতে প্রত্যেক মানুষ অনেক বড়—নইলে জার্ম্মাণীর ষ্টেট আইডিয়া হত সমাজ-সমস্যার শেষ ও শ্রেষ্ঠ মীমাংসা। আবার যে-কোন মানুষের চাইতে প্রত্যেক কবি বড়—নইলে এ পৃথিবীতে সবার চাইতে তাজ্জব ব্যাপার হত—ইংলিশ নেশানের মতো একটা নেশানের পক্ষে শেক্সপীয়রকে জন্ম দেওয়া। সুতরাং যে-কোন কবির চারপাশে তার জাতীয়তার দোহাই দিয়ে গণ্ডি টান্‌লে, সেই কবিকেই আমরা ছোট করব—তার জাতিকে বড় করতে পারব না।

কিন্তু সাহিত্যে জাত বাঁচিয়ে চলার দল আজ এই বলে' আব্দার ধরেছেন যে, আমাদের যদি কাব্য লিখতে হয়, তবে সেকাব্য লিখতে হবে বৃন্দাবনের,—তা সে জিওগ্রাফির বৃন্দাবনই হোক, বা হৃদ্-বৃন্দাবনই হোক; আমাদের যদি গান বাঁধতে হয়, তবে সে-গান হওয়া চাই রাধাকৃষ্ণের—তা সে রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিকই হোক্ বা আধ্যাত্মিকই হোক্; যদি নাটক লিখতে হয় ত শ্রীরাধার মানভঞ্জন—বড় জোর সুভদ্রাহরণ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণই বাঙ্গালী কবির অন্তরে চিরটা কাল সত্য হয়ে থাক্‌বে সৃষ্টির কোন্ নিয়মানুসারে, সেটা অবশ্য আমাদের

এ পর্য্যন্ত এঁরা বাংলিয়ে দেন নি। আর রাধাকৃষ্ণ চিরটা কাল যে কেন নায়কনায়িকার স্থান মৌরসি পাট্টা করে বসে থাকবেন, তাও বোঝা যায় না—অবশ্য একটা কারণ ছাড়া। সেটা হচ্ছে এই যে, এঁরা দু'জনেই পুরাতন। আর পুরাতনের প্রতি সনাতন মনের টান চিরকালই দেখা যায়। কিন্তু মানুষ নিজে একদিন যা' তৈরি করেছে, তা' দিয়ে আর একদিন তাকেই আবদ্ধ কর্‌তে চাওয়ার মতো মূর্খতা মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

যাহোক্, এঁদের এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কথা বল্‌তেই হবে, নইলে আমরাও হব সেই চীনেম্যানের সামিল—যে বলেছিল যে তার মাথাটা আর চীনে-মাথা নেই, সেটা হয়ে গেছে বিদেশী মাথা—কেননা সেমাথা থেকে টিকি কেটে ফেলা হয়েছে। চীনেম্যানের বুদ্ধি তাকে বোঝবার অবসর দেয় নি যে, তার মাথার ওপরেই চীনে-টিকি গজিয়েছিল—তার টিকির আগায় চীনে-মাথা গজায় নি।

(৩)

কোন মানুষ দুইমুহূর্ত্ত এক লোক নয়। দু'মুহূর্ত্ত এক হলেও দু'দিন এক নয়—দু'দিন এক হলেও দু'বছর এক নয়। তার দেহের ত কথাই নেই—সেটা আমাদের চর্ম্মচক্ষেই ধরা পড়ে—কিন্তু তার অন্তরও পলে পলে তিলে তিলে নূতন হ'য়ে উঠ্‌ছে—নব নব কল্পনা—নব নব আশা আকাঙ্খা দিয়ে—নব নব বেদনার মধ্যে দিয়ে। কেননা মানুষের জীবনের রাগ এক নয়—সহস্র। মানুষের অন্তর-দেবতার জীবন-পথে অভিযান হয় সহস্র রাগিণীতে বাঁশী বাজিয়ে—সহস্র

রঙের নিশান উড়িয়ে, এর সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্য বোধহয় প্রমাণের দরকার নেই। কারণ এ সব আমাদের দেখা কথা—অর্থাৎ Facts. এ সত্ত্বেও যদি কেউ উপরের কথায় আপত্তি তোলেন, তবে এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, তিনি নিতান্তই একজন তার্কিক—আর কিছু নন্।

মানুষের সম্বন্ধে এই কথাটা যেমন সত্য, একটা জাতি বা সমাজের পক্ষেও এটা ঠিক তেমনি সত্য। এই যে আমরা বাঙালী জাতি—আমরা আর্য্য না অনার্য্য, মঙ্গোল না দ্রাবিড়—না সবগুলো মিশিয়ে একটা কিছু—সে সম্বন্ধে কোন থিওরি খাড়া করবার অধিকার আছে মাত্র এক নৃ-তত্ত্ববিদের। কিন্তু এমন যদি ব্রাহ্মণ আজ বাংলাদেশে থাকেন, যিনি বুক ঠুকে সাহস করে' বল্‌তে পারেন যে, তাঁর ধমনীর প্রত্যেক বিন্দু শোণিত আর্য্য-শোণিত—তবে সেই বাঙালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সেকালের আর্য্য ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গের যে মিলটা পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁরা দু'জনেই মানুষ। কিন্তু যেহেতু মানুষ গরু গাধা নয়, সেই জন্যে আজকার এই মানুষ আর সে দিনের সেই মানুষের মধ্যে ভিতরের দিকটায় একটা প্রকাণ্ড অমিল দাঁড়িয়ে গেছে—সে এম্‌নি অমিল যে এদের এক জনের কথা আর এক জনের বুঝতে হলে একছত্র কথার পঞ্চাশ পত্র টীকা না হ'লে চলে না। পাঁচ ছ'শ বছর আগেকার বাঙালী আর আজকের বাঙালী এক নয়। পাঁচ ছ'শ বছর আগের বাঙালী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির জন্ম দিয়েছে। আর আজকের আমরা যে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি নই, তা সাময়িক পত্রিকার কোন কোন কবিতাতে স্পষ্ট করে' লেখা থাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যাঁর চোখ আছে তিনিই সেটা পড়তে পারেন। এখন

এই যে একটা মানুষের বা সমাজের বা জাতির পরিবর্ত্তন—তা কেন হয়, বা কেমন করে' হয়, এ প্রবন্ধে সেটা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রবন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এ-পরিবর্ত্তন ঘটে—এ সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেই।

নদীর মুখ বন্ধ হয়ে গেলে তার স্রোতহীন জল শৈবালদলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন আর সেখানে কল কল ছল ছল তান ওঠে না,—ওঠে শুধু মণ্ডুককুলের ঐক্যতান সঙ্গীত। এতো গেল নদীর কথা। তেমনি মানুষের জীবনের যে-কোন রসকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌লে তা কিছু-দিনের মধ্যেই হয়ে ওঠে তাড়ি। আর সে তাড়ি পান করে' মানুষে যে লীলাখেলা করে, তা' আর যাই হোক্ আধ্যাত্মিক মোটেই নয়। সুতরাং কোন এক যুগের মানুষের অনুভূত কোন এক বিশেষ রসকে সনাতন করে তোলায় মানুষের বিপদ আছে। তাই এমন যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সে বৈষ্ণবধর্ম্মের রসতত্ত্বও মেতে গিয়ে, হয়ে দাঁড়াল আদিরস। আর এই আদিরসের রঙে রঙীন্ হয়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে ছবি ফুটে উঠ্‌ল, তার রস হাস্যও নয় করুণও নয়—তার রস বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোন বিশেষ অনুভূতিকে মানুষের পক্ষে সনাতন করে তুলতে কেউ-ই পারেন না—কারণ তা সনাতন করে তুল্‌তে পারার অর্থ ভগবানের এ সৃষ্টি-লীলার অবসান। তাই স্বয়ং বুদ্ধদেব তা পারেন নি—স্বয়ং খৃষ্টদেবও কৃতকার্য্য হন নি। প্রমাণ—এই দুই মহা পুরুষের আজকালকার শিষ্যেরা।

সুতরাং যখন মানুষের, সমাজের, জাতির পরিবর্ত্তন হচ্ছে—মানুষের জীবন-দেবতার লীলা-বিলাসের পরিবর্ত্তন হচ্ছে—যুগে যুগে তার অন্তরে নব নব আকর্ষণ সত্য হয়ে উঠে আনন্দের ডাক তাকে

নব নব পথে আহ্বান কর্‌ছে—তখন তারই রচিত সাহিত্যে একই রকমের রস, একই রকমের সুর, একই রকমের ভঙ্গী চিরন্তন করে রাখবার চেষ্টাটা যে কেবল বিজ্ঞান-সম্মতই নয় তা নয়—সেটা সহজ জ্ঞানসম্মতও নয়। বর্ত্তমানের মানুষকে অস্বীকার করে যদি আমরা তার অতীতকেই বড় করে তুলি, তবে সামাজিক জীবনে যেমন আমাদের মিলেছে ভণ্ডামি—তেমনি সাহিত্যিক বা কবির কাছ থেকে আমাদের যা' মিলবে সে হচ্ছে রসহীন ছোব্‌ড়া, আর কিছু নয়—বড় জোর শক্তিশালী যাঁরা তাঁদের হাতে গড়ে উঠবে চাকচিক্য-ময় প্রাণহীন প্রতিমা। কারণ মিথ্যা যেখানে, সেখানে মানুষ আনন্দ পেতে পারে না—আর যেখানে সে নিজে আনন্দ পায় না, সেখানে সে অপরকে আনন্দ দিতে কিছুতেই পারে না—মরে গেলেও নয়। সুতরাং আজ যাঁরা বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আদর্শ করে তুলে, মনে করছেন যে তাঁরা বাঙালী জাতিকে একটা মহত্ত্বের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাংলার সাহিত্যিকদের একটা মস্ত মিথ্যা পথই দেখিয়ে দিচ্ছেন। এঁদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, যেটা চলে আস্‌ছে সেটাই যদি চিরকাল চলে আসে, তবে আজ যেটা চলে আস্‌ছে সেটাও চলে আসতে পারত না।

(৪)

এই সব কথা মনে করেই আমরা বাংলার নবীন ও তরুণ যাঁরা তাঁদের আজ এই একটা সাবধানের ইঙ্গিত করা কর্ত্তব্য বলে মনে করছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বীণাপাণির মন্দিরে আপনার জীবনের

সত্য খুঁজে পেয়েছেন—বীণাপাণির বীণার তানে যাঁদের মন মজেছে—তাঁরা যেন সে বীণাপাণির মন্দিরে প্রবেশ করেন—আপনার জীবন-দেবতার সত্য অর্ঘ্য নিয়ে, কোন অতীতকে নিয়ে নয়—তা সে অতীত যত বড়ই হোক, যত মহানই হোক, যত লোভনীয়ই হোক। সাহিত্যিক জীবনে সফলতা লাভের একই পন্থা—আপনার অন্তরের সত্য। সাহিত্যিকের আপনার জীবনের সত্যের মধ্যেই সেই ফুলগুলি ফুটে ওঠে—যে ফুল দিয়ে বীণাপাণি নিভৃতে বসে তার জন্যে বিজয়মাল্য রচনা করেন। এ পথের পথিকের আর কোন পন্থা নেই। শুধু এ পথেরই বা বলি কেন—কোন পথের পথিকেরই অন্য পন্থা নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

আজ বাংলার মানুষকে আহ্বান করে' আমরা বল্‌ছি যে, তাঁরা যেন বাঙালীর মিথ্যা জাতীয়তার নামে আপনার ভিতরের মানুষকে খাটো না করেন। তাঁরা যেন না ভোলেন যে, বাহিরের জগতে আমরা বাঙালী কিন্তু মনের জগতে আমরা মানুষ। সামাজিক জীবনে ত মানুষ আপনার চারদিকে গণ্ডী টান্‌তে বাধ্য—নইলে সংসার চলে না। কিন্তু মনের জগতে তার অসীম স্বাধীনতা। মনের জগতের এই স্বাধীনতার সংকোচ যেন তাঁরা কোন দিনই না ঘটান। দেশভেদে, জাতিভেদে, আচারভেদে, বর্ণভেদে, ধর্ম্মভেদেও মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই—কিন্তু আমরা এই মনের জগত চিরকাল উন্মুক্ত রেখে যেন আশা কর্‌তে পারি যে বাহিরের সহস্র অমিল সত্ত্বেও বিশ্ববাসীর একদিন এখানে মিলন হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ছোট গল্প।

-ঃ*ঃ

আমরা পাঁচজনে মিলে, এই যুদ্ধ নিয়ে বাক্-যুদ্ধ কর্‌ছিলুম। সুপ্রসন্ন হঠাৎ তর্কে ক্ষান্ত দিয়ে, একখানি বাঙলা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। আমরা তাঁর পড়ায় বাধা দিলুম না। আমরা জানতুম যে তাঁর সঙ্গে কারও মতের মিল হচ্ছে না বলে, তিনি বিরক্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে ফের আলোচনার ভিতর টেনে আন্‌তে গেলে, তিনি মহা চটে যেতেন। আমি বরাবর লক্ষ্য করে আস্‌ছি যে, এই যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে গেলেই নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির অন্তরেও বীররসের সঞ্চার হয়, শেষটা তর্ক একটা মারামারি ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং আমি কথাটা উল্টে নেবার মনে মনে একটা সদুপায় খুঁজ্‌ছি, এমন সময় সুপ্রসন্ন হঠাৎ আবার বইখানা টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে, বলে উঠ্‌লেন—Nonsense.

কথাটা এত চেঁচিয়ে বল্‌লেন, যে তাতে আমরা সকলেই একটু চম্‌কে উঠলুম।

আমি বল্লুম "কি nonsense হে" ? সুপ্রসন্ন বল্‌লেন—

—"তোমাদের এই বাঙলা বইয়ে যা লেখা হয় তাই। সাধে ভদ্রলোকে বাঙলা পড়ে না। এই বইখানা খুলেই দেখি লেখক বল্‌ছেন, ছোট গল্প প্রথমত ছোট হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই। কি চমৎকার definition। এর পরেও লোকে বলে বাঙালীর শরীরে লজিক নেই!"

অনুকুল এই শুনে একটু হেসে উত্তর করলেন,—

—"ওহে অত চটো কেন ? দেখ্‌ছ না লেখক নিজের নাম রেখেছেন 'বীরবল'। ঐ থেকেই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে ও হচ্ছে রসিকতা।"

—"তোমরা যাকে বলো রসিকতা আমি তাকেই বলি nonsense. একটা জোড়া কথাকে ভেঙ্গে বলায় মানুষে যে কি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

এ শুনে প্রশান্ত আর চুপ করে থাক্‌তে পারলেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে বল্‌লেন,—

—"তোমার বুদ্ধির অগম্য হলেই যে তা' আর সকলের বুদ্ধির অগম্য হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বীরবলের ও কথা nonsenseও নয় রসিকতাও নয়—ষোল আনা সাচ্চা কথা।"

যে যা, বল্‌ত প্রশান্ত তার প্রতিবাদ কর্‌ত; এই ছিল তার চিরকেলে স্বভাব। সুতরাং সে সুপ্রসন্ন ও অনুকুল দু'জনের দ্বিমতকে এক বাণে বিদ্ধ করায়, আমরা মোটেই আশ্চর্য্য হলুম না। বরং নিজের মতকে সে কি করে' প্রতিষ্ঠা করে তাই শোনবার আগ্রহ, আমার মনে জেগে উঠ্‌ল। তর্কের মুখে প্রশান্ত অনেক নতুন কথা বল্‌ত। তাই আমি বল্লুম—

—"দেখো প্রশান্ত, রসিকতাকে যে সত্য কথা মনে করে রসজ্ঞান তারও নেই।"

পিঠ পিঠ জবাব এলো—

—"সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে সত্যজ্ঞান তারও নেই।"

—"মানলুম। তারপর ওর সত্যিটি কোনখানে বুঝিয়ে দাও ত হে ?"

—"বীরবলের কথাটা একবার উল্টে নেওয়া যাক্। তাহলে দাঁড়ায় এই যে—"ছোট গল্প হচ্ছে সেই পদার্থ, যা প্রথমত ছোট নয়, দ্বিতীয়ত গল্প নয়। তা যদি হয় ত, Kant-এর শুদ্ধ বুদ্ধির সুবিচারও ছোট গল্প।"

এ কথা শুনে আমরা অবশ্য হেসে উঠলুম, কিন্তু সুপ্রসন্ন আরও অপ্রসন্ন হয়ে বল্‌লেন—"তোমার যে রকম বুদ্ধি তাতে তোমার বাঙলা লেখক হওয়া উচিত। Nonsense-কে উল্টে নিলেই যে তা Sense হয় এ তত্ত্ব কোন্ লজিকে পেয়েছ, গ্রীক না জার্ম্মাণ? ছোট শব্দের নিজের কোনও অর্থ নেই, ও হচ্ছে একটা আপেক্ষিক শব্দ, অন্য কিছুর সঙ্গে মেপে না নিলে ওর মানে পাওয়া যায় না।"

—"তা'হলে War and Peace-এর চেহারা চোখের সুমুখে রাখ্‌লে Anna Karenina-কে ছোট গল্প বল্‌তে হবে। আর রাজসিংহের পাশে বসিয়ে দিলেই বিষবৃক্ষ ছোট গল্প হয়ে যাবে। একই কথার যে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা মানে হয়, এইটে ভুলে গেলেই মানুষের মাথা ঘুলিয়ে যায়। গণিতে "ছোট" শব্দ relative ও লজিকে Correlative; কিন্তু সাহিত্যে তা positive."

—"তাহলে তোমার মতে ছোট গল্পের ঠিক মাপটা কি?"

—"এক ফর্ম্মা। যার দেহ এক ফর্ম্মায় আঁটে না, তা বড় গল্প না হতে পারে কিন্তু তা ছোট গল্প নয়।"

—"তোমার কথা গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা হচ্ছে এই, যে ফর্ম্মাও সব এক মাপের নয়। ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোল-পেজি আছে।"

—"ছন্দও আট মাত্রার, বারো মাত্রার, ষোল মাত্রার হয়ে থাকে, অতএব যদি বলা যায় যে পদ্য ছন্দের সীমানা টপ্‌কে গেলে, তা গদ্য না হতে পারে কিন্তু তা পদ্য হয় না, তাহলে সে কথাও তোমাদের কাছে গ্রাহ্য নয়।"

সুপ্রসন্ন তর্কের এ পেঁচের কাটান হাতের গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে বল্লেন—

—"আচ্ছা তা যেন হল। গল্প, গল্প হওয়া উচিত এ কথা বলে বীরবল কি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন? আমরা জান্‌তে চাই গল্প কাকে বলে?"

প্রশান্ত অতি প্রশান্ত ভাবে উত্তর করলেন—

—"গল্প হচ্ছে সেই জিনিস যা আমরা কর্‌তে জানি নে।"

—"শুন্‌তে ত জানি?"

—"সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তোমরা ভালবাসো শুধু বর্ণনা আর বক্তৃতা, যার ভিতর গল্প ফোটা দূরে যাক্‌ শুধু চাপা পড়ে যায়। বড় গল্পের তোড়া বাঁধতে হলে হয়ত তার ভিতর দেদার পাতা পূরে দিতে হয়। কিন্তু ছোট গল্প হওয়া উচিত ঠিক একটি ফুলের মত, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভিতর স্থান নেই।"

—"দেখো প্রশান্ত, উপমা যুক্তি নয়। যারা উপমা দিয়ে কথা বলে, তাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুর কোনও জ্ঞানলাভ করি নে, লাভ করি শুধু উপমারই জ্ঞান। তোমার ঐ ফুল পাতা রাখো, এখন বল দেখি, ছোট গল্পের প্রাণ কি?"

—"ট্রাজেডি।"

—"কেন কমেডি নয় কেন?"

—"এই কারণে, যে ট্রাজেডি অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে যায়—যথা, খুন জখম মৃত্যু ইত্যাদি, আর কমেডির অভিনয় ত সারা জীবন ধরেই হচ্ছে।"

অনুকুল এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বল্‌লেন—

—"আমার মত ঠিক উল্টো। জীবনের অধিকাংশ মুহূর্ত্তই হচ্ছে কমিক। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত গুলোকেই এক সঙ্গে ঠিক দিলে তবে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা আগাগোড়া ট্রাজিক। পৃথিবীতে যা ছোট তাই কমিক আর যা বড় তাই ট্রাজিক।"

"জীবনটা ট্রাজিক কি কমিক এ তর্ক উঠলে যে প্রথমে তা কমিক হবে আর শেষটা ট্রাজিক হতেও পারে এ কথা আমি জানতুম। তারপর ঐ ত হচ্ছে সকল দর্শনের আসল সমস্যা। আর কোনও দর্শনই অদ্যাবধি যখন তার মীমাংসা করতে পারে নি তখন আমরা যে হাত হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব, সে ভরসাও আমার ছিল না। আলোচনা, যুদ্ধ থেকে গল্পে এসে পড়ায় একটু হাঁপছেড়ে বেঁচে-ছিলুম, তাই দর্শনের একটা ঘোরতর তর্ক হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি এই বলে উভয় পক্ষের আপোষ মীমাংসা করে দিলুম যে—'ট্রাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ'। প্রফেসার এতক্ষণ আমাদের তর্কে যোগ দেন নি; নীরবে একমনে আমাদের কথা শুনছিলেন। অতঃপর তিনি ঈষৎ হাস্য করে বল্‌লেন—

—"প্রশান্তর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ছোট গল্প আমারই লেখা উচিত, কেননা আমার মুখে গল্প ছোট হতে বাধ্য। আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই, আর বক্তৃতা করবার প্রবৃত্তি নেই। এই ত গেল প্রথম কথা। তারপর জীবনটাকে আমি ট্রাজেডিও মনে করি নে, কমেডিও মনে করি নে; কারণ আমার মতে সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও

দুই। ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখন আমার নিজের জীবনের একটী ঘটনা বল্‌তে যাচ্ছি। তোমরা দেখো প্রথমে তা ছোট হয় কি না, আর দ্বিতীয়ত তা গল্প হয় কি না। এই-টুকু ভরসা আমি দিতে পারি যে, তা ছাপ্‌লে আট পেজের কম হবে না, ষোলো পেজেরও বেশি হবে না—বারো পেজের কাছ ঘেঁসেই থাক্‌বে। তবে তা এক 'সবুজ পত্র' ছাড়া আর কোন কাগজ ছাপ্‌তে রাজি হবে কি না, বল্‌তে পারি নে। কেননা তার গায়ে ভাষার কোনও পোষাক থাক্‌বে না। ভাষা জিনিসটে যদি আমার ঠোঁটের গোড়ায় থাক্‌ত তাহলে আমি আঁকও কষ্‌তুম না, গল্পও লিখ্‌তুম না, ওকালতি কর্‌তুম। আর তাহলে আমার টাকারও এত টানাটানি হত না। সে যাহোক এখন গল্প শোনো।"

প্রফেসারের কথা।

আমি যে বছর B. Sc. পাশ করি সেই বছর পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে জ্বরে পড়ি। সে জ্বর আর দু'তিন মাসের মধ্যে গা থেকে বেমালুম ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লুম না। দেখলুম, চণ্ডীদাসের অন্তরের পীরিতি বেয়াধির মত, আমার গায়ের জ্বর শুধু "থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে জ্বালার নাহিক ওর।" শেষটা স্থির করলুম চেঞ্জে যাব। কোথায়, জানো?—উত্তরবঙ্গে! ম্যালেরিয়ার পিঠস্থানে। এর কারণ তখন বাবা সেখানে ছিলেন, এবং ভাল হাওয়ার চাইতে ভাল খাওয়ার উপর আমার বেশি ভরসা ছিল। এ বিশ্বাস আমার পৈতৃক। বাবার জীবনের প্রধান সখ ছিল আহার। তিনি ওষুধে বিশ্বাস করতেন

কিন্তু পথ্যে বিশ্বাস কর্‌তেন না, সুতরাং বাবার আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত মনে করলুম। জানতুম তাঁর আশ্রয়ে জ্বর বিষম হলেও সাবু খেতে হবে না।

একদিন রাত দুপুরে রাণাঘাট থেকে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলুম। মেল ছেড়ে প্যাসেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল। একে ডিসেম্বার মাস তার উপর আমার শরীর অসুস্থ তাই এক পাল অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে অতটা পথ যাবার প্রবৃত্তি হ'ল না। জানতুম যে প্যাসেঞ্জারে গেলে সম্ভবত একটা পূরো সেকেণ্ড ক্লাস কমপার্টমেণ্ট আমার একার ভোগেই আস্‌বে। আর তাও যদি না হয় ত গাড়ীতে যে লম্বা হয়ে সুতে পার্‌ব, আর কোনও গার্ড ড্রাইভার গোছের ইংরেজের সঙ্গে একত্র যে যেতে হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলুম। এর একটা আশা ফলেছিল, আর একটা ফলে নি। আমি লম্বা হয়ে শুতে পেরেছিলুম কিন্তু ঘুমতে পাই নি। গাড়ীতে একটা বুড়ো সাহেব ছিল, সে রাত চারটে পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ হোঁস ছিল, ততক্ষণ শুধু মদ চালালে। তার দেহের গড়নটা নিতান্ত অদ্ভুত, কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত ঠিক বোতলের মত। মদ খেয়েই তার শরীরটা বোতলের মত হয়েছে, কিম্বা তার শরীরটা বোতলের মত বলে মদ সে খায়, এ সমস্যার মীমাংসা আমি কর্‌তে পারলুম না। যারা দেহের গঠন ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নির্ণয় করে, এ Problem-টা তাদের জন্য, অর্থাৎ ফিজিওলজিষ্টদের জন্য রেখে দিলুম। যাক্ এ সব কথা। আমার সঙ্গে বৃদ্ধটি কোনরূপ অভদ্রতা করে নি, বরং দেখবামাত্রই আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে, সে ভদ্রলোক এতটা মাখামাখি করবার চেষ্টা করেছিল, যে আমি জেগে থেকেও ঘুমিয়ে পড়বার ভাণ করলুম। মাতাল আমি

পূর্ব্বে কখনও এত হাতের গোড়ায়, আর এতক্ষণ ধরে দেখি নি, সুতরাং এই তার খাঁটি নমুনা কি না বল্‌তে পারি নে। সে ভদ্রলোক পালায় পালায় হাস্‌ছিল ও কাঁদছিল। হাস্‌ছিল—বিড় বিড় করে কি বকে, আর কাঁদ্‌ছিল, পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর গুণ কীর্ত্তণ করে। সে যাত্রা গাড়ীতে প্রথমেই মানব-জীবনের এই ট্রাজি-কমেডির পরিচয় লাভ করলুম। আমার পক্ষে এই মাত্‌লামির অভিনয়টা কিন্তু ঠিক কমেডি বলে' বোধ হয় নি। দুর্ব্বল শরীরে শীতের রাত্তিরে রাত্রি-জাগরণটা ঠাট্টার কথা নয়, বিশেষত সে জাগরণের অংশীদার যখন এমন লোক যার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মদের গন্ধ অবিরাম ছুট্‌ছে। মানুষ যখন ব্যারাম থেকে সবে সেরে ওঠে তখন তার সকল ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়, বিশেষত ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আমারও তাই হয়েছিল। ফলে জ্বর আসবার মুখে যে রকম গা পাক দেয়, মাথা ঘোরে আমার ঠিক সেই রকম হয়েছিল। ঘ্রাণে যে অর্দ্ধ ভোজনের ফল হয় এ সত্যের সে রাত্তিরে আমি নাকে মুখে প্রমাণ পাই।

পরদিন ভোরের বেলায় শীতে হি হি কর্‌তে কর্‌তে ষ্টীমারে পদ্মা পার হলুম। সারায় গিয়ে এবার যে গাড়ীতে চড়্‌লুম তাতে জনপ্রাণী ছিল না। আগের রাত্তিরের পাপ সেইখানেই বিদেয় হল। মনে মনে বল্‌লুম বাঁচলুম। যদিচ বিনা নেশায় মানুষটা কি রকম তা দেখবার ঈষৎ কৌতূহল ছিল। সাদা চোখে হয়ত সে আমার দিকে কটমটিয়ে চাইত। শুনেছি নেশার অনুরাগ খোঁয়ারিতে রাগে দাঁড়ায়। সে যাই হোক, গাড়ী চল্‌তে লাগল, কিন্তু সে এমনি ভাবে যে, গম্যস্থানে পৌঁছবার জন্য যেন তার কোনও তাড়া নেই। ট্রেণ প্রতি ষ্টেশনে থেমে জিরিয়ে, একপেট জল খেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে সুস্থে ঘটর ঘটর করে' অগ্রসর হতে লাগল। আমি সাহিত্যিক হ'লে, এই

ফাঁকে উত্তর-বঙ্গের মাঠ-ঘাট, জল-বায়ু, গাছপালার একটা লম্বা বর্ণনা লিখতে পারতুম। কিন্তু সত্যিকথা বলতে গেলে, আমার চোখে এ সব কিছুই পড়ে নি; আর যদি পড়ে থাকে ত মনে কিছুই ঢোকে নি, কেননা কি যে দেখেছিলুম তার বিন্দু বিসর্গ কিছুই মনে নেই। মনে এইমাত্র আছে যে, আমি গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একটা গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখি, গাড়ী হিলি ষ্টেশনে পৌঁচেছে—আর বেলা তখন একটা।

চোখ তাকিয়ে দেখি, একদল মুটে হুড়মুড় করে এসে গাড়ীর ভিতর ঢুকে এক রাশ বাক্স ও তোরোঙ্গে ঘর ছেয়ে ফেল্‌লে। সেই সব বাক্স ও তোরঙ্গের উপর বড় বড় কালির অক্ষরে লেখা ছিল Mr. A. Day. দেখে আমার প্রাণে ভয় ঢুকে গেল, এই মনে করে, যে রাত্‌টে ত একটা সাহেবে জ্বালিয়েছে দিনটা হয়ত আর একটা সাহেবে জ্বালাবে, সম্ভবত বেশিই জ্বালাবে, কেননা আগন্তুক যে সরকারি সাহেব তার সাক্ষী, তাঁর চাপ্‌রাশ ধারী পেয়াদা, সুমুখেই হাজির ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বেঞ্চির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসলুম। স্বীকার করছি আমি বীরপুরুষ নই।

অতপর যিনি কামরায় প্রবেশ কর্‌লেন তাঁকে দেখে আমি ভীত না হই চকিত হয়ে গেলুম। তাঁর নাম মিষ্টার Day না হয়ে মিষ্টার Night হলেই ঠিক হ'ত। আমরা বাঙালীরা শুন্‌তে পাই মোঙ্গল দ্রাবিড় জাত। কথাটা সম্ভবত ঠিক, কেননা আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারায় মঙ্গোলিয়ানের রঙের বেশ একটু আমেজ আছে। কিন্তু পাকা মাদ্রাজি রঙ শুধু দু'চার জনের মধ্যেই পাওয়া যায়। Mr. Day সেই দু'চার জনের একজন। আমি কিন্তু তার রঙ দেখে অবাক

হই নি, চেহারা দেখে চম্‌কে গিয়েছিলুম। এ দেশে ঢের শ্যামবর্ণ লোক আছে .যারা অতি সুপুরুষ, কিন্তু এই হ্যাটকোট ধারী যে কোন জাতীয় জীব তা বলা কঠিন। মানুষের সঙ্গে ভাঁটার যে কতটা সাদৃশ্য থাক্‌তে পারে ইতিপূর্ব্বে তার চাক্ষুস পরিচয় কখনই পাই নি। সেই দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় সমান লোকটির, গা হাত পা মাথা চোখ গাল সবই ছিল গোলাকার। তারপর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তাঁর কোট পেণ্টালুনের ভিতর দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছিল। কোট পেণ্টালুন, কাপড়ের,—তাঁর দেহ যে তাঁর চামড়া ফেটে বেরয় নি, এই আশ্চর্য্য। তাঁকে দেখে আমার শুধু কোলাবেঙের কথা মনে পড়তে লাগল, আর আমি হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। যা অসামান্য তাই মানুষের চোখকে টানে, তা সে সু-রূপই হোক্ আর কু-রূপই হোক। একটু পরেই আমার হোঁস হল, যে ব্যবহারটা আমার পক্ষে অভদ্রতা হচ্ছে। অমনি আমি তাঁর সুগোল নিটোল বপু থেকে চোখ তুলে নিয়ে অন্য দিকে চাইলুম। অন্ধকারের পর আলো দেখলে লোকের মন যেমন এক নিমিষে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আমারও ঠিক তাই হল। এবার যা চোখে পড়ল, তা সত্য সত্যই আলো—সে রূপ, আলোর মতই উজ্জ্বল, আলোর মতই প্রসন্ন। Mr. Day-র সঙ্গে দুটি কিশোরীও যে গাড়ীতে উঠেছিলেন, প্রথমে তা লক্ষ্য করি নি। এখন দেখলুম তার একটি Mr. Day-র ঈষৎ সংক্ষিপ্ত শাড়ী বাঁধাই সংস্করণ। এর বেশি আর কিছু বল্‌তে চাইনে। Weismann যাই বলুন বাপের রূপ সন্তানে বর্ত্তায়, তা সে-রূপ সোপার্জ্জিতই হোক আর অন্বয়াগতই হোক। অপরটির রূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য ; কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমার চোখে ও মনে সেই মুহূর্ত্তে যা চিরদিনের মত ছেপে গেল, সে হচ্ছে

একটা আলোর অনুভূতি। এর বেশি আমি আর কিছু বল্‌তে পারি নে। আমি যদি চিরজীবন আঁক না কষে কবিতা লিখ্‌তুম, তাহলে হয়ত তার চেহারা কথায় এঁকে তোমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারতুম। আমার মনে হল সে আপাদ-মস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে, তার আঙ্গুলের ডগা দিয়ে, অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। Leyden Jar-এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চল্‌ত, তা'হলে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বল্‌তে গেলে, প্রাণের চেহারা তার চোখ-মুখ তার অঙ্গ-ভঙ্গী তার বেশভূষা সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুটে বেরচ্ছিল। সেই একদিনের জন্য আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে, অধ্যাপক জে, সি, বোসের কথা সত্য,—প্রাণ আর বিদ্যুৎ একই পদার্থ।

এই উচ্ছ্বাস থেকে তোমরা অনুমান করছ, যে আমি প্রথম দর্শনেই তার ভালবাসায় পড়ে গেলুম। ভালবাসা কাকে বলে তা জানি নে, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, যে সেই মুহূর্ত্তে আমার বুকের ভিতর একটি নূতন জানালা খুলে গেল, আর সেই দ্বার দিয়ে আমি একটা নূতন জগত আবিষ্কার করলুম, যে জগতের আলোয় মোহ আছে, বাতাসে মদ আছে। এই থেকেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পার্‌বে। আমার বিশ্বাস আমি যদি কবি হতুম তা'হলে তোমরা যাকে ভালবাসা বলো, তা আমার মনে অত শীগ্‌গির জন্মাতো না। যারা ছেলেবেলা থেকে কাব্যচর্চ্চা করে তারা ও জিনিসের টীকে নেয়। আমাদের মত চিরজীবন আঁক-কষা লোকদেরই ও রোগ চট্‌ করে পেয়ে বসে। মাপ করো, একটু বক্তৃতা করে ফেললুম, তোমাদের কাছে সাফাই হবার জন্য। এখন শোনো তারপর কি হল।

Mr. Day আমার সঙ্গে কথপোকথন স্থরু করে দিলেন এবং সেই ছলে আমার আদ্যোপান্ত পরিচয় নিলেন। মেয়ে দুটি আমাদের কথা-বার্ত্তা অবশ্য শুন্‌ছিল, স্থূলাঙ্গীটি মনোযোগ সহকারে, আর অপরটি আপাতদৃষ্টিতে—অন্যমনস্ক ভাবে। আমি আপাতদৃষ্টিতে বল্‌ছি এই কারণে যে, এ আমার এক একটা কথায় তার চোখের হাসি সাড়া দিচ্ছিল। আমার নাম কিশোরীরঞ্জন, এ কথা শুনে বিদ্যুৎ তার চোখের কোণে চিক্‌মিক্ করতে লাগল, তার ঠোঁটের উপর লুকোচুরি খেল্‌তে লাগল। স্থূলাঙ্গীটি কিন্তু আসল কাজের কথাগুলো হাঁ করে গিল্‌ছিল। আমার বাবা যে পাটের কারবার করেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মার্কামারা ছেলে তারপর অবিবাহিত, তারপর জাতিতে কায়স্থ, এ খবর গুলো বুঝলুম সে তার বুকের নোট বুকে টুকে নিচ্ছে। আমাদের সাংসারিক অবস্থা যে কি রকম, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় Mr. Day-র প্রয়োজন হয় নি। হয়ত তিনি আমার বাবাকে নামে জান্‌তেন, নয়ত তিনি আমার বেশভূষার পারিপাট্য, আসবাবপত্রের আভিজাত্য থেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন, যে আমাদের সংসারে আর যে বস্তুরই অভাব থাক্—অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। স্থতরাং আমি বাবার এক ছেলে ও ফার্ষ্ট ডিভিসনে B. Sc. পাশ করেছি, এ সংবাদ পেয়ে তিনি আমার প্রতি হঠাৎ অতিশয় অনুরক্ত হয়ে পড়্‌লেন। আগের রাত্তিরে বুড়ো সাহেবটি যে পরিমাণ হয়েছিলেন তার চাইতে এক চুল কম নয়। মদ যে এ দুনিয়ায় কত রকমের আছে, এ যাত্রায় তার জ্ঞান আমার ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল।

এর পর তাঁর পরিচয় তিনি নিজে হতেই দিলেন। সে পরিচয় তিনি খুব লম্বা করে দিয়েছিলেন, আমি তা দু' কথায় বল্‌ছি। তিনিও

কায়স্থ, তিনিও B. A. পাশ। এখন তিনি গভর্ণমেণ্টের একজন বড় চাকুরে—Settlement Officer। কিন্তু যে কথা তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে বলেছিলেন, সে হচ্ছে এই যে, তিনি বিলেত-ফেরৎ নন, ব্রাহ্মও নন, পাকা হিন্দু; তবে তিনি শিক্ষিত লোক বলে স্ত্রী-শিক্ষায় বিশ্বাস করেন এবং বাল্য-বিবাহে বিশ্বাস করেন না। সংক্ষেপে তিনি reformer নন—reformed Hindu। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, জুতো মোজা পরতে শিখিয়েছেন, এবং এই সব শিক্ষা দেবার জন্য বড় করে রেখেছেন, এতদিনও বিবাহ দেন নি। তবে পয়লা নম্বরের পাশকরা ছেলে পেলে এখন মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছেন। একথা শুনে আমি তার দিকে চাইলুম, কার দিকে অবশ্য বলবার দরকার নেই। অমনি তার মুখে আলো ফুটে উঠ্ল, কিন্তু তার ভিতর কি যেন একটা মানে ছিল, যা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার মনে হল সে আলোর অন্তরে ছিল অপার রহস্য, আর অগাধ মায়া। এক কথায়, আরতির আলোতে প্রতিমার চেহারা যে রকম দেখায়—সেই হাসির আলোতে তার চেহারা ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। শরীর যার রুগ্ন সে পরের মায়া চায় এবং একটুতেই মনে করে অনেকখানি পায়। এই সূত্রে আমি একটা মস্তবড় সত্য আবিষ্কার করে ফেল্‌লুম, সে হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকে বলকে ভক্তি করে কিন্তু ভালবাসে দুর্ব্বলকে।

সে যাই হোক, আমি মনে মনে তার গলায় মালা দিলুম, আর তার আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌লুম, সেও তার প্রতিদান কর্‌লে। এই মানসিক গান্ধর্ব্ব বিবাহকে সামাজিক ব্রাহ্ম বিবাহে পরিণত কর্‌তে যে বৃথায় কালক্ষেপ করব না, সে বিষয়েও কৃতসংকল্প হলুম। ছুটির মধ্যে

সুন্দরীটিই যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। যদি জিজ্ঞাসা করো যে, দুই বোনের ভিতর চেহারার প্রভেদ এত বেশি কেন? তার উত্তর—একটি হয়েছে মায়ের মত আর একটি বাপের মত। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অবশ্য আমাকে differential calculus-এর আঁক কষতে হয় নি।

আমি ও মিষ্টার দে দুজনেই হল্‌দিবাড়ী নামলুম। দে সাহেবের ঐ ছিল কর্ম্মস্থল এবং বাবাও তাঁর ব্যবসার কি তদ্বিরের জন্য সে সময়ে ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেসনে যখন আমি দে সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি—তখন সেই সুন্দরীর দিকে চেয়ে দেখি, সে মুখে হাসির রেখা পর্য্যন্ত নেই। যে চোখ এতক্ষণ বিদ্যুতের মত চঞ্চল ছিল, সে চোখ এখন তারার মত স্থির হয়ে রয়েছে, আর তার ভিতরে কি একটা বিষাদ, একটা নৈরাশ্যের কালো ছায়া পড়েছে। সে দৃষ্টি যখন আমার চোখের উপর পড়্‌ল, তখন আমার মনে হল, তা যেন স্পষ্টাক্ষরে বল্‌লে "আমি এ জীবনে তোমাকে আর ভুলতে পারব না; আশা করি তুমিও আমাকে মনে রাখবে।" মানুষের চোখে যে কথা কয় একথা আমি আগে জানতুম না। অতঃপর আমি চোখ নীচু করে সেখান থেকে চলে এলুম।

তারপর যা হ'ল, শোনো। আমি এ বিয়েতে বাবার মত করালুম। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, তার উপর আবার ভালো ছেলে; সুতরাং বাবা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে দ্বিধা করলেন না। প্রস্তাবটা অবশ্য বরের পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হল। উভয় পক্ষের ভিতর মামুলি কথাবার্ত্তা চল্‌ল। তারপর আমরা একদিন সেজেগুজে মেয়ে দেখতে

গেলুম। মেয়ে আমি আগে দেখ্‌লেও বাবা ত দেখেন নি। তা ছাড়া রীত রক্ষে বলেও ত একটা জিনিস আছে।

দে সাহেবের বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হবার পর, খানিকক্ষণ বাদেই একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের সুমুখে এনে হাজির করা হল। সে এসে দাঁড়াবামাত্র আমার চোখে বিদ্যুতের আলো নয় বুকে বিদ্যুতের ধাক্কা লাগ্‌ল। এ সে নয়—অন্যটি। সাজগোজের ভিতর তার কদর্য্যতা জোর করে ঠেলে বেরিয়েছিল। আমি যদি তার সেদিনকার মূর্ত্তির বর্ণনা করি, তাহলে নিষ্ঠুর কথা বলব। তার কথা তাই থাক্। আমি এ ধাক্কায় এতটা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম যে, কাঠের পুতুলের মত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পর্দ্দার আড়াল থেকে পাশের ঘরে একটি মেয়ে বোধহয় আমার ঐ অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল। আমার বুঝ্‌তে বাকী রইল না—সে হাসি কার। আমি যদি কবি হতুম—তাহলে সেই মুহূর্ত্তে বলতুম "ধরণী দ্বিধা হও আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।"

ব্যাপার কি হয়েছিল জানো, যে মেয়েটিকে আমাকে দেখানো হয়েছিল, সে হচ্ছে দে-সাহেবের অবিবাহিতা কন্যা আর যাকে পর্দ্দার আড়ালে রাখা হয়েছিল সে হচ্ছে দে বাহাদুরের বিবাহিতা স্ত্রী, অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের। বলা বাহুল্য আমি এ বিবাহ করতে কিছুতেই রাজি হলুম না, যদিচ বাবা বিরক্ত হলেন, দে-সাহেব রাগ করলেন, আর দেশশুদ্ধ লোক আমার নিন্দা কর্‌তে লাগ্‌ল।

এ ঘটনার হপ্তা খানেক বাদে ডাকে একখানি চিঠি পেলুম। লেখা স্ত্রী-হস্তের। সে চিঠি এই—

"যদি আমার প্রতি তোমার কোনরূপ মায়া থাকে, তাহলে তুমি ঐ বিবাহ করো, নচেৎ এ পরিবারে আমার তেষ্টানো ভার হবে।

কিশোরী—

এ চিঠি পেয়ে আমার সংকল্প ক্ষণিকের জন্য টলেছিল; কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম ও কাজ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা দুজনেই এক ঘরের লোক এবং দুজনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ রাখ্‌তে হবে এবং সে দুই মিথ্যাভাবে। নিজের মন যাচিয়ে বুঝ্‌লুম, চিরজীবন এ অভিনয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। এই হচ্ছে আমার গল্প—এখন তোমরা স্থির কর যে, এ ট্রাজেডি, কি কমেডি, কিম্বা এক সঙ্গে ও দুই।

প্রফেসর এই বলে থাম্‌লে, অনুকুল হেসে বল্‌লে—

—"অবশ্য কমেডি। ইংরাজিতে যাকে বলে Comedy of Errors."

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—

—"মোটেই নয়, এ শুধু ট্রাজেডি নয় একেবারে চতুরঙ্গ ট্রাজেডি।"

ঐ চতুরঙ্গ বিশেষণের সার্থকতা কি প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর কর্‌লেন,—

—"স্ত্রী কিশোরী আর প্রোফেসার কিশোরী এই দুই কিশোরীর পক্ষে ব্যাপারটা যে কি ট্রাজিক তা ত সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ। আর এটা বোঝাও শক্ত নয়, যে দে-সাহেবের মনের শান্তিও চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল, আর তাঁর মেয়ের হয় আর বিয়ে হল না, নয় কোনও বাঁদরের সঙ্গে হ'ল।"

প্রফেসর এর জবাবে বল্‌লেন, "শ্রীমতীর জন্য দুঃখ করবার

কিছু নেই, তার আমার চাইতে ঢের ভাল বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সে আমার দ্বিগুণ মাইনে পায়। কথাটা হয় ত তোমরা বিশ্বাস করছ না কিন্তু ঘটনা তাই। দে বাহাদুর দশ হাজার টাকা পণ দিয়ে একটি M. A.-এর সঙ্গে তার বিবাহ দেন, তার পরে সাহেব সুবোকে ধরে, তাকে ডেপুটি করে দেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তাকে খালি পায়ে বেড়াতে হ'ত, এখন সে দু'বেলা জুতো মোজা পরছে। তার পর বলা বাহুল্য, যে দে-বাহাদুরের যে রকম আকৃতি প্রকৃতি, তাতে করে তিনি ট্রাজেডি দূরে থাক কোনও কমেডিরও নায়ক হতে পারেন না, তাঁর যথার্থ স্থান হচ্ছে প্রহসনের মধ্যে।"

—"আচ্ছা তা হলে তোমাদের দুজনের পক্ষে ত ঘটনাটা ট্রাজিক?"

—"কি করে জানলে? অপর কিশোরীর বিষয় ত তুমি কিছুই জানো না, আর আমার মনের খবরই বা তুমি কি রাখো?"

—"আচ্ছা ধরে নিচ্ছি যে, অপরটির পক্ষে ব্যাপারটা হয়েছে comedy, খুব সম্ভবত তাই—কেননা তা নইলে তোমার দুর্দ্দশা দেখে সে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌বে কেন? কিন্তু তোমার পক্ষে যে এটা ট্রাজেডি, তার প্রমাণ, তুমি অদ্যাবধি বিবাহ করো নি।"

—"বিবাহ করা আর না করা, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বড় ট্রাজেডি তা যখন জানিনে, তখন ধরে নেওয়া যাক—করাটাই হচ্ছে comedy. যদিচ বিবাহটা কমেডির শেষ অঙ্ক বলেই নাটকে প্রসিদ্ধ। সে যাই হোক্ আমি যে বিয়ে করি নি তার কারণ—টাকার অভাব।

—"বটে! তুমি যে মাইনে পাও তাতে আর দশজন ছেলে পিলে নিয়ে ত দিব্যি ঘর সংসার করছে।"

—"তা ঠিক। আমার পক্ষে তা করা কেন সম্ভব নয়, তা বল্‌ছি। বছর কয়েক আগে বোধ হয় জানো, যে, পাটের কারবারে একটা বড় গোছের মার খেয়ে বাবার ধন ও প্রাণ দুই এক সঙ্গে যায়। ফলে আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি। তারপর এই চাক্‌রিতে ঢুকে মা'র অনুরোধে বিয়ে কর্‌তে রাজি হলুম। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল, আমি অবশ্য মেয়ে দেখি নি কিন্তু পাকা দেখাও হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে আবার এক খানি চিঠি পেলুম, লেখা সেই স্ত্রী হস্তের। সে চিঠির মোদ্দা কথা এই যে, লেখিকা বিধবা হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কপর্দ্দক শূন্য। দে-সাহেব তাঁর উইলে তাঁর স্ত্রীকে এক কড়াও দিয়ে যান নি। তাঁর চিরজীবনের সঞ্চিত ঘুষের টাকা তিনি তাঁর কন্যারত্নকে দিয়ে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে খোরপোষের মামলা করা কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চেয়ে ছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে মামলা করা থেকে নিবৃত্ত করে, তাঁর সংসারের ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। ভেবে দেখো দেখি, যে গল্পটা তোমাদের বললুম, সেটা আদালতে কি বিশ্রী আকারে দেখা দিত। বলা বাহুল্য, এর পর আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলুম, মা বিরক্ত হলেন, কন্যা পক্ষ রাগ করলেন, দেশশুদ্ধ লোক নিন্দে করতে লাগল কিন্তু আমি তাতে টল্‌লুম না। কেননা দু'সংসার চালাবার মত রোজ-গার আমার নেই।

—"দেখো তুমি অদ্ভূত কথা বল্‌ছ, একটি হিন্দু বিধবার আর কি লাগে, মাসে দশ টাকা হলেই ত চলে যায়, তা আর তুমি দিতে পারো না?"

—"যদি দশ টাকায় হতো তাহলে আমি পাকা দেখার পর বিয়ে

ভেঙ্গে দিয়ে সমাজে দুর্ণামেরভাগী হতুম না। সে একা নয়, তার বাপ মা আছে, তারা যে হতদরিদ্র তা বোধ হয়, তাদের দে-সাহেবকে কন্যাদান থেকেই বুঝতে পারো। তারপর আমি যে ঘটনার উল্লেখ করেছি তার সাত মাস পরে তার যে কন্যাসন্তান হয় সে এখন বড় হয়ে উঠ্‌ছে। এই সবকটির অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমাকেই কর্‌তে হয়, আর তা অবশ্য দশ টাকায় হয় না।"

অনুকূল জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"তার রূপ আজও কি আলোর মত জ্বল্‌ছে ?"

—"বল্‌তে পারি নে, কেননা তার সঙ্গে সেই ট্রেণে ছাড়া আমার আর সাক্ষাৎ হয় নি।"

—"কি বল্‌ছ, তুমি তার গোনাগুষ্ঠি খাইয়ে পরিয়ে রাখ্‌ছ আর সে তোমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করে নি ?"

—"একবার কেন, বহুবার সাক্ষাৎ কর্‌তে চেয়েছিল কিন্তু আমি করি নি।"

অনুকূল হেসে বল্‌লে, "পাছে 'নেশার অনুরাগ খোঁয়ারির রাগে পরিণত হয়' এই ভয়ে বুঝি ?"

—"না তার কন্যাটি পাছে তার দিদির মত দেখ্‌তে হয় এই ভয়ে!"

শেষে আমি বল্‌লুম, "প্রফেসার তোমার গল্প উৎরেছে। তুমি করতে চাইলে বিয়ে তা হ'ল না, কিন্তু বিয়ের দায়টা পড়্‌ল তোমার ঘাড়ে। এ ব্যাপার যদি ট্রাজি-কমেডি না হয়, ত ট্রাজি-কমেডি কাকে বলে তা আমি জানি নে"।

সুপ্রসন্ন বল্‌লে—

—"তা হতে পারে, কিন্তু এ গল্প ছোট গল্প হয় নি, কেননা, এতক্ষণে ষোলপেজ পেরিয়ে গেল।"

প্রশান্ত অমনি বলে উঠল যে—

"তা যদি হয়ে থাকে ত সে প্রফেসারের গল্প বলার দোষে নয়— তোমাদের জেরা আর সওয়াল জবাবের গুণে।"

প্রফেসার হেসে বল্‌লেন—"প্রশান্ত যা বল্‌ছে তা ঠিক, শুধু "তোমাদের" বদলে "আমাদের" ব্যবহার কর্‌লে তার বক্তব্যটা ব্যাকরণ শুদ্ধ হত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

"এত্তো বড়" কিম্বা "কিছু নয়"।

(১)

আমার একটি আড়াই বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন যাঁর নাম, "ছোট-কালী বাবু।" তিনি যে লোককে চেনেন না, তাকে বলেন—"কেউ নয়," আর যে জিনিষ জানেন না তাকে বলেন—"কিছু নয়।" যখন শুনি, আমাদের পলিটিক্সের একদল বলছেন, Reform-scheme "কিছু নয়," তখন আমার ছোট কালী বাবুর কথা মনে পড়ে যায়।

(২)

আমর ভ্রাতুষ্পুত্রটির আর একটি গুণ আছে। কোন জিনিষ তাঁর হাতে এলে, তিনি বুক ফুলিয়ে এবং গলা মোটা করে বলেন, "এত্তো বড়"—তা সে বস্তু যতই ছোট হো'ক। যখন শুনি আমাদের পলিটিক্সের আর এক দল বলছেন, Reform-scheme, "এত্তো বড়," তখনও আমার ছোট কালী বাবুর কথা মনে পড়ে।

(৩)

পলিটিক্সের জগতে, আমরা আজও সাবালক হই নি, কিন্তু তাই বলে আমাদের পলিটিক্সের বড়বাবুরা যে সব ছোট কালী বাবু এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং এঁদের এই সব মৎফরাকা মত প্রকাশের নিশ্চয়ই অপর কারণ আছে।

(৪)

সে কারণ হচ্ছে “যুদ্ধজ্বর।” Reform-scheme-ও বার হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশে যুদ্ধজ্বরও এসে পড়্‌ল। এ জ্বরে ধরলে মানুষে বেহোঁস হয়। সুতরাং এই জ্বরের প্রকোপে উক্ত Scheme সম্বন্ধে যা বলা কওয়া হয়েছে, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কেন না সে সময়ে বক্তাদের কারও মাথার ঠিক ছিল না।

(৫)

এ জ্বর যে আমাদের পলিটিসিয়ানদের গায়েই বেশি করে ফুটে উঠেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে,—Bengal Provincial Conference-এর সেদিনকার অধিবেশনে। সে সভার temperature সেদিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ১০৫ ডিগ্রীর উপরে উঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে ক্ষেত্রে কারও কারও জ্বর যে বিকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে—তাঁদের বক্তৃতায়। শুন্‌তে পাই এদেশের জনৈক অতি-বক্তা নাকি বলেছিলেন, যে“স্বরাজ” তিনি President Wilson-এর কাছে চেয়ে নেবেন। এ রকম প্রলাপ অবশ্য বাংলা দেশে কেউ সজ্ঞানে বক্‌তে পারে না, কেননা বাঙালীতে ও কাঙালীতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

(৬)

এই যুদ্ধজ্বরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পাচ্ছি দু-দলেরই মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। যাঁরা আগে বলেছিলেন ‘কিছু নয়’, তাঁরা এখন বলছেন, ‘না, কিছু বটে’, আর যাঁরা আগে বলেছিলেন

'এত্তো বড়,' তাঁরা এখন বলছেন—'না ত্যাত্তো বড় নয়'। এখন যদি উভয় পক্ষ একত্র হয়ে এ বিষয়ে হিসাব মোকাবিলা করেন, ত আমার বিশ্বাস উভয় পক্ষই দেখ্‌তে পাবেন যে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোনও গরমিল নেই। সুতরাং বামমার্গ এবং দক্ষিণ মার্গের পলিটি-সিয়ানদের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁরা এই ফাঁকে তাঁদের আড়া-আড়ির তাড়াতাড়ি একটা আপোষ মীমাংসা করে নিন্। এ সুযোগ কোন পক্ষেরই হারানো উচিত নয়, কেননা যুদ্ধ-জ্বরের আবার relapse হয় এবং তা হলে, ব্যাপার হয়ে ওঠে একেবারে মারাত্মক।

(৭)

কিন্তু আমাদের এ প্রার্থনায় কোন পক্ষ যে কর্ণপাত কর্‌বেন, সে বিষয়ে বড় একটা ভরসা নেই। এঁরা বল্‌বেন, পলিটিক্স শুধু হিসেব নিকেশের কথা নয়, ও হচ্ছে আসলে হৃদয়ের কথা। যাদের মধ্যে বুকের মিল নেই, তাদের মধ্যে মুখের মিল কদিন থাক্‌বে?

(৮)

হৃদয়ের দোহাই দিলে এ দেশে নির্ব্বুদ্ধিতার সাতখুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের দেশে "এত্তো বড়" জিনিষ। যার মাথা নেই তার মাথা-ব্যথার কথা শুন্‌লে আমরা অবশ্য হাসি কিন্তু যার বুক নেই তার বুকের ব্যাথার কথা শুন্‌লে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব, আর এই জন্যেই ত এদেশে কোনও কাজের কথা বলা এত কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভাল জিনিষ; এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচুদরের জিনিষ এবং উদর যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে মস্তক বলে পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু মস্তকের সঙ্গে হৃদয়ের একটা

মস্তপ্রভেদ আছে। মানুষের মাথায় দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ সে যে তত হৃদয়বান এই হচ্ছে লোক-মত। এ মতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কেননা সে তর্ক লোকে কানে তুল্‌বে না। এ কথা কে না জানে যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"।

(৯)

তবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ও স্বরাজ-প্রাপ্তির উপায় এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। তারপর পলিটিক্সে আমরা যাকে হৃদয়াবেগ বলি, সে চাঞ্চল্যের মূল হৃদয়ে কি মস্তকে তাও ঠিক জানা নেই। আমরা যে আজ তিনপুরুষ ধরে পলিটিক্সের বিলিতি মদ্য পান করে আস্‌ছি সে কথা ত আর অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং আমাদের এই পলিটিকাল ছট্‌ফটানির মূলে হৃদয়ের লালরক্তই বা কতখানি আছে আর বিলাতের লালপানীই বা কতখানি আছে,—অর্থাৎ বুকের ব্যাথাই বা কতখানি আছে, আর বইয়ের কথাই বা কতখানি আছে তা কে জোর করে বল্‌তে পারে?

(১০)

তন্ত্রশাস্ত্রে বলে,—"নাভিষেকাৎ বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্য সেবনাৎ" এ কথা যে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। এতকাল আমরা বিলাতি পলিটিক্সের শুধু মদ্যপান করে এসেছি এইবার Reform-scheme-এর প্রসাদে সে পলিটিক্সে আমরা অভিষিক্ত হব। এ শুধু যথালাভ নয়—মহালাভ। এর কারণ, এ তন্ত্রে

অভিষেকের আমাদের পক্ষে প্রয়োজন আছে। পেট্রিয়টিজম ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু পলিটিক্স হচ্ছে কর্ম্ম, এবং অপরাপর কর্ম্মের ন্যায় এ কর্ম্মেও কৃতীত্ব লাভ করবার জন্য কিঞ্চিৎ শিক্ষা দীক্ষার দরকার। তা ছাড়া ডিমোক্রাসি স্বদেশী মাল নয়—আহেল বিলাতি জিনিস, এবং এ বস্তুর এতদিন আমরা শুধু কাগজে কলমে চর্চ্চা করে এসেছি—এখন হাতে কলমে চর্চ্চা করবার দিন এসেছে।

(১১)

এই অভিষেক কথাটাই ত যত গোল বাধিয়েছে। বামাচারী ও দক্ষিণাচারীদের যত মারামারি সে সবই ত এ Scheme-য়ে ঐ বস্তুর অস্তি নাস্তি নিয়ে। কিন্তু এ নিয়ে অতি তুষ্ট কিম্বা অতি রুষ্ট হবার কোনও কারণ ত আমি দেখতে পাই নে। অতিতুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি মনে ভাবছেন যে, এই Scheme-এর প্রসাদে তাঁরা অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করেছেন? আর অতিরুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি মনে ভেবেছিলেন যে, ইংরাজ-রাজ, এই সুযোগে ভারতবাসীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে, একছুটে "বাণপ্রস্থ" অবলম্বন করবেন?

(১২)

যারা রূপকথার রাজ্যে কিম্বা পৌরাণিক যুগে বাস করে না, তাদের বক্তব্য এই যে, Reform-scheme, আকাশের চাঁদও নয় দিল্লীর লাড্ডুও নয়, কিন্তু এমন জিনিষ—যার সাহায্যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলবার সুযোগ পাব। ভুলে গেলে চল্‌বে না, যে স্বরাজ যখন আমরা উত্তরাধিকারীসত্ত্বে লাভ

করি নি, তখন তা আমাদের অর্জ্জন করতে হবে। এবং এ অর্জ্জন সাধনা অতএব সময়সাপেক্ষ।

(১৩)

সে যাই হোক্ এই Reform-Scheme-এর দৌলতে আর কিছু না হোক্ আমরা অন্তত একটা বিদ্যে শিখব। এই যুদ্ধের কৃপায় আমরা যেমন জিওগ্রাফি শিখেছি, এই Reform-এর কৃপায় আমরা তেমনি Constitutional Law শিখ্‌ব। তারপর যুদ্ধের ফলে আমাদের ঘরে ঘরে যেমন সব বড় বড় general তৈরি হয়ে উঠেছে, এই Reform-এর ফলে ঘরে ঘরে সব বড় বড় constitution builders তৈরি হয়ে উঠ্‌বে। ইতিমধ্যেই উকিলের আপিসে ও Bar Library-তে দু'চার জন "এত্তো বড়" constitution builder দেখা দিয়েছেন। জাতির পক্ষে এটা কি একটা কম লাভ! অতএব "এত্তো বড়" কথাটা কিছুতেই বলা যায় না যে Reform-scheme—"কিছু নয়"।

বীরবল।

ছোট কালীবাবু।

(তেপাটি) *

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
অপিচ বয়েস তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে চলে যবে সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু।
ব্যামো হলে ব্রাণ্ডি খায়, খায় নাকো সাবু,
সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর,
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
যদিচ বয়েস তার আড়াই বছর।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

* ফরাসী কবিতা Triolet-এর ছাঁচে ঢালাই করে আমি এক সময়ে গুটি ছয়েক পদ্য রচনা করি এবং তার নাম দিই তেপাটি। সে সকল তেপাটিতে Triolet-এর ঠিক গড়নটি বজায় রাখতে পারি নি। হাত দুই জমির ভিতর কুঁচিমোড়া ভাঙ্গা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা যিনি কখনো কসরৎ করেছেন তিনিই জানেন। তেপাটি লেখাও হচ্ছে লেখনীর একটা কসরৎ। Triolet অষ্টপদী কবিতা। এই আট পদের ভিতর, প্রথম পদটি ধুয়ো হিসেবে আর দু'বার, আর দ্বিতীয় পদটি আর একবার দেখা দেয়। তা ছাড়া এ পদ্যের ভিতর শুধু একজোড়া মিল আছে। প্রথম তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম আর সপ্তম পদ একসঙ্গে মেলে; বাকী তিন পদ একসঙ্গে মেলে। বলা বাহুল্য এ কবিতার ভাব ভাষা দুই নেহাৎ হাল্কা হওয়া চাই।

ভাদ্র, ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-এ্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোটস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পত্র।

শ্রীমান্ চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

তোমার চিঠির জবাব অনেক দিন হ'ল লিখে রেখেছি, কিন্তু কতকগুলি দৈব-ঘটনার ধাক্কায় এতদূর অব্যবস্থিত চিত্ত হ'য়ে পড়েছিলুম যে, এতদিন সে জবাব তোমাকে পাঠাতে পারি নি। ব্যাপার যা ঘটেছিল বল্‌ছি। প্রথমে আবির্ভূত হ'ল—Reform Scheme, তার পিঠ পিঠ এল—ভূমিকম্প, তারপর দু'দিন না যেতেই ঘাড়ে পড়্‌ল—যুদ্ধজ্বর, তারপর দেখা দিল অকাল-নিদাঘ। এ জ্বরে যে আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলুম, সে কথা বলাই বাহুল্য। যে বিপদ দেশশুদ্ধ লোক মাথা পেতে নিয়েছে, আমি যে তা আমার দেহকে স্পর্শ কর্‌তে দেব না, আমার প্রকৃতি ততটা অসামাজিক নয়। এই যুদ্ধজ্বরে ছুঁলে মানুষের যে মাথা ঘুলিয়ে যায়, সেকথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এর উপর যদি আবার এই সব আকস্মিক উপদ্রবের কার্য্য-কারণ ও ফলাফল নিয়ে ঘরে বাইরে ঘোর ও জোর তর্ক কর্‌তে হয়, তাহ'লে মানুষের মাথার অবস্থা যে কি রকম হয় তা সহজেই বুঝ্‌তে পারো। ও অবস্থায় চিঠি ডাকে দেওয়া প্রভৃতি ছোটখাটো সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি ব্যক্তিবিশেষ যদি মাসাবধি কাল উপেক্ষা করে, তাহ'লে তার বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না।

আমরা এই মাসখানেক ধরে' কি কি বিষয় নিয়ে কোন্ কোন্ তর্ক করেছি, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি। এই আষাঢ়ে গ্রীষ্ম ভুঁইফুড়ে উঠেছে কিনা, অর্থাৎ তা ভূমিকম্পের ফল কিনা, অথবা দেশের এতটা গা গরম হবার কারণ এই কিনা যে, আমাদের মাতৃভূমির গায়েও যুদ্ধজ্বর হয়েছে, তারপর ভূমিকম্পটা জ্বর আস্‌বার আগে পৃথিবীর দেহের কাঁপুনি মাত্র, না আর কিছু, এই সব গুরুতর সমস্যা নিয়ে আমার চারপাশে দিনের পর দিন রাতের পর রাত নানারূপ বৈজ্ঞানিক, অ-বৈজ্ঞানিক এবং অতি-বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলেছে। এবং আমাকে তাতে বরাবর যোগদান কর্‌তে হয়েছে।

এ সকল বিষয়ে নীরব থাক্‌লে আমি যে স্বদেশ ও স্বজাতির ভাল মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে বিষয়ে অবশ্য কারও মনে আর কোনও সন্দেহ থাক্‌ত না।

তর্কে অবশ্য এ সকল সমস্যার কোনও কালে মীমাংসা হয় না, এবং হ'তে পারে না। অতএব এবং অতঃপর ভোটে স্থির হ'য়ে গেল, যে Reform Scheme-এর জন্ম হচ্ছে এই সব নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক উৎপাতের কারণ। বৌদ্ধশাস্ত্রে পড়েছ ত যে, বুদ্ধদেবের জন্মের সময় জম্বুদ্বীপে কি প্রলয় ব্যাপার ঘটেছিল, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সব পর্ব্বত হ'য়ে গিয়েছিল হ্রদ আর সব হ্রদ হয়ে গিয়েছিল পর্ব্বত।

অতএব সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে দাঁড়াল এই যে, এই অকাল-নিদাঘের কারণ যুদ্ধজ্বর—এই যুদ্ধজ্বরের কারণ ভূমিকম্প এবং এই ভূমিকম্পের কারণ Reform Scheme, কেননা ঐ Scheme সম্বন্ধে বাসুকী অসম্মতিসূচক মাথা নেড়েছেন। এর কারণও স্পষ্ট, "শেষ" যে Extremist, সে কথা যে কোনও অভিধানে যাচিয়ে নিতে পারো।

সে যাইহোক্, এই Reform Scheme-এর স্পর্শে আমাদের মনের দেশে যে একটা বেজায় ভূমিকম্প হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর ফলে আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড ফাট ধরেছে এবং তার ভিতর দিয়ে বেরচ্ছে এখন অনর্গল ধোঁয়া। আমার জনৈক রাসায়নিক বন্ধু বলেন, সে ধোঁয়া Poisonous gas! যে ধোঁয়ায় আমাদের দেশ আজ ছেয়ে ফেলেছে, তা বিষাক্ত হোক্ আর না হোক্, তা যে আমাদের চোখে ঢুকেছে তার আর সন্দেহ নেই, কেননা আমরা কোন জিনিষই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নে, কাজেই সে চোখ কেবলই রগ্‌ড়াচ্ছি, আর লাল কর্‌ছি। এই ত আমাদের অবস্থা।

আসল কথা এই, এই কলিকাতা মহানগরীতে আমারা যা হয় একটা হুজুগ না নিয়ে বেশি দিন থাক্‌তে পারি নে। যদি একটা টাট্‌কা হুজুগের মাল বাইরে থেকে না আসে, তাহ'লে আমরা তা ঘরে বসে বানাই। ঐ হচ্ছে একমাত্র স্বদেশী industry, যাতে আমরা সম্পূর্ণ কৃতীত্ব লাভ করেছি। আমাদের ধারণা, আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে হুজুগ হচ্ছে একটা প্রধান উপায়। সম্প্রতি একটা হুজুগের অভাবে আমরা একটু মিইয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময় আমাদের কপাল গুণে Reform Scheme আমাদের হাতে এসে পড়্‌ল, অমনি তাই নিয়ে আমরা একটা মহা গোলযোগ বাধিয়ে দিয়েছি। এ হুজুগে যে আমিও মাতি নি, সে কথা বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে।

আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের এমন একটি সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি, যে ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যত অনেকটা স্থির হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় ভয়ের কথাও ঢের আছে, ভরসার কথাও ঢের আছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে যাদের চিত্ত ব'লে একটা পদার্থ আছে তাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটা নিতান্তই স্বাভাবিক। সাহিত্যে আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হ'লেও ব্যবহারিক জীবনে জাতিগত প্রাণ; কেননা আমাদের জাতি ব'লে কোনও একটা জিনিষ নেই। সাহিত্য জগতে অবশ্য এমন সব মুক্ত পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যাঁরা স্বদেশের খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও নির্ব্বিকার চিত্তে কাব্যকলার চর্চ্চা করে গেছেন, যথা—Leonards da Vince এবং Gœthe, কিন্তু এঁরা হচ্ছেন মনোজগতের স্বর্লোকের অধিবাসী, আর আমরা হচ্ছি তুচ্ছ ভূ-লোকের। সুতরাং তাঁদের পক্ষে যা শোভা পায়, আমাদের পক্ষে তা ধৃষ্টতা মাত্র। ভাগবতে দেখ্‌তে পাই, শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি আছে, তাঁদের কার্য্যকলাপ সাধারণ লোকের পক্ষে অনুকরণীয় নয়।

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—এ উপদেশ অর্জ্জুনের জন্য, তোমার আমার জন্য নয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—অতএব কর্ত্তব্যও নয়।

ফরাসী কবি Theophile Gautier-এর কাব্য আমার নিকট চিরদিনই আদরের সামগ্রী; তবুও তাঁর Emaux et Camées-এর গৌরচন্দ্রিকা আমার কাছেও চক্ষুঃশূল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে যিনি প্যারিসে বসে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে স্ত্রীজাতির কর-চরণ-বসন-ভূষণের বিষয় কবিতা রচনা করেছিলেন, তিনি অবশ্য এক-জন অতি বাহাদুর লোক। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যে নিজকে Gœthe-

এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, ঐ কথাটাই আমার কানে খারাপ লাগে। কেননা কবি হিসেবে Gautier-এর সঙ্গে Gœthe-এর সেই প্রভেদ কাব্য হিসেবে Mademoiselle de Maupin-এর সঙ্গে Faust-এর যে প্রভেদ। সুতরাং Gœthe-র পক্ষে যে ঔদাসিন্য স্বাভাবিক Gautier-এর পক্ষে তা নিতান্তই কৃত্রিম। এই কারণে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী জর্ম্মাণ সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ প্যারিসে বন্দী হয়ে Gautier-র মন্ত্র-শিষ্য Banville যে সব Idylles Prussiennes রচনা করে-ছিলেন, আমার কাছে আজকের দিনে তাঁর গুরুর কবিতার চাইতে তা ঢের বেশি উপাদেয়। এ সকল কবিতা Banville-এর বুকের তাজা রক্তে ছোপানো কিন্তু তাতে ক'রে সে সব কবিতার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, কেননা তার ভিতর অতিরঞ্জিত কিছুই নেই। যে রক্তে তাঁর কবিতা রঞ্জিত, সে রক্ত হচ্ছে কবির বুকের রক্ত; সাধারণ লোকের নয়, সুতরাং হিংসায় তা বিকৃত নয়, মদে তা কলুষিত নয়। Banville নিজেকে কাব্য-রাজ্যের বাজিকর বলে' পরিচয় দিয়েছেন। সেই বাজি-কর এক্ষেত্রে বেদনার বলে যাদুকর হয়ে উঠেছেন। এই সব কবিতা এত যে মর্ম্মস্পর্শী—তার কারণ Banville মানুষের মনের কথা দেবতার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বিজীত ফ্রান্সের শোক যাঁর অন্তরে বিজয়ী শ্লোকে পরিণত হয়েছে, তাঁর প্রাণের বেদনা বিশ্বমানবের চির-আনন্দের সামগ্রী হয়ে রয়েছে। তবে সাহিত্যিকদের পক্ষে পলিটিক্স সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া অসম্ভব হলেও নির্লিপ্ত থাকা যে কর্ত্তব্য Gautier-এর একথা আমি মান্য করি।

Banville-র চিত্তচাঞ্চল্য কাব্য-জগতে যে স্থির সৌদামিনী হয়েছে, তার কারণ তাঁর রাগ বিরাগ, তাঁর আশা নৈরাশ্য, তাঁর হাসি

কান্নার মূলে ছিল পেট্রিয়টিজম্—পলিটিক্স্ নয়। এর প্রথমটি সাহিত্যের বিষয় হলেও দ্বিতীয়টি নয়। পেট্রিয়টিজম্ ও পলিটিক্স্ যে এক বস্তু নয়, তার প্রমাণ,—নিত্য দেখতে পাওয়া যায় যে, যার দেহে পেট্রিয়টিজমের লেশমাত্র নেই, তিনিও পলিটিক্সের দরবারে উচ্চ আসন অধিকার কর্‌ছেন। অনেকের ধারণা, পলিটিক্স পাকা কর্‌তে হলে পেট্রিয়টিজমকে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। একথা যদি সত্য হয় তাহ'লে এ কথাও সত্য যে পেট্রিয়টিজমের ধর্ম্মরক্ষা করতে হলে পলিটিক্সকে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। এ কথার ত ভুল নেই যে, পলিটিক্স পেট্রিয়টিজমের ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত করে। একমাত্র শাসন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ঘটালে প্রাচীন সমাজ যদি রাতারাতি নবীন হয়ে উঠ্‌ত, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। সাহিত্যের ভাবনা পলিটিক্সের ভাবনার চাইতে ঢের বেশি গুরুতর—কেননা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রাচীনকে নবীন করা। সে যাইহোক্ সরস্বতীর সেবক-দের পক্ষে রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে থাকাই কর্ত্তব্য। ও যুদ্ধে সাহিত্যিকেরা যোগদান কর্‌লে পলিটিক্সেরও বিপদ সাহিত্যেরও ক্ষতি।

সাহিত্যিকেরা পলিটিক্‌সে কি গোল বাধান সে সম্বন্ধে নানা পলিটি-সিয়ান নানা কথা বলেছেন, সে সব কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তাঁদের সকল কথার সারমর্ম্ম এই যে, পলিটিক্‌সের আসরে সাহিত্যিকের আসা পলিটিক্‌স ব্যবসায়ীদের কাছে তদ্রুপ ভয়াবহ, জুরির বাক্সে স্কুল মাষ্টারের বসা আইন ব্যবসায়ীদের কাছে যদ্রুপ ভয়াবহ। তবে যে পলিটিসিয়ানরা সাহিত্যিকদের দলে টান্‌বার জন্য সময়ে সময়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তার কারণ সারস্বতদের হাতে কলম নামক একটি বস্তু আছে,

যা নাকি অস্ত্র হিসেবে তলোয়ারের চাইতেও জবর। কলমের মুখ তলোয়ারের চাইতে বেশি ধারালো হোক্ আর না হোক্ এ যুগে অসিজীবীর চাইতে মসিজীবীর প্রতাপ বেশি বই কম নয়। পুরাকালে রাজনীতির লড়াই রাজায় রাজায় হ'ত, সুতরাং রাজার অস্ত্র তরবারীই ছিল সে কালের প্রধান অস্ত্র; একালে রাজনীতির লড়াই হয় রাজায় প্রজায়, সুতরাং প্রজার অস্ত্র কলমই হচ্ছে একালের প্রধান অস্ত্র। এই কারণে পলিটিসিয়ানরা সাহিত্যিকদের এলেম চান্ না—চান্ শুধু তাদের কলম। কিন্তু কলম হচ্ছে সেই জাতীয় জিনিষ যা কাউকে ধার দেওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বচন এই যে—

"লেখনী পুস্তিকা রামা পরহস্তে গতাগতা।
কদাচিৎ পুনরায়াতা ভ্রষ্টা মুষ্টা চ চুম্বিতা॥"

এই কারণেও পলিটিক্সের হাটে বাজারে কলম আমাদের সাম্‌লে রাখাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে এই যে, পলিটিক্সের রাজ্য আমাদের দেশ নয়। ওদেশে গেলে আমাদের জাত যায়, কেননা আমাদের যা ধর্ম্ম, ওরাজ্যে তার চর্চ্চা কর্‌বার যো নেই। ওদেশে টিঁকে থাক্‌তে হলে সর্ব্বপ্রথমে নিজের মনকে পরের মতের ছাই চাপা দিতে হয়। পলিটিকাল জগতে এক অদ্বৈতবাদ ছাড়া অপর কোনও বাদ চলে না। যে দলেই যাও দেখ্‌তে পাবে নেতারা নিজেদের বল্‌ছেন "সোঽহং" আর নীতরা তাঁদের বলছেন "তত্ত্বমসি।" আমা-দের পক্ষে অবশ্য অদ্বৈতবাদী হওয়া অসম্ভব, কেননা আমাদের মনের

যত কারবার সে সবই এই বহুরূপী বিশ্বের সঙ্গে, আর সেই কারণেই আমরা বহুবাদী। তারপর, পরের মতে সায় দিয়ে আমরা আমাদের মনের স্বাধীনতা হারাতে প্রস্তুত নই। কেননা স্বাতন্ত্র্যের চর্চ্চাটা আমাদের একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতিলোক তার নিজের স্বাধীনতা না হারালে সমগ্রজাতি যে তার স্বাধীনতা লাভ করে না, যে গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, সে শাস্ত্রে আমাদের দখল নেই। সে যাই হোক্ পলিটিক্‌সে এমন অনেক কথা বল্‌তে হয়, যার অর্থের সন্ধান নিতে গেলে ওক্ষেত্রে অনর্থ ঘটে। তারপর পলিটিক্‌সে স্বপক্ষ-বাৎসল্য ও বিপক্ষ-বিদ্বেষ কিঞ্চিৎ অতি মাত্রায় চর্চ্চা কর্‌তে হয়, নচেৎ দল বাঁধা যায় না। এ ক্ষেত্রে উদারতা দুর্ব্বলতা এবং নিরপেক্ষতা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই গণ্য। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে যে কতদূর লাঞ্ছিত গঞ্জিত, পীড়িত ও বিড়ম্বিত হ'তে হয়, ইতিহাসে তার একটি মস্ত বড় উদাহরণ আছে—বেচারা Cicero! তার লাঞ্ছনা যিশুখৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে সুরু হয়েছে, আজও তার শেষ হলো না; রোমের জের এখন জর্ম্মাণী টানছে। অথচ Cicero-র অপরাধ কি?—তিনি থেকে থেকেই সাহিত্য চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে রোমের Republic রক্ষা কর্‌তে প্রাণপণ বাক্যব্যয় কর্‌তেন। ফলে সে Republic'ও রক্ষা হয় নি এবং সাহিত্যের republic-এও তিনি যথাযোগ্য স্থান পান নি। পলিটিক্‌-সের শাস্তিভোগের হাত থেকে তিনি আত্মহত্যা করেও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পলিটিক্‌সের চর্চ্চা ত দেশশুদ্ধ লোকে করে, এমন কি এ ক্ষেত্রে রাম-শ্যাম-হরি ত জ্যেষ্ঠ অধিকারী বলেই গণ্য! তবে Cicero-র উপর নানা-দেশের নানা-লোকের নানা-ভাষায় নানা-রকম

কটু কথার কারণ কি? কারণ এই যে, এ চর্চ্চায় তিনি স্বাধিকার প্রমত্ততার পরিচয় দিয়েছেন, ভগবান তাঁকে অসাধারণ বাক্‌শক্তি দান করেছিলেন, সেই শক্তি তিনি পলিটিক্‌সে অপব্যয় করেছিলেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্য তাই তাঁকে অদ্যাবধি কর্‌তে হচ্ছে। আণ্টনীর ধর্ম্মপত্নী Fulvia, Cicero-র ছিন্নমস্তকের মুখে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করে' যে স্বামীভক্তির পরিচয় দিয়েছিল, আজকের দিনে অসংখ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত তাঁদের লেখনীর নিষ্ঠিবন Cicero-র প্রেতাত্মার গায়ে নিক্ষেপ করে, সেই স্বামী ভক্তির পরিচয় দিচ্ছেন! অবশ্য এঁদের স্বামী আণ্টনি নন—Cæsar, জার্ম্মাণদেশে যিনি Kaiser রূপ ধারণ করেছেন।

এইখানেই থামা যাক্, নচেৎ তুমি বল্‌বে আমি শুধু বিদ্যে দেখাচ্ছি। অবশ্য ও অপরাধের ভয়ে নিরস্ত হবার কোনরূপ কারণ নেই। পলিটিসিয়ানরা যদি মাঠে ঘাটে চিৎকার করে' তাঁদের অবিদ্যা জাহির কর্‌তে কুণ্ঠিত না হন, তাহ'লে আমরাই বা আমাদের বিদ্যে জাহির কর্‌তে কুণ্ঠিত হব কেন?

থামা উচিত এই কারণে যে, কলিকাতা সহরের হাল পলিটিক্‌সের সূত্রে, সেকালের রোম এবং একালের প্যারিসের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কথা পেড়ে আমি বিদ্যের পরিচয় দিতে পারি কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছি নে। তা ছাড়া কোথায় Cicero আর কোথায় আমরা। তাঁর হাতে ছিল ভাষার বিদ্যুন্মণ্ডিত বজ্র, আর আমাদের হাতে আছে টিনের ঝুমঝুমি। তবে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যখন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, তখন সাহিত্য বিভাগ অপরাপর বিভাগ থেকে অনতিবিলম্বে পৃথক হওয়াই কর্ত্তব্য।

অপর জাতের পক্ষে যাই হোক আমাদের মনের উপর পালটিক্সের ধাক্কা মাঝে মাঝেই আসা চাই—নইলে আমরা কাব্য পড়্‌তে পারি কিন্তু গড়্‌তে পার্‌ব না। আমাদের সমাজ এতই একঘেয়ে, এতই জড়ভরত যে, সে সমাজ নিত্য নতুন ঘা দিয়ে আমাদের মনকে জাগ্রত রাখে না, আর কাব্য-কলাও ঝিমন্ত মনের সৃষ্টি নয়। পলিটিক্সের উত্তেজনা ক্ষণিক হলেও উত্তেজনা ত বটে, অতএব স্বল্পমাত্রায় ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী। পলিটিক্স সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে যা অকর্ত্তব্য সে হচ্ছে ও-বিষয়ে কিছু লেখা। কেননা এ বিষয়ে কলম চালাতে গেলে style-এর মাথা খেতে হবে। পলিটিক্স লিখ্‌তে হবে প্রথমত ইংরাজিতে, তারপর খবরের কাগজের ভাবে ও ভাষায়। কাগুজি ভাবে যে গোঁড়া ভাব এবং কাগুজি-ইংরাজি যে পাতি-ইংরাজি, তার পরিচয় লাভ কর্‌তে বেশীদূর যেতে হবে না, "বেঙ্গলী" কিম্বা "অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লেই এ সত্যের সাক্ষাৎ মিল্‌বে। মণ্টেগু সাহেবের রিপোর্ট নিয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে এত যে মতভেদ ঘটেছে তার সর্ব্বপ্রধান কারণ—সে রিপোর্ট খাঁটি ইংরাজিতে লেখা। অপর পক্ষে "রউলট কমিশন"-এর রিপোর্ট সম্বন্ধে যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে দু'মত নেই, তার কারণ—সে রিপোর্ট পাতি-ইংরাজিতে লেখা।

এই সব কারণে, অতঃপর এই Reform Scheme-এর হুজুগ থেকে আলগা হ'তে চাই। কিন্তু যা চাই তাই কি ঘটে? পলিটিক্সেরও একটা নেশা আছে, আর সে নেশায় যে একবার মেতেছে তার পক্ষে ও জিনিষ ছাড়া বড় কঠিন। একটি বাঙলা গানের অস্থায়ী আমার মনে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, তার কারণ—গানটির

কথাগুলি যেমন pathetic, তার সুরও তেমনি উচ্চ অঙ্গের—একেবারে মালকোষ!

সে গানের প্রথম পদ এই—

"ছাড়্‌ব বল্‌লে কি ছাড়া যায়!
এ ত কাক নয়, কোকিল নয়,
যে হুস্‌ কর্‌লে উড়ে যায়!"

এ কবিতায় অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—কেননা ভালবাসা মাত্রই নেশা, আর নেশা মাত্রের-ই একটা মৌতাত আছে।

২০শে আগষ্ট, ১৯১৮ খৃঃ।

বীরবল।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা।

বিশ্বসৃষ্টির পর বিধাতা পুরুষ এক জোড়া মানুষের মাথায় প্রকাণ্ড কেতাবের বোঝা চাপাইয়া ধরাতলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্র জিনিসটা এক ভাবে খুবই সহজবোধ্য। তবে এরূপ সহজবাদীদের দলে ভিড়িতে অতি বড় ভূতভক্তও এখন বোধ হয় একটু পশ্চাদ্‌পদ, কারণ শাস্ত্র-সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আদি ও অকৃত্রিম হইলেও ইহা একেবারে নিরেট খেয়ালের কোটাতেই ঠাসা, জ্ঞান ও যুক্তির মুক্ত বাতাস তাহাতে একটুও লাগিবার জো নাই। কিন্তু এদিকে কালের এমনি প্রভাব, কোন প্রকার গোড়ামিই এখন আর নিজের অটল অন্ধতার উপর খাড়া থাকিয়াই তৃপ্ত নয়, যুক্তি তর্কের খোলা পথে কোন রকমে একটু চলিবার আশায় বেজায় ব্যগ্র, তা সহজ গতিতেই হোক্, আর তির্য্যক্ ভাবেই হোক্।

মানুষ ও কেতাবী শাস্ত্র বিশ্বস্রষ্টার যমজ সন্তান, এইরূপ মত যদি কোথাও কাহারও থাকে, তবে সেটার আমরা কিছুমাত্র সম্বর্দ্ধনা না করিয়া বিদায় দিতে পারি। কি রক্ষণশীল কি উদারনৈতিক, সকল তার্কিকই বোধ হয় এই মতটির পক্ষ হইয়া ওকালতি করিতে এখন কুণ্ঠিত। মনুষ্যসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ মানি আর না মানি, তাহাতেই বা এ বিষয়ে কি আসে যায়। মানুষ জীবপর্য্যায়ের

শেষ পরিণতিই হোক্, কিংবা কোন এডাম ও ইভের বংশধরই হোক্, মানুষ যে একেবারে পুঁথি বগলে করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হয় নাই, এটা একটা মস্ত তর্ক বিতর্ক করিয়া বুঝিবার জিনিস নয়। অন্য দেশের শাস্ত্র প্রায় কথঞ্চিৎ একেলে—অনেকের গায়ে সন-তারিখের মার্কা মারা—সাহজাত্য লইয়া তাহারা মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেই পারে না।

আমাদের বেদ লইয়াই বোধ হয় কিছু গণ্ডগোল। পণ্ডিতেরা এই বেদকে অপৌরুষেয় বলেন, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণকে একমাত্র বেদেরই সন্তান সন্ততি বলিয়া প্রচার করেন। বেদে ভারতীয় সকল শাস্ত্র বিজ্ঞানের উদ্ভব কিনা ইহা ভাবিবার এখন আমাদের দরকার নাই। বেদের উদ্ভবটাই কি এইটাই এখন জ্ঞাতব্য। বেদ অপৌরুষেয় মানে যদি এই হয় যে ওটা মানুষের রচনা নয়, বিধাতৃদেব স্বয়ং উহা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া আদি মানবের লাইব্রেরীতে রাখিয়াছিলেন, তবে সেটা এই আলোচনার একটা অন্তরায়ের মত হইয়া দাঁড়ায় বটে। কিন্তু এরূপ মতটা আমরা এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে প্রস্তুত নহি, শুধু পাল্টা জবাবে এইটুকুই বলিব, আগে বিধাতৃদেবের ভাষাটাই কি ঠিক হোক তারপর ও-কথা শোনা যাইবে। শুধু বৈদিক সংস্কৃতেই যে বিধাতা সাহিত্য বা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেন, এটা আজও কিছুমাত্র প্রমাণ করা হয় নাই। কাজেই ও মতটা এখন মুলতুবিই রহিল।

তবে এটাই কি ঠিক নয় যে, শাস্ত্র মানুষ গড়ে নাই—মানুষই শাস্ত্র গড়িয়াছে। বিধাতা মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অমনি টোল খুলিয়া বসেন নাই এবং নবজাত জীবটিকেও আগে শাস্ত্রের বেত্রাঘাতে

গড়িয়া পিটিয়া তারপর কার্য্যক্ষেত্রে পাঠান নাই। বিধাতা শুধু ভারতবর্ষেরই বিধাতা নহেন, এবং তাঁহার টোল যদি থাকে, সেটা শুধু বৈদিক-সংস্কৃতচর্চ্চারই কেন্দ্র হইতে পারে না। অপৌরুষেয়ের অর্থটা অমন করিয়া খাটাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুধীজন অবশ্যই জ্ঞান ও যুক্তির সহিত মিলাইয়া ইহার অন্য অর্থও করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। কিন্তু এখনও যাঁহারা চাঁদে বুড়ীর চরকা কাটায়, কি সাপের মাথায় ধরিত্রীর অবস্থানে অটল বিশ্বাস রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র। কেহ হয়ত মনে করিবেন এমন সাদা কথা লইয়া এত কালি কলমের খরচ কেন! আমরাও বলি ঐটাই ত ক্ষোভ!

(২)

অনেকে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারেন,—বেদ ত কেতাব নয়, বেদ হইল জ্ঞান। কেতাব পরে হইয়াছে এবং সেটা অবশ্যই মানুষের লেখা। এবং জ্ঞানকে অপৌরুষেয় বলা চলে। বেশ, কিন্তু এই জ্ঞান মানুষের ভিতর গজাইল কেমন করিয়া? শাস্ত্রান্তরে আছে, মানুষ যেমনই জ্ঞান বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলটি ভক্ষণ করিল, অমনি তাহার মনে জ্ঞানের বেদনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এ জ্ঞান বোধ হয় বৈদিক জ্ঞান নয়। কারণ এ জ্ঞানে হইল মানুষের পতন, বৈদিক জ্ঞানে হইল মানুষের উন্নয়ন। পতনই হো'ক, আর উন্নয়নই হো'ক এই বিভিন্ন জ্ঞানগুলো কি তড়িদ্বিকাশের মত সহসা মানুষের অন্তরে ঢুকিয়াছিল? এবং সে গুলো কি একেবারে পূর্ণ শাস্ত্রের আকার ধরিয়া মানুষের মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল? যদি তাহাই হয়, তবু সে শাস্ত্র বুঝিয়াছিল কে? অবশ্যই মানুষের মন। তাহা হইলেই শাস্ত্র আসার আগেই

মানুষের মনের সৃষ্টি মানিতেই হইবে। আর মনের সঙ্গে মনের পূর্ণ স্বাধীনতা তখন ত থাকিবেই। অতএব যে ভাবেই হো'ক মানুষের স্বাধীন মনই শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞান প্রথমেই মানুষের মন গড়িতে বসে নাই।

কিন্তু জ্ঞানের আগমন সম্বন্ধে কথাটা এখনও ঘোলাটে রহিয়াছে। সত্যই কি মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্য মনে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান একেবারে হঠাৎ আসিয়া উদিত হইয়াছিল। মানুষের মনটা কি জহ্নু মুনির মত সমগ্র জ্ঞান-মন্দাকিনী এক গণ্ডুষে পান করিয়াছিল? জহ্নু-মুনির গঙ্গা গলাধঃকরণের গল্পটা অবশ্যই পৌরাণিক, প্রামাণিক নয়। এমন করিয়া মনুষ্য-মনের জ্ঞান লাভের মতটাকেও পুরাণের কোঠাতেই ফেলা চলে, কিন্তু প্রমাণের কাছ ঘেঁসিয়াও আনা যায় না। কারণ এটাও নিতান্ত আজগুবি ও গাজুরি বলিয়াই ঠেকে। মানুষের বর্ত্তমান ও অতীত ইতিহাস ইহার পক্ষে কোনই সাক্ষ্য দেয় না। সমগ্র জ্ঞানের কথা দূরে থাক্, একটি বিশেষ জ্ঞানও মানুষ বহু সাধনার পরই লাভ করে। এ সত্যের কোন একটা বিশেষ উদাহরণ দিবার দরকারই নাই, ইহা মানুষের জীবনে নিয়তই ঘটিতেছে। শুধু ব্যষ্টি জীবনেই নয়, সমষ্ঠি জীবনেও। কত ব্যক্তি-পরম্পরার সাধনার ফলে তবে একটি জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। কত পুরুষ-পরম্পরার চেষ্টায় তবে একটি জাতীয় সংস্কার গড়িয়া ওঠে। তবে কেমন করিয়া বলিব মানব সৃষ্টির আদিতে সমস্ত জ্ঞানগুলো এখনকার কল-টেপা বৈদ্যুতিক আলোর মত—মানুষের মনে একেবারে এক চোটে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া-ছিল। মানুষের আর যাহাই বদলাক, তাহার প্রকৃতিটী ডিগবাজি খাওয়ার মত কখনই উলটাইতে পারে না।

মানব মনে জ্ঞান কখনো এমন করিয়া একেবারে আসে নাই আর সেটা কোন যুগেই নিঃশেষে আসিবার জিনিসও নয়। জ্ঞানের একেবারে আসাটা অনেকের কাছে অসম্ভব ঠেকিলেও, তাহার নিঃশেষে আসাটা তাঁহারা আবার অসম্ভব রকমই বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ভগবান কোন অজ্ঞাত অতীতেই তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারের যাহা কিছু সব মানুষকে দিয়া ফেলিয়াছেন, এখন তিনি যেন সম্পূর্ণ রিক্ত-হস্ত। অতীতের প্রতি একটা একান্ত ভক্তি ছাড়া এই ধারণার কি অন্য কোন ভিত্তি আছে? অতীতের প্রতি ভক্তি অবশ্যই ভাল জিনিস, কিন্তু সেটাকে এমন গরহিসেবী খেয়ালে বাড়াইয়া তোলা নিশ্চয়ই ভাল জিনিস নয়। ভারতের বেদ গড়িতে কোন কাল্পনিক অতীতে ভগবানের জ্ঞান-ভাণ্ডারটা সব উজাড় হইয়া গেল, এরূপ ধারণায় বেদের গৌরব বাড়ে কি না সন্দেহ, জ্ঞানের গৌরব ত নিশ্চয়ই বাড়ে না। গোটা কত খণ্ড আলোক—তাহার সংখ্যাও যতই কেন হোক না—সূর্য্যের জ্যোতির কাছে যে নিতান্ত ক্ষুদ্র, এটা কে না স্বীকার করিবে? একটি পরিমিত জ্ঞানকে আত্মস্থ করা অপেক্ষা কি অনন্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়া বেশী গৌরব নয়?

কি প্রাকৃতিক জ্ঞান, কি অধ্যাত্ম জ্ঞান, কোন জ্ঞানই কোন দেশ কাল পাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। দুয়েরই ক্রমবিকাশ আছে, ক্রমোন্নতি আছে। তবে দুয়ের বিকাশ ও উন্নতি অবশ্যই সব সময়ে ও সব যায়গায় সমান বেগে চলিতে থাকে না। কোন একটি বিশেষ যুগে বা বিশেষ স্থলে এই দুয়ের কোন একটির বিশেষ উন্মেষ যে ঘটে, এ কথা অবশ্যই মানি। কিন্তু সেই বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ উন্মেষের সঙ্গে তাহা যে একেবারে শেষ হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয়ই মানিবার মত

নয়। ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম জ্ঞানের দেশ, য়ুরোপ প্রাকৃত জ্ঞানের কেন্দ্র অথবা অতীতে অধ্যাত্ম জ্ঞানের চর্চ্চা বেশী হইয়াছিল, এখন প্রাকৃতিক জ্ঞানের উপরেই মানুষের বেশী ঝোঁক—এ রকম তর্ক কতকটা হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক জ্ঞানটা য়ুরোপ একেবারে বিশ্বের ভাণ্ডার ঝাড়িয়া আনিয়াছে, বলা যদি নিতান্ত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হয়, তবে অতীত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপর সর্ব্বগ্রাসী দাবিটাকেই বা কেমন করিয়া নিতান্ত সম্ভব ও স্বাভাবিক রকমে খাড়া করা যায়?

(৩)

এখন তর্ক উঠিতে পারে, সকল জ্ঞানই কি তবে অনুশীলন-সাপেক্ষ? তাহাই যদি হয়, তবে মহাপুরুষদের বিশেষত্ব কি? তাঁহারা ত আর বহু গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন নাই। দেশের পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানগুলো ঘষা মাজা করাই ত তাঁহাদের জীবনের কাজ ছিল না। তাঁহারা ছিলেন মহাগিরির অভ্রভেদী চূড়ার মত। স্বর্গের নবতর কল্যাণতর আলোকেই তাঁহাদের ললাটদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, মর্ত্তের বহু আয়াসপুষ্ট ঝাড়লণ্ঠনের বাতিতে নয়। তাঁহারা ধুলা কাদা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জ্ঞানরত্নের টুকরা-টাকরা সংগ্রহ করেন নাই, আকাশ হইতে অজস্রধারে এই রত্নবৃষ্টি তাঁহাদের চারিধারে পড়িয়াছিল। অনুশীলনের অবিরাম আঘাতে তাঁহারা জ্ঞান-মন্দিরের দরজাটা একটু একটু করিয়া খোলেন নাই, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই সরিয়াছিল—তাঁহাদের যোগমন্ত্রের প্রভাবে। যোগী না হইয়াও

যোগ মানি, এবং যোগের এই মাহাত্ম্যেও অবিশ্বাস নাই। কিন্তু মহাপুরুষ বা যোগী যে একটা নিতান্ত অসম্ভব রকম আকাশকুসুম জাতীয় জিনিস এটা কখনই মনে হয় না। মহাপুরুষকে যদি ধবল-গিরি বলি, তবে তাঁহার সমসাময়িক মানবসমষ্টিকে হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিব—পুরাণের পাখাওয়ালা মৈনাকের সঙ্গে যাঁহারা তাঁহাকে সমশ্রেণী করিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। পাহাড়ের সঙ্গে পাহাড়ের শৃঙ্গের একাত্মতা উড়াইয়া দিলে একটা কাল্পনিক খেয়ালই সৃষ্ট হয়, সেটা আর সত্যকার জিনিস থাকে না। মহাপুরুষ-মহীরুহের মাথাটা আকাশ স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু তাহার শিকড়টা থাকে মাটির ভিতরেই। তাহার পত্রের মুখ স্বর্গের বাতাস হইতে অনেক পুষ্টিকর খাদ্য পায় বটে কিন্তু মাটির রসে তাহার বড় কম বর্দ্ধন করে না। কৃষ্ণ বা খৃষ্ট জুলু বা কাফ্রীর মধ্যে জন্মান নাই। মহাপুরুষ তাঁহার দেশকে উচ্চে তোলেন সত্য কিন্তু তাঁহার নিজের দেশই আবার তাঁহার উচ্চতা পরিমিত করে। আর পৃথিবীতে ধবল-গিরি যেমন একমাত্র পর্ব্বতশৃঙ্গ নয়, তেমনই কোন বিশেষ দেশের মহাপুরুষের মধ্যেই মহাপুরুষত্বের খতম হয় না। মহাপুরুষের আবির্ভাব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল কালেই ঘটিতে পারে। সেই আবির্ভাবের সঙ্গে কত শাস্ত্রমতেরও বিবর্ত্তনের ও বিসর্জ্জনের সম্ভাবনা।

জ্ঞানীই বল, আর যোগীই বল, সকলেই নিজ নিজ সমাজ-ক্ষেত্রেই ফুটিয়া ওঠেন, আকাশকুসুমের পর্য্যায়ে কাহাকেও ফেলা চলে না। ইঁহারা নব নব জ্ঞানের সৌরভে ধরিত্রী বক্ষ আমোদিত করেন বটে, কিন্তু সে সৌরভের সম্পর্ক শুধু নন্দনের পারিজাতের সঙ্গেই নয়

ক্রমিক অনুশীলনে দেশের মধ্যে যে জ্ঞানের আবাদ হইয়াছিল, তাহার গন্ধও সেই মর্ত্ত্যের পুষ্পের সৌরভে বহুল পরিমাণে সৌরভিত। ফল কথা, জ্ঞানের আবির্ভাবের মধ্যে কখনবা একটি আকস্মিক দৈব ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও ক্রমবিকাশের পদ্ধতিটা সেই সঙ্গে না মানিবার জো নাই। জ্ঞানের এই দৈব ও মর্ত্ত্য বিকাশ এক বিশেষ দেশ কাল পাত্রের বিশেষ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, ধরাবক্ষে মানুষের স্থিতি যতদিন, ততদিনই ইহার প্রক্রিয়া সর্ব্বত্র চলিতে থাকিবে। এই বিকাশ-ক্রিয়ার মূলে যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা চিরদিনই বিদ্যমান, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ বিকাশ স্থবিরত্বে সম্ভবে না, ইচ্ছার গতিশীলতা হইতেই যে ইহার উদ্ভব।

(৪)

তবে স্বাধীন মতের নাম শুনিলেই আমরা আঁতকাইয়া উঠি কেন? পুরাতন বন্ধনের অচলতার মধ্যে মানুষ বেশ একটা আরাম পায়। নূতনকে মানুষ স্বভাবত একটু সন্দেহের চক্ষে দেখে। যাহার সঙ্গে বহুদিন ঘরকন্না করিয়াছি, তাহাকে মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে পারে, একজন নূতন অতিথিকে ততটা বিশ্বাস করিতে চায় না। পুরাতন কতকটা নিশ্চিত, ইহার মধ্যে একটা শান্ত নিশ্চিন্ততা আছেই। আবার নূতনের সঙ্গে একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কা জড়ানো। তাই নূতন অনেকেরই দু-চক্ষের বিষ। নূতনকে বিশ্বাস করা দূরে থাক, তাহাকে পরখ করিবার ইচ্ছাটাই অনেকে দাবিয়া রাখে। তাহা হইলেও এমন সময় আসে যখন ঐ পুরাতন নিশ্চিন্ত শান্তিটিই মানুষের মনের উপর একটা বোঝার মত হইয়া দাঁড়ায়। সে তখন

একটু চিন্তা করিবার স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত হয়। শেষে সে বুঝিতে পারে, যাহাকে সে বিষ বলিয়া ভাবিয়াছে তাহারই মধ্যে অমৃতরূপে তাহার নব জীবনের বীজই বিদ্যমান।

নূতন মাত্রকেই আমরা অশুভ মনে করিব কেন? আর এই নূতনের জননী যে মানব-মনের স্বাধীনতা, তাহাকেই বা শত্রু বলিয়া ভাবিব কেন? যদি শত্রুর কথাই তোল, তবে দেখিবে নূতন পুরাতন উভয়ের মধ্যে সে ওৎ পাতিয়া থাকিতে পারে। পুরাতনের বন্ধনে কিছু না কিছু জড়ত্বের জাল রচনা করে আবার নূতন স্বাধীনতার মধ্যেও কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিবার সম্ভাবনা। অবিমিশ্র মঙ্গল কোনটাই নয় অথচ দুই-ই আমাদের চাই।

যখন দুই-ই আমাদের দরকার তখন উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজিতেই হয়। কিন্তু এই সামঞ্জস্য করার ভার ত আর পুরাতন শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপানো যায় না। পুরাতন শাস্ত্র নিজে ত এখন কতকগুলো কালির আঁচড় মাত্র, তা সেটা ভূর্জ্জপত্রেই থাকুক, আর ফুলিস্কেপেই পড়ুক। এই কালির আঁচড়ের সঙ্গে যখন আমাদের জ্ঞানের সংযোগ ঘটে, তখনই না তাঁহার গৌরব আমরা বুঝ্‌তে পারি। আর স্বাধীনতা জিনিসটি কি, তাহাত আমরা নিজেদের জীবনে পদে পদে বুঝিতেছি। মানুষ যখন শাস্ত্র ও স্বাধীনতা দুই-ই বোঝে, তখন মানুষের পক্ষে উভয়ের একটা সামঞ্জস্য সাধন করা অসম্ভব নয়। অসম্ভব ত নয়-ই, বরং মানুষ এরূপ একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা নূতনের প্রচারক তাঁহারা ত একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টায় ফিরিবেন-ই, কিন্তু পুরাতনের উপাসকেরা-ই কি এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন?

কথাটা শুনিতে একটু হেঁয়ালীর মতই ঠেকে। নিরেট শাস্ত্রাধীনতার মধ্যে আবার সামঞ্জস্যের স্থান কোথায়! সামঞ্জস্য ত নূতনকে লইয়া, এই নূতনকে আমল দিলেই যাঁহাদের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে, তাঁহাদের সামঞ্জস্যে প্রয়োজন কি? তাঁহাদের ধর্ম্মে ইহার প্রয়োজন না থাকুক, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্ম অনেক সময় এই প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। শাস্ত্র না বদলাক, সময় যে বদলায়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। আবার অবস্থার অনুযায়ী একটু ব্যবস্থার বদল না করিলেই বা চলে কৈ? হাজার বৎসরের বিধিগুলো এখনকার অবস্থার সঙ্গে কি ষোল আনা খাপ খাওয়ান যায়? তাই অবস্থার গতিকে শাস্ত্রপন্থীরও পক্ষে সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক পুরাতনের সঙ্গে এই নূতনের একটু সমন্বয় করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তবে তাঁহার সমন্বয়টা চলে একটু বেনামি রকমে। পুরাতনের সঙ্গে নূতন বিধির সংযোগ করা তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম হইলেও, পুরাতনকে মাজিয়া ঘষিয়া একটা নূতন জলুস দিতে তিনি পিছ পা হন না। তাঁহার শাস্ত্রের অক্ষরগুলো যেমন, তেমনই থাকে বটে, কিন্তু তাহার অর্থটি, তাঁহার ব্যাখ্যা, ভাষ্য টীকা টিপ্পনির মুখে বেশ একটু ওলট পালট খায়। তবে এই চেষ্টা অনেক সময় সম্যক ফলবতী হয় না। অবস্থার একটু আধটু অদল বদলে এটুকুতে কিছু কাজ দেখিতে পারে কিন্তু অবস্থাটা যখন কালপ্রভাবে বড় বেশী ফারাক হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর ঐ বেনামি সমন্বয়ের ছিটে-ফোটায় কিছুই শানায় না।

(৫)

যাঁহারা স্বাধীনতার প্রচারক, শাস্ত্রপন্থীরা তাঁহাদের উপর বড় সদয় নহেন। ইঁহাদের উক্তিগুলো শাস্ত্রপন্থীরা অনেক সময় নিজেদের সুবিধা মত বেশ একটু একপেশে রকমেই ব্যাখ্যা করেন। ইঁহাদের কথার অ-বিভক্ত ভাবটা না বুঝিয়া তাহার বিভক্ত শব্দগুলোই যেন বেশী নাড়াচাড়া করা হয়। তাই অনেক সময় এই সব আলোচনার মধ্যে ব্যখ্যাতার উপলব্ধি অপেক্ষা যেন আক্রোশই বেশী প্রকাশ পায়। শাস্ত্রপন্থীদের শাস্ত্রের স্থান বুঝি স্বয়ং ভগবানের চেয়েও উচ্চে। শাস্ত্রের উপর কোন রকম একটু মৃদু আলোচনার আঁচও ইঁহারা সহ্য করিতে অপারগ। কাহারও ভাবভঙ্গীতে শাস্ত্রের প্রতি একটু অ-বশ্যতা দেখিলেই তাঁহারা বেজায় খাপ্পা হইয়া পড়েন। এই অ-বশ্যতার কারণটা কি এবং সেটা বাস্তবিক বিবেচ্য কি না, এ সব দেখিবার তাঁহাদের অবসরই থাকে না। তাই তাঁহাদের পাল্টা জবাবে যুক্তি ততটা থাকে না, যতটা থাকে হয় ভাবের ফোয়ারা, নয় গালি-গলাজের নর্দ্দামা। এই ফোয়ারা বা নর্দ্দামার বেগ কোন সমাজকে ক্ষণিক টানিয়া লইয়া যাইতে পারে কিন্তু সে খুব বেশী দূর নয়। কারণ শাস্ত্র-গৌরবের যে একটু অংশ তাঁহারা নষ্ট করিতে বসিয়াছে মনে করেন তাহার পুনরুদ্ধারের যথার্থ পথ ত আর ইহাতে একটুও বাড়ে না বরং ক্রমে মরিয়াই আসে।

শাস্ত্রপন্থীদের অভিধানে স্বাধীনতা মানে—একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা। শাস্ত্রের প্রতি অ-বশ্যতার হ্রাস মানে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র, রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি একেবারে সবগুলো সাপ্টাইয়া অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন। স্বাধীনতা জিনিসটা কি বাস্তবিক এমনই বিকট! যখন

আমাদের আত্মাপুরুষ কোন একটা জড়ত্ব বা দাসত্বের বন্ধন ছিঁড়িতে উদ্যত, তখন তাহার সেই উদ্যমটায় অল্পাধিক একটা বিপ্লবের ভাব থাকিতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু সেইটাই ত আর স্বাধীনতার চিরন্তন মূর্ত্তি নয়। যে শাস্ত্রটা বর্ত্তমানে মানবাত্মার প্রসারণে অন্তরায় ঘটায়, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা সেটাকে না ছাঁটিয়া থাকিতে পারে না কিন্তু তাহা বলিয়াই আমরা অতীত হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাকে নির্ম্মূলে ধ্বংস করাই স্বাধীনতার কাজ নয়। যদি কখন কোন স্বাধীনতা এমন প্রলয়ের আকারে দেখা দেয়, তবে তাহারও বিলয় অচিরেই ঘটে। এবং আবার সেই মৃত্যুঞ্জয় অবিনাশী অতীত নূতন কল্যাণের রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়।

স্বাধীনতার কাজ শাস্ত্রকে বিলুপ্ত করা নয়, শাস্ত্রকে আত্মস্থ করা। শাস্ত্র যখন আমার জ্ঞানের ভিতর থাকে না, থাকে শুধু কেতাবের অক্ষরে, দশের কথায় ও দেশের প্রথায় তখন তাহা আমার মনে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করিলেও যথার্থ আমার জিনিস হয় না। যখন তাহাকে আমি আমার নিজের সাধনা ও উপলব্ধির মধ্যে লাভ করি, তখনই সে আমার হয়। স্বাধীনতা শাস্ত্রকে বাদ দিতে চায় না, কথা ও প্রথা বহুকাল ধরিয়া তাহার উপর যে একটি পুরু জাল বুনিয়াছে, সেইটাকে সরাইয়া তাহার আসল মূর্ত্তিটি দেখিতে চায়। এই দেখিবার ফলে তাহাতে যদি কোন অমঙ্গল বা অসঙ্গতির লক্ষণ ধরা পড়ে স্বাধীনতা তখনই তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে কোমর বাঁধে, নহিলে শাস্ত্র দেখিলেই তাহার মাথায় মুগুর মারা, স্বাধীনতার এমন ডাকাতী পেশা নয়।

এমন যথেচ্ছ ভাবে মুগুর মারিতে গেলে সে আঘাত কি আমাদের স্বাধীন জ্ঞানের নিজের গায়েও কতকটা পড়ে না? আমাদের স্বাধীন

জ্ঞানের ভিতরে কি পূর্ব্বসঞ্চিত শাস্ত্রজ্ঞান নিহিত নাই? অতীতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে বাদ দিলে মানবের স্বাধীন জ্ঞানের আর থাকে কি? সেটা ত তখন আদি মানবের একটা অপরিস্ফুট আবছায়া রকমের সংস্কারে পরিণত হয়। তাহার পরিধি অতি ক্ষুদ্র, তাহার চিন্তাশক্তি অতি তুচ্ছ। ক্রমশঃ বিকসিত, বিবর্দ্ধিত ও সঞ্চিত জ্ঞানের সাহচর্য্যেই না সেই স্বাধীন জ্ঞান আজ এমন পরিপুষ্ট। যে জাতির মধ্যে সমষ্ঠিগত জ্ঞান বৰ্দ্ধিত ও সঞ্চিত হয় নাই, তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীন জ্ঞানও অতি অপরিণত। পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞান-সমষ্ঠি দ্বারাই আমাদের ব্যষ্টি-জ্ঞানের উৎকর্ষ পরিমিত হয়। তবে স্বাধীন জ্ঞানকে একটা উদ্ভট কিছু বলিয়া আমাদের মনে করিবার কি কারণ আছে? আমাদের স্বাধীন জ্ঞান ত আর পূর্ব্ব-লব্ধ শাস্ত্র জ্ঞানের একান্ত সম্পর্ক বিরহিত একটা কিম্ভূত কিমাকার জিনিস নয়।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বাধীন জ্ঞানের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা দিলেও, বাস্তবিক তাহারা উভয়ে উভয়ের শত্রু নয়। তাহারা পরস্পরের পরিপোষণই করিয়া থাকে। এই পরিপোষণের পথ খোলসা থাকিলে, বিরোধের ভাব কখনই থাকিতে পারে না। আমাদের এই কথা হইতে বোধহয় কেহই এমন বুঝিবেন না যে আমরা স্বাধীন মত মাত্রকেই বরণ করিয়া লইতে বলিতেছি, মানবের কল্যাণের জন্য যেমন শাস্ত্রজ্ঞানের দরকার, তেমনই তাহার কল্যাণের জন্যই স্বাধীন জ্ঞানের দাবিটাও অগ্রাহ্য নয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

পয়ার।

:*:-

কবিবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

স্থ-করকমলেষু—

সবিনয় নিবেদন,

সেদিন "বিচিত্রায়" যখন ছন্দের আলোচনা হয়, তখন সে আলোচনায় যে আমি যোগদান করি নি, তার প্রথম কারণ—সভার একটেরে বসেছিলুম বলে', আপনার বক্তব্য সকল কথা আমার কর্ণগোচর হয় নি, এবং তার দ্বিতীয় কারণ ওবিচারে আমি অনধিকারী। এ কথা আমি বিনয় করে বল্‌ছি নে। এ বিষয়ে আমার শক্তির অভাবের পরিচয় আমি আর্টের অপর একটি ক্ষেত্রে বহুকাল পূর্ব্বে লাভ করি। আমার তালজ্ঞান যদি সহজ হ'ত, তাহ'লে আমি একজন চলনসই গাইয়ে হ'তে পারতুম ; কেননা আমি তাল-কাণা হ'লেও সুর-কালা নই,—এবং সুর ভগবান শুধু আমার কানে নয় কণ্ঠেও দিয়েছিলেন। আমার এমন একদিন গিয়েছে যখন, আমি আর সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে গান অভ্যাস কর্‌বার চেষ্টা করেছি এবং সে চেষ্টার ফলে সুরকে কায়দা করে আন্‌তে অল্প-বিস্তর কৃতকার্য্যও হয়েছিলুম। কিন্তু একদিন আমার একটি পাখোয়াজি বন্ধু আমাকে 'বেতাল সিদ্ধ গায়ক' বলাতে চিরদিনের মত সঙ্গীতের চর্চ্চা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হই। অতএব এ কথা স্বীকার

করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, ছন্দ সম্বন্ধে আমার অশিক্ষিত কিম্বা শিক্ষিত কোনরূপ পটুত্ব নেই। কবিতা আমি ছন্দের দিকে নজর রেখে পড়ি নে। তবে এমন সব কবি আছেন, যাঁদের কবিতার ছন্দ অতিশয় অন্যমনস্ক লোকেরও চোখ এড়িয়ে যায় না—যথা ভারতচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। এঁদের লেখা পড়েই কবিতায় ছন্দের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমার চোখ ফুটেছে।

এ অবস্থায় আপনার অনুরোধে আমি কেন যে অনধিকার চর্চ্চা করতে উদ্যত হয়েছি তারও কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। সেদিনকার সভায় আমার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও ভদ্রলোক আমার মৌনতা, আপনাদের মতের সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেন্ নি। তিনি বলেন যে, আমি পয়ার ত্রিপদীর ভক্ত বলে ওক্ষেত্রে নীরব ছিলুম। এ কথা বলার অর্থ এই যে, যার বিষয়ে দুটো ভাল কথা বল্‌বার নেই তার বিষয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। আমি পয়ার ত্রিপদীর ভক্ত কি না সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, তবে বাংলার ঐ দুই মামুলি ছন্দের স্বপক্ষে যে কিছু বলবার নেই, এ কথা আমি বিনা ওজরে স্বীকার করে নিতে পারি নে। সুতরাং আমি এই সুযোগে পয়ার ত্রিপদীর পক্ষ থেকে একটু ওকালতী করতে চাই। বলা বাহুল্য ছন্দ সম্বন্ধে আমি যা বল্‌ব সে উপরচাল হিসেবে গণ্য করতে হবে—অর্থাৎ তা গ্রাহ্য করা আর না করা সম্পূর্ণ খেলোয়াড়-দের হাত।

আমি পয়ার ত্রিপদীর বিরোধী নই, কেননা আমি কোনও ছন্দেরই বিরোধী নই। সকল ছন্দেরই এক একটা বিশেষ মূল্য, বিশেষ মর্য্যাদা ও বিশেষ সার্থকতা আছে। আমি কোনও art-form-কেই অবজ্ঞা করিনে ; এবং প্রতিটিকেই আর্টের রাজ্যের চিরস্থায়ী

সম্পদ বলে মনে করি। শুনতে পাই এই জড়জগতের শক্তি ও পরমাণুর পুঁজি বাড়েও না কমেও না, প্রকৃতির ও মূলধন অনাদি ও অনন্ত। চোখের সুমুখে আমরা যে হ্রাস বৃদ্ধি দেখতে পাই তার কারণ বিশ্বের একদিকে যেমন শিকস্তি হয় আর একদিকে তেমনি পয়স্তি হয়। এর এক অংশে যখন কিছু যোগ হয়, তখন বুঝতে হবে আর এক অংশে ঠিক ততখানি বিয়োগ হয়েছে। সমগ্রটার পরিমাণ ও ওজন চিরকালই সমান থেকে যায়। কিন্তু মনোজগতের হিসেবটা এর ঠিক উল্টো। জড়জগৎটা আমাদের পড়ে পাওয়া আর মনোজগৎটা আমাদের হাতে গড়া। সে জগৎটা শুধু বেড়েই চলেছে আর সে যোগের গুণে। মানুষের জ্ঞানের সম্বল, চিন্তার ধারা, অনুভূতির প্রসার যে যুগের পর যুগে বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই। তার কারণ এক যুগের মনের ধনের সঙ্গে আর এক যুগের মনের ধনের যোগ হচ্ছে। এস্থলে অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্বচিন্তা কি সব বজায় থাকে, না ও সব বস্তু ক্রমান্বয়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে এবং নূতন জ্ঞান নূতন চিন্তা পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান অধিকার করছে? এর উত্তরে আমি বলি—পুরাতনই নূতনের জন্মদাতা; সুতরাং তার যা যথার্থ সম্পদ নূতন তা উত্তরাধিকারী সত্ত্বে লাভ করে। নূতন কতক পরিমাণ পুরাতনেরই জের টেনে চলে—এ সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মমত নীতিমত প্রভৃতি কখনও স্ব-রূপে চিরস্থায়ী হতে পারে না, এ সবারই অস্তিত্ব কালের অধীন। একমাত্র আর্টই কালের অধীন নয়। যাকে আমরা আর্ট বলি তা আপাদ-মস্তক একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি বলে তা আর হ্রাস-বৃদ্ধির অধীন নয়। Venus de

Milo, তাজমহল, শকুন্তলা ও হ্যামলেট প্রভৃতি প্রতিটি একটি সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মানসী সৃষ্টি, ওর উপর আর মানুষের খোদকারি চলে না। মানুষে নূতন সৃষ্টি যে করতে পারে শুধু তাই নয়—সে যদি প্রাণে নয় মনেও বেঁচে থাকতে চায়, তাহ'লে মনের দেশে সে নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু যা আর্ট তা মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী। A thing of beauty is a joy for ever—এ কথা যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য।

মানুষে যে শুধু আর্ট সৃষ্টি করে তাই নয়—সেই সঙ্গে কতকগুলি art-form-ও সৃষ্টি করে। এবং আর্টের মত এই আর্ট-ফরমগুলোও—মানুষের চির-সম্পদ। এই সব চিরাগত art-form-কে সানন্দে বরণ করে নেওয়ায় মানুষে আত্মার দৈন্য নয়—শক্তিরই পরিচয় দেয়। মানুষে যাকে ভাষা বলে সেও একটি art-form ছাড়া আর কিছুই নয়, আত্ম-প্রকাশের একটি বিশিষ্ট উপায়। এই ভাষার ছাঁচে নিজের মন ঢালাই করতে কোনও কবি অদ্যাবধি আপত্তিও করেন নি, ব্যথাও বোধ করেন নি। এ ছাঁচ একটি প্রকাণ্ড ছাঁচ বলে লোকে এটিকে ছাঁচ বলে চিনতেই পারে না, অথচ ভাষা ভাবের ছাঁচ বই আর কিছুই নয়। তর্ক অবশ্য ওঠে ছোটখাটো ছাঁচ নিয়ে—যেমন গ্রীসের নাটকের ছাঁচ, আমাদের দেশের রাগরাগিণীর ছাঁচ, আর সকল দেশের কবিতার ছন্দের ছাঁচ। এই সব সঙ্কীর্ণ ছাঁচ যে গুণী লোকের প্রতিভাকে চেপে মারে নি—তার প্রমাণ Æschylus, Sophocles Euripides প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বাগ্রগণ্য নাটককারেরাও ঐ একই ছাঁচে তাঁদের সকল মন, সকল প্রাণ, সকল জ্ঞান, সকল ধ্যান ঢেলে দিয়ে এক একটি অপূর্ব্ব সুন্দর-মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন, অথচ এঁদের একের প্রতিভা অপরের

প্রতিভার স্বজাতি নয়। Æschylus-এর সঙ্গে Euripides-এর তফাৎটা কতদূর তার পরিচয় Aristophanes-এর Frogs-এ পাবেন। এঁদের জ্যেষ্ঠটি দক্ষিণ মার্গের, কনিষ্ঠটি বাম মার্গের এবং মধ্যমটি মধ্যপথের চরম কবি। ভরসা করে চরম কবি বল্‌ছি এই জন্যে, যে অনুবাদে যাঁদের রচনা এত চমৎকার, তাঁদের মুল রচনার সৌন্দর্য্যের নিশ্চয়ই আর তুলনা নেই।

এই লম্বা ভূমিকাই প্রমাণ যে, এক্ষেত্রে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত হতে পিছ-পা হচ্ছি, কারণ ছন্দের উপর হস্তক্ষেপ কর্‌তে আমি স্বতঃই নারাজ। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দের বাঁধাবাঁধি নিয়মকে আমি কবিতা রচনার শত্রু নয়—মিত্র হিসেবেই গণ্য করি। আমি ইতিপূর্ব্বে আমার মত দু'ছত্রে প্রকাশ করেছি। আমি লিখেছি—

> ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
> শিল্পী যাহা মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।

একথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমার মনের কথা, আমার সনেটের অন্তরে যে মুক্তি নয়—স্ফূর্ত্তি লাভ করেছে, তার কারণ আমি ছন্দ-শিল্পী নই। আপনার হাতে ঐ একই জিনিস চতুর্দ্দশ-দল ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ত। পয়ার ত্রিপদী যে ছন্দশিল্পীদের তেমন প্রিয় নয়—তার কারণ এদের বন্ধন কড়া নয়—ঢিলে। এক হিসেবে এ দুই verse-form-এর ঐ সহজ ঢিলেঢালা ভাবটা দোষেরও বটে গুণেরও বটে। আনাড়ির হাতে এ দুই-ই যেমন অচল, গুণীর হাতে আবার তা তেমনি সচল। কেন তা পরে বল্‌ছি।

(২)

পয়ার বাংলা কাব্যের শুধু বাঁধা সড়ক নয়—একেবারে বড় রাস্তা, সাধুভাষায় যাকে বলে রাজ-পথ। কাব্যের এ রকম রাজ-পথ সকল ভাষাতেই আছে। গ্রীকের Hexametre, সংস্কৃতের অনুষ্টুপ, ফরাসীর Alexandrine, ইংরাজির Iambic-pentametre-এ—সবই হচ্ছে পয়ারের স্বজাতি। এক আধ মাত্রার কমবেশিতে কিছু যায় আসে না—এ সব ছন্দের ভিতর একটা মস্ত বড় মিল আছে। এ সব ছন্দই চরণে চরণ মিলিয়ে চলে এবং এদের প্রত্যেকের প্রতি চরণটি কিঞ্চিৎ লম্বা। এর একটি কারণ এ সব ছন্দের জন্ম গদ্যের জন্মের বহুপূর্ব্বে হয়েছিল। সভ্যতার আদিযুগে এই শ্রেণীর পদ্যই ছিল মানুষের সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়। এরি সাহায্যে মানুষকে গল্প বল্‌তে হ'ত, জ্ঞান বিতরণ কর্‌তে হ'ত, রাগ বিরাগ প্রকাশ কর্‌তে হ'ত। কিন্তু এ সব ছন্দ হচ্ছে প্রধানত আখ্যায়িকারই বাহন। একটানা একটা লম্বা গল্প বলে যাবার জন্য এই হচ্ছে কাব্যের সনাতন পথ। এ সব ছন্দে মানুষের মন চল্‌তে পারে, এমন কি ছুট্‌তেও পারে কিন্তু নাচ্‌তে পারে না, অন্তত সহজে ত নয়-ই। ভাবের এ বাহনের যে শুধু পিঠ চৌড়া তা নয়—এর গতিও ধীর, ললিত। এ ছন্দের ভিতর space এবং repose দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেই কারণে অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল দেশেই কবিরা ভাবের দীর্ঘযাত্রা কর্‌তে হলে ঐ প্রশস্ত পথই অবলম্বন করেন। এ সব ছন্দের তাল হচ্ছে চৌতাল ধামারের ঘরের। পয়ারের তাল ঢিমে বলে আনাড়ির হাতে তা প্রায় গদ্য হয়ে যায়—অপরপক্ষে গুণীর হাতে তার ধ্বনি মৃদঙ্গের পরং-এর মত জমাট ও

ভরাট হয়ে ওঠে। উদাহরণ—রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত। এ পয়ার কালিদাসের মন্দাকান্তার অনুরণনে ভরপুর। এ ছন্দ ইচ্ছামত দ্রুত ও বিলম্বিত করা যায়—অবশ্য এর অবিরল ঘন ভাবটি বজায় রেখে, নচেৎ এর স্ব-রূপটি বজায় থাকে না। এই কারণে যদিচ ভাবপ্রকাশের একটি নতুন ও সোজা পথ—গদ্য বেরিয়েছে তবুও কাব্যের এই আদি ছন্দ আজও সশরীরে বর্ত্তমান হয়েছে। গদ্যেরও অবশ্য rhythm আছে কিন্তু metre নেই। এই metre-এর অভাবেই গদ্য এশ্রেণীর পদ্যের মত সাকার হয়ে উঠ্‌তে পারে না এবং art হিসেবে সেইজন্য গদ্যের স্থান আজও পদ্যের নীচে। আমি পূর্ব্বে বলেছি পয়ার প্রভৃতি চৌতাল ধামারের ঘরের তাল। ও তালে ভাষাকে নাচান যায় না—কিন্তু ঐ তালকে আড়্ করে নিলে, ভেঙ্গে নিলে—যৎ খেমটা সবই পাওয়া যায়। সুতরাং পয়ার প্রভৃতি ছন্দ যেমন metre-এর বন্ধন মুক্ত হয়ে একদিকে গদ্যে পরিণত হয়েছে অপর দিকে তেমনি metre-এর ভাঙ্গচুরে নানা ছন্দে পরিণত হয়েছে। সকল ছন্দের কুলের খবর আমি জানিনে কিন্তু পয়ার ত্রিপদী ভেঙ্গে ও আড় করে যে নানা ছন্দ গড়া যায় তার পরিচয় ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব দাঁড়াল এই যে, পয়ার ত্রিপদী যে নিজগুণে বেঁচে আছে—তাই নয়, ঐ মূল ছন্দ থেকে নানা ছন্দের উদ্ভবও হয়েছে। আমার একথা যদি সত্য হয়, তাহলে পয়ার ত্রিপদীকে কাব্যরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করে দেবার দিন আজও আসে নি। ভবিষ্যতে কি হয় তা বলা যায় না।

(৩)

কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার এ ওকালতিটে একদম বাজে খাটুনি হয়েছে।—আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, পয়ার ত্রিপদীকে মানে মানে বিদায় দেবার কথা কেউ মুখে আনা দূরে থাক্ মনেও আনেন্ নি। শুনছি, তর্ক উঠেছে এই নিয়ে যে, চল্‌তি বাংলা কথাকে পয়ারের ভিতর খাপ খাওয়ানো যায় কি না। এর জবাব দিতে হলে পয়ারের শুধু চরিত্র নয় জীবনচরিত ও ঈষৎ আলোচনা করা দরকার।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি এ জাতের ছন্দ সকল ভাষাতেই আছে এবং সকল ভাষারই সেটি শুধু পুরাতন নয় সনাতন ছন্দ। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে এ ছন্দ গড়্‌লে কে? এর উত্তরে অনেকে বল্‌বেন—"জাতীয় প্রতিভা।" আমার মতে ও উত্তর—"জানি না" বলারই সামিল। কেন না জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা যাই বলুন—"জাতীয় প্রতিভা" বলে' কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। প্রতিভা শুধু দুচার জনের থাকে, এবং জনগণের মধ্যে সকলযুগে সকলদেশে যা পুরো মাত্রায় থাকে তা হচ্ছে প্রতিভা-বিদ্বেষ। জাতীয় নির্বুদ্ধিতাই জাতিকে বিশিষ্টতা দেয়, কেননা প্রতি জাতের একটা বিশেষ রকম নির্বুদ্ধিতা আছে। জার্ম্মাণরা যাকে বলে "জাতীয় অহং"—তার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু জাতীয় অহঙ্কারে। এবং যার জন্য যে জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত, তাই নিয়ে সে জাতি গৌরব করে। এর প্রমাণ এক জাতির হামবড়ামি অন্য জাতির কাছে চির দিনই—যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি বিরক্তিকর। বাল্মীকির মুখে "শ্লোক" যেমন একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল তেমনি অপর সকল জাতির ভিতরও কোনও না কোনও কবির মুখেই এসব ছন্দ অকস্মাৎ জন্ম লাভ করেছে। এশ্রেণীর ছন্দকে এই হিসাবে জাতীয় ছন্দ বলা যায়

যে এপথ একের দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও বহু কবির পায়ে পায়ে তা কাব্যের বড় রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এস্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—এ সব ছন্দ কেন অপরের কাছে এ ভাবে গ্রাহ্য হয়েছে। এর একমাত্র উত্তর, এ সব ছন্দের জাতীয় ভাষার সঙ্গে ওজনেও পরিমাণে একটা স্বাভাবিক মিল আছে অর্থাৎ ভাষার শব্দরাশি এই সব ছন্দের ভিতর আরামে এবং খাপে খাপে বসে যেতে পারে। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে বাংলা কথার যে বাংলার পয়ারের ভিতর স্থান হবে না, এ হতেই পারে না। তবে এ রকম সন্দেহ যে লোকের মনে জাগে তার কারণ, আমাদের এ কালের মুখের কথার সঙ্গে সেকালের পদ্যের কথার সম্পূর্ণ মিল নেই। পয়ারের নাম উচ্চারণ কর্‌বামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ান কৃত্তিবাস ও কাশিদাস। আমাদের চলতি ভাষায় হয়ত কাশিদাসী পয়ার লেখা না যেতে পারে কিন্তু তাই বলে পয়ার কেন লেখা যাবে না তা বুঝ্‌তে পারি নে। মুখের কথাকে আমি পয়ারস্থ কর্‌তে পারি নে, কিন্তু আপনি ও রবীন্দ্রনাথ যে ইচ্ছা কর্‌লেই পারেন সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই।

পয়ার বল্‌তে আমরা সাধারণ লোকে কি বুঝি? সেই ছন্দ—যার প্রতি পদে চৌদ্দটি করে অক্ষর থাকে। পয়ারের পয়ারত্ব যদি অক্ষরের সংখ্যার উপরেই নির্ভর করে তাহলে বলা বাহুল্য নানা রকম মাত্রায় ও ছন্দকে চালানো যেতে পারে। শুধু চার মাত্রা নয়, তিন মাত্রা, পাঁচ মাত্রার তালেও পয়ারকে খেলানো যায়। অর্থাৎ আমরা কাওয়ালি ছাড়া—একতালা, ঝাঁপতাল এমন কি যৎও লাগিয়ে দিতে পারি। তা যে পারি তার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবন্ধে পাবেন। পয়ারের আকার যে অক্ষরগত তার কারণ, বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দ হয়

দু'অক্ষরের নয় তিন অক্ষরের, বড় জোর চার অক্ষরের, তার বেশি নয়। সুতরাং চৌদ্দ অক্ষরের পদের অভ্যন্তরে আমাদের অধিকাংশ শব্দই অক্লেশে পাশাপাশি বসে যায়।

পয়ারের রূপ যে অক্ষরের উপর নির্ভর করে এ কথা যে সকলে মানেন না, তার কারণ বাংলা শব্দের অক্ষরের আকারের সঙ্গে মাত্রার ওজন মেলে না। বাংলা শব্দের হয় মধ্যে, নয় শেষে হসন্ত থাকায় দুই অক্ষরের শব্দের মাত্রা দেড় এবং তিন অক্ষরের আড়াই। এবং তাল জিনিসটে যখন মাত্রাগত তখন অক্ষর গুণে পয়ার লিখ্‌লে ছন্দ যে বেতালা হয়ে যাবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ গরমিল কবির কোনও ক্ষতি করে না। কেননা কবি অক্ষর গুণেও কবিতা লেখেন না, মাত্রা গুণেও নয়। তাঁর রচনা আপনা হতেই ছন্দে পড়ে যায়,– কেননা তিনি যখন কবিতা লেখেন তখন তাঁর কানে—ছন্দের পুরো সুরটা বাজ্‌তে থাকে,—তিনি মাত্রার সঙ্গে মাত্রা জুড়ে পদ্য রচনা করেন না। অর্থাৎ কবির মনপ্রাণ থেকে যা বেরয় তা গোটা ভাবেই বেরয়, আমরা সেই গোটা জিনিসটিকে পরে ভাগ করে তার গড়নের সন্ধান পাই। আর যিনি কবি নন্ অর্থাৎ যাঁর অন্তরে ছন্দ নেই তিনি অক্ষর গুণেই লিখুন আর মাত্রা গুণেই লিখুন— তাঁর হাত থেকে যা বেরবে তার হয়ত তাল পাওয়া যাবে না, আর যদি তাল পাওয়া যায় ত সুর পাওয়া যাবে না। "অন্য লোকে লাঠি বাজে" বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে" না, এমন কথা কেউ বল্‌তে পারেন্ না। মাত্রার হের-ফের করে কবি ছন্দের সম্পূর্ণতা রক্ষা করেন। মাত্রার কম বেশীর হিসেব তখনই চোখে পড়ে যখন আমরা প্রতি শব্দটিকে আলাদা করে দেখি—কিন্তু একটি পুরো

পদকে একটি ধ্বনি হিসেবে দেখ্‌লে ও জিনিস আমাদের নজরেই পড়ে না।

তারপর আর একটি প্রশ্ন ওঠে। যদি পয়ারকে মাত্রাগত ছন্দ হিসেবে গ্রাহ্য কর্‌তে হয় এবং কাশিদাসী পয়ারকেই আদর্শ পয়ার হিসেবে গণ্য কর্‌তে হয়—তাহলে সে পয়ারের ভিতর মুখের কথাকে বেমালুম খাপ খাওয়ান যায় কি না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়ে দিয়ছেন যে পয়ারের তাল কাওয়ালি অর্থাৎ চারটি পদে এ ছন্দ সম্পূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, এ ছন্দের ভাগ চারটি হলেও ঝোঁক দুটি মাত্র। সুতরাং একে আট মাত্রার দ্বিপদী ছন্দ বলা যেতে পারে। হসন্তের গুণে প্রতি বাংলা শব্দের একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে—সুতরাং এ সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়, যে এত ঝোঁকওয়ালা শব্দকে কি করে ঐ দুই ঝোঁকের ছন্দে বসিয়ে দেওয়া যায়। তারা ত প্রত্যেকেই নিজের ঝোঁকে ঠেলে ঠেলে উঠবে এবং এদের কারও ঝোঁক মধ্যে কারও ঝোঁক শেষে।

বাংলা কথার ঝোঁক বেশি আর টান কম; আর সাধুশব্দের টান বেশি ঝোঁক কম। সুতরাং কারও কারও মতে পয়ারের মত সটান ছন্দে সাধুশব্দেরই ন্যায্য অধিকার আছে—বাংলা কথার নেই। এর উত্তরে আমার বক্তব্য যে, যার পদে পদে ঝোঁক নেই, তাকে ছন্দ নামে অভিহিত করা যায় না। কাশিদাসী পয়ার গাওয়া যায় কিন্তু পড়া যায় না। যে পয়ার পড়বার জন্য রচিত হবে তাতে সাধুশব্দ চলবে না, কেননা সে শব্দের ঝোঁক নেই। ঝোঁক আর টান দুইয়ে মিলে এক না হলে ছন্দ হয় না। স্রোতের জল একটানা অথচ হিল্লোলিত অর্থাৎ সে জল সটান চলে কিন্তু ঝোঁকে ঝোঁকে। যে জলের ঝোঁক নেই—তার

গতিও নেই তার একটানা চেহারাটা শুধু অচলতার লক্ষণ। সুতরাং ঝোঁকপ্রধান বলে বাংলা শব্দ কেন উদার ছন্দের মধ্যে স্থান পাবে না বুঝতে পারছি নে। ইংরাজি শব্দও ত সব ঝোঁকপ্রধান, তৎসত্ত্বেও Iambic pentametre-এর মধ্যে তারা সজোরে বসে রয়েছে। বাংলা শব্দ যদি আট মাত্রার তাল অর্থাৎ মধ্যমানে পড়্‌তে রাজি না হয় তাতে কিছু আসে যায় না—কাওয়ালি ঠুংরিতে ঠিক বসে যাবে। সুতরাং মুখের কথায় সেকেলে পয়ার লেখা না গেলেও, তার চাইতে ঢের বেশি স্রোতস্বতী ছন্দে লেখা যাবে।

আমার এ সব কথা আমি কাউকে গ্রাহ্য কর্‌তে বলিনে, কেননা আমি জানি যে, আমি ভাদ্র মাসে জন্মায় নি। তবে কোনো বিষয়ে যখন একটা তর্ক ওঠে তখন সে বিষয়টাকে শুধু ভিতর থেকে নয় বাইরে থেকে দেখারও একটা সার্থকতা আছে, এই বিশ্বাসে আমি ছন্দসম্বন্ধে out-sider হিসাবেই আপনার অনুরোধ মত এ আলোচনায় যোগদান কর্‌তে সাহসী হয়েছি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

একটি সত্যি গল্প।

উচ্ছল উদ্দাম পার্ব্বত্য ঝরণা হু হু শব্দে পাহাড়ের গা দিয়ে ছুটে চলেছে—যেন সে জানিয়ে দিতে চায় যে, এ জগতে গতির চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। সেই ঝরণার ধারে একটুখানি সমতল জায়গার উপরে ছোট্ট একটি কুটীর—আর সেই কুটীরে বাস কর্‌ত এক তরুণ পাহাড়ি। তরুণ পাহাড়ির দিনমান কোনই কাজ ছিল না—সে তার কুটীরের চার পাশ বন্য গোলাপের গাছে গাছে ভরে' তুলেছিল—বন্য গোলাপ আরও কত রকমের ফুল লতা পাতা দিয়ে তার কুটীর খানিকে কুঞ্জবনের মত করে' তুলেছিল। দিনমান সে সেই ফুল লতা পাতার চর্চ্চা করেই কাটিয়ে দিত—কেবল সকাল বেলায় যখন প্রভাতী সূর্য্যের আলোর স্পর্শে পাহাড়ের গায়ের বরফ চিক্‌মিক্ করে' উঠ্‌ত তখন সে একবার সেই ঝরণাটির ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। সেখানে গিয়ে ঝরণার অপর দিকে বহুক্ষণ ধরে চেয়ে থাক্‌ত, যেন কার আসবার কথা আছে—যেন সে কার অপেক্ষায় সেখানে কুটীর বেঁধে রয়েছে। কিন্তু সারাবেলা দেখে দেখে যখন মাথার উপরে উঁচু পাহাড়ের বরফের সোনালি রঙ্ চলে' গিয়ে তা রূপোলি রঙে ঝিক্ ঝিক্ করে' উঠ্‌ত তখন সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে কুটীরে ফিরে আস্‌ত—আবার ফুলগাছগুলোর তত্ত্বাবধান, পরিচর্য্যা কর্‌ত।

এমনি করে কিছু দিন কেটে গেল। একদিন ত'কে আর অমনি ফিরে আস্‌তে হ'ল না। সে ঝরণার ধারে গিয়ে দেখ্‌লে যে অপর পারে একটা পাথরের উপরে চুপ করে' বসে রয়েছে এক সুন্দরী তরুণী, যেন পাষাণ ফেটে পদ্মফুল ফুটেছে।

মুহূর্ত্তে পাহাড়িকে কে যেন বলে' দিয়ে গেল যে এ সেই—যার অপেক্ষায় সে প্রতিদিন ঘুরে বেড়াত। মুহূর্ত্তে পাহাড়ির অন্তরটা সার্থকতায় ভরে' উঠ্‌ল—তার চোখে পলক পড়্‌ল না—অনিমেষ নয়নে সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল সেই সুন্দরী অপরিচিতা তরুণীকে।

অচেনা? অচেনা ত বটেই; কিন্তু তার মত চেনা ত আর কেউ নেই—আর কিছু নেই। বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে পলে পলে তারই অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে সে গড়ে' উঠেছে—তারই আনন্দের ভিতর দিয়েই যে তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয়। এ পরিচয় ত এক দিনের নয়—এক কালের নয়—এ পরিচয় যে বহু দিনের, বহু কালের—কত জন্মের। অচেনাই বটে—কিন্তু অতি অন্তরতম।

পাহাড়ি জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ওগো তরুণি, তোমার নামটি কি? তুমি আস্‌ছ কোথা থেকে?"

তরুণী উত্তর দিলে—"নাম আমার তরুণী—আস্‌ছি আমি বহুদিন হ'তে—বহুদূর থেকে।"

"বহুদিন হ'তে?—তবে ত তুমিই সেই—যার অপেক্ষায় আমি এতদিন কাটিয়েছি। বহুদূর থেকে!—তাই বুঝি আমি দিগন্তের কোলে কোলে তোমারই পায়ের নূপুরের গুঞ্জন শুন্‌তে পেতুম—ঐ দূর বনান্তরাল থেকে যে বাতাস বয়ে' আস্‌ত তাতে তোমারই কুন্তলের সুরভী-ঘ্রাণ পেতুম—ঐ ঊর্দ্ধে বহুদূরে সুনীল গগনে তোমারই নীল

নয়নের অসীম দৃষ্টির গভীরতা আমার চোখে ধরা পড়্ত। তবে ত তুমিই সেই—তবে ত তুমি আমার-ই। ওগো তরুণি, আমাদের মিলন হবে কেমন করে? ওপার ছেড়ে এ পারে আস্‌বে না কি—?"

"তোমার নামটী কি?"

"নাম আমার কল্পশেখর।"

"কল্পশেখর, তোমার সাধ্য কি আমায় ধরে' রাখ্‌বে তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে—তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে ত আমার জায়গা হবে না। আর এই খরস্রোতা নির্ঝরিণীকেই বা আমি পেরিয়ে যাব কেমন করে—এ স্রোত যে মত্ত-মাতঙ্গকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার চাইতে কল্পশেখর, তুমিই এধারে এস। ওধারে ঐ কুটীর তোমার গণ্ডী। কিন্তু এধারে ত কোন গণ্ডী নেই—এধারে দিগন্তের আলো, দিগন্তের বাতাস। সার দিয়ে ঐ যে পাহাড়ের পর পাহাড় অনন্ত যুগ ধরে' মৌন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেই অনন্ত যুগের স্বপ্ন এধারে। ঐ অনন্ত যুগের স্বপ্ন নিয়ে অনন্ত যুগের সাক্ষী হ'য়ে যে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে তার আশে পাশে ভিতরে বাহিরে উপরে নীচে কত পথ কত অপথ—কত উপত্যকা অধিত্যকা—কত অসমাপ্তি। এই পথ অ-পথ ধরে' উপত্যকা অধিত্যকার ভিতর দিয়ে এই অসমাপ্তির দিকেই আমরা যাত্রা করব, কল্পশেখর—তুমিই ওধার ত্যাগ করে এধারে এস না।"

"তবে তাই আস্‌ব তরুণী।"

কল্পশেখর জলে নাম্‌ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অনুভব কর্‌লে যে তাকে নির্ঝরিণীর খরস্রোত কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে। কল্পশেখর তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে নির্ঝরিণীর তটে দাঁড়ালে। সাধ্য কি মানুষের এই খরস্রোতা অগভীর নির্ঝরিণী পায়ে হেঁটে পার হয়। . . ..

কল্পশেখর বল্‌লে—"শোনো তরুণী, মানুষের সাধ্য নেই এই খর-স্রোতা নির্ঝরিণী হেঁটে পার হয়। শোনো, চল আমরা দুজনে এই ঝরণা ধরে' উজানের দিকে চলে যাই। যেখানে এর পরিসর স্বল্প হবে সেখানে এটাকে আমি ডিঙ্গিয়ে যাব।" তরুণী বল্‌লে—"আচ্ছা চল।"

দু'জনে দু'পার দিয়ে ঝরণার উজানে যাত্রা কর্‌ল।

দু'জনে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে সোনালি সূর্য্য পূব গগনে উঠে মাঝ গগনে গিয়ে পড়ল—আবার সেখান থেকে ক্লান্ত দেহে রাঙা মুখে পশ্চিমে ঢলে' পড়ল, কিন্তু ঝরণা তেমনি হুহু শব্দে ছুটে চলেছে, কোনখানেই তার পরিসর এমন সঙ্কীর্ণ হয় নি যে, কল্পশেখর তা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যা যখন তার কাজল আঁখি নিয়ে, তার কালো আঁচল আকাশে উড়িয়ে প্রকৃতিকে নিস্তব্ধ হ'তে ইঙ্গিত কর্‌ল তখন তরুণী ব্যথিত কণ্ঠে ডাক্‌ল—"কল্পশেখর।"

"কি?"

"আর ত আমি হাঁট্‌তে পারি না, কল্পশেখর।"

কল্পশেখর বল্‌লে—"তবে আজকার মত আমাদের যাত্রা শেষ। শোনো তরুণি, এইখানে আমরা দু'জনে রাত কাটাব। তারপর প্রভাত হ'লে আবার চল্‌ব।"

তারা সেইখানে নির্ঝরিণীর দু'ধারে দু'জনে শ্রান্ত দেহে বসে' পড়ল, দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। চারিদিকের স্তব্ধতার বুক চিরে হু হু শব্দে উদ্দাম উচ্ছল ঝরণা তাদের দু'জনার মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মতো অক্লান্ত বেগে ছুটে চল্‌ল।

ধীরে ধীরে চারিদিকে আঁধার নিবিড় হ'য়ে এল, সুন্দরীর নীলাঞ্চলে চুমকির মতো, নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে' উঠ্‌ল। কৌতূহলী

হ'য়ে বুঝি তারা মুখর ঝরণার দু'পাশে এই দুটী মৌন প্রাণীকে দেখ্‌তে লাগল। কি চায় এরা? কোন্ মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে এরা? পরিণাম কি হবে এদের? তাই বুঝি তারা পরস্পরের মাঝে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল।

তার পরদিন প্রভাত হ'লে তারা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু যেমন ঝরণা তেমনি, কোথাও একটু সংকীর্ণ হয় নি, কোথাও তার গতিবেগ একটু মন্দ হয় নি—এ যেন অনন্ত কালের পথে অনাদি কাল থেকে ছুটে চলেছে। আবার সন্ধ্যা হ'ল, আবার নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্ জ্বল্ করে' উঠ্‌ল। আবার তারা বিশ্রাম কর্‌তে বস্‌ল।

পরদিন প্রভাতে আবার তারা চল্‌তে লাগ্‌ল, তার পরদিন—তার পর দিন, এমনি করে' তারা চল্‌তেই লাগ্‌ল। যতই তাদের আশা ব্যর্থ হচ্ছিল—ততই তাদের আকাঙ্খা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, যতই তাদের আকাঙ্খা প্রবল হচ্ছিল ততই তাদের উৎসাহ উদ্যম অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এমনি করে' কত দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কত উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করে', কত পর্ব্বতচূড়া প্রদক্ষিণ করে' তারা সেই পার্ব্বত্য ঝরণার উজানে চল্‌ল। কিন্তু সে ঝরণার কোন পরিবর্ত্তন নেই—একই গতি, একই পরিসর, কোথায়ও এমন অবসর নেই যেখানে কল্পশেখর তা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে, সাহস করে' উল্লম্ফনের চেষ্টা কর্‌তে পারে। এমনি করে' পাঁচটী বৎসর কেটে গেল।

সেদিনও তারা চল্‌ছিল, হঠাৎ নির্ঝরিণীর হুহু শব্দকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে এক বিশাল গর্জ্জন তাদের কানে এসে বাজ্‌ল। যেন সহস্র প্রভঞ্জন এ স্বষ্টিকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে সহস্র দিকে একসঙ্গে ছুটেছে—যেন সপ্ত সিন্ধুর লক্ষ লক্ষ উর্ম্মি সহসা ক্ষিপ্ত হ'য়ে একসঙ্গে

পৃথিবার পায়ে এসে মাথা খুঁড়্ছে। কল্পশেখর একটু থেমে তরুণীকে বল্লে—"তরুণি শুন্ছ ?"

"শুন্ছি।"

"কিসের শব্দ এ ?"

"বুঝি মহাপ্রলয়ের ?"

"অগ্রসর হবার সাহস আছে ?"

"তুমি যেখানে যাবে সেখানে আমার ভয় নেই।"

"তবে চল।"

দুজনে আবার চল্তে লাগ্ল। তারা যতই অগ্রসর হতে লাগ্ল ততই সে গর্জ্জন প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়ে উঠ্তে লাগ্ল। অবশেষে তারা সেই বিশাল গর্জ্জনের কারণ আবিষ্কার কর্ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চলাও বন্ধ হ'ল। কিন্তু হায় তাদের যাত্রা শেষ হ'ল না !

তারা যেখানটায় এসে পড়্ল সেখানে তাদের সাম্নে বিশাল প্রাচীরের মত এক খাড়া পাহাড় আপনার মাথা তুলে রয়েছে—একেবারে খাড়া—দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর এই খাড়া পাহাড়। উপরে তাকিয়ে তার উচ্চতার শেষ দেখা যায় না। যেন বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীর সকল কৌতুহলের, সকল আশা-আকাঙ্খার বাধা স্বরূপ যোজন-দীর্ঘ যোজন-উচ্চ এক খাড়া প্রাচীর তৈরী করে' এখানে বসিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষের এখানেই গতির শেষ—আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। আর সেই পাহাড়ের মাথার উপর থেকে একটি প্রকাণ্ড জল-প্রপাত বিরাট গর্জ্জন করে' এসে পড়্ছে। এই প্রপাতই সেই ঝরণা হ'য়ে বয়ে গিয়েছে যার তীরে তীরে তারা এই পাঁচ বৎসর হেঁটে এসেছে। এই প্রপাতের শব্দই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত

হয়ে চতুর্গুণ শব্দে তাদের কানে এসে বাজ্‌ছিল। তারা সেই প্রপাত ও নির্ঝরিণীর সঙ্গম স্থলে নির্ঝরিণীর দু'পারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কল্পশেখর ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

এতদিন অন্তত তাদের মিলনের চেষ্টা কর্‌বার উপায় ছিল, আজ তারও শেষ। হয় মিলন, নয় মিলনের চেষ্টা। চেষ্টাও যখন অসম্ভব, তখন জীবনে কাজ কি? কিন্তু এত সহজেই নিরস্ত হব? প্রথম বাধাতেই আ-জীবনের সাধনা পরাজয় মান্‌বে? অসম্ভব! কল্পশেখরের অন্তর দেবতা ত তা মান্‌তে চায় না। এই দুরারোহ পাহাড়ে ওঠ্‌বার কি কোন উপায় নেই—কোন পথই নেই? এই জলপ্রপাতেই নির্ঝরিণীর উৎপত্তি। সুতরাং সেখানেই এর শেষ। এই পাহাড়ের ওপরেই তাদের যাত্রা শেষ হবে—তাদের মিলন হবে। কল্পশেখর তার বামে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখ্‌ল। যতদূর দৃষ্টি চলে খাড়া পাহাড় পূর্ব্বে পশ্চিমে আপনাকে বিস্তার করে' নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন বল্‌ছে—মানুষ, তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা জল্পনা উদ্যম উৎসাহের এইখানে শেষ—যাও ধরিত্রীর সন্তান আপনার মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরে যাও।

এমন সময় সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে একবার কল্পশেখরকে আরবার তরুণীকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—যেন তাদের এখানে উপস্থিতির অর্থ সে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে সে কল্পশেখরকে সম্বোধন করে' বল্‌লে—"তুমি কে?"

"আমি মানব।"

তরুণীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তুমি কে?"

"আমি মানবী।"

"কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

কল্পশেখর বল্‌লে—"আমরা আস্‌ছি সেই দেশ থেকে, যেখানে ফুল ফোটে আবার ঝরে' যায়—মানুষ জন্মে আবার মরে' যায়—যেখানে গড়ে আবার ভাঙে—ভাঙে আবার গড়ে—যেখানে আশার অন্ত নেই, আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, সাহসের সীমা নেই।"

"তোমরা মর্ত্ত্যের জীব?"

"আমরা মর্ত্ত্যের জীব।"

"কি চাও তোমরা?"

"তুমি কে?"

"আমি গন্ধর্ব্ব।"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—আমরা চাই পরস্পরের মিলন। এই পাঁচ বৎসর ধরে' আমরা এই নির্ঝরিণীর দু'তীর দিয়ে দু'জনে হেঁটে এসেছি—আর এই পাঁচ বৎসর ধরে' এই নির্ঝরিণী আমাদের মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মত বয়ে' গিয়েছে। জানি আজ আমাদের যাত্রার শেষ। কোথায়? ওইখানে—যেখান থেকে জলপ্রপাত পড়্‌ছে—ঐখানে নির্ঝরিণীর শেষ, ঐখানে বাধার শেষ, ঐখানে আমাদের মিলন হবে।"

"অসম্ভব।"

"কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব?"

"তোমাদের মিলন।"

"কেন অসম্ভব গন্ধর্ব্ব?"

"কেন অসম্ভব তা বল্‌তে পারিনে। তবে বোধ হয় মিলন হলে' সকল পাওয়ার, সকল চাওয়ার শেষ—তাই বুঝি অসম্ভব। শোনো মানব, এ চেষ্টা ছাড়—তোমরা ফিরে যাও।"

মানব উন্নত-শিরে বজ্র-কণ্ঠে বল্‌ল—"কখনও না।"

মানবী নত-নয়নে মৃদুস্বরে প্রতিধ্বনি কর্‌লে—"কখনও না।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার কি কোন উপায় নেই—কোন রাস্তা নেই গন্ধর্ব্ব?"

"তোমরা ফিরে যাও।"

"এ পর্ব্বতে আরোহণ করা কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব?"

"শোনো—তোমরা ফিরে যাও।"

"একি মানুষের অসাধ্য গন্ধর্ব্ব?"

"অসাধ্য নয়—দুঃসাধ্য।"

"তবে সাধ্য।"

"আপনার অদৃষ্টকে বশ কর্‌তে চাও?"

"চাই।"

"নিতান্তই ফির্‌বে না?"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—ফির্‌ব কোথায়? ফেরা মানে মৃত্যু। আজন্ম যে স্বপ্ন অন্তরে সুপ্ত হয়েছিল—কৈশোরে যে স্বপ্ন অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার নিরুদ্দেশ সন্ধানে ঘরছাড়া করেছিল—যৌবনে গত পাঁচ বৎসর ধরে' যে আকাঙ্ক্ষার মাদকতা এ দেহের অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছে—সেই স্বপ্ন সেই আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়তে বল, গন্ধর্ব্ব! মানুষের মন তুমি জান না।"

"বেশ তবে শোন। এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা আছে—কিন্তু সেখানে যাবার জন্যে চাই অসীম ধৈর্য্য। তোমাদের তা আছে।"

"মানুষের ধৈর্য্যের সীমা নেই।"

গন্ধর্ব্ব বল্‌তে লাগ্‌ল—"এই যে পাহাড় এ প্রাচীরের মতো, যোজন দীর্ঘ—একেবারে প্রাচীরের মতো খাড়া। কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রাচীর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দুই প্রান্ত শুধু উপর থেকে ঢালু হ'য়ে নেমেছে। সেই ঢালু জায়গা দিয়ে এর উপরে ওঠ্‌বার পথ। এখন তোমাদের দু'জনকে নির্ঝরিণীর দু'তীর থেকে পর্ব্বতের দু'প্রান্তে পৌঁছিতে হবে। সেখানে পৌঁছে পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা দেখ্‌বে। দু'ধার থেকে দু'রাস্তা বরাবর চলে' পাহাড়ের উপরের একটা হ্রদের তীরে প্রকাণ্ড একটা শাল্মলী তরুর মূলে এসে মিলেছে। সেই হ্রদ থেকেই এই ঝরণার উৎপত্তি। ওই রাস্তায় যদি তোমরা পথ হারিয়ে না ফেল তবে সেই হ্রদের তীরে তোমাদের মিলন হ'তে পারে।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এ যাত্রা শেষ হবে কত দিনে ?"

গন্ধর্ব্ব উত্তর দিলে—"কত দিনে তা কে জানে—কে বল্‌বে সে কথা ?"

গন্ধর্ব্ব অন্তর্ধান হ'ল।

কল্পশেখর তরুণীর দিকে ফিরে বল্‌ল—"তরুণী সাহস আছে ?" তরুণী উত্তর দিলে—"আছে।"

"লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবে না ?"

"না।"

দু'জনে দু'দিকে যাত্রা কর্‌ল। কত দিনের জন্যে কে বল্‌বে ?

* * * * *

সে দিন সূর্য্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখর বাতাসের গায় তাজা পদ্ম ও ভিজে শেওলার গন্ধ পেলে। কল্পশেখর বুঝ্‌ল যে গন্ধর্ব্ব যে হ্রদের কথা বল্‌ছিল সে হ্রদ আর বেশি দূরে নয়—তার যাত্রা শেষ হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। কল্পশেখর দ্রুত পদে চল্‌তে লাগ্‌ল। যখন চারদিক আঁধার হয়ে এল তখন সে হ্রদের তীরে এসে পৌঁছিল। চারদিকে চেয়ে সে হ্রদের উত্তর তীরে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখ্‌তে পেলে। বুঝ্‌লে এই সেই শাল্মলী তরু। কল্পশেখর হ্রদের তীর দিয়ে গিয়ে সেই শাল্মলী তরুর মূলে পৌঁছিল। তারপর তারি নীচে বসে' পড়্‌ল।

চারদিক তখন নিবিড় কালো আঁধারে ঢেকে গেছে—গভীর নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছে। আলকাৎরার চাইতেও কালো সে আঁধার, মৃত্যুর চাইতেও গভীর সে নিস্তব্ধতা। এম্‌নি আঁধারের মাঝে, এমনি নিস্তব্ধতার মাঝে কল্পশেখর বসে' বসে' হাজার চিন্তার জালে তার মনটাকে জড়াতে লাগ্‌ল।

কল্পশেখরের ত আজ যাত্রা শেষ। কিন্তু তরুণী!—কোথায় সে? সে কি এই কঠিন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে' আস্‌তে পার্‌বে এই তার গম্য-স্থানে—এই তার কাম্য-স্থানে? পথে কত বিপদ কত আপদ অতিক্রম করে' না কল্পশেখর আজ এই হ্রদের তীরে কত বর্ষ পরে পৌঁছেচে—ওঃ কত বর্ষ—সে যেন সৃষ্টির আগে হতে—সারাজীবন যেন সে পথই চলেছে—এই সাহস এই ধৈর্য্য কি তরুণীর হবে?—ওঃ—তরুণি—তরুণি!

সহসা সেই গভীর নিস্তব্ধতা বিভিন্ন করে' কার পায়ের শব্দ কল্পশেখরের কানে এসে বাজ্‌ল। কল্পশেখর উৎকর্ণ হয়ে সেই দিকে

চেয়ে দেখ্‌ল। নিবিড় আঁধারে কিছুই দেখা যায় না—কিন্তু স্পষ্ট পদশব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে কল্পশেখরের দৃষ্টি আঁধার ভেদ কর্‌তে সমর্থ হ'ল। সে দেখ্‌লে একটা মানুষের মূর্ত্তিই বটে—তারই পানে আস্‌ছে।

কল্পশেখরের শিরায় শিরায় শোণিত দুরন্ত নৃত্য লাগিয়ে দিল—তার হৃদয়ে যেন অসংখ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল। কল্পশেখর উঠে সেই মূর্ত্তিটীর পানে অগ্রসর হ'ল। যখন তারা পরস্পর কাছাকাছি হ'ল তখন কল্পশেখর যেন অপরিচিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তুমি কে?"

"আমি তরুণী।"

মুহূর্ত্তে চারটি বাহু দুইটি দেহকে জড়িয়ে নিল—তাদের আজীবন ব্যর্থ প্রাণের অনন্ত পিপাসা নিয়ে, চারটি অধর একটা নিবিড় চুম্বনে যুক্ত হ'ল—তাদের আজীবন পরিপুষ্ট হৃদয়ের অদম্য কামনা নিয়ে। তারপর আজীবন সাধনার সিদ্ধিলাভের শেষে জীবনব্যাপী ক্লান্তি যেন তাদের দুটি শরীরের ওপরে একেবারে ভেঙে পড়্‌ল—তারা সেইখানে বসে' পড়্‌ল—তারপর ধীরে ধীরে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে সেই পাষাণ শয্যায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ল। পাষাণ-শয্যা?—না, সে-শয্যা পুষ্পের চাইতেও কোমল।

পরদিন প্রথম ঊষার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখরের ঘুম ভাঙ্‌ল। ধীরে ধীরে তার সব কথা মনে পড়্‌ল। সফল তার জীবন। আজীবন সাধনার ধন আজ তার আলিঙ্গনে। কল্পশেখর আলিঙ্গন-বদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—একি!!!

উদ্যতফণা ফণিণীকে সাম্‌নে দেখ্‌লে পথিক যেমন লাফিয়ে উঠে দশ হাত পিছিয়ে যায়, তেমনি চক্ষের পলকে কল্পশেখর তাকে আপনার আলিঙ্গন মুক্ত করে' লাফিয়ে উঠে সেই পাষাণ শয্যার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। তারপর বজ্রাহতের মতো শূন্যদৃষ্টিতে তারি সারা-নিশার আলিঙ্গনবদ্ধা নিদ্রাভিভূতার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিদ্রাভিভূতা আলিঙ্গনচ্যুতা হ'য়ে ধীরে ধীরে চোখ মেল্‌ল। পাষাণ শয্যা ত্যাগ করে' উঠে বস্‌ল। তারপর কল্পশেখরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল!

কল্পশেখর কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কে তুমি?"

"আমি তরুণী।"

কল্পশেখর পাগলের মতো হেসে উঠ্‌ল। সে হাসি আশে পাশে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে কোন্ এক প্রেতলোকের বিকট বীভৎস শব্দের মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। চীৎকার করে' নিশির সঙ্গিনীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে ঘৃণার স্বরে বলে উঠ্‌ল—"তুমি—তুমি তরুণী—এই লোল চর্ম্ম, বিরল দন্ত, মুখের উপরে শুক্‌নো চামড়ার মতো দু'খানা ঠোঁট—দীপ্তিহীন কোটরগত ঐ দু'টি চোখ—মাথায় কাশফুলের মতো সাদা একরাশ চুল—তুমি—তুমি—তরুণী!"

জরাগ্রস্ত রমণী করুণ বিষাদের হাসি হেসে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কল্পশেখরের কাছে এসে তার হাতখানি ধরে' তাকে হ্রদের তীরে জলের কিনারে নিয়ে গেল। তারপর আপনার কৃশ হস্তের শুষ্ক অঙ্গুলি বিস্তার করে' জলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"দেখ।" কল্পশেখর দেখ্‌ল।

কল্পশেখর দেখ্‌ল হ্রদের জলে আপনার প্রতিবিম্ব। পেশীহীন গণ্ডদ্বয়ে রসহীন চাম্‌ড়া ঝুল্‌ছে—সাদা ভূরুর নীচে কোটরগত দু'টি চক্ষু কুয়াশায় ঢেকে গেছে—মসৃণ ললাটে করাল কাল তার নিষ্ঠুর দাঁত বসিয়েছে—আর মাথার ওপরে বরফের চাইতেও সাদা একরাশ চুল গুচ্ছে গুচ্ছে তার অস্থি-চর্ম্ম-সম্বল কাঁধের ওপরে এসে পড়েছে। তরুণীর ধ্যানে এতদিন তার তা চোখেই পড়ে নি। কল্পশেখর দুই হাতে মুখ চোখ ঢেকে সেইখানে বসে পড়ল।

মানুষের দেহ তার মনকে ব্যর্থ করেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বন্ধু

-ঃ*ঃ-

অজিতদের যে গ্রামে বসবাস, সে গ্রামে তাদের স্বজন বা স্বজাতীয় বল্‌তে কেউ ছিল না। তেমনতর একটি স্থানকে অজিতের পূর্ব্ব-পুরুষ যে বাড়া করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করেছিলেন, তার কারণ তাঁর কাছে হয়ত স্বজন বা স্বজাতির চাইতে জল-বাতাস-আলোর খাতিরটা ছিল ঢের বেশি। অজিতের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যেন সমস্ত গ্রামের ভিতর ছিল গ্রাম্য-দেবতা, অথবা দেবতার চাইতেও উন্নততর কোন জীব। কারণ, তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যে ক'জনের সঙ্গে আমার পরিচয়, তাঁদের ত জানি সবারই ভোগ-রাগ আছে, মানুষের হাতে তৈরী লুচি-সন্দেশ বা পোলাও পরমান্নে। কিন্তু অজিতদের গ্রামবাসীরা তাদের কাছে ছিল এতই হেয়, যে তাদের ছোঁয়া লাগ্‌লে অজিতদের বাড়ীর কুয়োটার পর্য্যন্ত জাতিপাত হবার সম্ভাবনা।

এই গ্রামে জয়হরি সরকার ছিল একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। জমি-জমা তার ছিল বিস্তর। আর নিজহাতেই সে চাষ-আবাদের কাজ কর্‌ত। জয়হরির ব্যবসা ঘৃণিত হলেও, তার সততার খ্যাতি গ্রামের ভিতর বেশ ছিল। তার মানের অভাব থাক্‌লেও, ধনের অসদ্ভাব ছিল না। জাতিতে জয়হরি ছিল নমঃশূদ্র। এই জয়হরি সরকারের পুত্র ভজহরি হ'ল অজিতের বন্ধু।

অজিত আর ভজহরির মধ্যে কোন্ সূত্রে বন্ধুত্ব হ'ল, তার ইতিহাস একটুখানি বলে রাখা আবশ্যক। আন্তরিক প্রীতির যোগই এ বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়। বর-কণের পরস্পরের হৃদয়ের প্রীতি বা প্রাণের আকর্ষণ ব্যতিরেকে, একমাত্র অভিভাবকদের মর্জিতেই যেমন তাদের উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়, তেমনিতর অজিত ও ভজহরির মধ্যে যে বন্ধুত্বের যোগ,—ও ব্যাপারটি অভিভাবকদের ইচ্ছাক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

অজিত যখন ছ'সাত বছরের বালক, তখন দেশে একটি নতুন ব্যামো দেখা দিয়েছিল। সেকালে পল্লীর পিতামাতার অন্তরে এই একটি সংস্কার ছিল, যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধ পাতিয়ে পুত্র কন্যাদের ধর্ম্ম-সূত্রে যুক্ত না করলে, ধর্ম্মরাজের চর বা অনুচর বর্গের হাত থেকে আর পরিত্রাণ নেই। সে কারণ, নতুন ব্যামোটি যখন দেখা দিল, তখন চিকিৎসকের শরণাগত হবার আগ্রহ পল্লীবাসীদের ভিতর তেমন প্রকাশ পেলে না; বরং ধর্ম্ম-রাজের অনুচরবৃন্দকে একটি বন্ধনের অজুহাত দেখাবার জন্য ধর্ম্মকে স্বাক্ষী-রেখে "সই" পাতাবার বা বন্ধুত্ব স্থাপন করবার হুজুগটা পল্লীতে বড় বেশি বেড়ে গেল।

অজিতের ঠাকুরমা ছিলেন সেকালের গিন্নি। এমন কোন কুসংস্কার দেশে ছিল না, যার উপর তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা না ছিল, দেশে এমন কোন আজগুবি কথা উঠ্ত না, যার উপর তিনি বিশ্বাস স্থাপন না করতেন। আকাশের অনন্তব্যাপী যে নীলিমা, ওটা একদিন একটা শামিয়ানার মতো মানুষের ঠিক মাথার উপরেই ছিল, হাত বাড়িয়ে বেশ ছোঁয়াও চল্‌ত। তারপর কোন্ আদ্যিকালের এক বুড়ি কোন রাজার বাড়ীর উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে হাতের ঝাঁটাখানি তুলে যেমনি আকাশের গায়ে একটি বাড়ি মার্‌লে, অমনি ক্ষোভে অভিমানে

নিকটের আকাশ কোন্ সুদূরে প্রস্থান কর্‌ল,—এম্‌নি ধরণের ঢের ঢের শিক্ষা অজিত তার ঠাকুরমার কাছে পেয়েছিল। তারপর পৃথিবীটা যে ত্রিকোণ, তিন মুড়োতে তিনটি ভীমকায় জন্তু,—সিংহ, হস্তী আর অজগর, পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে, আর এরাই ধরার পাপের ভার যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন এক একবার ঘাড় নাড়া দেয়, আর অমনি পৃথিবীতে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়,—অজিত ইংরেজি ইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে যেদিন থেকে 'বিজ্ঞান পাঠ' পড়্‌তে সুরু করেছিল, সেই দিন থেকে ঠাকুরমার ঐ রকমের ধারণাগুলি দূর করবার জন্য তাঁর সঙ্গে বিস্তর তর্ক বিতর্ক করেছিল, কিন্তু তবু কৃতকার্য্য হতে পারে নি। দেশে নতুন ব্যামোটি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, তার "প্রিভেণ্টিভ" স্বরূপ একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধ পাতাবার যে হুজুগটা উঠেছিল, সেটা এহেন ঠাকুরমার কানে যেদিন এসে পৌঁছিল, সেদিন কাউকে ধরে তাঁর নাতিটির সঙ্গে জুড়ি মিলিয়ে দেবার তাঁর ব্যস্ততার আর পরিসীমা রইল না। কিন্তু ভদ্র-পরিবার গ্রামে একটিও ছিল না। গ্রামের ভিতর অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল জয়হরি সরকার। তার পুত্র ভজহরি অজিতদের পাঠশালাতেই পড়্‌ত, আর বয়সেও সে ছিল অজিতের সমান। তারপর চেহারাখানিও তার ছিল বেশ ভদ্র-দস্তুর। জাতিতে নমঃশূদ্র হলেও, একটি ব্রাহ্মণ কুমারের বন্ধু হবার যোগ্যতা গ্রামের ভিতর যদি কারু থাকে, ত সে হ'ল ভজহরি। ঠাকুরমা ভজহরিকেই মনোনীত কর্‌লেন।

যদিচ প্রাণের প্রীতিই বন্ধু দু'টির মিলনের সূত্র নয়, তবু যে পর্য্যন্ত অজিত গ্রামের পাঠশালাতে পড়েছিল, ভজহরিকে না হ'লে তার চল্‌ত না।

বাড়ীর ভিতর তার খেলার একমাত্র সাথী ছিল তার ছোট বোনটি—রেণুকা, আর পাঠশালাতে অজিতের প্রধান সঙ্গীই হ'ল ভজহরি। অজিত যখন পাঠশালা থেকে ফির্‌ত, গঙ্গাজলে তার দেহের পরিশুদ্ধি না হ'লে ঠাকুরমা অবশ্য তাকে স্পর্শ করতেন না। তবু জাতিতে ভজহরি তার চাইতে যে ঢের নীচু, সে কারণে পাঠশালার জীবনে অজিতের অন্তরে তার প্রতি কোনরূপ ঘৃণার উদ্রেক হয় নি। কিন্তু অজিতের বাপ যখন জেলা কোর্টে ওকালতি কর্‌তে বস্‌লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অজিত পাঠশালার পড়া শেষ ক'রে, সহরের ইংরেজি ইস্কুলে পড়তে সুরু কর্‌ল, তখন ভজহরির সম্বন্ধে অজিতের মনোভাবের বেশ একটু বিপর্য্যয় ঘট্‌ল। ছুটিতে অজিত যখন সহর থেকে বাড়ী আস্‌ত, ভজহরির সংসর্গ সে আদৌ আর বাঞ্ছনীয় মনে করত না; বরং অজিতের মনে একটা শঙ্কা থাক্‌ত, কখন বা ভজহরি ছুটে এসে বন্ধু বলে তাকে সম্বোধন করে। দু'জনের ভিতর যে আকাশ পাতাল প্রভেদ! ভজহরির প্রমোশন হয়েছে গ্রামের পাঠশালা থেকে বাড়ীর গো-শালাতে। আর অজিত সহরের ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। মা, খুড়িমা, মাসী, পিশি সবার কাছে অজিত ইংরেজিতে কত কথা কয়! জল আবশ্যক হ'লে, ছোট বোনটিকে আদেশ করে, 'রেণু! এক গেলাস ওয়াটার।' ভাত চাইতে হ'লে মাকে ডেকে বলে, 'মাদার, এক মুঠো রাইস্‌ দাও।' আবার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে তাঁর গলাটি জড়িয়ে ধরে বলে,—'ঠাকুরমা, তুমি আমার গ্র্যাণ্ড মাদার।' তারপর চাকর-বাকর, অতিথি-অভ্যাগত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অজিত উচ্চৈঃস্বরে তাঁর ইংরেজি পুঁথির পাঠ আবৃত্তি করে,—"আই মেট্‌ এ লেম ম্যান্‌ ক্লোজ টু মাই ফার্ম্ম,"

ইত্যাদি। ইংরেজিতে যে এতদূর বিদ্বান, সে গ্রামের পাঠশালাতেই পড়াশোনা ইতি করেছে এমন একটি কৃষক-বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করতে লজ্জিত না হবেই বা কেন? ভজহরি আবার জাতিতেও এমনি নীচ যে, তার হাতের জলটুকু মুখে তুলতেও নেই। তারপর ভজহরির পিতা জয়হরি সরকার সামান্য একজন হেলে। অজিতের বাপের সঙ্গে সে লাগে কোথায়? অজিতের বাপ জেলা কোর্টের উকীল, জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের সুমুখে দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজি ভাষাতে কত লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন। এমনি ধারা যথেষ্ট হেতু ছিল, যাতে করে অজিতের মনোবৃত্তিগুলো দিনে দিনে ভজহরির প্রতি বিমুখ হয়ে উঠ্‌ল। তবু অজিতের বাড়ী আস্‌বার সংবাদটি কানে পৌঁছামাত্র, ভজহরির পিসিমা ভ্রাতষ্পুত্রের বেশ-ভূষা বেশ একটু পরিপাটি করে, তাকে সঙ্গে নিয়ে অজিতদের বাড়ী এসে হাজির হ'ত।

ভজহরির মাথার উশ্‌কো-খুশ্‌কো চুলগুলো তেলে-জলে বেশ করে চুপিয়ে দেওয়া হ'ত। পরণে তার থাক্‌ত রঙ্গীন জোলাটে কাপড়, ঘাড়ের উপর কোঁচানো ফুলদার একখানি চাদর। দু'হাতে তার রূপোর দু'গাছি বালা। তারপর ভজহরির কপালের উপর এসে পড়্‌ত, তার এক গোছা চুলের সঙ্গে সংলগ্ন রূপোর দু'টি ঘুন্‌টি। আর তার বুকের উপর ঝুল্‌ত রূপোর একটি পান।

কিন্তু ভজহরির এই সজ্জাটি তার পিসিমার প্রাণে যতই আনন্দ দান করুক না কেন, অজিতের অন্তরে আদৌ প্রীতির সঞ্চার কর্‌ত না। ইংরেজি ইস্কুলের বিদ্যা আর সহরের অভিজ্ঞতা নিয়ে অজিত যে কালে বাড়ী আস্‌ত, গ্রামের ভজহরি ছোঁড়াটা তার যে বন্ধু এ কথা স্মরণ করে, অজিত ঠাকুরমার গুরুতর অপরাধটি মনে প্রাণে কোনক্রমে

আর ক্ষমা কর্‌তে পারত না। ভজহরি পিসিমার সঙ্গে এসে অজিতদের অন্দর-বাড়ীতে যেমনি প্রবেশ কর্‌ত, অজিত বাহির-বাড়ীতে দৌড়ে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একখানি চৌকী টেনে বসে, খুব করে' দু' পা নাচাত। এরপর অবশ্য, ভজহরি তার বন্ধুর সাহচর্য্য লাভের আশা ত্যাগ করে পিসিমার আঁচল খানিই বিশেষ করে আশ্রয় কর্‌ত।

অজিত বিদ্যার সিঁড়ি এক একটি করে ডিঙ্গিয়ে যতই অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল, তার বন্ধু ভজহরির স্মৃতি, কালির আঁচরটির মতো যেন ছুরি দিয়ে চেঁচে উঠিয়ে মনটাকে পরিষ্কার করে ফেল্‌ল। এর পর ঠাকুরমার মৃত্যুতে গ্রামটির সঙ্গেও অজিতদের সম্বন্ধ এক রকম ঘুচ্‌ল। আত্মীয় স্বজন বা স্বজাতি মোটেই যেখানে নেই, তেমনতর একটি স্থানে অজিতদের যে বস-বাস বজায় ছিল, তার একমাত্র হেতুই হ'ল— ঠাকুরমা। স্বামীর প্রেম-প্রীতির আকর্ষণী-শক্তি যেন গ্রামের মাটিতে জড়িয়ে থেকে ঠাকুরমাকে সেই খানেই আবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু মৃত্যু যে দিন ঠাকুরমাকেই সেখান থেকে টেনে সরিয়ে ফেল্‌ল, তখন আর গ্রামের ভিঁটে মাটি ত্যাগ করে একেবারে সহুরে হবার পক্ষে অজিতদের কোন দিকে কোন বাধা রইল না।

অজিত এরপর স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ কর্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার মাত্রাও তার দিন দিন বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। আর একটিবার তার মনের গতির চেহারা বদল হল, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সোপানটি অতিক্রম করে এসে, অজিত একটিবার ফিরে চাইল। অমনি তার পনেরো বৎসরের সাধনার যে ধন তার মোহটা অনেকখানি কেটে গেল।

গ্রামের বিল-খাল, নালা-ডোবাতে বন্যার জল যখন প্রথমে এসে

পড়ে, তখন তার চলার ভঙ্গীতে, উৎক্ষেপ বিক্ষেপে, উদ্দাম গতিতে, কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দে তার আগমন-বার্ত্তা দশ জনকে জানিয়ে দেয়। জ্ঞানের আসার রীতিও যেন তাই। কিন্তু যে দিন তার পরিপূর্ণ, প্রশান্ত রূপটির দর্শন-লাভ ঘটে তখন চিত্তের সমস্ত বাড়াবাড়ি ভাব সমাহিত হয়ে আসে। সেই পূর্ণ জ্ঞানের আভাতে অজিতের মনের ক্ষেত্র প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, তার বিদ্যার আস্ফালন, শিক্ষার অভিমান, বংশের গৌরব, জাতের বড়াই তার মন থেকে অন্তর্হিত হ'ল।

তার প্রাণের উপর রুশীয় সোস্যালিজ্‌ম্‌ আর ফরাসী সাম্যবাদের ধ্বজা উড়্‌ল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থ জীবনের চির-সাথী হ'ল। টলষ্টয়, গান্ধীকে অজিত তার জীবনের আদর্শ কর্‌ল। মিল, টুর্‌গেনিফ ইব্‌সেন্‌, বার্ণার্ড শ, গ্যালস্‌ওয়ার্থী প্রভৃতি সাহিত্যিকদের অজিত তার গুরু-পদে অভিষিক্ত কর্‌ল। দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বদ্ধ-বাতাসে অজিতের অন্তর পুরুষটি যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। দেশের একদল নবীন সাহিত্যিকের সঙ্গে যোগ দিয়ে অজিত জাতীয় মনের আব্‌হাওয়াতে বিপুল একটি পরিবর্ত্তন ঘটাতে প্রবৃত্ত হ'ল। সমাজ-সংস্কারকদের দলের একজন চাঁই হয়ে, অজিত দেশের সমাজটাকে ভেঙ্গে-চুরে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপর নতুন করে তার গোড়াপত্তন কর্‌তে কৃতসংকল্প পেল। পল্লীর উন্নতি সাধন আর দেশের নারী-জাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দান, এই দু'টি তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল। লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত জন-সাধারণের অন্তরে আত্ম-সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলা, দেশের কৃষক শ্রেণীর মান বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে অজিত যেন একবারে উঠে পড়ে লাগ্‌ল।

কিন্তু একদিকে অজিত যেমন দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে সারা হচ্ছিল, অন্যদিকে অজিতের পিতা অনাদিনাথ তেমনি পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় বিশেষ করে মন দিয়েছিলেন। অজিত এম্ এ, পাশ কর্‌বার পর থেকে, অনাদিনাথ প্রতিদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়ে তাঁকে সেলাম জানিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর বেশ একটি সুযোগ উপস্থিত হ'ল। বিভাগীয় কমিশনার সাহেব অনাদিনাথের কোন এক মক্কেল-জমিদারের এলাকার ভিতর শিকার কর্‌তে এলেন। অনাদিনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে জমিদারের খরচায় রসদাদি জোগালেন, এবং যথা-বিধি তদ্‌বির-তদারক কর্‌লেন। এর ফলে, অনাদিনাথ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আর বিভাগীয় কমিশনার উভয়েরই বিশেষ প্রীতিভাজন হলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে হাকিমী-পদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা পুত্র অজিত-মোহনের অনেকটা বেড়ে গেল। তবু একটা বাধা ছিল, অজিতের বয়সের অঙ্কে একটি বৎসর বাহুল্য হয়ে পড়েছিল। সেটি ঝেড়ে ফেল্‌তে অজিতের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। ম্যাজিষ্ট্রেটের সুমুখে অজিত এমন একটি সত্য-পাঠ কর্‌ল, যার প্রধান অঙ্গই হ'ল—জল-জ্যান্ত একটি মিথ্যা!

যে পদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল চোরকে সাজা দেওয়া, সেই পদটি অধিকার কর্‌বার জন্য সর্ব্বপ্রথমে চুরি বিদ্যাই অজিতকে অবলম্বন করতে হ'ল। তবে পরদ্রব্য অবশ্য নয়, আপনার বয়স চুরি, কাজটি হয়ত গর্হিত না হতেও পারে। তবু অজিতের বিবেক-বুদ্ধি তার প্রাণে যে হুল না ফুটিয়েছিল, তা নয়। কিন্তু মাথার উপর ছিল তার পিতৃ-আজ্ঞা। পরশুরাম যে দেশের দশ-অবতারের এক অবতার, সেই দেশেতে জন্ম নিয়ে পিতৃ-আদেশ অমান্য করবে এমন সাধ্য কার?

কত যুগ যুগান্তরের শ্রদ্ধার ভারে যে সংস্কারটি মনের ভিতর কেটে বসেছে, একদিন ইচ্ছামাত্র সেটিকে মন থেকে সরিয়ে ফেলা, বড় সহজ কথা ত নয়। কাজেই দেশের উন্নতিকল্পে যে সব শুভ অভিপ্রায় আকাশের তারার মত অজিতের অন্তরে এক একটি করে ফুটে উঠেছিল, পিতৃ-আজ্ঞার সুমুখে এক নিমিষে সব যেন আকাশ কুসুমের মতো ঝরে পড়্‌ল। দেশ উদ্ধারের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে, চোর ডাকাতের দণ্ড-মুণ্ডের একটি বিধাতারূপে অজিত একদিন বিচার-আসন দখল কর্‌ল।

অজিতের কার্য্যকালের প্রথম দু'টি বৎসর কেটেছিল তার আপনার জেলাতে। সেই সময়ের একটি ঘটনা, নিতান্ত ক্ষুদ্র হ'লেও আজকের এই ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

যে গ্রামের মাটিতে অজিত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর যাকে জড়িয়েছিল তার শৈশবের স্মৃতি, অর্দ্ধ যুগ বাদে আবার একটি দিন অজিত সেই গ্রামে পদার্পণ কর্‌ল। এবার অবশ্য গ্রামের একজন অধিবাসী রূপে নয়, একটি বাঁটোয়ারা মোকদ্দমার তদন্তকারী একজন হাকিম স্বরূপে। গ্রামে এসে অজিত তার বাড়ীর ভিঁটেতেই তাঁবু গাড়্‌ল। বাড়ীর ঘর-দুয়োর তখন একখানিও অবশিষ্ট ছিল না। ঘরগুলোর সব চালের খড় পচে খসে পড়েছিল। বাঁশের সাজ উঁইতে জীর্ণ করেছিল। মাটির দেয়াল বৃষ্টির জলে ধুইয়ে ধ্বসে পড়েছিল। ঘরের মেঝের উপর ঘাস-দূর্ব্বো গজিয়েছিল। আর বাড়ীর উঠোন এরণ্ড-আকন্দ, শুঁটি, ভেঁটি, তৃণ, লতা, গুল্মতে ভরে উটেছিল। বাড়ীর এই দৃশ্য কোন পরম আত্মীয়ের চরম দুর্দ্দশার মতো অজিতের মনকে বড়ই পীড়া দিতে লাগ্‌ল। আজ যেন অতীত তার মোহিনী রূপ ধারণ

করে অজিতের অন্তর মাঝে দেখা দিলে। রেণু,—আহা রেণু, আজ কোথায়? ছোট বোনটির কথা মনে আসতেই বেদনার একটি প্রবল উচ্ছ্বাস অজিতের প্রাণটার ভিতর ঢেউ তুল্‌ল। অজিতের মনে পড়্‌ল, পূজোর পর ইস্কুলের ছুটি যখন শেষ হয়, বাড়ী থেকে তার যাত্রার দিনে, সে যখন নদীর ঘাটে নৌকোতে এসে উঠ্‌ল, রেণু ঠাকুরমার আঁচলখানি ধরে ঘাটের পাড়ের উপর দাঁড়াল, আর নৌকোখানি যে পর্য্যন্ত না তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এল, রেণু সেইখানে ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে দাদার নৌকোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। রেণুর কাছে সেই হ'ল অজিতের জন্মশোধ বিদায়।

ঠাকুরমা?—ঠাকুরমার ত স্নেহের অন্ত ছিল না। নিত্যি তিরিশ দিন সাঁঝের সময় মণ্ডপ-ঘরের দুয়োরে উপুড় হয়ে পড়ে অজিতের মঙ্গল কামনায় ঠাকুর দেবতার কাছে তিনি কত প্রার্থনাই না করেছেন। আহা! ঠাকুরমাও আজ আর নেই।

অজিতের প্রীতি ও অনুরাগের যে ধারাটি দিনে দিনে শুকিয়ে এসেছিল, আজ আবার তাতে প্রবল জোয়ার এল। আর সেই জোয়ারে ভেসে এল আর একজনের স্মৃতি। সে হ'ল গ্রামের জয়হরি সরকারের পুত্র ভজহরি সরকার। গ্রামের যে পাঠশালাতে অজিত ভজহরির সঙ্গে একত্রে পড়্‌ত, আজও সে পাঠশালা আছে। তবে যাঁদের যত্নে পাঠশালা গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল, তাঁদের অভাবে অনাদরের রূপ পাঠশালার ঘরে ফুটে বেরিয়েছে। ঘরের মেঝেতে এতই ধুলো জমেছে যে, একত্র কর্‌লে তার ওজন হয়ত এক মণের কম হবে না। ঘরের চৌকাঠ-কবাট কোথায় সব অদৃশ্য হয়েছে, আর তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য রয়েছে ক'খানি দর্‌মা।

বেঞ্চিগুলোর ভিতর কোনোখানির হয়ত একদিকের দুটো পায়া ভেঙ্গেই গেছে আর সেই পায়ার পরিবর্ত্তে দুটো বাঁশের খুঁটো পুঁতে রাখা হয়েছে। একখানি বেঞ্চির গায়ে আজও লেখা রয়েছে, 'ভজহরি আমার বন্ধু।' অজিত একদিন তার ছুরির ডগা দিয়ে আঁচড় কেটে ওবাক্যটি বেঞ্চির গায়ে লিখেছিল। এরপর অজিত যখন ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়্‌তে গিয়েছিল, তখন ভজহরির প্রতি তার কি অবজ্ঞা! আর ঠাকুরমা ভজহরিকে বড়ই অসামান্য একটি অধিকার দান করেছেন, এইটে বিবেচনা করে, অজিত তার ঠাকুরমাকে পর্য্যন্ত ক্ষমা কর্‌তে পারে নি। ঠাকুরমার কাছে অজিতের সে অপরাধের গুরুত্ব যেন আজ দশগুণ বেড়ে উঠ্‌ল। আইডিয়ালের যে উচ্চ আকাশে অজিতের প্রাণটি একদিন ডানা মেলে ছিল, সেইখান থেকে অজিত লক্ষ্য করে দেখ্‌ল, ভজহরিকে হেয় জ্ঞান কর্‌তে পারে এমন কোন হেতু তার নেই। ভজহরির পেটে বিদ্যা নেই বটে, কিন্তু অজিতের বিদ্যাই বা তার কোন্ কাজে লাগ্‌ছে? অজিত ত একদিন দেশ-বিদেশের ঢের ইতিহাস মুখস্থ করেছিল। অমুক রাজার রাজত্বকালে অমুক দেশের রাজনীতিক বা সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল। অমুক সাম্রাজ্য কি ভাবে গড়ে উঠ্‌ল। অমুক দেশের অমুক সময়ের ধর্ম্ম বা সমাজ-বিপ্লব কি ভাবে সংঘটন হ'ল। অমুক সভ্যতার কি রূপ, কি নিদর্শন, কি আদর্শ, কি মূলমন্ত্র ইত্যাদি ঢের তথ্য অজিত জেনে ছিল। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা চুরি মোকদ্দমার রায় লিখে, অথবা বাঁটোয়ারা মোকদ্দমার তদন্তের রিপোর্ট লিখে যার জীবন কাট্‌ছে, তার দেশ-বিদেশের নানা তথ্য জেনে রাখবার কোন্ প্রয়োজন ছিল? আর শিক্ষার গুমরই বা কোথায়? অজিত যখন কলেজে পড়েছে, অনেক

রাত জেগে এথিক্‌সের সূত্রগুলো ধরে সে টানা হেঁচ্‌ড়া করেছে। সত্যাসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেহারা অজিত পর্য্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু তার জীবনের ফাঁকে সুবৃহৎ ও সুস্পষ্ট মিথ্যা প্রবেশ লাভ করেছে।

অজিতের মগজের ভিতর যে সব আইডিয়া একদিন ভিড় করেছিল, যদিও সে গুলো অন্তর্হিত হয়েছিল, তবুও তারা তার মনের উপর রেখাপাত করে গিয়েছিল। সেই রেখাগুলো আজ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আইডিয়ালের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে অজিত তার আপনার জীবনটাকে বড়ই খাটো করে দেখ্‌ল। আর তার কল্পনার দৃষ্টিতে কৃষক-পুত্র ভজহরির জীবনটাই মহিমাময় হয়ে উঠ্‌ল। অজিত মনে মনে ঠাহর কর্‌ল, ভজহরির যথেষ্ট সমাদর করে, ঠাকুরমার কাছে তার অপরাধের গুরুত্ব লাঘব কর্‌বে। সেই কারণে, ভজহরিকে ডাক্‌বার জন্য অজিত সেই দিন সাঁঝের আগে তার কাছে লোক পাঠাল।

প্রবল প্রতাপান্বিত যে পুলিশ-দারোগা তার উপরেও অজিতমোহন হ'ল দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতারূপী একজন হাকিম। ভজহরি ঘাড়ের উপর চাদরখানি ফেলে দিয়েই, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাকিম অজিতমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দৌড় দিল। আস্‌বার পথে, অজিতমোহন যে এককালে তার বন্ধু ছিল, এই দুরন্ত চিন্তাটি বারবার একটি বিভীষিকার মত ভজহরির অন্তরে উদয় হল। আর ভজহরি শঙ্কিত হয়ে সেটিকে তার সমস্ত মন দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগ্‌ল। বিশহাত দূরে থাক্‌তেই, ভজহরি জোড়-করে একেবারে নুইয়ে পড়ে মাটীতে কপাল ঠেকাবার উপক্রম করল। অজিত হাকিমী পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও, মানুষের মনুষ্যত্বকে কোন রকমে খর্ব্ব হতে দেখ্‌লে, বড় বেশি খুসি

হ'তে পারত না। আর আজকের কথা ত ছিল স্বতন্ত্র। ভজহরি তার কাছে এতদূর খাটো হয়ে যে আসবে, এটা যদিও খুব স্বাভাবিক, তবু অজিতের কল্পনাকে যথেষ্ট পীড়া দেবারই কথা। তারপর যে এতদূর খাটো হয়ে এল, তাকে বন্ধু-সম্ভাষণে আপনার উচ্চতর প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে উন্নত করা, অজিতের পক্ষে বড় সহজ হ'ল না। দু'টো বিপরীত শক্তি তার প্রাণের ভিতর যেন ঠেলাঠেলি করতে সুরু করল। একদিকে হাকিমী পদের মান-মর্য্যাদার দাবী আর অন্যদিকে তার আদর্শ-জীবনের উদার সাম্য-জ্ঞান, যেন দুটো ষাঁড়ের মত অজিতের মনের ক্ষেত্রে বিষম একটা হুড়াহুড়ি বাধিয়ে দিল। সেই লড়াই-এর একটু ফাঁকে একটি কথা অজিতের প্রাণের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, "বন্ধু"! এ কথায় বক্তা ও শ্রোতা দু'জনেই সমান চম্‌কে উঠল। অজিত লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেল, ভজহরি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

আশ্বিন ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পত্র।

—:*:—

শ্রীমান্ চিরকিশোর

কল্যানীয়েষু।

আমার শেষ চিঠি পড়ে, তুমি চম্‌কে না যাও, চমৎকৃত যে হয়েছ, সে কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি নে। পত্রখানি যে আগাগোড়া পড়্‌তে পেরেছ, এই আমার সৌভাগ্য। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ—ইউক্লিড পরমতত্ত্ব নয়, চরম আর্ট—একথা বলে আমি কি বল্‌তে চেয়েছি? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর—যা বল্‌তে চেয়েছি, তা ঐ পত্রের ভিতরেই আছে। মনে ভাব্‌তে পার, এ উত্তর হচ্ছে—চালাকি করে ও প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আসলে কিন্তু তা নয়। লেখক কি সব সময়ে জানেন যে তিনি কি বল্‌তে চান? কলমের মুখ দিয়ে যে অনেক সময় এমন সব কথা বেরিয়ে যায়, যা বল্‌বার লেখকের কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না,—তা লেখকমাত্রেই জানেন। লিখ্‌তে বস্‌লেই দেখা যায়, কথায় কথা টানে, ভাব ভাবের পিছনে ছোটে, তারপর লেখা আপনা হতেই তার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। সুতরাং সে মূর্ত্তির যদি কোনও মাথামুণ্ডু না থাকে, ত সে কলমের দোষ, লেখকের নয়। কবিকঙ্কন ভারতচন্দ্র প্রভৃতি যে বলেন যে সরস্বতী তাঁদের মুখে বাণী দিয়েছেন, সে কথা আমি বিশ্বাস করি। আমরা যাঁদের কবি বলি, তাঁদের মন যে ভাবসাগরে চিরদিন পাল খাটিয়ে অকূলের দিকে চলে, এ কথা যে না জানে, সে কাব্য কাকে বলে তা

জানে না। তবে অ-কবি আমরা, অবশ্য চিরদিন গুণ টেনেই চলি,—অর্থাৎ মাটির আশ্রয় ত্যাগ করবার আমাদের সাহসও নেই, শক্তিও নেই। ভাবের যাত্রা নিরাপদে সাঙ্গ করবার জন্য আমাদের মত সাহিত্যিকদের পক্ষে, নিরেট বস্তুজগতের উপর পা রেখে লজিকের সিধে পথ ধরে চলা ছাড়া আর উপায় নেই। সুতরাং আমি এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে, আমার গেল চিঠিতে আর যাই থাক্—কোনও প্রকাণ্ড সত্য নেই। তবে কি ওটি একটি প্রকাণ্ড রসিকতা?—তাও নয়, কেননা রসিকতা কখন প্রকাণ্ড হয় না। ইংরেজরাও জানেন যে 'Brevity is the soul of wit. ও একটা খামখেয়ালি লেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর ভিতর যদি কিছু থাকে ত,—মানুষের মন লজিকের পথ ছেড়ে দিলে কি ভাবে চলে, তারই পরিচয়। যদি বল লজিকের ধ্রুবপদ ছেড়ে খেয়ালের বেচাল ধরবার প্রয়োজন কি? তার উত্তর—গুণটানার দাসত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করবার লোভ সকলের-ই মাঝে মাঝে হয়।

আমি জানি, এ কথার জবাব তুমি কি দেবে। তুমি বলবে, ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনে, আইডিয়া নিয়ে খেলা করাটা কি সঙ্গত?—তোমরা যে আজকাল সব কাজেরই হাতে হাতে ফল পেতে চাও, সে কথা কে না জানে। এ ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, কেননা আমাদের কোন কাজেরই ফল ফলে না। যাদের সুমুখে সময় ঢের আছে তারা মেওয়া ফলাতে চেষ্টা করুক—কিন্তু আমাদের বয়েসের লোকের সবুর সয় না, আর তা'তে করে শুধু মেজাজ বিগড়ে যায়। এ অবস্থায় মনের কথা লিখতে গেলেই তা মেজাজি লেখা হয়ে উঠবে। আর আমার মতে মেজাজি লেখার চাইতে খেয়ালি লেখা ঢের ভাল, কেননা ঢের বেশি নিরাপদ। যে লেখার মাথা-মুণ্ডু নেই—তার মুণ্ডুপাত কেউ

কর্‌তে পার্‌বেন না, অতএব তার বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্রধারণ কর্‌বেন না"। অপর কিছু লিখ্‌তে গেলেই কলমধারীদের সঙ্গে আমার কাজিয়া বাধে। কেউ ডান গালে চাঁটি মারলে, বাঁ গালটি যে অমনি বাঁয়া করে দিতে হবে, এ মন্ত্রে আমি দীক্ষিত হই নি। আমাদের দেশে যাঁরা লেখনী ধারণ করেন, তাঁরা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই লেখক না হয়ে সমালোচক হতেই ব্যস্ত। সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ে বলে, প্রদীপ দিয়ে ঘর আলো করাই সঙ্গত, চালে আগুন লাগিয়ে দেওয়া অসঙ্গত। সেকালের জনসাধারণ যে কথাটা জান্‌ত, একালের শিক্ষিত সমাজ তা ভুলে না গেলে, মনের প্রদীপের আমরা এর চাইতে সদ্ব্যবহার করতে পার্‌তুম। অমরা যে তা করিনে, তার কারণ—আমরা আলোর চাইতে আগুনকে চিনি বেশি। ফলে, যে কথায় মনে আলো ফেলে, তার চাইতে যে কথায় বুকে আগুন জ্বলে, এদেশে তার বাজার-দর ঢের বেশি। কাজেই বাজে কথা বক্‌তে হয়।

তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক্ যে, আমাদের পক্ষে এখন প্রধান দরকার হচ্ছে—প্রাণের তেজ বাড়ানো। আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উত্তাপটা যে এখন subnormal—একথা আমিও অস্বীকার করি নে। তবে আলোর ভিতরে যে আগুন নেই, এ সত্য কোন্ হাতে ধরা পড়েছে? রক্তমাংসের হাতে ত নয়ই। রসিকতাকে পাঁচজনে এত নীচু নজরে দেখে কেন? লোকের বিশ্বাস হাসির আলোর গায়ে চমক আছে, কিন্তু তার অন্তরে কোনও শক্তি নেই; অর্থাৎ বিদ্যুতের অন্তরে বজ্র নেই। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে তাঁদেরি মত, যাঁরা যে বস্তু স্পর্শ কর্‌তে পারেন না তার গুণাগুণ মানেন না, কেননা জানেন না। আলোর দোষই এই যে, ও বস্তু ম'নুষের করতলগত

হয় না। তারপর রসিকতা ছেড়ে যদি সত্যকথা বল, তাতেও রক্ষে নেই। অমনি লোকে বল্‌তে সুরু কর্‌বে যে, সে কথা অপ্রিয়, এবং অপ্রিয় সত্য বলা শাস্ত্রে নিষেধ। এ নিষেধ আমিও মান্য করি। তবে সত্যের খাতিরে আমি বল্‌তে বাধ্য যে, সত্য প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয়—তা শুধু সত্য। সত্যের প্রিয়তা অপ্রিয়তা নির্ভর করে শ্রোতার উপরে। যা একজনের কাছে প্রিয়, তা আর একজনের কাছে অতিশয় অপ্রিয় হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। একালে যে কথা আমাদের জাতের আত্ম-গরিমা না বাড়ায়, সকলেই জানে যে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়,—হো'ক না সে কথা ষোল-আনা সত্য। কিন্তু সেকালে ভারতবর্ষে আর্য্য নামক এক জাত ছিল—যাদের প্রকৃতি ছিল ঠিক আমাদের উল্টো। ভাসের নাটকে পড়েছি যে, উত্তরগোগৃহে শত্রুর দল রণে ভঙ্গ দেবার পর, রাজকুমার উত্তর ঘরে এসে শুন্‌লেন যে, দূতমুখে বিরাট-রাজের কাছে এই সংবাদ পৌঁচেছে যে, তাঁর বীরত্বেই সে যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে। ব্যাপার হয়েছিল অন্য-রূপ। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন বৃহন্নলা, আর উত্তর শুধু রথের মধ্যে সাক্ষী-গোপাল হয়ে বসেছিলেন। উত্তর এই মিথ্যা-প্রশংসায় হৃষ্ট হওয়া দূরে থাক্, অতিশয় রুষ্ট হয়ে বিরাট-রাজের কাছে বলেন যে, এই মিথ্যা-খ্যাতি বিষের মত তার দেহ-মনকে দগ্ধ কর্‌ছে; কেননা যে সত্যসন্ধ, মিথ্যা-প্রশংসা তার কাছে যেমন অগ্রাহ্য, তেমনি অসহ্য। এই কথায় উত্তর যে মনোভাব প্রকাশ করেন, সে মনোভাব যে আর্য্য, তার পরিচয় আমরা ঐ একই নাটকে, দ্রোণের মুখেও পাই। দ্রোণ শকুনীকে বলেন যে, সত্যের অপলাপ করা গান্ধার দেশের লোকের ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু আর্য্যের নয়। সে যাই হো'ক, একালের সাহিত্যে

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর পত্র।

৺চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজীবন পত্রব্যবহার ছিল। এই পত্রযোগে পরস্পরের ভিতর বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা চল্‌ত। বসু মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ, তিনি সাহিত্যসেবীদের মধ্যে এইরূপ literary correspondence-এর প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আজ ৩৪ বৎসর পূর্ব্বের লেখা বসু মহাশয়ের ছ'খানি পত্র প্রকাশ করছি—এর থেকে সেকালে কি ভাবে সাহিত্য আলোচনা করা হ'ত তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

সম্পাদক।

(১)

কলিকাতা

৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পড়িয়া আমি বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমি যাহাদিগকে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে সম্মান করি, তাঁহারা আমাকে স্নেহ করেন ইহা বুঝিতে পারিলে আমি যথার্থই সুখী হই।

সাহিত্য ক্ষেত্রে আমি আপনাকে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে নিষেধ করি না—সাহিত্য ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহ বড় আবশ্যক। সঞ্জীবনীতে আপনি আমার পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াও আমি দুঃখিত হই

নাই। আমি যথার্থই * * বাবুকে গালি দিয়াছি, পাছে আপনারা এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—এই ভাবিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। আপনার সুধাময় পত্রপাঠে সে ব্যথা নিবৃত্ত হইয়াছে।

আমার কোন লেখা আপনি কখনও কোন লোকের কাছে নিন্দা করিয়াছেন, এ কথা আপনার পত্রে প্রথম জানিলাম, আগে জানিতাম না। অতএব সেরকম নিন্দার কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত হই নাই। আপনার লিখিত একটি প্রবন্ধে আমার নিন্দা দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যখন সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন সে প্রবন্ধের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আর ব্যথিত করিব না।

লোকের কাছে মুখে মুখে সমালোচনার কথা যখন উঠিল, তখন আমার একটা সামান্য মত প্রকাশ করি। আমার বোধ হয় যে, আমাদের পরস্পরের গ্রন্থ শুধু ছাপায় সমালোচিত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে চিঠিতে সমালোচিত হওয়া ভাল। বন্ধুর গ্রন্থ সম্বন্ধে বন্ধুকে মত জানাইতে হইলে যে শুধু প্রশংসাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; বরং বন্ধুভাবে বন্ধুকে মত জানাইতে বন্ধুর লেখার দোষগুলির প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকা সম্ভব এবং উচিত। লেখার গুণ এবং দোষ, এ দু'য়ের মধ্যে গুণ জানা খুব আবশ্যক,—কিন্তু দোষ জানা তদপেক্ষা বেশী আবশ্যক। ছাপার সমালোচনায় কি গুণ, কি দোষ, কিছুই ভাল করিয়া বুঝান হয় না. অথচ দোষগুলি অতি অযথা প্রণালীতে গাহিয়া দেওয়া হয়, প্রায়ই রূক্ষ এবং অভদ্র ভাষায় বলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে যাঁহার দোষের উল্লেখ করা হয়, তাঁহার দোষগুলি হয় দোষ বলিয়া মনে হয় না, নয় সমালোচনার ব্যবহার দেখিয়া

তাঁহার কথিত দোষগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিয়া তাহার সংশোধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুভাবে চিঠিতে সমালোচনা হইলে এ সকল কুফল ফলে না। কারণ, সেরকম সমালোচনা প্রথমতঃ যত্নসহকারে করিতে হয়, অতএব সমালোচনা বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সে সমালোচনা ভদ্রভাবে এবং সহানুভূতির সহিত লিখিত হওয়ায়, যাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা তাঁহারও তাহাতে আস্থা হয়, এবং সমালোচনা ঠিক বোধ হইলে তদনুসারে নিজের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্তি, যত্ন এবং চেষ্টা হয়। এবং এই প্রণালীতে সমালোচনা করিতে করিতে আমাদের সাহিত্যের, বিশেষত সমালোচনা-সাহিত্যের (Critical literature-এর) ভাবভঙ্গী ভদ্রোচিত এবং সম্মানার্হ হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি দেখিয়া বড় দুঃখিত যে, আমাদের মধ্যে এই প্রণালীর সমালোচনার জন্য কাহারও বড় একটা স্পৃহা নাই। আমাদের মধ্যে বন্ধু বন্ধুকে বই উপহার দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মতের বা সমালোচনার কামনা করেন না। বোধহয় কেবল প্রশংসার তৃষ্ণা প্রবল বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে প্রধান লেখকেরা সমালোচনাকে বেশী ভয় করেন। আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি, আমরা বড়ই অপদার্থ। কিন্তু আমি যে প্রণালীর সমালোচনার কথা লিখিলাম, সে প্রণালী প্রচলিত হইলে সমালোচনাটা ক্রমে গা-সওয়া হয় না? এবং মোটের উপর আমাদের খুব উপকার হয় না? বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে প্রকৃত literary correspondence নাই বলিয়া আমার বোধ হয়।

বিনীত

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

(২)

কলিকাতা,
৯ অক্টোবর, ১৮৮৪।

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্কিম বাবুর আধুনিক গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে আপনি আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ বলিতেছি।

* * * * *

তারপর দেবী চৌধুরাণীর কথা। দেবীর সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আপনাকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যেন আপনি একটু ভুল বুঝিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন—দেবী চৌধুরাণী কেমন করিয়া ডাকাইত হইল, কেমন করিয়া ডাকাইতি করিল?—কিন্তু দেবী চৌধুরাণী ত ডাকাইতি করে নাই। ডাকাইতের সঙ্গে ঘুরিত ফিরিত বটে, কিন্তু কখনও ডাকাইতি করে নাই। ডাকাইতের দলকে উৎসাহিত, চমকিত এবং আবদ্ধ রাখিবার জন্য ভবানী পাঠক দেবীকে রাণী সাজাইয়াছিল, কিন্তু দেবী ডাকাইতি করিত না। তবে দেবী ডাকাইতের দলের রাণীগিরি করিয়া, স্বয়ং ডাকাইতি না করিলেও ডাকাইতিকে প্রশ্রয় দিয়াছে, এরূপ তর্ক করা যাইতে পারে। কিন্তু গোড়ায় ভবানী পাঠক দেবীকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে তাহার ডাকাইতি, ডাকাইতি নয়—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন মাত্র। দেবী তখন সেই

কথা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিল। এরূপ বুঝা নিতান্ত অসম্ভব, অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। অতএব দেবীর ডাকাইতের দলে থাকা বড় একটা বিচিত্র নয়। কিন্তু ডাকাইতের দলে থাকা দোষের নয়, এরূপ বুঝিয়াও দেবী স্বয়ং ডাকাইতি করে নাই, করিতে পারে নাই। ইহাতে নারীচরিত্রের সঙ্গতিই রক্ষিত হইয়াছে, অসঙ্গতি ঘটে নাই। ডাকাইতের দলে থাকিয়া দেবী তাহার দৈব-লব্ধ প্রভূত অর্থ গরিব দুঃখীকে দান করিয়া বেড়াইত। ইহাও স্ত্রী-স্বভাবসঙ্গত। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি দুই একটি স্ত্রীলোক স্বামীর বিষয় পাইয়া তাহা গরিব দুঃখীকে দিয়া কাঙ্গালিনী হইয়াছে। তারপর রাণীগিরি করা। সেটা কিন্তু তাহার মনোগত নয়। গল্পটি পড়িলে এ কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দেবীর রাণীগিরি করা তাহার মনোগত নয়, কেবল ভবানী পাঠকের অনুরোধে তাহা করিত। ভবানী পাঠকের প্রয়োজন সাধন হইয়া গেলেই রাণীগিরি ছাড়িয়া কাঙ্গালিনী সাজিত। ভবানী পাঠক তাহাকে বড় বিপদ হইতে রক্ষা করে, তাহাকে অনেক যত্নে শিক্ষা দান করে, তাহাকে বড়ই ভালবাসে এবং ভক্তি করে। সেও ভবানীকে পরম গুরু বলিয়া ভক্তি করে। অতএব ভবানী পাঠকের অনুরোধে তাহার এক আধবার রাণীগিরি করা বড় একটা অসঙ্গত কাজ নয়। অতএব দেবাকে আমি এমন কোন কাজ করিতে দেখি নাই, যাহার মূল তাহার "ভিতর" নাই, অথবা যাহা স্ত্রী-চরিত্রের সহিত সঙ্গত হয় না। দেবীর মাতৃ-গৃহ ত্যাগ হইতে শ্বশুরগৃহে পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার জীবনপ্রণালীটা (Mode of life) অবশ্যই কতকটা masculine-রকম বোধ হয়। অত স্বাধীন ও সাহসিক ভাব পুরুষকেই সাজে, বাঙ্গালি স্ত্রী-কে সাজে না। কিন্তু প্রথম কথা এই যে,

দেবী জীবনের চিত্র নয়, আদর্শ চিত্র ; এবং সেই জন্য কবি দেবী-চরিত্রে এমন মশলা সংযোগ করিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালি মেয়ের চরিত্রে থাকিলে ভাল হয়। একজন ইউরোপীয় স্ত্রী দেবীর মতন জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিলে বোধহয় তাহাতেও স্ত্রী-চরিত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অর্থাৎ দেবীতে যে উপকরণ কবি যোগ করিয়াছেন, সে উপকরণ ইউরোপীয় স্ত্রী-চরিত্রে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই উপকরণ স্ত্রী-চরিত্রের একেবারে অনুপ-যোগী নয়। তাই, কবি বাঙ্গালি মেয়ের চরিত্রে সে উপকরণ থাকা স্পৃহনীয় বিবেচনা করিয়া দেবীর চরিত্রে সে উপকরণ সংযোগ করিয়াছেন। আনন্দ মঠের শান্তিতেও এরূপ করা হইয়াছে। অতএব আমার মতে, দেবীকে কবির ideal বা আদর্শ চরিত্র বলিয়া ধরিলে, দেবীর জীবনাংশটা বড় একটা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সেই জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে আমি ইহাও বলি যে, সেরূপ জীবনপ্রণালী সাধারণত বাঙ্গালির মেয়ের পক্ষে অসম্ভব বা অসঙ্গত হইলেও, সকল বাঙ্গালির মেয়ের পক্ষে অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। রাণী ভবানীর কথা আমরা যেরূপ শুনিয়া থাকি, তাহাতে বোধ হয় যে রাণী ভবানীও আবশ্যক হইলে দেবীর জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যখন প্রফুল্লকে প্রথম দেখি, তখনও তাহাতে এমনি সাহস, প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভর-শক্তির লক্ষণ দেখিতে পাই যে, তাহার পরে যখন তাহাকে ডাকাইতের দলে থাকিয়া প্রভুত্ব করিতে দেখি, তখন কিছুমাত্র বিস্মিত হই না। তখন যথার্থই বোধ হয়, এরূপ অবস্থায় সেই প্রফুল্ল যে এই দেবীরাণী হইয়া পড়িবে, ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়। অতএব দেবীতে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত বা হঠাৎ

আরোপিত হইয়াছে, অথবা তাহার গোড়ার চরিত্রের সহিত অসঙ্গত হইতেছে, এমন কিছুই আমি দেখিতে পাই না।

তথাপি আমি বলি যে বঙ্কিমের আগেকার উপন্যাস আমাকে যত ভাল লাগিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী তত ভাল লাগে নাই। তাহার কারণ দেবী চৌধুরাণীতে theory-র অবতারণা। দেবী অনেক সাহসের, অনেক বুদ্ধির, অনেক দয়ার কার্য্য করিয়াছে; কিন্তু কবি যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ভবানী পাঠকের শিক্ষার গুণে দেবী সে সব কাজ করিয়াছিল, তাহাই কি ঠিক? সে শিক্ষা না পাইলে দেবী কি সে সব কাজ করিতে পারিত না? আমাকে বেশ পরিষ্কার বোধ হয় যে, দেবী এমন কোন কার্য্য করে নাই—যাহা করিবার জন্য তাহার বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। আমি গল্পের গোড়াতেই দেবীতে যে সকল মশলা দেখিতে পাই, সে সকল মশলার গুণে দেবীকৃত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়, বিশেষ শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। শিক্ষার কথাটা এত করিয়া লিখিবার ফল এই হইয়াছে যে, দেবী যা কিছু করিতেছে তাই যেন সেই শিক্ষার গুণে করিতেছে, তাই যেন সেই শিক্ষার demonstration মাত্র, এরূপ মনে হয়। দেবী রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কোন পক্ষে একটিও মানুষ মরে নাই, একটিও মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই? অমনি মনে হইতেছে যেন দেবী সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কসামাজা theory বজায় রাখিতেছে। অনেক স্থলে এইরকম মনে হয়। দেবীকে শিক্ষার অধীন না করিলে, এবং কথায় কথায় নিষ্কাম ধর্ম্মের নিক্তি তুলিয়া না ধরিলে, দেবীর কোনও কার্য্যের বিবরণ পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইতে হইত না—কোনও কার্য্যই unspontaneous বলিয়া বোধ

হইত না। দেবীর সকল কার্য্যই তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ এবং সেই-জন্য বড়ই প্রীতিকর। কেবল এক শিক্ষার কথা এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের ধুয়া তুলিবার দরুণ, সেই সকল চমৎকার কার্য্যের বিবরণ অনেকাংশে পূর্ণানন্দ প্রদানে অসমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কোন কার্য্যই আমার অসঙ্গত, অস্বাভাবিক বা অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। আমার বোধহয় যদি ভবানী পাঠকের শিক্ষাপ্রণালীর উল্লেখমাত্র না থাকিত, এবং গল্পের মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম্ম এই শব্দ পর্য্যন্তও ব্যবহৃত না হইত, তাহা হইলে দেবী চৌধুরাণী শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যের নয়, মনুষ্যের সাহিত্যের একখানি চমৎকার রত্ন হইয়া থাকিত। গল্পের তবে তাৎপর্য্য উৎসর্গপত্রে ইঙ্গিতে লক্ষিত হইলেই বেশ সুন্দর হইত।

সীতারামে আমি এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে আমার আরো অনেক আছে। দরকার হয় পরে বলিব। ইতি

বিনীত

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

রসিকতার চাইতে সত্যকথা যে বেশি অচল—সে কথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই।

সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যই অবশ্য সমালোচকদের কাছে লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হয়ে এসেছে। সামাজিক মনের সাহিত্য-বিদ্বেষের একটা টাটকা উদাহরণ নেওয়া যাক্।—তুমি সম্ভবত জান যে, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে দু'দল লেখকের আবির্ভাব হয়। একটি ছিল আর্টের দল, আর একটি বিজ্ঞানের দল। Realist-রা বল্‌তেন যে, সাহিত্যের কর্ত্তব্য, সত্য কথা বলা; আর Parnassian-রা বল্‌তেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সুন্দর কথা বলা। এ দু-দলের ভিতর অবশ্য যথেষ্ট দলাদলি ছিল, এবং পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে যথেষ্ট মিথ্যা কথা আর যথেষ্ট কদর্য্য কথা বলেছেন। কিন্তু সমালোচকদের হাতে এ দু-দলই সমান মার খেয়েছেন। তাঁরা আর্টের দলকে বল্‌তেন—তোমাদের লেখায় সত্য নেই; আর বিজ্ঞানের দলকে বল্‌তেন—তোমাদের লেখায় সৌন্দর্য্য নেই। সমালোচকেরা অবশ্য সত্যের জন্য কিম্বা সৌন্দর্য্যের জন্য থোড়াই কেয়ার কর্‌তেন—লেখকদের বিরুদ্ধে তাঁদের আসল অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁদের কলমের মুখ দিয়ে যা বার হয় তা কাজের কথা নয়। সত্য জেনেই বা কি হবে, আর রূপ দেখেই বা কি হবে,—সমাজ চায় সেই কথা—যা জীবনের হাটে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায়, যা পরিবার নামক ছোট ঘরকর্‌না, আর সমাজ নামক বড় ঘরকর্‌না, দুয়েরই সমান কাজে লাগে। মানুষের মনের জীবন তার কাজের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও যে তার অধীন নয়—এ কথা জনসাধারণ মানে না; কেননা কাজ সকলেরই আছে, কিন্তু মন সকলের নেই।

কর্ম্ম ও জ্ঞান, এ দুই বিচ্ছিন্ন না হলেও যে বিভিন্ন, এ কথা ইউ-

য়োপেও লুকোনো নেই। সুতরাং সাহিত্যিকরা যখন সমাজকে সম্বোধন করে বল্‌লেন যে,—তোমাদের ঘরকর্‌না তোমরা চালাও, আমরা তার তেল-নুন-লক্‌ড়ি যোগাতে পার্‌ব না; তখন সমাজ উত্তর কর্‌লে যে, আমরা তোমাদের আমাদের বাজার-সরকারি কর্‌তে বল্‌ছি নে, আমাদের হয় হাসাও নয় কাঁদাও। তা'তে বিজ্ঞান ও আর্ট একজোট হয়ে সমস্বরে বল্‌লে আমাদের "বয়ে গেছে।" বিজ্ঞানের দল বল্‌লেন,—আমরা তোমাদের চোখের সুমুখে এমন আলো ধরে দেব, যাতে করে যা সুন্দর তাও কুৎসিত দেখাবে; আর আর্টের দল বল্‌লেন, আমরা রেখা ও বর্ণের এমনি বিন্যাস কর্‌ব যে, তাতে করে যা কুৎসিত তাও সুন্দর দেখাবে। সমাজ প্রতিকূল না হলে, লেখকেরা এতটা গোঁয়ার হয়ে উঠতেন না, এবং Zolaও সরস্বতীর মন্দিরকে ব্যাধি মন্দির করতেন না, এবং Gautierও তাকে চিত্রশালায় ভর্ত্তি কর্‌তেন না। তবে এঁদের একটা কথা খুবই সত্য; সে হচ্ছে এই যে, হাসি-কান্নার বাইরে না গেলে, কি সত্য কি সুন্দর ও দুয়ের কোনটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সত্য ও সুন্দরের চর্চ্চাও হচ্ছে একরকমের যোগসাধনা।

যে কথা Leconte-de-Lisle এবং Flaubert-এর মুখে শোভা পায়, সে কথা অবশ্য আমাদের মত লেখকের উচ্চারণ করবারও অধিকার নেই। পাঠকসমাজ যদি আমাদের কাছে হাসি-কান্না চান, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই। ফরমায়েস কর্‌লে আমি অন্তত ওর প্রথম ভাগটা কায়ক্লেশে যোগাতে পারি। কিন্তু পাঠকসমাজ হাসি ভালবাসে না, তারা চায় শুধু কাঁদ্‌তে; অথচ চোখের জলে কলম ডুবিয়ে আমি লিখ্‌লে তাতে হরফ ফোটে না। এইজন্যই ত

এত বাজে বকি, এবং যে ইউক্লিডের আমি কোনও ধার ধারি নে, তারই গুণ গাই। আমার মাল বাজারে না কাটুক, তাতে কোনও ক্ষতি নেই—দুঃখের বিষয় এই যে, দেশে আজকাল সাহিত্য কেউ চায় না। সমাজ চায় সেই পলিটিক্‌স্,যাতে তার ক্রোধ ও মদ বাড়ে,—সেই ইক্‌নমিক্‌স্, যাতে তার লোভ ও মাৎসর্য্য বাড়ে,—সেই দর্শন, যাতে তার মোহ বাড়ায়—আর সেই গল্প ও সেই কবিতা, যাতে তার কামনা বাড়ায়—এবং সে কামনা নিষ্ফল হলে, হা-হুতাশ করতে শেখায়। বলা বাহুল্য ষড়-রিপুর কোনটিকেই বাড়ানো সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়—সাহিত্যের একমাত্র কর্ম্ম হচ্ছে আত্মাকে বাড়ানো। এ কথা যে না বোঝে, তাকে তর্ক-যুক্তির সাহায্যে বোঝান অসম্ভব; কেননা আত্মা-বস্তুকে জানা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। যা সকলের ভিতর আছে, তা সকল থেকে ছাড়িয়ে কি করে আলাদা করে দেখানো যেতে পারে?—তুমি বলবে এ সব হচ্ছে mysticism-এর বুলি। অবশ্য তাই;—যে লেখার ভিতর mystery নেই, তা কি কখন সাহিত্য হতে পারে?—Mysticism-এর বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই; তবে উপনিষদের "অতিবাদ" শব্দ বোধহয় ঐ জিনিসকেই বোঝায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে যে, যে ব্যক্তি প্রাণতত্ত্ব দর্শন করেন, মনন করেন, এবং তা যে সর্ব্বের অতিরিক্ত এইরূপ নিশ্চয় করেন, তিনিই অতিবাদী হন। এবং এই সূত্রে সনৎকুমার উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কেউ বলে তুমি অতিবাদী—তাহলে উত্তরে বলবে—হাঁ আমি অতিবাদী; নিজের অতিবাদিত্ব স্বীকার করবে, কখন গোপন করবে না। সুতরাং mysticism-কে প্রত্যাখ্যান করবার আমাদের কোনও দায় নেই। এ সত্য কি সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে যে, যার অন্তরে দর্শন নেই, তা কাব্য

নয়; আর যার অন্তরে অতির ধারণা নেই, তা দর্শন নয়।* সে যাই হোক্, পৃথিবীর যে-কোন ভাষার যে-কোন কাব্য নিয়ে তাকে বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখাও ত, তার কবিত্ব কোন্ উপাদানের মধ্যে নিহিত?—যদি তুমি তা পার, তাহলে তুমি মানুষের দেহকে dissect করেও হাতে ধরে দেখিয়ে দিতে পার তার প্রাণ কোথায়। যার ভিতর রহস্য নেই, তার ভিতর আনন্দও নেই; আর যার ভিতর আনন্দ নেই—তার ভিতর সত্যও নেই, সৌন্দর্য্যও নেই। মানুষে আনন্দের অধিকারী বলেই কাব্য ও কলার সৃষ্টি করেছে।

যারা কথা নিয়ে কারবার করে তারাই জানে, ও হচ্ছে একরকম আগুন নিয়ে খেলা করা। কথার শক্তি অসীম, এবং সে শক্তি যেমন প্রাণ-বর্দ্ধক তেমনি মারাত্মক। কথায় আত্মাকে যেমন জাগিয়ে তোলে, তেমনি আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মানুষে একটা কথার মত কথা পেলে তাই আঁকড়ে ধরে জীবন যাপন করে,—সে কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাটা তারা আর আবশ্যক মনে করে না। সাহিত্যের উপর সমাজের রাগই এই যে, সাহিত্য নতুন কথা বলে, আর না হয়ত পুরোণো কথার নতুন অর্থ বার করে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ "আনন্দ" শব্দটি মানুষের মুখে সহজেই একটা বুলি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ দেশে সে ভয় বিশেষ আছে। বড় বড় কথাকে অর্থহীন বুলিতে পরিণত করতে আমরা সিদ্ধহস্ত। অতএব আনন্দ শব্দের মর্ম্ম আমি কি বুঝি, তা তোমাকে বলছি।

আনন্দ অর্থ আমোদ নয়, আরাম নয়, এমন কি সুখও নয়। আনন্দ মনের শান্তি ভঙ্গ করে। সেই কারণে যাঁরা মানুষকে আনন্দের বারতা শুনিয়েছেন, তাঁরাই পৃথিবীতে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করেছেন।

যীশুখৃষ্ট স্পষ্টই বলেছেন যে "আমি তোমাদের শান্তি দিতে আসি নি, দিতে এসেছি অসি"। শ্রীকৃষ্ণ অসি নিয়ে আসেন নি, এসেছিলেন বাঁশি নিয়ে। কিন্তু সে বাঁশি যে কি গোল ঘটিয়েছিল, তা সকলেই জানেন। সে বাঁশির ডাকে যমুনা যে উজান বয়েছিল—সে আনন্দে, সুখে নয়। যার প্রতি অণু পরমাণুকে উজান ঠেলে যেতে হয়, তার সুখই বা কোথায়, আর সোয়াস্তিই বা কোথায়? সাহিত্যের অসিই বল আর বাঁশিই বল—দুয়েরই কাজ হচ্ছে সকল মনের শান্তি ভেঙ্গে দেওয়া। কেননা কাব্য চায় মানুষকে আনন্দ দিতে, আর কবি জানে যে শান্তি হচ্ছে সীমার ধর্ম্ম—আনন্দ অসীমের। এই সীমা অতিক্রম করবার শক্তিপ্রয়োগে আনন্দের জন্ম, এবং সেই শক্তির বৃদ্ধিতেই আনন্দের স্ফূর্ত্তি। মানুষ ঘর ছাড়্‌তে চায় না, আর সাহিত্য তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। এই জন্যেই ত সাহিত্যের উপর সমাজের এত আক্রোশ, এত অত্যাচার। অতএব প্রতিদেশে প্রতিযুগে সাহিত্যের কথা সামাজিক sedition হিসাবে গণ্য। সুতরাং আমরা যদি সাহিত্য রচনা না করে বাজে বকি, তাতে আমাদের বুদ্ধির দোষ দিতে পার না।

এ কথা শুনে তুমি হেসে বল্‌বে যে, আমি যখন কবি নই—তার্কিক, তখন আমার ভয় কি?—এ কথা আমি মানি যে, আমি কাউকে আনন্দ দিতে পারি নে বলে অনেককে শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু বিচার করাও যে সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়—বৌদ্ধ শাস্ত্র হতে তার প্রমাণ দিচ্ছি। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস জান, অতএব তোমাকে বলা বাহুল্য যে King Menander ছিলেন বহ্লিকের গ্রীক ভূপতি, এবং তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ভিক্ষু নাগসেন ছিলেন তাঁর দীক্ষা-গুরু। নাগসেনের সঙ্গে Menander-এর প্রথম সাক্ষাতে কি কথোপকথন

হয়েছিল, "মিলিন্দ পঞ্হো" থেকে এখানে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

রাজা বলিলেন, "ভদন্ত নাগসেন, আমার সহিত আপনি আলাপ করিবেন কি ?"

—মহারাজ, আপনি যদি পণ্ডিতগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, আমি আলাপ করিব। আর যদি রাজাগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, মহারাজ তবে আমি আলাপ করিব না।

—ভদন্ত নাগসেন, পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?

—মহারাজ, পণ্ডিতগণের বিচারে (বাদী ও প্রতিবাদীর দুরবগাহ প্রশ্নরূপ) আবেষ্টনও করা হয়, এবং (তাহার যথোচিত উত্তররূপ) নিরাবরণও করা হয়; কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হয়, এবং তদ্বিরুদ্ধ বৈলক্ষণ্যও প্রদর্শিত হয়। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা কোপ করেন না। মহারাজ, পণ্ডিতেরা এই প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন।

—আর রাজারা কি প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?

—মহারাজ, রাজারা আলাপে কোন একটি বস্তুর প্রতিজ্ঞা করিয়া লন। যদি কেহ ঐ বস্তুকে প্রতিকুল ভাবে প্রতিপাদন করে, তবে তাঁহারা ইহাকে দণ্ড দাও বলিয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। মহারাজ, রাজারা এই প্রকারে আলাপ করেন।

এ কথা যে সত্য, তা একালেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য; আর এ কথা কে না জানে যে, একালে সাহিত্য-সমাজের রাজাগণ হচ্ছেন জনসাধারণ,—ইংরাজিতে যাকে বলে public। সুতরাং স্বয়ং নাগসেন যখন রাজার সঙ্গে বিচার করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন, তখন আমি যে

public-মহারাজার সঙ্গে বিচার করতে কুণ্ঠিত হব, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

নাগসেন অবশ্য অবশেষে মহারাজ মিলিন্দের সঙ্গে বহু বিচার করেন, তার কারণ তাঁর শেষ কথার উত্তরে মহারাজ বলেন :—

"ভদন্ত নাগসেন, আমি পণ্ডিত-বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করিব, রাজবিচার অবলম্বন করিব না। ভদন্ত, আপনি বিশ্বস্ত হইয়া আমার সহিত আলাপ করুন। আপনি যেমন ভিক্ষু সামণের (নব শিষ্য) উপাসক বা পরিচারকের সহিত আলাপ করেন, সেইরূপ বিশ্বস্ত হইয়া আলাপ করুন, আপনি ভয় করিবেন না।"

এ হেন অভয় পাঠকসমাজ আমাকে কখনই দেবেন না ;—কেননা Menander মহারাজা হলেও গ্রীক, আর আমাদের জনসাধারণ আর যাই হ'ন, গ্রীক নন। এ ক্ষেত্রে বাজে বকা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ?

২০শে জুলাই, ১৯১৮ খৃঃ

বীরবল।

সাহিত্যের জাতরক্ষা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যিনি বলেন যে বহুদিন হ'ল আমরা সমুদ্র যাত্রা করি নি, আজই বা তা করতে যাব কেন? আর যিনি বলেন যে অতীতকালে আমাদের কবিরা রাধা-কৃষ্ণের গান লিখেছেন, আজই আমরা মহীন্ বা বিনোদিনীর মনের প্রাণের খোঁজ নেব কেন? এই দু' ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবিক পক্ষেই কোন প্রভেদ নেই। এই দু'জনের মধ্যেই রয়েছে একটা দীনতা। এই দীনতাতেই তাঁরা জাতীয়তা তথা 'পেট্রিয়টিজ্‌ম'-এর উজ্জ্বল রঙ চড়িয়ে বীরত্ব বলে' চালান করে দিতে চাচ্ছেন।

যাদের নিজের উপরে কোন ভরসাই নেই, তারাই পদে পদে পিছন ফিরে আপনার পথ ঠিক করতে চায়—আর যাদের বাস্তবিকই কিছু বল্‌বার নেই, তারাই আপনার কথা গুলোকে অতীতের ছাঁচে ঢালাই করে' তার একটা মূল্য বাড়িয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে। এ যেন "কীটোপি সুমনোসঙ্গাৎ"—দেবতার মাথায় গিয়ে চড়ে' বস্‌বার চেষ্টা। এই হচ্ছে তাদের দীনতা।

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে, এমন লোকও থাক্‌তে পারেন, যাঁর বাস্তবিকই নিজস্ব কিছু বল্‌বার আছে। আর তিনি নিশ্চয়ই সে কথা বল্‌বেন—আপনার ভাষায়, আপনার সুরে, আপনারই অন্তরের

রঙ্ ফলিয়ে। তাঁকে আমরা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ্তে পার্ব না। আর সেই না পারাটা অতি সুখের কথা।

কিন্তু ঐ যে দীনতা—ওদীনতা কিন্তু মানুষ কোন দিনই স্বীকার কর্বে না। অন্তত যেমানুষের বাঁচ্বার ক্ষমতা আছে সে—মানুষ। কারণ এই দীনতা যেমানুষ স্বীকার কর্বে সেই মানুষই প্রকৃত পক্ষে তার জাতীয়তার মূলে কুড়ুল মার্বে। কেননা এটা খুব স্পষ্ট কথা যে, একটা কোন জাতিকে মেরে ফেলে তার জাতীয়তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায় না। আর একটা জাতিকে বাস্তবিক মেরে ফেলা হবে, যদি সেই জাতির প্রত্যেক মানুষটা আপনাকে ঐ দীনতার সাবু-বার্লি দিয়ে পুষ্ট কর্তে থাকে।

একটা কথা কিন্তু মনে না লেগে যায় না। সেটা হচ্ছে এই যে, যাঁরা আজ বাঙ্লা-সাহিত্যে 'জাতীয়তা জাতীয়তা' বলে' খুব কলরব কর্ছেন, মনে হয় তাঁরা ভাবছেন যে বাঙালীর জাতীয়তাটা বুঝি তাঁদের কয়েক জনের মুঠোর মধ্যেই আছে। এইটে তাঁদের একটা মহাভুল। এই ভুলটাকে তাঁরা ভুল বলে' মনে কর্তে পার্ছেন না—নইলে তাঁদের কোলাহলটা অনেকটা নরম হ'য়ে আস্ত। আসল কথা এই যে, বাঙালীর জাতীয়তার হিসেবটা আমাদের কারও জামার পকেটে নেই—আছে সেটা এক বিশ্ব-বিধাতার মনের পটে।

কতকগুলো জিনিস আছে যার সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না, যেমন—ব্রহ্ম, কবিত্ব। তেমনি একটা জাতির জাতীয়তা যে কি, তারও সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না, কেননা জীবন জিনিসটা জ্যামিতি: পরিমিতিও নয়। কিন্তু ব্রহ্ম বা কবিত্বের সংজ্ঞা দেওয়া গেলেও, ব্রহ্ম বা' মদ্ যে কি নয় তা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে

তেমনি একটা জাতির জাতীয়তার সংজ্ঞা নিরূপণ করা না গেলেও তার জাতীয়তা যে কি নয় তা বলা তত শক্ত নয়। সেই জন্য একথা আজ আমরা নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে, বাঙালীর জাতীয়তা আর যাই হোক্‌ সেটা কেবল রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা বা বৈষ্ণব মহাজনের রসতত্ত্ব নয়। কেন নয়?—এ সম্বন্ধে যা মনে হয় তা বল্‌বার চেষ্টা করব।

(২)

জগতে যত ধর্ম্ম আছে তার মধ্যে আমরা, হিন্দুরা, কেবল আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সনাতনত্বের দাবী কর্‌তে পারি। কেন পারি তাও বল্‌ছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা উল্টো ধারণা আছে, সেইটে আগে বলে' নেব।

অনেকে মনে করেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তার মানে হচ্ছে এই যে, অতীত কালের যা কিছু তাই চিরকালের সত্য। বেদে যে সব উপলব্ধি বা চিন্তার কথা আছে, যে সব ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ সেই যুগের মানুষেরা যে রকম অবস্থার মধ্যে যে-রকমে আপনার জীবনের সত্যকে, জগতের সত্যকে, ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের, জগতের, ভগবানের ও সত্যের সেই রূপই কেবল চিরন্তন সত্য। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তার অর্থ এ নয়। এর মানে যদি তাই হয়, তবে আমরা বাঙালীরা আজ কেউই ন্দু নই। কারণ আমাদের চিন্তার রাজ্য আর বৈদিক যুগের মানুষের পারে ্যার রাজ্যের মধ্যে তিন সাত্তা একুশ সমুদ্র ও তিন তেরং উনচল্লিশ সে ীর ব্যবধান, আর আমাদের কর্ম্মের সঙ্গে বৈ পা যুগের কর্ম্মের যে

মিল সেটা শুধু "কৃ" ধাতুর মিল, তবে আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, যেমন বিবাহ পৈতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে এখনও সে যুগের ক্রিয়াদির একটু ছিঁটে ফোঁটা রকমের মিল আছে। তবে বলা বাহুল্য সবাই জানেন যে, সে মিলটা অত্যন্তই বাহিরের মিল—ভিতরের নয়। কেবল তাই নয়। আমাদের ধর্ম্মের সনাতনত্বের ঐ অর্থ অনুসারে আমাদের আর হিন্দু হবার কোন দিনই উপায় নেই। কারণ, যতই চেষ্টা করা যাক্ না কেন, একই কল্পযুগে বিশ্বমানবের জীবনে একই ভাব ঠিক অবিকল একই রকমে দু'বার আসে না—বিশ্বমানবের যে কোন অংশ সম্বন্ধেও সেই কথা।

কিন্তু ঐ যে বলেছি "কৃ" ধাতুর মিল—ঐ মিলটাই হচ্ছে আসল মিল। ঐটেই হচ্ছে সনাতনত্বের মূল—ঐ দিক থেকেই হিন্দু সনাতন। ঐ "কৃ" ধাতুর পিছনে হাজার যুগে হাজার প্রত্যয় লাগিয়ে হাজার ভঙ্গীতে মানুষ নাচ্‌বে কিন্তু "কৃ" সর্ব্বদাই "কৃ"। এই সত্যটাই প্রাচীন ঋষিরা দেখতে পেয়েছিলেন, আর অর্ব্বাচীন আমরা, দেখতে পাচ্ছি নে। সে যুগের তাঁরা বুঝেছিলেন যে, প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তন করা চল্‌তে পারে কিন্তু ঐ "কৃ" ধাতুকে ত্যাগ করবেন যিনি, তাঁর এ জগতে নিষ্কৃতি নেই। আর আজ আমাদের যে অবস্থা তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ঐ "কৃ" ধাতুটাকে খাটো করে' আমরা প্রত্যয়-টাকে বাড়িয়ে তুলে মনে করেছি যে সেইটেই সনাতন।

তেমনি আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে চার হাজার বছর পূর্ব্বের আর্য্যদের ধর্ম্মের যে মিল সেটা হচ্ছে "কৃ" ধাতুর মিল—মনের মিল নয় কিম্বা অনুষ্ঠানের মিল নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন মনকেই সনাতন বলে' মনে করেন। কথাটা আমি বানিয়ে বল্‌ছি নে।

এর প্রমাণ এই যে, আজও প্রাচীন কালের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নাম করে' মাঝে মাঝে হা-হুতাশ শুন্‌তে পাওয়া যায় এবং তা প্রবর্ত্তন করবার ধুয়োও মধ্যে মধ্যে ওঠে। এঁরা গায়ের জোরেই মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান। কিন্তু মনের জোর যে গায়ের জোরের চাইতে জেয়াদাই হ'য়ে থাকে, এটা সনাতন সত্য। প্রাচীন কালের মানুষেরা নিজ নিজ মন নিয়েই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে' গেছেন আর আমরাই বা কেন আমাদের নিজের মন নিয়ে আমাদের নিজের জীবন গঠন করব না—এ প্রশ্নটা যে কেন অনেকের মনে উদয় হয় না, সেটা আশ্চর্য্যই বল্‌তে হবে—বিশেষত এই Self-determination-এর দিনে। Self-determination যে কেবল রাজনৈতিক জগতেই সুখ স্বাস্থ্য ও আনন্দের মূল তাই নয়—মানুষের অন্তরের জগতেও তাই। তবে এই রকমের মনের ভাবের কারণও যে নেই তা নয়। আমি আগেই বলেছি—সেটা হচ্ছে মানুষের দীনতা, তার নিজের উপর ভরসার অভাব। সেকালের সবাই ছিলেন এক একজন প্রকাণ্ড ঋষি আর একালের আমরা সবাই এক একজন দীন অকিঞ্চন! মানুষের এই ভাব মানুষকে কোন দিনই অমৃতের পথে নিয়ে যাবে না। এই ভাব মানুষের শক্তিকে কোন দিনই উদ্বুদ্ধ কবরার সাহায্য করবে না। আর যে শক্তিহীন তার যে আত্মদর্শন লাভ ঘটে না—এ ত উপনিষদেরই কথা।

প্রাচীন কালের ঋষিরা মনকে সত্য বলে' জেনেছিলেন, কারণ তাঁরা মানুষের প্রকৃতি বলে' যে জিনিসটা আছে, তার রহস্য বুঝেছিলেন। প্রকৃতির ধর্ম্ম যে কি, তা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা মানুষের ধর্ম্মকে কোন "ক্রীড"-এর দ্বারা আবদ্ধ করেন নি—মানুষের ধর্ম্মকে

তাঁরা "রিলিজন" করে' তোলেন নি। 'রিলিজন' হচ্ছে ভগবানে পৌঁছবার পাকা সড়ক, আর ধর্ম্ম হচ্ছে আত্ম-সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার প্রকৃতির মেঠো রাস্তা। আর আত্ম-সাক্ষাৎ লাভ হলেই ভগবান দর্শন হয়। কেননা ভগবান যে মানুষকে তাঁর নিজের 'মডেলে' তৈরী করেছেন, সে-কথা বাইবেলেও বলে।

কিন্তু 'রিলিজন' ভগবানে পৌঁছিবার পাকা সড়ক হলেও যে সেটা সোজা রাস্তা এমন নয়—কেননা মনটা 'রিলিজনের' "ক্রীডে"র জালে জড়িয়ে পড়ে। ও অবস্থায় ভগবান ত দূরের কথা—মানুষ নিজেকেই দেখ্‌তে পায় না। মনের যা সত্য তা মনের মধ্যেই আছে—তা তার বাইরে নেই। বাইরের "ক্রীড" হয়ত মনের কাছে ঘোর মিথ্যা। আর মিথ্যার মধ্যে মানুষের দৃষ্টি খোলে না কোনদিন, বরং আরও ঘুলিয়ে যায়। আর ঘুলিয়ে-যাওয়া দৃষ্টি নিয়ে নিজেকেও বোঝা যায় না—ভগবানকেও পাওয়া যায় না।

এই যে এক যুগের মানুষের মন আর এক যুগের মানুষের মনের সঙ্গে এক নয়, আবার এক যুগের মানুষের মধ্যেই একজনের প্রকৃতি আর একজনের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন—এই সত্যটা প্রাচীন ঋষিরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছিলেন বলে' তাঁদের মধ্যে ধর্ম্ম বলে' যে জিনিসটা গড়ে উঠ্‌ল, সেটা কোন একজনের উপলব্ধ একটা সত্য নয়। আর সেই জন্যেই ক্রিশ্চিয়ান 'ক্যাথলিক' বা 'প্রটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্মে যেরী, খৃষ্ট বা বাইবেলের যে স্থান, মুসলমান ধর্ম্মে মহম্মদ বা কোরাণের যে স্থান, হিন্দুর ধর্ম্মে মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও ঠিক সেই স্থান নয়—বেদ বা কোন উপনিষদের বা গীতার ঠিক সেই স্থান নয়। সেইজন্যে হিন্দুর ধর্ম্মজগতে চিন্তার এত বিচিত্রতা—

সংস্কারকের এতঃসংখ্য। এক দর্শনেরই ছ' ছ'টা শাখা—উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণ হাতের পায়ের আঙুল গুণেও সংখ্যা করা যায় না। হিন্দুর ধর্ম্মে সকল প্রকার বিচিত্রতার স্থান আছে বলেই তা সনাতন। তার ধর্ম্মে মানুষের সকল প্রকার সত্যের জন্যেই সিংহাসন পাতা আছে—তাই তা সনাতন। তাই এ ধর্ম্মে প্রকৃতি অনুসারে কেউ ভগবানকে প্রেমময় রূপে পাচ্ছেন, কেউ বা শক্তিময় রূপে দেখ্‌ছেন—কারও আরাধ্য কৃষ্ণ, কারও আরাধ্য কালী। কারও জীবনে চরম সত্য বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল—নিরাকার আনন্দময় ব্রহ্মে, আবার কেউ দেখতে পেলেন সাকার ভগবান। এমন কি চার্ব্বাকও হিন্দু, কারণ চার্ব্বাকও মানুষের মনের একটা দিক, একটা অবস্থার প্রতিনিধি। তার স্থানও সনাতনের মধ্যেই—তার বাইরে নয়, অর্থাৎ এক কথায় সনাতন—সনাতন, কারণ তা সমস্তকেই আলিঙ্গন করে' আছে। আর ব্রহ্ম যে চরম সত্য তার কারণ হচ্ছে, ব্রহ্মে সকল সত্যের আরোপ করেও তাঁকে আনন্দময় রূপেই পাওয়া যায়।

এখন উপরের ঐ কথা যদি মানি তবে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যদি এম্‌নি ব্যাপক, তার আধ্যাত্মিক জীবনের দিকটা যদি এম্‌নি উদার, তবে সে হিন্দুর সামাজিক জীবন এমন সংকীর্ণ কেন? তবে সে হিন্দু এমন শুচিবাতিকগ্রস্ত কেন? সে শতাব্দী শতাব্দী ধরে' যারাই হিন্দু নয় তাদেরই 'পর নাসিকা কুঞ্চিত করে' ম্লেচ্ছ যবন ইত্যাদি নামে আপ্যায়িত করে' আসছে কেন? তারা অহিন্দু কাউকেই ছোঁয় না—কারও সঙ্গে খায় না এবং ছুঁলে খেলে তাদের ধর্ম্মের পতন হয়—একথা মনে করে কেন? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, হিন্দুর জীবনে ওটা অনেকটা আধুনিক কালের বস্তু—ওটা

তার শক্তিহীন অবস্থার কথা। হয়ত এর মধ্যে কিছু রাজনৈতিক রহস্যও লুকিয়ে আছে। দেশের কথা যে কেবল একালেই অনেকের কাছে দ্বেষের কথা তা নয়, সকল কালেই সেটা কারো কারো কাছে কিছু কিছু তাই ছিল। যার সঙ্গে গায়ের জোরে পারিনে তাকে অস্পৃশ্য মনে করাই প্রশস্ত—এটা সকল বুদ্ধিমানেই বল্‌বেন। ওটা হচ্ছে হিন্দু সমাজের আচারের কথা—হয়ত তার আত্মরক্ষা কর্‌বার প্রয়াসের চিহ্ন। তবে আমাদের এম্‌নি কপাল যে, এখন এই সামাজিক আচার ব্যবহারগুলোই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের ধর্ম্মের আসল রহস্য। সামাজিক অনেক আচার বিচার যে আমাদের মনের কাছে ঘোর মিথ্যা হয়েও টি`কে আছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা অন্তত শতকরা আশী জনা মনে করি যে, ঐ আচারগুলোই হচ্ছে বৈতরণী পার হবার আসল "লছমন ঝোলা"। তাই যখন আমাদের মধ্যে সৌখীন কেউ একখানা 'মাটন্ চপে'র পাশে পাশেই দুটো দ্বিজবিশেষের "হাফ্ বয়েল্‌ড্" অণ্ড নিয়ে জলযোগ কর্‌তে বসেন তখন চারিদিক থেকে অনুষ্টুপ ছন্দে সমস্বরে ঐক্যতান সঙ্গীত আরম্ভ হয়ে যায়—গেল "ধর্ম্ম" গেল "জাত"! এখানে একথা আমার বলা মোটেই উদ্দেশ্য নয় যে, হিন্দু সমাজে বা অপর কোন সমাজে আচার বিচারে একটা পূর্ণ 'এনার্কিজ্‌ম্' রাজত্ব করুক, তাহলে মানুষের মধ্যে সমাজ যে জন্যে গড়ে উঠ্‌ল তা ব্যর্থই হবে; কারণ সমাজের পিছনেও একটা সত্য রয়েছে। এখানে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, হিন্দুর যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল—মানুষের জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান, মানুষের নিজের চোখের সাম্‌নে নিজেকে তুলে ধরা, নিজের সঙ্গে স্বষ্টির, জীবের সঙ্গে জগতের, জগতের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ ইত্যাদি

আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, মানুষের জীবনে যে একটা চিরন্তনের আনন্দ-রস ধারা অনাদিকাল থেকে প্রবহমান, তার আবিষ্কার ও উপলব্ধি—সেই ধর্ম্মের আজ কার্য্য হয়েছে হিন্দুর রন্ধন-শালার বিরুদ্ধে অভিযান! এ যেন কামধেনুকে দিয়ে ধান মাড়িয়ে নেওয়া—কামধেনুর অমৃত দেবার ক্ষমতার খোঁজই নেই। যদি বল যে জনসাধারণের কাছ থেকে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিকটার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করবার আশা করা পাগলামী।—তার উত্তর হচ্ছে এই যে, কেবল জন-সাধারণ নয়, আমাদের সমাজে হোম্‌রা চোম্‌রা যাঁরা, তাঁদের ধর্ম্মও হচ্ছে কোন্ দিন বেগুণ খেতে নেই ইত্যাদি। কিন্তু যাক্ সে কথা।

এখন সনাতত্বের যে ব্যাখ্যা করা গেল, তাই যদি স্বীকার করি তবে কোন্ সাহসে আজ আমরা বল্‌ব যে, বৈষ্ণবের রসতত্ত্বই সকল বাঙালী হিন্দুর অন্তরে সকল কালে সরস হ'য়ে ও সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে বা থাক্‌বে? এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই সিদ্ধান্তটাই আপনি গড়িয়ে আসে যে, মানুষের বৈষ্ণবীভাব একটা ভাব, সনাতন ধর্ম্মে বৈষ্ণব "রিলিজন"-এর স্থান একটা স্থান, কিন্তু সব স্থানই তার নয়। এই বৈষ্ণব "রিলিজন"-কে যদি বাঙালীর ধর্ম্মের একান্তরূপ বলে' বাংলাদেশের উপরে চাপিয়ে দি, তবে বাঙালী হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের আসল যে রহস্যটুকু তারই মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। এখন এই বৈষ্ণবীভাব যদি প্রত্যেক বাঙালীর কাঁধে বাহির থেকে চাপিয়ে দি, তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিজের কাছে নিজে মিথ্যা হ'য়ে উঠ্‌বেন, সেই মিথ্যার মধ্যে দুর্ব্বল যাঁরা, তাঁরা কোন দিন আপনার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবেন না—আর শক্তিমান যাঁরা, তাঁরা বাহিরের ঐ মিথ্যার জাল ছিঁড়ে ফেলে আপনার নিজের অন্তরের সত্যকে আনন্দ-বীণা বাজিয়ে জগতের

মেলায় অভিনন্দিত করবে। হিন্দুর ধর্ম্ম—মানুষের ধর্ম্ম। মানুষের ধর্ম্মে ভগবান নিজেকে এক স্থানেই একান্ত করে' বেঁধে রাখেন নি। দিকে দিকে তাঁর আনন্দ-বীণা সহস্র সুরে, সহস্র রাগিনীতে বাজ্‌ছে—দিকে দিকে তাঁর আনন্দ-স্বরূপ, সহস্র রূপে সহস্র নামে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই সহস্র সুর সহস্র রূপ থেকে হিন্দু মানুষকে খণ্ডিত কর্‌তে চায় নি—কোন দিন বাঙালী হিন্দুও তা থেকে বঞ্চিত হ'তে চাইবে না—এই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। আর এই কারণেই হিন্দুর ধর্ম্ম সনতান ধর্ম্ম।

হিন্দু ধর্ম্মের এই উদারতা, বাঙালী হিন্দুকে মান্‌তে হবে। কিন্তু যদি সে নাও মানে তবে, এই উদারতাই তার জীবনে চিরকাল কার্য্যকরী হ'য়ে থাক্‌বে—কারণ মানুষের জীবনে এই উদারতাই চিরকালের সত্য। আর মানুষ মানুক বা না মানুক, সত্য সব সময়েই তার অজ্ঞাতসারেও আপনাকে জয়যুক্ত করে' তোলে। মানুষ যতই মনে করুক না যে, সে এককালে [illegible] অনুর মতো অচল [illegible] থাক্‌বে, তা সে পারবে না—অনি[illegible] [illegible]সারে সে পিছিয়ে পড়্‌বে, ক[illegible] যে জিনিস [illegible]ড় নয়, সৃষ্টির মধ্যে যা[illegible] গতি নেই তারই অগ[illegible] অগতি

হিন্দু ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিকটায় যদি বৈষ্ণব রসতত্ত্বই একমাত্র হয়—তবে বাঙালী হিন্দুর জাতীয়তাও তা নয়। কারণ একটা আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তা একই জিনিস—শুধু একটা হচ্ছে স্বরূপ, আর একটা হচ্ছে বাহিরের রূপ।

পূর্ব্বপক্ষ এর উত্তরে একটা কথা বল্‌তে পারেন। তাঁরা

বল্‌তে পারেন—"হে তর্কবাগীশ লেখক! তোমার তর্ক সব বাজে। কিম্বা যদি বাজে নাও হয় তাহলে আমাদের ক্ষতি নেই। কারণ তুমি ধর্ম্মের যে উদারতাই দেখাও না কেন্—আমাদের যে কথা, সে হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির কথা। আমরা দিব্যদৃষ্টিতে আজ বাঙালীর প্রকৃতিকে স্পষ্ট দেখেছি। আর দেখেছি সে প্রকৃতির গলায় তুলসীর মালা, নাকের ডগায় কনকোজ্জ্বল তিলক, হাতে একতারা, গায়ে নামাবলী, কণ্ঠে পদাবলী। বাঙালীর প্রকৃতি বৈষ্ণবী। আর সেই জন্যেই আজ আমরা বাঙালীকে আর সব মিথ্যা পথ ত্যাগ করিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। এই পথই বাঙালার সত্য—সুতরাং এই পথেই তার জীবনের সিদ্ধি ও সার্থকতা।"

এর উত্তরে আমরা শুধু এইটুকু বল্‌ব যে,—তাঁরা ভুল দেখেছেন। আর তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যেদিন কীর্ত্তনের ভাবতরঙ্গে "শান্তিপুর ডুবুডুবু আর ন'দে ভেসে যায়" যায় হয়েছিল সেদিনও সমস্ত বাংলা বৈষ্ণব হ'য়ে যায় নি।

আশ

জান্‌লেই হবে না—তাঁকে শক্তিময় বলেও মান্‌তে হবে। আমাদের আত্মাকে আজ রসতত্ত্বের মিষ্টি হাঁড়িতেই ডুবিয়ে রাখ্‌লে চল্‌বে না—শক্তির রাজমুকুটেও তাকে মণ্ডিত কর্‌তে হবে।

তাই আজ আমরা আশা কর্‌ব—ঐ মনের কোণে গোপন আশা স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশা কর্‌ব— তরুণ বাংলার অন্তরে অন্তরে নেমে আসুক প্রাণের স্রোতের "পাগ্‌লা ঝোরা।" নেমে আসুক আজ সে "পাগ্‌লা ঝোরা"—উর্ব্বরতাহীন অর্থহীন শত সহস্র সংস্কারের শক্ত মাটী কেটে কেটে—মনের জমাট বাঁধা পাষাণ ভার টলিয়ে দিয়ে দিয়ে—পুরাতনকে আপনার কাছ থেকে আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিয়ে—নতুনকে আপনার কাছে আপনাকে সত্য করে' সার্থক করে' তুলে তুলে। নেমে আসুক "পাগ্‌লা ঝোরা,"—এই তরুণ বাংলার উপরে শত ধারায় সহস্র ধারায়—শিল্পে, কথায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, যশে গৌরবে—সহস্র দিক মুক্তির গান গেয়ে গেয়ে—তৃপ্তির গান গেয়ে গেয়ে। আত্মার মুক্তি হোক্—আত্মার তৃপ্তি হোক্। আজ যে তরুণ বাংলার হৃদয়ে আকুল স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে—মুক্তি, মুক্তি। সে মুক্তি কেবল বাহিরের নয়—ভিতরের ;—কেবল দেহের নয়—অন্তরের। সে যে আজ—

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে যায়
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়
আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগত মাঝারে লুটিতে চায়।

পাঠকেরা শঙ্কিত হবেন না। মমসেন থেকে দুটো অধ্যায় ইংরেজি অনুবাদের বাঙ্গলা তর্জ্জমা করে' দিয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকপদ লাভের কোনও চেষ্টাই ক'র্‌ব না। রোম সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বল্‌তে যাচ্ছি তা নিতান্তই এলোমেলো রকমের। তাতে প্রত্ন-তত্ত্বের পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাসের গাম্ভীর্য্য—এ দুয়ের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং যাঁরা প্রবন্ধের নাম দেখে পড়্‌তে সুরু করেছেন তাঁরা হয়ত আর অগ্রসর না হ'লেই ভাল কর্‌বেন। আর যাঁরা নাম দেখেই পাতা উল্‌টে যেতে চাচ্ছেন, তাঁরা একবার শেষ পর্য্যন্ত পড়বার চেষ্টা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন।

(২)

প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের পশ্চিমের মাষ্টার ম'শায়দের কাছে অনেক রকম গঞ্জনা শুনেছে। তিরস্কারের একটা প্রধান বিষয় এই যে বংশপরিচয়ে তাঁরাও ছিলেন রোমানদেরই জ্ঞাতি। সুতরাং সেই একই রক্ত শরীরে থাক্‌তে তাঁরা যে কেমন করে হিন্দু-সভ্যতার মত এমন দুর্ব্বল ও বিকৃত সভ্যতা গড়ে বস্‌লেন, এটা পণ্ডিতদের মনে যেমন বিরাগেরও সঞ্চার করেছে তেম্‌নি জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এবং এই সংশয়ের সমাধানে তাঁরা নানা রকম সম্ভব অসম্ভব, অবশ্য সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদের প্রচার করেছেন। গল্প আছে, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্‌ রয়েল সোসাইটীর নতুন প্রতিষ্ঠা করে' পণ্ডিতদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, মাছ মর্‌লেই ঠিক সেই সময়টা তার ওজন বেড়ে যায় কেন? পণ্ডিতেরা উত্তর খুঁজে

গলদঘর্ম্ম হয়ে গেলেন। অবশেষে একজন বল্লেন, আচ্ছা দেখাই যাক্ না ওজন ক'রে, মাছটা মরলেই তা যথার্থ বেশী ভারী হয়ে ওঠে কিনা। মম্‌সেনের বিপুলায়তন পুঁথি শেষ করে' এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে, যে যাঁরা এই রোমান-সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাকে অতি খাটো ও নিতান্ত হাল্কা বলেছেন, 'সভ্যতা' বল্‌তে তাঁরা কি বোঝেন? সভ্যতার কোন্ মাপকাটিতে তাঁরা এই দুই সভ্যতাকে মাপ করেছেন? কোন্ তৌলে এদের ওজনে তুলেছেন? এই যে রোমান-সভ্যতা, যার গৌরবের দীপ্তিতে পণ্ডিতদের চোক ঝল্‌সে গেছে, এ ত একটা একটানা পরের দেশ জয় ও অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস। প্রথম 'লেশিয়ামের' উপর রোমের প্রভুত্ব বিস্তার, তারপর তারি সাহায্যে উত্তরের ইট্রাস্‌কানদের ধ্বংশ করে' ইতালীর আর সকল জাতিগুলোকে পিছে ফেলে গোটা দেশটায় নিজের আধিপত্য স্থাপন। আবার মেডিটারেনিয়ানের ওপারের প্রবল রাজ্যটী, সিসিলির সেতু পার হয়ে এই আধিপত্যের কোনও বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কা-তেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বিজিত ইতালীর সাহায্যে তাকে সমূলে উচ্ছেদ; এবং কার্থেজের অধিনায়ক 'হ্যামিলকার বার্‌কা' বা বিদ্যুতের বংশধর, স্পেন থেকেই যাত্রা সুরু করে' বজ্র হয়ে রোমের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নাই এই নীতি অনুসারে স্পেনেও রাজ্য বিস্তার। এম্‌নি ক'রে দক্ষিণ আর পশ্চিমের ভাবনা যখন ঘুচ্‌ল তখন স্বভাবতই দৃষ্টি গেল পূবের দিকে। গায়ে জোর থাক্‌লে এ 'আশঙ্কার' ত আর শেষ নাই! পূবে তখন ছিল আলেক্‌জেণ্ডারের ভাঙ্গা সাম্রাজ্যের গোটা কয়েক বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা। ওরি মধ্যে যে দুটি একটু প্রবল—ম্যাসিডন আর এসিয়া, তারা তখন রোমেরই মত

আশপাশের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে' নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল। এ ব্যাপারকে অবশ্য উপেক্ষা কি মার্জ্জনা কিছুই করা চলে না। কেননা পরের দেশ জয় করে' রাজ্য ও বলবৃদ্ধি জিনিসটি মানুষের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই নিজের পক্ষে খুব সুসঙ্গত ও অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্য সকলের বেলাই নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে মনে হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই রোমকে এ দুটি রাজ্য আক্রমণ করতে হ'ল; এবং এদের বাহুল্য অংশগুলি ছেঁটে ফেলে যাতে এরা অতঃপর বেশি নড়াচড়া না করে' ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হ'ল। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে রোম একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতেও কসুর করলে না। ইতালীতে তখন হেলেনিক সভ্যতার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। তারি গুরুদক্ষিণা হিসাবে গ্রীসের ছোট ছোট নখদন্তহীন নাগরিক রাজ্যগুলিকে ম্যাসিডনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে' রোম তাদের একবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের কথা মহানুভবতার এ খেলাও রোম বেশি দিন খেলতে পারল না। কারণ দানে পাওয়া স্বাধীনতার মানেই হ'ল—স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগটা করতে হবে দাতারই ইচ্ছা অনুসারে। সুতরাং গ্রীসের চপল প্রকৃতির লোকগুলি যখন নিয়মের ব্যতিক্রম করে', ম্যাসিডনের আবার মাথা তুলবার চেষ্টা দেখে, তাকেই নায়ক ভেবে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ করল, তখন এই পূবের দেশগুলির আধা স্বাধীনতা আধা অধীনতার বিশ্রী অবস্থাটা ঘুচিয়ে সোজা-সুজি এদের করায়ত্ত করে' নেওয়া ছাড়া রোমের আর গত্যন্তর থাকল না। এর পর রোমান চোখের দিক্‌চক্রবালে যে দুটি রাজ্য বাকী থাকল, সিরিয়া আর মিশর, তাদের নিয়ে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হ'ল

না। অবস্থা দেখে তারা আপনারাই এসে রোমের পায়ে মাথা টেকালে। সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠ্‌ল তখন কাজে কাজেই তার "বৈজ্ঞানিক চৌহদ্দি"-রও খোঁজ পড়ল। কৃষ্ণসাগরতীরের মিথ্‌রেডেসিরের রোমের শিকল ভেঙ্গে হাত পা ছড়াবার দুরাকাঙ্ক্ষা দমন উপলক্ষে, রাজ্যের পূব-সীমা ইউফ্রেটিসে গিয়ে ঠেক্‌ল, এবং স্বয়ং জুলিয়স কেল্টদের মৃতদেহের উপর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্রাটেরও আবির্ভাব হতে খুব বেশি বিলম্ব ঘট্‌ল না। কেননা তিন শ বছর রাজ্য-জয়ে আর রাজ্যভোগে প্রাচীন রোমান বল-বীর্য্য-ঐক্য সকলেরই তখন লোপ হয়েছে। প্রকৃতির পরিশোধ! আর পররাজ্যজয়ে যে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি তার নায়কত্ব না পেলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হ'ত। সিজারের উত্তরাধিকারীরা আরও তিন শ বছর ধরে' এই রোম-সাম্রাজ্য, যাকে কোন রকমেই আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, শাসন ও রক্ষা কর্‌লেন। রাজ্যের সকল জাতির লোকের মধ্যে রোম-নাগরিকের অধিকার ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কেননা তখন সকলেই রোম-সম্রাটের সমান প্রজা, 'ফেলো সিটি-জেনের' অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ফেলো সাব্‌জেক্ট'। উঁচু আশা ও বড় আকাঙ্ক্ষার তাড়না না থাক্‌লে যে-শান্তি আপনিই আসে, রাজ্যজুড়ে সে শান্তি বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌ল। ঘরকন্নার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পাকা আইন কানুন এই বহুজাতি ভূয়িষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে গড়ে উঠ্‌ল। তারপর মানুষের গড়া অপর সকল রাজ্যের মত রোম-সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়ল। ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র ভূ-মধ্যসাগর ছেড়ে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকে আশ্রয় কর্‌ল। তারি তীরে তীরে

নবীন নানা জাতির মধ্যে মানুষের সভ্যতার চির-পুরাতন ও চির-নূতন খেলার আরম্ভ হ'ল।

(৩)

এই যে ছয় সাত শ বছরের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের পলিটিকাল ইতিহাস, রোমান সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনীরও এই হ'ল অন্তত চোদ্দ আনা। একে বাদ দিলে রোমান সভ্যতার যা অবশিষ্ট থাকে তার গৌরবের কাছে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথা দূরে থাক্, তার চেয়ে অনেক ছোট সভ্যতারও মাথা নীচু করার কোনও কারণ দেখা যায় না। হেলেনিক সভ্যতার দৃষ্টান্তটি চোখের সাম্‌নে থাকলেও নিজেদের সভ্যতার এই স্বরূপ সম্বন্ধে রোমানদের মনেও সংশয়ের কোনও অবসর ছিল না। আগষ্টাশের সভাকবি তাঁর যুগের আত্মবিস্মৃত রোমানদের প্রকৃত রোমান-গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ছেন,—'জানি আর আর সব জাতি আছে যারা কঠিন ধাতুকে সুষমাময় গড়ন দিতে পারে, পাথরের হিম দেহ থেকে প্রাণের বিপুল উচ্ছাস খুজে বের কর্‌তে পারে, জ্ঞানের আঙুল আকাশে তুলে নক্ষত্রলোকেরও সকল বার্ত্তা এঁকে দেখাতে পারে, কথার সঙ্গে কথা গেঁথে লোকের করতালি নিতেও তারা পটু, কিন্তু রোমান, এ সব কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ হ'ল—সকল জাতির উপর রাজত্ব করা। সেই হ'ল তোমার শিল্পকলা। তোমার গৌরব হ'ল বিজিত রাজ্যে শান্তি আনা, উঁচুমাথাকে যুদ্ধে নীচু করা, পতিত যে শত্রু তাকে করুণা দেখান। 'এনিড' যে ইতিহাস নয় কাব্য, পতিত শত্রুকে করুণা দেখানোর কথা বলে' ভার্জিল বোধ হয় তারি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা রোমের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এ

বস্তুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যা হোক, ল্যাটিন কবির রোমান সভ্যতা ও গৌরবের এই বর্ণনাটা আধুনিক কালের রোমান-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এক রকম সকলেই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নাই। এবং এরি মধ্যে মানুষের সভ্যতা, প্রকৃতি ও শক্তির বিরাট বিকাশ দেখে তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। মানি, বহু জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় কর্‌তে হ'লে জাতির মধ্যে যে বীর্য্য, যে ঐক্য, যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বন্ধনের প্রয়োজন, তার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এই বস্তুকে সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ বল্‌লে মানুষের প্রকৃতিকেই অপমান করা হয়। আর জাতির এই বীর্য্য, ঐক্য ও বুদ্ধি যখন পরের দেশ জয় ও পরের উপর আধিপত্যেই নিঃশেষে ব্যয় হয়, তখন তার শক্তি দেখে অবশ্য স্তম্ভিত হতে হয়, যেমন কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্ত্তিতে মানুষ স্তম্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা সমগ্র জাতি নবীন শক্তি সঞ্চারের আকস্মিক উন্মাদনায় নয়, কিন্তু যেমন মম্‌সেন দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী সূক্ষ্ম লাভ লোকসানের হিসাব গণনা করে চোখের সুমুখে যখনি যাকে প্রবল বা বর্দ্ধিষ্ণু দেখেছে তারি বুকের উপর পড়ে, তার জীবনের বল নিঃশেষে শুষে নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, রোমান ইতিহাসের এই ব্যাপারটি তার ভীষণতায় মানুষকে স্তম্ভিত না করেই পারে না; খৃষ্টান ও পার্শি পুরাণে যে অন্ধকার ও অমঙ্গলের দেবতার কল্পনা আছে সেটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোমের এই প্রবল পলিটিকাল সভ্যতা, কেবল সম-সাময়িকদেরই মাথা ভয়ে হেঁট করিয়ে রাখে নি, কিন্তু উত্তর-কালের ঐতিহাসিকদেরও শ্রদ্ধায় নতমুণ্ড করে' রেখেছে। প্রাণতত্ত্ব-

বিদেরা হয় বল্‌বেন মানুষ পশুরই বংশধর ; শক্তির বিকাশ দেখ্‌লেই পূজা না করে' থাক্‌তে পারে না। মম্‌সেন বলেছেন, এথেন্স যে রোমের মত রাষ্ট্র গড়্‌তে পারে নি, সে জন্য তার দোষ ধরা মূর্খতা। কেননা গ্রীক প্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও যা কিছু বিশেষত্ব, তা ছিল তেমন একটা রাষ্ট্র গড়ে' তোলার প্রতিকূল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে বরণ না করে', গ্রীসের পক্ষে জাতীয় একতা থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। সেই জন্য গ্রীসে জাতীয় একত্বের যখনি বিকাশ ঘটেছে সেটা কোনও রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর ভর করে' নয়। অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, হোমারের কবিতা, উরিপিডিসের নাটক এই সবই ছিল হেলাসের ঐক্য-বন্ধন। ঠিক আবার তেমনি ফিডিয়াস কি আরিস্টফেনিসের জন্ম দেয় নি বলে রোমকে অবহেলা করা অন্ধতা। কেননা রোম স্বাধীনতার জন্য স্বাতন্ত্র্যকে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্ম্মমভাবে দমন করেছে। ফলে হয়ত ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে, প্রতিভার ফুলও মুকুলেই ঝরে পড়েছে ; কিন্তু তার বদলে রোম পেয়েছে স্বদেশের উপর এমন মমত্ববোধ ও 'পেট্রিয়টিজম', গ্রীসের জীবনে যার কোনও দিন প্রবেশ ঘটে নি। এবং প্রাচীন সভ্যজাতিগুলির মধ্যে রোমই স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হয়েছে। সেই জাতীয় ঐক্যের ফলে কেবল বিচ্ছিন্ন হেলেনিক জাতির উপরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জানা অংশের উপর প্রভুত্ব, তাদের করতলগত হয়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে আছে 'পুরুষের' শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, তাই শেষ, তাই 'পরা গতি'। পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর উপর অবাধ প্রভুত্ব কি মানব সভ্যতার 'পুরুষ', তার 'কাষ্ঠা' ও 'পরা গতি'! এ প্রভুত্ব ত

কালে উঠে কিছুকালের পরই বিলোপ হয়; মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছুই স্থায়ী সম্পদ রেখে যায় না। আমার সুমুখে উরিপিডিসের কয়েক খানি নাটক রয়েছে। এগুলি ত কেবল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর হেলাসের ঐক্য-বন্ধন নয়। তেইশ শ' বছর আগেকার এথেন্সের নাগরিকের মত আমিও যে আজ সে কাব্যের রসে মেতে উঠ্‌ছি। এগুলি যে চিরদিনের জন্য মানব-সভ্যতার অক্ষয় মঞ্জুষায় সঞ্চিত হয়ে গেছে। যুগের পর যুগ বিশ্বজন এর সুধা আনন্দে পান কর্‌বে। আর রোমের প্রভুত্ব?—সেটি রয়েছে—ঐ মম্‌সেনের পৃষ্ঠায়। এই যে প্রভেদ, এ ত মম্‌সেনের চার ভ্যলুমও মুছে ফেল্‌তে পারে না। একে কেবল মানুষের সভ্যতার প্রকার ভেদ বলে' আপোষ মীমাংসার চেষ্টায় কোনও ফল নাই। এর একটির চেয়ে আর একটি শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; যেমন জড়ের চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ, প্রাণের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সভ্যতার ধারা দুই। এক ধারা বয়ে যাচ্ছে—কেবলই কালের মধ্য দিয়ে, জাতিকে, সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতির মহাসাগরে মিশিয়ে দিচ্ছে। নতুন জাতি, নূতন সভ্যতার স্রোত এসে ধারার প্রবাহকে সচল রাখ্‌ছে। আর এক ধারা জন্ম নিয়েছে কালেরই মধ্যে, কিন্তু কালকে অতিক্রম করে' ধ্রুবলোকে অক্ষয় স্রোতে নিত্যকাল প্রবাহিত হচ্ছে। নূতন স্রোত এসে এ ধারাকে পুষ্ট কর্‌ছে; কিন্তু এতে একবার যা মিশছে, তার আর ধ্বংশ নেই, তা অচ্যুত। কেননা এ লোকে ত পুরাতন কিছু নেই, সবই সনাতন, অর্থাৎ চির-নূতন। সভ্যতার সৃষ্টির এই যে নশ্বর দিকটা এ কিছু তুচ্ছ নয়। এইখানেই বিবিধ মানবের বিচিত্র লীলা, সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র নির্ম্মাণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্বে, হীনতায় চিরদিন তরঙ্গিত

হয়ে উঠ্‌ছে। হোক্ না এ মৃত্যুর অধীন, তবুও জীবনের রসে ভরপুর। কিন্তু মানুষ ত কেবল জীব নয়। সে যে মর অমরের সন্ধিস্থল। মৃত্যুর পথে যাত্রী হয়েও সে অমৃতলোকেরই অধিবাসী। তাই তার সৃষ্টির যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা কালের অধীন নয়। তার ইতিহাস আছে কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। সেখানে যে ফুল একবার ফোটে তার প্রথম দিনের গন্ধ সুষমা চিরদিন অটুট থাকে; যে ফল একবার ফলে, রসে আস্বাদে তা চিরদিন সমান মধুর।

দুই সভ্যতার যদি শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা কর্‌তে হয়, তবে মানুষের সভ্যতার এই অক্ষয় ভাণ্ডারে কার কতটা দান, তাই হ'ল বিচারের প্রধান কথা। এ মাপ কাটিতে মাপ্‌লে, রোমান সভ্যতা গ্রীক কি হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে এক ধাপে দাঁড়াতে পারে না। তাকে নীচে নেমে দাঁড়াতে হয়। যতদিন তার সাম্রাজ্য ছিল, ততদিন তার বলের কাছে —সবারই মাথা নীচু করে' থাক্‌তে হয়েছে। কিন্তু উত্তর কালের লোকেরা কেন তার কাছে সম্ভ্রমে নতশির হবে? তাদের জন্য ত সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করে' রেখে যায় নি। তার যা প্রধান দাবী, তার পলিটিকাল শক্তি ও বুদ্ধি, তার পাওনা ত তার সম-সাময়িকেরা এক রকম ষোল আনাই মিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে সে দাবীর জোর খুব বেশি নয়। তার গৌরবের চৌদ্দ আনা হ'ল তার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস জীবনের কাহিনী হলে'ও জীবন নয়, কেবলি কাহিনী। তার পৃষ্ঠার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। একজন ফরাসী পণ্ডিত রোমানদের দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে গুলি এখন বক্তৃতা-শিক্ষার-ইস্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের মত মনে হলেও যাদের জন্য সে গুলি লেখা হয়েছিল তাদের জীবনে ওর

প্রভাব ছিল খুব বেশি। সুতরাং এ সব দার্শনিকের মূল্য বুঝ্‌তে হ'লে সেই সময়কার রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সে সব মিলিয়ে পড়্‌তে হবে। হায় রোম, তোমার দার্শনিক চিন্তারও ইতিহাসের হাত থেকে মুক্তি নাই!

(৪)

রোমের পলিটিকাল গৌরবের গুণগান মুখে যতই কেন থাকুক না, রোমান সভ্যতার এই প্রকৃতিটি পণ্ডিতদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার না করে' যায় নি। সেই জন্য য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কাছে কেমন করে' কতটা ঋণী, মম্‌সেন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং ছোট বড় মাঝারি সকল পণ্ডিতই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রধান কথাটা এই—রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীর যদি বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতিগুলির অসভ্যকল্প পূর্ব্ব-পুরুষদের ঠেকিয়ে না রাখ্‌ত, তবে তারা যখন রোম সাম্রাজ্যের উপরে পড়ে তাকে ধ্বংশ করেছিল, সে ঘটনাটি ঘট্‌ত আরও চার-শ' বছর আগে। এবং তা হলে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে,—স্পেনে, গলে, ড্যানিউবের তীরে তীরে, আফ্রিকায়, হেলেনিক সভ্যতার নব সংস্করণ মেডিটারেনিয়ন সভ্যতা যে শিকড় বসাতে সময় পেয়েছিল, তা আর ঘটে' উঠ্‌ত না। আর তার ফল হ'ত এই যে, ঐ অর্দ্ধ-সভ্য জাতিগুলি যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা গড়ে' তুলেছে, তা কখনই গড়্‌তে পারত না।

মানুষের ইতিহাসে যে ঘটনাটা এক রকমে ঘটে গেছে, সেটা সে রকম না ঘটে' অন্য রকম ঘট্‌লে তার ফলাফল কি হ'ত এ তর্ক নিরর্থক।

তাতে 'স্বপ্নলব্ধ' ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যকে তার চৌকিদারির প্রাপ্য প্রশংসাটা নির্ব্বিবাদেই দেওয়া যাক্। কিন্তু এ ত রোমান সভ্যতার কোনও গৌরবের কাহিনী নয়! এবং রোম সাম্রাজ্যকে যাঁরা চার-শ' বছর ধরে' রক্ষা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখ চেয়ে তা করেন নি! আর এটাও যদি গৌরবের কথা হয় তবে রোমকে আরও একটা গৌরবের জন্য পূজা দিতে হয়। সে হচ্ছে ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যের প্রাচীরকে রক্ষা করতে না পারা। কেননা রোম যদি আরও চার-শ' বছর সাম্রাজ্যকে অটুটই রাখ্তে পারত, তবে ত আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা আরও চার-শ' বছর পিছিয়ে যেত, এবং হয় ত সে সভ্যতা আর তখন গড়েই উঠ্তে পারত না! ইতিহাসে তার ওজন কত, সেটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ নয়।

এই যে চার-শ' বছর ধরে' পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে বিচিত্র সব জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এল তার ফলে সৃষ্টি হ'ল কি? মেডিটারেনিয়ন সভ্যতার এই প্রকাণ্ড শূন্যতা, সমস্ত পলিটিকাল সভ্যতা, রাজ্য-জয় ও রাজ্য-শাশনের সভ্যতার, উপর এটা একটা বিস্তৃত ভাষ্য। বিস্তীর্ণ বাগানের চার পাশে পাথর দিয়ে বেড় দেওয়া হ'ল পাছে আকস্মিক বিপৎপাতে বাগান নষ্ট হয়। পাথরের দেয়াল খাড়া হয়ে' দাঁড়িয়ে থাক্‌ল কিন্তু বাগানে ফুলও ফুট্‌ল না, ফলও পাক্‌ল না।

(৫)

রোমান সভ্যতার এই যে উচ্চ জয়গান, এ যে কেবল মিথ্যা স্তুতি তা নয়, এর কলরোল পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির মন চিরদিন বিপথের

দিকেই টান্‌বে। যেই যখন শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তারি মনে হবে মানুষের বৈচিত্র্যকে ধ্বংশ করে' পৃথিবীর যতটা অংশের উপর পারা যায়, নিজের আধিপত্যের একরঙা তুলিটা বুলিয়ে নেওয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নয়, সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব লাভেরই পথ। এ যে অতি-শয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মম্‌সেন থেকেই তুলে দিচ্ছি। সিজারের গল বিজয়ের বর্ণনা মম্‌সেন এই বলে' আরম্ভ করেছেন—যেমন মাধ্যাকর্ষণ ও আর আর পাঁচটা প্রাকৃতিক নিয়ম যার অন্যথা হবার যো নেই, তেমনি এও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যে জাতি রাষ্ট্র হ'য়ে গড়ে উঠেছে সে তার অ-রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগুলিকে গ্রাস কর্‌বে, এবং সভ্যজাতি, বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন তার প্রতিবেশিদের উচ্ছেদ কর্‌বে। এই নিয়মের বলে ইতালীয় জাতি (প্রাচীন জগতের একমাত্র জাতি যে শ্রেষ্ঠ পলিটিকাল উন্নতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মেশাতে পেরেছিল, যদিও শেষ বস্তুটির বিকাশ তাতে অপূর্ণ ভাবে এবং কতকটা বহিরা-বরণের মতই ছিল) পূবের গ্রীকদের, যাদের ধ্বংশের সময় পূর্ণ হয়ে এসেছিল, তাদের করায়াত্ত কর্‌তে, এবং পশ্চিমের কেণ্ট জার্ম্মাণদের, যারা সভ্যতার সিঁড়ির নীচের ধাপে ছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধন কর্‌তে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল।

প্রাকৃতিক নিয়ম যে কেমন করে' অধিকারে পরিণত হয় সে রহস্যের চাবী হয়ত হেগেলের 'লজিকে'ও মিল্‌বে না। সে যাই হোক্ এ 'নিয়ম' ও 'অধিকারের' মুস্কিল এই যে এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সারাক্ষণ নখদন্ত বের করেই থাক্‌তে হয়। কেননা মল্লাঙ্গনই হচ্ছে এ 'অধিকার' প্রমাণের একমাত্র স্থান। কারণ বুকের উপর চেপে বস্‌তে পার্‌লেই প্রমাণ হ'ল যে চেপে বসার অধিকার আছে; আর

তাই হল এ অধিকার প্রমাণের একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রথা। তারপর শক্তি থাক্‌লেই যখন 'অধিকার' আছে, তখন শক্তির পরীক্ষার অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা চলে না। পরীক্ষা না কর্‌লে ত শক্তিটা ঠিক আছে কিনা তা আগে থেকে অমনি জানবার উপায় নেই। শেষ পর্য্যন্ত ফেল হ'লেও "হলে" ঢোকার অধিকার অস্বীকার করা যায় কেমন করে'? গেল চার বছর ধরে' এই পরীক্ষাটা সারা য়ুরোপ জোড়া চল্‌ছে। মম্‌সেনের সৌভাগ্য যে বেঁচে থেকে তাঁর প্রণালীর ফলটা দেখে যেতে হয় নি। কিন্তু প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর, আধুনিক জার্ম্মাণির উপর মুখ বাঁকানোর তাঁদের কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্ম্মাণির পক্ষে অগৌরবের কিসে? আজকার পলিটিক্সে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন্ ন্যায়ের জোরে?

এই যে পলিটিকাল শক্তি ও সভ্যতার স্তুতিগান—এ মূলে হ'ল একটা 'মায়া'। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন মায়ার প্রকৃতি 'অধ্যাস',—একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করা। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে যখন জাতিতে জাতিতে লড়াই চলে' আস্‌ছে, আর কোন 'লীগ অব নেশনে'-ই তা শেষ হবে বলে' যখন বোধ হয় না, (কেননা 'লীগের' একটা অর্থ হচ্ছে এর ভিতরে যারা আস্‌বে না তারা শত্রু, আর বাইরে যাদের রাখা হবে তাদের এজমালীতে দমন করা চল্‌বে) তখন জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি তার আত্মরক্ষার পক্ষে অমূল্য। জাতির প্রাণই যদি না বাঁচে তবে তার মনের বিকাশও কাজে কাজেই বন্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তি যখন আত্মরক্ষায় নয়—পর-পীড়নেই রত থাকে, রক্ষার চেষ্টায় নয়—

ধ্বংশের লীলাতেই মেতে ওঠে তখনও যে তার পূজা, তার মূলে হ'ল 'অধ্যাস'। একের গুণ আর একজনে দেখা, রামের পাওনা শ্যামকে বুঝিয়ে দেওয়া। অবিশ্যি এ দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু একান্ত 'অবিষয়' হ'লে ত 'অধ্যাসেরও' উৎপত্তি হয় না।

(৬)

আমার এ প্রবন্ধটা যখন আগাগোড়াই অল্পবিস্তর অবান্তর রকমের, তখন নির্ভয়ে একটা খাঁটি অবান্তর কথা দিয়েই এর প্রথম প্রস্তাব শেষ করা যাক্।

ভাদ্রের 'সবুজ পত্রে' শ্রীমান চিরকিশোরের বরাবর শ্রীযুক্ত বীরবলের যে চিঠি বেরিয়েছে, তাতে জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের 'সিসেরোর' প্রেতাত্মার গায়ে লেখনীর নিষ্ঠিবন নিক্ষেপের কথাটা তোলা হয়েছে। এবং এ কাজটাতে যে তাঁরা আণ্টনীর পত্নী 'ফুল্‌ভিয়াব' মত পতি-ভক্তিরই পরিচয় দিচ্ছেন, যে পতি হলেন সীজার—যিনি জার্ম্মাণিতে 'কাইজার'রূপ নিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে।

এই যে সিসেরো-বিদ্বেষ, আর সিজার প্রীতি, মম্‌সেনকে এ দুয়েরই এক রকম স্রষ্টিকর্ত্তা বলা চলে। তাঁর 'রোমান ইতিহাস' বের হওয়ার পর থেকেই এ দুটি মনোভাব ইউরোপে অতি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা মম্‌সেনের হাতে সিসেরোর মত "ভাষার বিদ্যুম্মণ্ডিত বজ্র" ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁর 'ইতিহাস' হ'ল আদিম অরণ্যের প্রকাণ্ড বট। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাড়্‌তে বাড়্‌তে তা মনের অন্তঃস্তল ভেদ করে' এমন গভীর শিকড় ঢুকিয়ে দেয়, শাখা থেকে বহু পদ

নামিয়ে সমস্ত মনকে এমন করে' আঁক্‌ড়ে ধরে, যে তাকে মন থেকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে প্রায় প্রলয়ের ঝড়ের প্রয়োজন হয়। তবে আপাতত ইতালী আর ফ্রান্সে একটু একটু করে' সুর বদলাচ্ছে। কিন্তু একটা অপরাধের দায় থেকে মম্‌সেনকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর যে সীজার স্তুতি, তা এক অদ্বিতীয় সিজার অর্থাৎ 'গোয়াস জুলিয়াস সিজার'-এরই স্তুতি। মাতৃভাষায় অনুবাদ হ'লেও 'কাইজারের' স্তুতি নয়। মম্‌সেন তাঁর 'রোমান ইতিহাসের' যে জায়গায় এ কথাটা খুলে বলেছেন তা ভাবে ও ভাষায় এমন তাজা ও চোখা যে মহামহোপাধ্যায় জর্ম্মাণ অধ্যাপকের রচনা হ'লেও সেটা 'বীরবলের' লেখাতেও চল্‌তে পারে। মম্‌সেনের সেই কয়টি কথা উদ্ধৃত করে' বক্তব্য শেষ কর্‌ব। মম্‌সেন থেকে অনুবাদ কর্‌ব না প্রতিজ্ঞা করে' পাঠকদের আরম্ভেই যে ভরসা দিয়েছি এতে সম্ভব সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা এ কটি লাইন ইতিহাসও নয়, প্রত্নতত্ত্বও নয়।

আমাদের পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু কি মহেশ্বরের যেমন সব স্তব আছে, 'জুলিয়াস সিজারের' সেই রকম একটা স্তবের পর মম্‌সেন লিখেছেন—

ঐতিহাসিকেরা সব সময়েই মনে মনে একটা কথা ধরে' নেন যেটা হয়ত একবার এখানে প্রকাশ করে' বলাই ভাল। ইতিহাসের যে নিন্দা ও ইতিহাসের যে প্রশংসা তাকে তার চারপাশের ঘটনা ও অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে' কোনও শ্রেণীবিশেষের মানুষ, কি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নিন্দা প্রশংসা হিসাবে প্রয়োগ করা চলে না। সে চেষ্টা করে—হয় যার মগজে বুদ্ধি নাই, না হয় যার মনে মতলব আছে। সুতরাং এখানে সিজারের যে বিচার ও মূল্য নির্দ্ধারণ, সেটাকে যেন কেউ 'সিজারিয়ানিজিমের' অর্থাৎ সিজার-তন্ত্রের মূল্যনিরূপণ বলে'

নব-বিদ্যালয়

(ভাষা-শিক্ষা)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু।

আমরা যখন বাঙলা ভাষাকে স্কুল কলেজের ভাষা করে তোল্‌বার প্রস্তাব করি, তখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একদল লোক, আমাদের উপর খড়্‌গহস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিশ্বাস বাঙলা, বিদ্যা-শিক্ষার ভাষা হলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজি শিখ্‌বে না। এর পাল্টা জবাব অবশ্য এই যে, তারা ইংরাজি না শিখ্‌তে পারে কিন্তু বিদ্যা শিখ্‌বে। কিন্তু এ জবাবে কারও মন ভিজ্‌বে না। আমাদের দেশের কর্ত্তাব্যক্তিরা এর উত্তরে সমস্বরে বলবেন যে, সে বিদ্যে নিয়ে কি হবে—যার সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। ইংরাজি না জান্‌লে যে ভদ্রসন্তানের 'দিন আনা দিন খাওয়া' চলে না, এ কথা আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেও জানে। ও ভাষায় অজ্ঞ হলে যে আমাদের ওকালতি, ডাক্তারি, কেরাণীগিরি, মাষ্টারি, এমন কি রাজ-নীতির নেতাগিরি করাও বন্ধ হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং এসব ক্রিয়া বন্ধ হলে বাঙালীর জীবনে আর কি কাজ থাক্‌বে? ও অবস্থায় আমরা যে ঘরে বসে সাহিত্য রচনা কর্‌ব তারও সম্ভাবনা কম। যা কথায় কথায় ইংরাজির তরজামা নয়, তা যে বাঙ্‌লা

মাথা তোলে, তখন সেটা একদিকে জবর দখল, অন্যদিকে মুখ-ভেংচান। কিন্তু ইতিহাস আসল সিজারকে তার প্রাপ্য সম্মানের এক চুল থেকেও বঞ্চিত কর্‌তে রাজী হবে না। যদিও সে জানে যে, তার বিচার শুনে, হয় ত অতিসরল ব্যক্তিরা জাল-সিজারদের সাম্‌নেও মাথা নোয়াবে, এবং অতিশঠ ব্যক্তিরা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার একটা সুযোগ পাবে। কেননা ইতিহাসও একটা বাইবেল। এবং বাইবেলেরই মত যদিও সে মূর্খকেও ভুল বোঝা থেকে বারণ কর্‌তে পারে না, এবং সয়তানকেও বচন তুলে আওড়াতে বাধা দিতে পারে না, তবুও তারি মত এ দুই ব্যক্তিকেও সহ্য কর্‌বার এবং মার্জ্জনা করবার ক্ষমতা তারও আছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

এর সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিভার বেগে এবং সমস্ত রকম বাইরের বাধার অভাবে এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি যেমন অমিশ্র ও অবাধ ভাবে গড়ে' উঠতে পেরেছিল এমন আর কোথাও সম্ভব হয় নি। কিন্তু তবুও, যেমন গিবন অনেক পূর্ব্বেই দেখিয়েছেন, সিজারের সময় থেকেই রোমান রাষ্ট্রের ঐক্যটা ছিল কেবল বাইরের চাপের ঐক্য, এর গতি ছিল কলের চলা। এবং এর জীবনের রস নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে এর অন্তরটা তখন থেকেই হয়েছিল একবারে মৃত। যদি 'অটক্রেসির' প্রথম যুগে, এবং সব চেয়ে সীজারের নিজের মনে, রাজ-শাসনের একাধিপত্যের সঙ্গে জনসাধারণের উন্নতির স্বাধীন বিকাশের একটা মিলনের স্বপ্ন উঠে থাকে, তবে জুলিয়ান বংশের প্রতিভাশালী নৃপতিদের রাজ্যশাসনে সে স্বপ্ন টুট্‌তে বেশি দেরী হয় নি। আগুন আর জল এক পাত্রে রক্ষা করাটা যে কতদূর সম্ভব তার পরীক্ষাটা লোকের চোখের সাম্‌নে খুব ভীষণ রকমেই হয়েছিল। ইতিহাসে সিজারের সে কাজ তার প্রয়োজন ছিল, এবং তাতে সুফলও ফলেছিল। কিন্তু সে কাজ এমন নয় যার নিজেরই ভিতরেই কোনও মঙ্গল আছে। সেটা ছিল সমস্ত রকম সম্ভবপর অমঙ্গলের মধ্যে সব চেয়ে কম অমঙ্গল। যে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাসত্ব প্রথা, জন সাধারণের প্রতিনিধিমূলক শাসন যার কল্পনাতে কখনও ওঠে নি, যার প্রচলিত রাষ্ট্রপ্রণালী ছিল পাঁচ-শ' বছরের পুরাণো—যা এই আধ-হাজার বছরের মধ্যে পরিণত হয়েছিল প্রবল ও খাঁটি ধনীতন্ত্রে, সে ব্যবস্থার সাম্‌নে সিজারের সেনাপতি-তন্ত্রের একাধিপত্যই ছিল একমাত্র বাঁচবার পথ। ইতিহাসের বিচারে সিজারের 'সিজারিয়ানিজম্'-এর এই হ'ল বৈধতার দলিল। যখন ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যেও 'সিজারিয়ানিজম্'

চালিয়ে দেবার চেষ্টা না করে। অতীত যুগের ইতিহাস যে বর্ত্তমানের শিক্ষাদাতা একথা সত্য। কিন্তু এর এমন গ্রাম্য ও মোটা অর্থ নয় যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে গেলেই কোন না কোন জায়গায় বর্ত্তমানটা-কেই হুবহু দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, এবং আজকার দিনের পলিটিকাল ব্যাধির নিদান ও ব্যবস্থাপত্র একবারে হাতে হাতেই মিল্‌বে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভ্যতার ইতিহাস কেবল তখনি শিক্ষাপ্রদ, যখন তা থেকে মানুষের সভ্যতার প্রাণশক্তিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, যে শক্তিগুলির মূল প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক, কিন্তু যাদের সংমিশ্রণের রীতি প্রতি-জায়গাতেই বিভিন্ন, এবং যখন তা মানুষকে অন্ধ অনুকরণের পথে না নিয়ে গিয়ে নবীন সৃষ্টির কাজেই উৎসাহ দেয়। এই হিসাবে সিজার ও রোমান 'ইম্পিরিয়ালিজম্'-এর ইতিহাস, তার সমস্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠাতার অমানুষী প্রতিভা সত্ত্বেও, আজকার দিনের 'অটক্রেসির' যে তিক্ত ও কঠোর সমালোচনা, তেমন সমালোচনা কোন মানুষের হাতের লেখা থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে নৈসর্গিক নিয়মে অতি ক্ষুদ্র জীবদেহের কাছেও গঠন কৌশলের পরা-কাষ্ঠায় হাতগড়া যন্ত্রের হার মান্‌তে হয়, ঠিক সেই নিয়মেই যে শাসনতন্ত্রে দেশের অধিকাংশ লোকের নিজেদের ভালমন্দ নিজেদেরই স্বাধীন ভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার অবকাশ আছে, তা বহু বিষয়ে অপূর্ণ ও নানা দোষে দুষ্ট হ'লেও অতি ভাস্বর ও পিতৃতুল্য 'অটক্রেসি'রও তার সঙ্গে তুলনা চলে না। কেননা ওর একটির বিকাশ ও বৃদ্ধির সম্ভাবনার শেষ নাই, অর্থাৎ তার জীবন আছে; অপরটি যা তাই, অর্থাৎ মৃত। রোমান 'ইম্পিরিয়ালিজম্'-এর সেনাপতি-তন্ত্রের ইতিহাসে এই নৈসর্গিক নিয়মটির পরীক্ষা হয়ে গেছে, এবং সে হ'ল চরম পরীক্ষা। কেননা

সাহিত্য, অন্তত সাধু-বাঙ্‌লা সাহিত্য হ'তে পারে না, তার প্রমাণ শতকরা নিরনব্বই জন বাঙ্‌লা গদ্য লেখকের লেখায় অর্থাৎ আমাদের সকলের লেখায় নিত্যই পাওয়া যায়। অতএব ইংরাজি না শিখ্‌লে যে বাঙ্‌লার সর্ব্বনাশ হবে, এ বিষয়ে দ্বি মত নেই—এবং থাক্‌তে পারে না। তবে বাঙলা না শেখাটা ইংরাজি শিক্ষার সদুপায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রসাদে দেশের লোক যে ইংরাজি শিখ্‌ছে—ইংরাজি নবিশদের এই ধারণাটি অনেকটা অমূলক। পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে'—আমাদের বিদ্যার্থীরা যে, ইংরাজি ভাষার উপর কতটা অধিকার লাভ করে, তার পরিচয় যিনি কখন B. L. পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করেছেন, তিনিই পেয়েছেন। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে যাঁদের হাতে উকিলের সনন্দ দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন সাধু-ইংরাজি লেখা দূরে থাক্ শুদ্ধ ইংরাজিও লেখেন না, শতকরা পঁচিশজন লেখেন বাবু-ইংলিশ, আর শতকরা দশজন যা লেখেন, তা দিনেমার ওলন্দাজ কিম্বা আলেমানের ভাষা হ'তে পারে—কিন্তু ইংরাজের নয়; অথচ এঁরা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট! এত দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজি ভাষার এই একাগ্র চর্চ্চা এতটা বিফল হয় কেন? বাঙালী জাতি সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত নয়, তবে আমাদের যুবকদের মধ্যে শিক্ষার এই ব্যর্থতার কারণ কি?—কারণ এই যে, পাঁচ বৎসর বয়েসে ছেলেরা ইংরাজি ধরে এবং পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত তারা দিবারাত্র এক ঐ ইংরাজিরই চর্চ্চা করে।

সকল শিক্ষার মত, বিদেশীভাষা শিক্ষাও কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। শৈশব এ শিক্ষার উপযুক্ত কাল নয়, বালক এ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নয়। শিশুর দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ যা, বালকের মনের পক্ষে মাতৃভাষাও তাই। অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্য বিনা বালকের মন গড়ে ওঠে না। ছেলেরা যে ভাষা অষ্টপ্রহর শোনে, আর যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা কয়, সেই ভাষার সাহায্যেই তারা পরের কথা বুঝতে ও নিজের কথা বোঝাতে শেখে। ছেলের মন ও ছেলের ভাষা, ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ; সুতরাং এ দুই এক সঙ্গে যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি গড়ে ওঠে। তারপর অন্তুপ্রকাশ করবার চেষ্টাতেই মানব-সন্তানের ভাষার উপর যথার্থ অধিকার জন্মে এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। শিশুর দেহের সঙ্গে তার মন এবং তার মনের সঙ্গে তার স্বভাষা-জ্ঞান যে এক রকম স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে, এ কথা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে বিদেশী ভাষা, সজ্ঞানে শিখ্‌তে হয়; সুতরাং তা শেখ্‌বার জন্য সেই মন চাই—যে-মন বালকের নেই। বারো বৎসর বয়েসের পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা শেখ্‌বার চেষ্টাটা ছেলেদের পক্ষে যে, শুধু কষ্টকর ও ব্যর্থ, তাই নয়—তার মনের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। মন্ত মাংস সেবন ছোট ছেলের দেহের পক্ষে যতটা উপকারী, একটি বিদেশী ভাষার চর্চ্চা ছোট ছেলের মনের পক্ষে তার চাইতে বেশি উপকারী নয়। আমরা ছোট ছেলেদের তা গিলিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা জীর্ণ করবার শক্তি তাদের নেই। ফলে অল্প বয়েসে ইংরাজি শিখ্‌তে গিয়ে, আমাদের ছেলেরা ইংরাজিও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে না এবং লাভের মধ্যে শুধু মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মন ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষার চাপে জড় হয়ে

পড়ে, সে মন কৈশোর ও যৌবনে তার পূর্ণশক্তি লাভ করতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ যুবকদের মনের যে দম ও কশ নেই, তার একমাত্র কারণ আমাদের এই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু ইংরাজি শেখাটা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্য এতই প্রয়োজন, যে আমাদের সমাজের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক একবাক্যে বলবেন,—হোক আমাদের ছেলেরা মনে পঙ্গু, তাদের ঐ পাঁচ বছর বয়েস থেকেই A. B. C. শিখতে হবে, নচেৎ তারা বয়েসকালে ইংরাজি-নবিশ হতে পারবে না। না ভেবেচিন্তে কথা কওয়াটা, বিশেষত সেই সব বিষয়ে—যে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেননা অপর দেশের শিক্ষার প্রণালী এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এঁরা যদি কিছু খোঁজ খবর রাখতেন, তাহলে এঁরা এ কথা জানতেন যে, বারো বৎসর বয়েসের পরে, অর্থাৎ মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট পরিমাণে অধিকার লাভ করবার পরে, ছেলেরা দু-তিন বৎসরে বিদেশী ভাষা যতটা আয়ত্ত্ব করতে পারে, পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে তারপর দশ বৎসরের অবিরাম চর্চ্চায় তার সিকির সিকিও পারে না। এই কারণে নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের বারো বৎসর বয়েসের আগে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার সংশ্রবে আসতে দেওয়া হয় না। এদেশেও পুরাকালে উপনয়নের পরই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

অতএব ভাষা শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে—মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষাও যে একটা শিক্ষার বিষয়, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে বাঙালীমাত্রেরই অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। সে পটুত্ব যে বেশির ভাগ লোকের নেই, তা তাঁরা

বাঙলা লিখ্‌তে বস্‌লে অবিলম্বে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌বেন। সাহিত্যে আমাদের তুল্য মুখচোরা জাত যে অপর কোনও সভ্যদেশে নেই, তার কারণ আমাদের শিক্ষার গুণে আমরা আশৈশব আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাই নি। স্কুলের ছেলের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব এবং বাঙলাতে করা বারণ। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ লোকের ভাষাজ্ঞান ছোট ছেলের জ্ঞানেরই সমতুল্য, খাওয়া-পরা চলা-ফেরার জন্য যতখানি ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে ক'টি কথা না জান্‌লে নয়, আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী সেই ক'টি নিত্য ব্যবহার্য্য কথাই অক্লেশে ব্যবহার কর্‌তে পারেন। আমাদের অন্তরে মাতৃভাষার ভিৎ আছে কিন্তু সে ভিৎ এত কাঁচা যে, তার উপর কি দেশী কি বিলেতি কোনও পাকা ভাষার ইমারৎ খাড়া করা যায় না। অতএব মাতৃভাষা যদি আমরা শিক্ষা করি, তাতে করে ইংরাজি-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হবে না; উপরন্তু, আমাদের মন সবল, সুস্থ এবং স-ক্রিয় হয়ে উঠ্‌বে। তখন আমাদের আর, এ বলে দুঃখ কর্‌তে হবে না যে, দেশে এত বিদ্যে আছে অথচ তা দেশের কোনও কাজে লাগে না। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের সকল বিদ্যা যে আমাদের মনের চক্রব্যূহে ঢুক্‌তে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না, তার কারণ আত্মপ্রকাশের সহজ পথটিই আমরা বাল্যকালেই ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয়েছি।

মাতৃভাষাও শিক্ষা কর্‌বার জিনিষ, কিন্তু তাই বলে যে উপায়ে যে পদ্ধতিতে আমরা একটি বিদেশী অথবা একটি মৃতভাষা শিক্ষা করি, সে উপায় সে পদ্ধতি, মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকও নয়—

উপযোগীও নয়। বিদ্যারম্ভেই অমরকোষ ও মুগ্ধবোধ কণ্ঠস্থ করাই হয়ত সংস্কৃত শেখার সহজ উপায়, কিন্তু ব্যাকরণ অভিধানের সাহায্যে কাউকেও মাতৃভাষা শিখ্‌তে হয় না; সুতরাং ও উপায় অবলম্বন কর্‌তে শিশুদেরও বাধ্য করা অসঙ্গত। যে উপায়ে ছেলেরা ভাষা নিজে শেখে, সেই উপায় অবলম্বন করেই তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, অতএব এ শিক্ষার গোড়ায় ব্যাকরণ অভিধানের কোনও স্থান নেই। বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে, বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ শেখা। কিন্তু মাতৃভাষার গোড়াকার শিক্ষা হচ্ছে—বস্তুর সঙ্গে তার নামের, বাচ্যের সঙ্গে তার বাচকের সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা। ছেলেরা গ্রন্থ কিম্বা গুরুর সাহায্য না নিয়ে, আপনা হতেই যে-সব কথা শেখে, সেই শব্দসংগ্রহই হচ্ছে সব ভাষারই মূল উপাদান, এই উপাদান করায়ত্ত না কর্‌তে পার্‌লে, ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার জন্মে না, এবং একটি বিদেশী-ভাষা শেখার মুস্কিলই এই যে, সে ভাষার মূল উপাদানের পুঁজি নিয়ে আমরা তার বিস্তৃত জ্ঞান লাভ কর্‌তে বসি নে। সুতরাং মাতৃভাষার শিক্ষা লেখাপড়া দিয়ে সুরু করবার দরকার নেই, অর্থাৎ হাতে খড়ি দেওয়াটা বিদ্যারম্ভের প্রথম ক্রিয়া নয়। নব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির বিস্তারিত পরিচয় বারান্তরে দেব।

১লা অক্টোবর, ১৯১৮।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

'সবুজ পত্র' কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদাপ্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রীস ও রোম। *

—:*:—

কোন একটি জাতির ইতিহাস থাকা না থাকা কেবলমাত্র তার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না ; সেই সঙ্গে তার জাতীয় জীবন কর্ম্মক্ষম এবং সৃষ্টিক্ষম হওয়া চাই।

সেই জাতিকেই ঐতিহাসিক জাতি বলা যায়, যার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের নিয়মসকল আবিষ্কৃত হয়েছে, যে শাসনতন্ত্রে কিছু-না-কিছু শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পেরেছে, এবং যার সামাজিক ব্যবস্থা কতক পরিমাণে ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সে জাতির একটি ধর্ম্মজ্ঞান, একটি নীতিজ্ঞান আছে ; এবং সে জাতি হাতের কাজে ও মনের কাজে দক্ষতার পরিচয় দেয়। ঐতিহাসিক জাতি শিল্প, কলা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি করে। সে জাতি নিজের শক্তি প্রয়োগ করবার জন্য, ধনবৃদ্ধি এবং অহঙ্কার চরিতার্থ করবার জন্য অপর জাতির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে ; সে হয় ব্যবসাবাণিজ্য করে, নয় দেশ জয় করে, কিম্বা একসঙ্গে দুই-ই করে।

আজকের দিনে অনেক জাতিই ঐতিহাসিক নামের যোগ্য ; তাদের প্রত্যেকের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং পরস্পরের যোগাযোগের নামই ইতিহাস। কিন্তু আধুনিক কাল থেকে যত দূরে পিছিয়ে যাওয়া যায়,

* প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক Lavisse-এর "Vue Générale de L'Histoire Politique de L'Europe" নামক গ্রন্থ হতে অনূদিত।

ততই এইপ্রকার জাতি বিরল হয়ে আসে। য়ুরোপে প্রথমে এইরূপ জাতি একটিমাত্র ছিল—সে হচ্ছে গ্রীক জাতি; এবং গ্রীকদের পরে আর একটি জাতি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ অধিকার ও বিস্তার করেছে—সে হচ্ছে রোমান জাতি।

গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস নিয়ে সভ্যতার যে আদিপর্ব্ব রচিত হয়, তার শেষ হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে; সেই সময়ে জর্ম্মান ও শ্লাভজাতিরূপ নূতন অভিনেতা আবির্ভূত হয়ে, যে ইতিহাস এতদিন সহজ সরল ছিল, তাকে জটিল করে তোলে।

গ্রীস।

য়ুরোপের ইতিহাস যে তার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হতে, বা আদিম সভ্যতার ক্রোড়দেশের কাছ হতে আরম্ভ হ'ল, সেটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যে সকল জাতি য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর তীরদেশে, লিবাননের উপকূলে এবং নীল নদীর ধারে বাস করৃত, গ্রীস তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুফল লাভ করলে বটে, কিন্তু এই সকল পূর্ব্ব সভ্যতার সঙ্গে তুলনায় গ্রীক সভ্যতার একটি বিশেষত্ব ছিল, যেটিকে য়ুরোপীয় গুণ বলা যেতে পারে—সে হচ্ছে জীবনীশক্তির স্বাধীন স্ফূর্ত্তি।

গ্রীস যে প্রথম থেকেই য়ুরোপীয় সভ্যতার ছাঁচ গড়ে তুলৃলে, সেটাও কিছু বিচিত্র নয়। যে দেশ তার উপকূলের ভাঁজে ভাঁজে বাঁকে বাঁকে সমুদ্রের জলকে টেনে নিয়ে আসে, এবং যার উচ্চ তীরভূমি সমুদ্রের জলের মধ্যে আপন শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে দেয়; যে উপদ্বীপ দ্বীপে বেষ্টিত, এবং অধিত্যকা-ঘেরা উপত্যকায় বিভক্ত, সে যেন আমাদের য়ুরোপ-নামক মহা-উপদ্বীপের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—সেই প্রকার

বিস্তীর্ণ তার তীর, সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন তার সীমারেখা। গ্রীস যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত একখানি সংহত য়ুরোপ।

তার ইতিহাস য়ুরোপের ইতিহাসের সূচনা। গ্রীসের খণ্ড-জাতি-সকল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়, অথচ পৃথক। তার নগরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রবিশেষ, এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধে রাজ-নীতির সকলপ্রকার তন্ত্রই ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি তিনটি নগর সময়ে সময়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবে। গ্রীস তার সহরের পুণ্য গণ্ডির মধ্যে একটি রাষ্ট্রতন্ত্র এবং একটি সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পেরেছিল। মানবের কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল—কাব্যে ও কলায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে, শিল্পকর্ম্মে ও বাণিজ্যব্যবসায়। এই বিচিত্র কর্ম্মলব্ধ শক্তি সে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের চারিপাশের উপকূলে সে নিজ নগরীর কন্যাস্বরূপ অন্যান্য নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু সে নিজেকে যেমন কখনও এক রাষ্ট্রে আবদ্ধ করেনি, তেমনি এই বাহিরের প্রদেশগুলিকে একত্র করে' কখনও সাম্রাজ্যও গড়ে' তোলে নি। যখন তার কর্ম্মক্ষমতা নিঃশেষ হ'ল, ও যখন সে ম্যাসেডোনিয়ান নামক একটি সামরিক জাতির অধীন হয়ে পড়্‌ল, তখন কয়েকটি নব্য গ্রীকরাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান গুলি আসিয়া বা মিশরদেশে।

উত্তরকালে অন্ততঃ য়ুরোপে গ্রীসের পরমায়ু দীর্ঘ হবে, কারণ সে ভূ-ভাগে গ্রীক সভ্যতা নানা আকারে তার প্রবল প্রভাব বিস্তার কর্‌বে। প্রজা-তন্ত্র রোমের আচার ও বিচার তার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হবে। ইস্তাম্বুল পত্তনের পর তার দ্বারা 'বাইজাণ্টিনিজম্' নামক একটি

ধর্ম্মমূলক এবং রাজনৈতিক সভ্যতার সৃষ্টি হবে। রোম-সভ্যতার অন্তিম দশায় তার দ্বারা রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য নষ্ট হবে। মধ্যযুগে গ্রীক সভ্যতা পশ্চিম ইউরোপের মতিগতি এবং অনুষ্ঠানের প্রতিবাদী হবে, ও খৃষ্টধর্ম্মের শাসন-তন্ত্রের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ করবে। তার-পরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে সে ইতালীয় "নবজীবনের" যুগে মানুষের মনকে নতুন করে গড়বে, এবং বর্ত্তমান যুগের মানসী সভ্যতা সৃষ্টি করবে।

রোম-রাজত্ব।

গ্রীসীয় অন্তরীপের সঙ্গে ইতালীয় অন্তরীপের সাদৃশ্য নেই; তার রেখাগুলি অত ঢেউ-খেলানো নয়; তার চারপাশে অত দ্বীপের ভিড় নেই; গ্রীসের মত তার দ্বারসকল পূর্ব্বমুখী নয়। অপর পক্ষে ইতালী ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত, এবং সিসিলি তাকে প্রায় আফ্রিকার দৃষ্টিপথ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। গ্রীসের তুলনায় ইতালী ঢের বেশি মহাদেশের মত—নাবিকেরা যাকে বলে "স্থলকায়"। বিদেশী নাবিক এ দেশের সমুদ্রতীরবাসীদের দেখা দিত বটে, কিন্তু যে নগরের বিধিবিধানে তারা ঐক্যবদ্ধ, সে নগরের অধিবাসীগণ ছিল শ্রমজীবী।

চাষী যেমন করে' তার চাষের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে ক্রমে সুডোল করে' আনে, তেমনি রোমের প্রথম কয় শতাব্দী তার রাজ্য-বিস্তারেই কেটে গেল। বিজেতামাত্রই যেমন করে থাকে, সে দেশ জয় করতে আরম্ভ করেছিল বলেই ক্রমান্বয় জয় করে' যেতে লাগল। প্রথম কয়টি যুদ্ধ অপরাপর যুদ্ধ টেনে নিয়ে এল; প্রথম ক'বার জয়-

লাভের দরুণই অপরাপর জয়লাভ তার পক্ষে যুগপৎ আবশ্যক এবং সহজ হয়ে পড়্‌ল। শেষে তার এই বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল যে, অপর জাতিকে পদানত করাই তার জাতিধর্ম্ম; দেশজয়ই তার একরকম ব্যবসা হয়ে পড়্‌ল।

"Thine, O Roman, remember, to reign over every race."

ইতিহাসের ক্ষেত্রকে রোম অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে, তার মধ্যে স্পেন, গল, ব্রিটানি, আল্পস্‌ পর্ব্বত ও ডান্যুব নদীর মধ্যস্থিত দেশ, এবং জর্ম্মানির একাংশকে ভুক্ত করে' নিলে। অধীন দেশের ধনরত্ন আহরণকল্পে, বিজিত দেশকে রোমের "প্রদেশে" পরিণত করবার প্রথা উদ্ভাবিত হল। তার শাসনফলে পুরাতন জাতিগুলির বিশেষত্ব লুপ্ত হ'ল, এবং এক "রোম-মণ্ডল"-এর পরিধির মধ্যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বা স্বাভাবিক সীমান্তরেখাগুলি পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। 'রোম-মণ্ডল' অর্থে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ সুন্দর দেশ, যার কেন্দ্রে মাথা তুলেছিল "ক্যাপিটলের অটল পাষাণ"। গ্রীসীয় নগরগুলি প্রত্যেকে নিজ সাধ্যমত উপনিবেশের পত্তন করেছিল; গ্রীস নিজেকে বিক্ষিপ্ত করে' দিয়েছিল; রোম পৃথিবীকে কেন্দ্রীভূত করে' এনেছিল। গ্রীক জাতি নামে এক জাতি ছিল বটে, কিন্তু গ্রীক-সাম্রাজ্য বলে' কিছু ছিল না; অপর পক্ষে রোমান জাতি ও রোম-সাম্রাজ্য, এ দুই জিনিষই ছিল।

রোমের কার্য্যে গভীরতা এবং একাগ্রতা ছিল; সে অপরাপর জাতিকে ভেঙ্গে গড়েছে, অরাজকতার স্থানে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে, বিজিত জাতিকে নিজের ভাষা, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়েছে। বিশ্বমানবে একজাতীয়তা বা "মানবজাতি"রূপ উদার কল্পনা তার মনে

স্থান পেয়েছিল। তার বিধি-বিধানে মানুষের ন্যায়বুদ্ধি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এমন অসাধারণ ক্ষমতা দেখে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না,—কিন্তু এর সব ফলই ভাল হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

সবাইকে একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ মানুষের যথার্থ অভিব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য আবশ্যক। যত বেশি লোক রেষারেষি করে' কাজ করে, ততই পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র উর্ব্বর হয়ে ওঠে। রোম সাধ্যমত প্রতি জাতির বিশেষত্ব নষ্ট করেছে, তাদের যেন জাতীয় জীবনযাত্রার পক্ষে অক্ষম করে' ফেলেছে। যখন এই সাম্রাজ্যের সমবেত সাধারণ জীবন ফুরিয়ে এল, তখন ইতালী গল ও স্পেন, এরা নিজেদের জাতিরূপে গড়ে তুল্‌তে অসমর্থ হল ; বর্ব্বরদের আগমনের পরে, এবং অনেক শতাব্দী ধরে' বহু বিপদ আপদ মারামারি কাটাকাটির মধ্য কর্‌বার পর তবে তাদের দ্বারা একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক সভ্যতার গঠন আরম্ভ হল।

যে সব দেশকে রোম সভ্য করেছে, তাদের কাছে সে নিছক্ কৃতজ্ঞতার দাবী কর্‌তে পারে না। আমরা স্বাধীন গলের সঙ্গে রোমক গলের তুলনা কর্‌তে ভালবাসি। গ্রামসমূহ নগরে পরিণত, কুঁড়ে ঘর প্রাসাদে রূপান্তরিত, মেঠো পথের বদলে পাথর-বসানো রাস্তা, অশিক্ষিত বক্তার স্থানে কথাকুশল বাগ্মী, অসভ্য যোদ্ধার পরিবর্ত্তে সেনাপতি বা সম্রাট দেখ্‌তে পাই। আমরা এই ভেল্কি-খেলায় বিস্মিত হই, এবং এই গল-রোমক নগরগুলির সুখের জীবনের তারিফ করি।

কিন্তু যে সকল দেশকে রোম জয় করে' বহুকাল যাবৎ ভোগদখল করে নি, সে সকল দেশ যে আজ পৃথিবীতে এমন উচ্চ স্থান

অধিকার করেছে, এমন প্রবল বিশেষত্ব রক্ষা করেছে, ভবিষ্যতের প্রতি এমন অটল আস্থা রেখেছে—এ কেমন করে' হল ? অতীতে বেশি আয়ুক্ষয় করেনি বলেই কি তাদের দীর্ঘজীবনে অধিকার বেশ ? কিম্বা রোম এমন সব চিন্তার ধারাবাহিক অভ্যাস, এমন সব মানসিক ও নৈতিক ছাঁচ রেখে গেছে যা' স্বাধীন চেষ্টার হন্তারক ও প্রতিবন্ধক ?—এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই ; যে-সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বিশেষ আবশ্যক, সেইগুলিরই মীমাংসা কোনও কালে হয় না। যাই হোক, এই সব ভেবেচিন্তে আমরা যেন সরাসরি বিচার করতে কুণ্ঠিত হই ; সীজার যে Verdingetorix-কে জয় করেছিলেন, সেটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয় কিনা, তা নিশ্চিত বলা যায় না।

দুই সাম্রাজ্য।

যতই সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হোক্ না কেন, এই বিপুল বিজয়ীশক্তির বিরুদ্ধে এমন অনেক বিরোধী শক্তি মাথা তুলেছিল, যাদের সে পরাভূত করতে পারে নি।

অধিকাংশ স্থলে উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যেই মনোভাবের অমিল সুতরাং স্থায়ী বিরোধ ঘটে থাকে। কিন্তু রোম-রাজত্বকালে উত্তর-প্রদেশ ছিল বাহিরের শত্রুমাত্র, এবং তাকে বাইরেই রাখা হয়েছিল। তখন প্রকৃত বিরোধ ছিল য়ুরোপের পশ্চিমে এবং পূর্ব্বে—যে পশ্চিম প্রদেশকে সভ্যকরতঃ রোম অধীন ও আত্মসাৎ করেছিল, এবং যে পূর্ব্বপ্রদেশ তখনও তার গ্রীসীয় সভ্যতা রক্ষা করেছিল।

পশ্চিম য়ুরোপে রোম তার ভাব ও ভাষার প্রভাব বিস্তার করেছিল ; কিন্তু গ্রীসীয় সভ্যতার কাছ থেকে সে বড় জোর দক্ষিণ ইতালী

এবং সিসিলিকে ভাজিয়ে নিতে পেরেছিল ; এড্রিয়াটিক সমুদ্র হতে Taurus পর্য্যন্ত, গ্রীসের ভাষা এবং সভ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখানে গ্রীক নামের পরিবর্ত্তে রোমক নাম বসেছিল বটে, কিন্তু শুধু বাহিরের চেহারাটাই রোমান ছিল। যেদিন কনষ্টাণ্টাইন দ্বিতীয় রোমের প্রতিষ্ঠা করলেন, সেদিন যে সাম্রাজ্যের পত্তন হল, বাইজাণ্টাইন রাজদপ্তরে তার নাম রোমক-সাম্রাজ্য হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দপ্তরে সেটা চিরদিনই গ্রীক-সাম্রাজ্য।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ছিল; সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে, যেদিন থিয়োডোসের দুই পুত্র—একজন রাভেন্নাতে, আর একজন ইস্তাম্বুলে রাজপাট বসালেন। তখন থেকে যে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সূত্রপাত হল, তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব কাজ এবং স্ব স্ব শত্রু ছিল ; সে শত্রু বহুসংখ্যক ও প্রবল, এবং সেই দুরন্ত জনসমূহই এবার ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ অধিকার করবার চেষ্টা করলে।

অধঃপতনের কারণ।

দুই সাম্রাজ্যে বিভক্ত হওয়াই রোমরাজত্বের বিনাশের কারণ নয় ; কেবলমাত্র বাহিরের শত্রুর প্রভাবেও তার পতন হয় নি। রোমের পতন তার আচার অনুষ্ঠানের অবনতি, তার যুদ্ধজয় ও লোকদমনের কর্ম্মফল। তার এই বিপুল প্রজামণ্ডলীকে একটি রাজা দেবার প্রয়োজনবশতঃ প্রজাতন্ত্র রোম অবশেষে রাজতন্ত্র হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু বস্তুতঃ রাজশাসনের যুগ আরম্ভ হবার পরেও রোমে প্রজাতন্ত্রের বাহ্যানুষ্ঠানেরই ঠাট্ বজায় ছিল। রোমের রাজতন্ত্র অনেক দিন পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী বই কিছু ছিল না ;

স্থায়িত্বের পক্ষে প্রথমত যা থাকা দরকার, সেই উত্তরাধিকারীত্বের নিয়মই তার ছিল না। প্রত্যেক সম্রাটের মৃত্যুর পরেই গোলযোগ উপস্থিত হত; যিনি পৃথিবীর ঈশ্বর তাঁর নির্ব্বাচন অনেক সময়ে দৈবযোগেই সম্পন্ন হত। অবশ্য ক্রমে রাজতন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হল,—কিন্তু তখন সম্রাট হলেন নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাচারী এবং একাধিপতি। তাঁর রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীকে আত্মসাৎ করা, এবং কার্য্যতঃ সে উদ্দেশ্য অতিমাত্রায়ই সুসিদ্ধ হয়েছিল। রোমসাম্রাজ্যমণ্ডল অবশেষে এতেই নিঃশেষিত হ'ল।

পতনের কারণের মধ্যে রোমের দীর্ঘায়ু এবং তার তেজারতি ব্যবসাকেও ধরা যেতে পারে। পৃথিবীর জরা উপস্থিত হয়েছিল। সে নবীনের অন্বেষণ এবং অপেক্ষা করছিল। রাজনৈতিক বিপ্লবের দ্বারা নূতনকে পাবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ সাম্রাজ্য ছাড়া আর কোনরকম শাসনপ্রণালী যে হতে পারে, তা' কারো ধারণাতেই আসে নি; সামাজিক বিপ্লবের দ্বারাও নয়, কারণ ধীরে ধীরে সে সমাজে যে জাতিভেদ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ছাঁচেই সকলের মন ঢালাই হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম্ম-বিপ্লব একটি ঘটেছিল বটে, কিন্তু সে হচ্ছে সাম্রাজ্যের বিপক্ষে। যে প্রাচীন সমাজ আপনাতেই আপনি মুগ্ধ ছিল, যারা পরপারের কোন ধারই ধারত না, তাদের কাছে "আমার রাজ্য এ পৃথিবীর নয়" বলা মানে তাদের প্রতি ঐশী ঘৃণা প্রকাশ করা। "যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দাও, যাহা সীজারের তাহা সীজারকে দাও" বলা মানে ঈশ্বর এবং সীজারের পার্থক্য ঘোষণা করা—যদিও এযাবৎ এক সীজারেতেই ঐশী ও মানবী, দুই শক্তি মিলিত ছিল। একবার এই পার্থক্য মেনে নিলে রাজঋণ

অপেক্ষা দেবঋণ বেশি না হয়ে যায় কেমন করে'? যদি বল "আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংশ হবে"—তাহলে সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে "অমর এ সাম্রাজ্য"—এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়;—"অটল পাষাণ"কে টলানো হয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

একটি প্রেমের গান।

-:*:

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥

কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

এই হচ্ছে গানটা। কিন্তু "লাখে না মিলল এক"—তাই এমন গান বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে ঐ একটির দর্শন পেলেম।

(২)

"তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই ত এ লাখ লাখ যুগেও এ প্রেমের হ্রাস নেই—এ যে তিলে তিলে প্রতি পলে পলে নতুন কর্ছে —নতুন হচ্ছে মর্‌চে ধরবার অবসরই নেই এতে—স্বাদহীন হবার সম্ভাবনাই নেই এতে। যেখানে পুরাতন সেখানেই মানুষের অশ্রদ্ধা — যা পুরাতন তাই যে মানুষ অত্যন্ত করে' জানে, নিঃশেষ করে' জানে। যেখানে মানুষ নিঃশেষ করে' জানে সেখানে মানুষের আর চলবার পথ নেই—আকাঙ্ক্ষা সেখানে যোগময়—চেষ্টা সেখানে ক্লান্তিজনক অর্থহীন। সেখানে আছে শুধু আকাশের বোঝা—আনন্দের অবদান সেখানে নেই। আর আরামের বোঝা সুস্থ ও প্রাণবান মানুষের পক্ষে ঘোর অধর্ম্ম। তাই মানুষের প্রেমের লাখ লাখ যুগেও হ্রাস হবে না— লাখ লাখ যুগেও হৃদয়ে হৃদয় রেখে যে প্রেম স্বাদহীন হবে না—সে-প্রেম সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হচ্ছে যে, সে-প্রেম যেন তিলে তিলে নূতন করে—সে-প্রেম যেন "তিলে তিলে নূতন হোয়"। তিলে তিলে যদি তা নতুন হ'য়ে না ওঠে তবে আজ যাকে কেঁপে হিয়ায় রাখ্‌ছি কাল তাকে ডেকে বিদায় দেব। কারণ জীবনের খেলাই হচ্ছে নতুনের খেলা।

"তিলে তিলে নূতন হোয়"। জীবনের খেলাই হচ্ছে ওই—"তিলে তিলে নূতন হোয়"। কত লক্ষ বৎসর মানুষ বেঁচে আছে—কিন্তু তবুও সে আপনার কাছে আপনি বোঝা হ'য়ে উঠ্‌ল না—আপনার কাছে আপনি গলগ্রহের মতো হয়ে উঠ্‌ল না—কারণ সে যে "তিলে তিলে নূতন হোয়"। সে তিলে তিলে নূতন হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাই তার আপনার সম্বন্ধে আপনার কৌতুহলের শেষ নেই—অজ্ঞাত যা, গুপ্ত যা, সুপ্ত যা, তা দিনে দিনে বিকশিত হ'য়ে তার চোখের সাম্‌নে মনের

সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছে ; তাই তার ক্লান্তি নেই, ঔদাসীন্য নেই, বৈরাগ্য নেই। জীবনে যখন এই নতুনকে ঠেকিয়ে রাখ্‌ব তখনই জীবনের মরণকেও ডেকে আন্‌ব। কারণ মানুষের প্রতিপলের মরণই তার প্রতি দিনের জীবনকে গড়ে' তুল্‌ছে।

তিলে তিলে পলে পলে মানুষ নতুনকে পাচ্ছে বলে' এ জগতের রঙ্‌ তার চোখে আজও ফিঁকে হ'ল না। বাহিরের জগত হয়ত হাজার বছর সেই একই আছে—সেই বর্ষায় ঘন দেয়ার গুরু গুরু ডাক—কালো মেঘের ঝিলিক হানাহানি—পাগল বাদলের উতোল ধারা ; সেই শরতের চোখ-গলানো মন-মাতানো জোৎস্না ; সেই বসন্তের সবুজ বনের অবুঝ হাওয়ার মাতামাতি ; সেই শীতের রহস্যময় কুজ্ঝটিকা ঘেরা যেন স্বপ্নের জগত—হয়ত সেই সবই এক—কিন্তু মানুষ পুরাতনকে ত্যাগ করে', তার উপরে বিস্মৃতির তুলি বুলিয়ে তার অন্তরের জগতে প্রতি নিমেষে নতুনের জন্যে আসন পাত্‌ছে। তার ভয় কি জানি যদি কোন কিছুকেই আবার সে নতুন করে' না পায়—কি জানি যদি পুরাতন তার গুরু গম্ভীর অতিমাত্র চেনা মুখ নিয়ে হাজির হয়। সে চেনার মধ্যে যে চাইবার কিছু নেই—খুঁজবার কিছু নেই—বুঝবার কিছু নেই—তার পিছনে যে একটা মস্ত কালো দাঁড়ি সমাপ্তির শেষ টেনে বসে' আছে। আর সমাপ্তিকে নিয়ে ত মানুষ বাঁচ্‌তে পারে না—সমাপ্তি থাক্‌লে যে মানুষের সমস্ত প্রকৃতি, তার মন বুদ্ধি চিত্ত, তার কর্ম্ম-প্রেরণা ভোগ-প্রেরণা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই মানুষের জীবনেরও ঐ সত্য—তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"। জীবন্মৃত যে তার অন্তরেই নূতনের জন্যে আসন পাতা নেই—আর নূতনকে বরণ করে' নিতে নারাজ যে তারই মরণ।

"তিলে তিলে নূতন হোয়"। তাই জীবন এত মধুর—এত রসযুক্ত।

"আজ আমাদের সাধের বৃন্দাবন

নিত্য নূতন নূতন।"

এই যে জীবন-বৃন্দাবন তা নিত্য নূতন নূতন। নিত্য নূতন মুকুট মাথায় দিয়ে জীবন-দেবতা নিত্য নব রসে অভিষিক্ত হয়ে নিত্য নূতন পথে চল্‌ছেন। তাইত দেখি মানুষ অনন্ত—বাইরের রক্ত মাংস তার মনের পাতায় দাঁড়ি টানে নি। বাহিরকে সে অন্তরের অনন্ত রহস্যে মণ্ডিত করে নিত্য নূতনের খেলা খেল্‌ছে। তাই এই বাহিরের জগৎ তার অন্তরের রঙে "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

নতুন যেখানে আপনার পথ পায় নি—যেখানে সে অবজ্ঞাত হয়েছে—মানুষের মনে প্রাণে যেখানে সে ভয় বা তাচ্ছিল্য জাগিয়ে গিয়েছে—সেই খানেই পুরাতন ধীরে ধীরে মানুষকে জড়ে পরিণত করে' অমৃতের কাছ থেকে তাকে দূরে—অতিদূরে টেনে নিয়ে গেছে। মানুষের জীবনে অনন্ত সম্ভাবনার পথ সেখানে রুদ্ধ। সেখানে মানুষের আত্মার চাইতে মন—মনের চাইতে দেহের রক্ত মাংস বড় হ'য়ে উঠে ধীরে ধীরে তাকে মাটির দিকে টেনে নিয়ে গেছে—মাটিতে শিকড় গেড়ে তাকে উদ্ভিদে পরিণত করেছে—উদ্ভিদ ধীরে ধীরে পাথরে পরিণতি লাভ করেছে। নূতনের মধ্যে রয়েছে গতি—তাই সেখানে রয়েছে মানুষের কল্যাণ। তাই মানুষের জীবনের একটা বড় সত্য হচ্ছে ঐ—যে তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

(৩)

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

জন্ম ভরে' রূপ দেখলুম তবু নয়নের তৃপ্তি হ'ল না—নয়নের বৈরাগ্য এলো না। কারণ আমি যে সে-রূপ দেখে তিলে তিলে নতুন হচ্ছি—কারণ সে-রূপ যে আমার চোখে তিলে তিলে নতুন হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কি এ রূপ? কিসের এ রূপ? না দেখে জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিট্‌ল না—জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিট্‌বে না। এ রূপ কি শুধু ঐ মুখের? তার সুবিন্যস্ত পেশীসমূহের? নিটোল সুগোল গণ্ডের? নির্ভুল পরিমিত রেখাবন্ধনীর? শ্যাম দূর্ব্বাদলসন্নিভ বা চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণের? বনস্পতি সদৃশ উন্নত ঋজু দেহযষ্টি বা ললিত-লবঙ্গলতাতুল্য লীলায়িত দেহলতার?—না। তা যদি হ'ত তবে তা নিষ্ঠুর তৃপ্তি এনে সমাপ্তির গান গাইত। না, এ রূপ আমি সাদা চোখে খালি মুখেই দেখি নি—চোখের পিছনে যে মন আছে সেই মন দিয়ে দেখেছি—মনের পিছনে যে আত্মা আছে, সেই আত্মা দিয়ে স্পর্শ করেছি—তাই এ রূপের নশ্বরতা নেই—তাই এ রাগের মাদকতার বিরতি নেই। ঐ বাইরের রূপের পিছনে, বাইরের রূপের অন্তরে, বাইরের রূপকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা আছে—আমার অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার সঙ্গে সেই অনির্ব্বচনীয়তার যোগ হয়েছে, তাই ও রূপের সৌন্দর্য্য জন্ম জন্মান্তরেও আমার কাছে মলিন হ'ল না—তাই ওর নেশা আমার লেগেই রইল—তাই

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

এ রূপ যদি কেবল রক্ত মাংসের রূপ হ'ত, তবে হিয়ার স্পন্দন থেমে গিয়ে দু'দিনে ক্রন্দন উঠ্‌ত।

কবি লিখ্‌ছেন—"যেখানে পদ্মফুলের নির্ব্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্ব্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশী। * * *। পদ্মের যেখানে এই বেশী সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশীরও একটা গভীর মিল। তাই ত গাহিতে পারি

কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রসপুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।

গগন মগন হ'ল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে;
গুন্‌ গুন্‌ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে;

নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল!"

মন কেবল ভুলিলই নয়—মন ভুলেই রইল—লাখ লাখ যুগ ভুলে রইল—জন্ম জন্মান্তর ভুলে রইল। এ কার গুণে? কিসের গুণে?—ঐ অনির্ব্বচনীয়তা, যারই কেবল জরা নেই, মৃত্যু নেই, আদি নেই, অন্ত নেই। এ অনির্ব্বচনীয়তা বচনে বল্‌তে পারি নে—চেষ্টা করি মাত্র, বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি নে—দর্শন করি মাত্র, তাই ত

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

তাই

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

এই অনির্ব্বচনীয়তা আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে এই জগতে। নইলে কোনদিন মানুষ সব ত্যাগ করে' নির্ব্বচনের জন্যে উৎগ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ত—চোখ বুঁজে সব তপস্যায় বসে' যেত—চোখ খুলে আর চাইতই না কোন দিকে। কিন্তু এই অনির্ব্বচনীয়তা তাকে যুগে যুগে ঔদাসীন্য থেকে মুক্তি দিচ্ছে—বৈরাগ্য থেকে ফিরিয়ে আন্‌ছে। এই অনির্ব্বচনীয়তাই তার জীবনের গভীরতম সত্য, তাই চোখের অশ্রু মনের ব্যথা প্রাণের ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও সে বেঁচে এসেছে। কিন্তু এই অন্তরতম অনির্ব্বচনীয়তাকে আমাদের মন জানছে না, বুদ্ধি বুঝছে না। এই অনির্ব্বচনীয়তাকে মনে প্রাণে চিত্তে বুদ্ধিতে মানুষের সমস্ত প্রকৃতিতে সত্য করে' তোলা—জাগ্রত করে' তোলাই হচ্ছে মানুষের আজীবনের সাধনা।

(৪)

এই অনির্ব্বচনীয়তারই সন্ধান হিন্দু একদিন পেয়েছিল—এই অনির্ব্বচনীয়তার উৎস কোথায় তা টের পেয়েছিল। তাই সেদিন সে বাহির থেকে ভিতরে ফিরল। সেদিন সে খোলা চোখ বন্ধ করল—মন বুদ্ধিকে রুদ্ধ করল—হাত বাঁধল, পা বাঁধল। সেদিন সে পদ্মাসনে বসে' গেল তপস্যার অনির্ব্বচনীয়তার ঐ উৎসে পৌঁছিতে হবে—তাতে অবগাহন করতে হবে—জীবনের গভীরতম সত্যকে জানতে হবে।

বাহিরে তার দুর্গতির সীমা রইল না। তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি নিলামে চড়ল—তার সংসার অশ্রুতে অশ্রুতে সিক্ত হল, হাহাকারে হাহাকারে পুর্ণ হল—কুটীরের দ্বারে তার দুর্ভিক্ষ রাক্ষস করাল বদন ব্যাদন করে' তাকে ভয় দেখাতে লাগল, মহামারী প্রেত তার যোগাসনের চারিদিকে অট্টহাস্য করে' করে' নাচতে লাগল—কিন্তু হিন্দু টলল না; যোগীর ধ্যান ভাঙল না—রক্তমাংসের দুঃখ, চোখের অশ্রু, প্রাণের ব্যথা মানুষকে জয় করতে পারল না—ধ্রুব-তারার মতো একটি তারা শুধু তার ইচ্ছাশক্তির সামনে জ্বল্ জ্বল্ করে' জেগে রইল—ঐ অনির্ব্বচনীয়তাকে জানতে হবে—তার উৎসে পৌঁছিতে হবে—তাতে অবগাহন করতে সৃষ্টির নিগূঢ়তম সত্যকে আপনার করতে হবে। এমনি হিন্দুর একাগ্রতা, এমনি হিন্দুর শক্তি—এ শক্তি যেদিন বেরিয়ে এসে জগত-লীলায় মাতবে. সেদিন সে হবে অপরাজেয় অরিন্দম।

কিন্তু সকল সত্য অনুষ্ঠান মিথ্যাও কিছু জড়িয়ে আনে—যেমন প্লাবনের জল আবর্জ্জনারাশি জড়িয়ে আনে। তাই রব উঠল—ঐ

শেষ, ঐ অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার উৎসে পৌঁছা—ঐখানে সমাধি, মহাসমাধি—তারপর অক্ষর ব্রহ্মে নির্ব্বাণ মানব জন্মের চরম সার্থকতা।

কিন্তু ঐ শেষ নয়—অনির্ব্বচনীয়তা শেষ নয়—ওটা যে সৃষ্টির আরম্ভ—মানুষের ওটাই যে প্রারম্ভ। ঐ আরম্ভ থেকে মানুষকে অজ্ঞানে আরম্ভ কর্‌তে হবে। ঐ অনির্ব্বচনীয় উৎসে অবগাহন করে' দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিকে 'অমৃতময় করে' হিন্দুকে আবার বেরিয়ে আস্‌তে হবে অমর হ'য়ে শক্তিমান হ'য়ে। সংসারের চোখের অশ্রু মিশিয়ে দিয়ে তার মুখের হাসি আবার ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে—মহাজনের অনুচরকে দূর কর্‌তে হবে—মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে ঐ অনির্ব্বচনীয়তায় অভিষেক করে' সত্য করে' তুল্‌তে হবে—মানুষের সে সত্যকে জগতে সার্থক করে' তুল্‌তে হবে। বিশ্ববাসীকে ঐ অনির্ব্বচনীয়তার সংবাদ দিতে হবে—তার সন্ধান দিতে হবে। বিশ্ববাসী যে অনির্ব্বচনীয়তার উৎসে অবগাহন করে' অমর হ'য়ে সজ্ঞানে চোখ মেলে বস্‌বে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

সে রূপের ব্যাখ্যান করে' করে' সে জন্ম-জন্মান্তর নবীনতা লাভ কর্‌বে—বিশ্ববাসী গৌরবোন্নতশিরে আবার একবার বল্‌বে যে তারা হচ্ছে—অমৃতস্য পুত্রাঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাঙলা কি পড়্‌ব?

প্রথম প্রস্তাব

(বন্ধু-সমাজে পঠিত।)

কি বই পড়্‌লে বাঙলা শেখা যায়? তোমাদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত, বিশেষত আমার পক্ষে, কেননা আমি বাঙলা বই পড়ে বাঙলা ভাষা শিখি নি, বাঙলা ভাষা শিখেই বাঙলা বই পড়েছি। নিজের ভাষা শেখ্‌বার জন্য কারও কোন বই পড়া আবশ্যক কিনা, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে; অপর পক্ষে কেবল মাত্র ও উপায়ে পরের ভাষা যে কতদূর শেখা যায়—তার প্রমাণ খুঁজে বার কর্‌তে আমাদের বেশি দূর যেতে হবে না; তার অসংখ্য উদাহরণ আমাদের হাতের গোড়াতেই রয়েছে। আমরা ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরাজী ভাষাকে যে কতদূর আমলে এনেছি তা আমরা ঠিক না জান্‌লেও ইংরাজেরা ঠিক জানে। আমাদের ইংরাজী বিদ্যেয় ওকালতি ও এডিটরির ব্যবসা কোন প্রকারে চালান যায়, কিন্তু তার দৌলতে ইংরাজী সাহিত্য লেখা ত চলেই না, ঠিকমত পড়াও চলে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

তবে এ কথাও সত্য যে, যাঁর বইয়ের ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই—তাঁর ভাষাজ্ঞান অনেকটা আদিম। যে ভাষা তিনি জানেন তাতে করে ঘরকর্‌না চালান যায়, নিত্য জীবনের সুখ দুঃখ রাগ বিরাগ প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ সে ভাষার সম্বলে দিন চলে যায় এবং

সম্ভবত ভাল হালেই চলে যায় কিন্তু তাতে মানুষের মনের সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। এটা সুখের বিষয়ই হোক্, আর দুঃখের বিষয়ই হোক্, কথাটা কিন্তু সত্য যে, মানুষের জীবন একেবারে দৈনিক নয়, একমাত্র দিন-এনে দিন-খেয়ে মানুষ চরিতার্থ হয় না। তার স্বভাবের তাড়না থেকেই সে দর্শন বিজ্ঞান কাব্যকলার সৃষ্টি কর্‌তে বাধ্য হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও ঐশ্বর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। সুতরাং যিনি সাহিত্য রচনা কর্‌তে চান কিম্বা সাহিত্য রস উপভোগ কর্‌তে চান, তাঁর পক্ষে বইয়ের ভাষার পরিচয় লাভ করাটা অবশ্য প্রয়োজন।

আমার এ কথা থেকে কেউ যেন মনে করো না যে, মুখের ভাষা ও বইয়ের ভাষা দুটি আলাদা ভাষা। এরূপ যাঁদের ধারণা, আমি তাঁদের জ্ঞাতিও নই, কুটুম্বও নই। মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা সম্পূর্ণ এক নয় কিন্তু তাই বলে সম্পূর্ণ বিভিন্নও নয়। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদটা যে কোথায় তা দু-কথায় বলা কঠিন। এ দুই য়র ভিতর একটি মোটাগোছের দাঁড়ি টান্‌বার জন্য মানুষের পক্ষে যতটা নির্ভীক হওয়া দরকার, আমি ততটা নই। কেননা নিত্য দেখ্‌তে পাই যে, লেখকের মর্জ্জি অনুসারে এ রেখা ক্রমান্বয়ে এগোয় ও পিছয়। সত্যকথা বল্‌তে গেলে, সাহিত্যের কোন একটি বিশেষ ভাষা নেই, প্রতি লেখকেরই একটি নিজস্ব ভাষা আছে; কিন্তু এঁদের সকলের ভাষার অন্তরে একটি সাধারণ গুণ আছে, যার দরুণ যাঁরা সত্যিকার লেখক তাঁদের লেখা সাহিত্য নামে পরিচিত, এবং সে গুণের নাম হচ্ছে শ্রী। আমাদের দৈনিক জীবনের মৌখিক ভাষার চাইতে, সাহিত্যের ভাষার কান্তি ঢের বেশি পরিপুষ্ট, শ্রী ঢের বেশি

পরিস্ফুট। কিন্তু তাই বলে মুখের কথার সঙ্গে বইয়ের কথার পার্থক্য জাতিগত নয়। সুন্দরী স্ত্রীলোক ও অ-সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখ একই উপাদানে গড়া, নাক কান চোখ মুখ দুজনেরই আছে এবং কম্পাস দিয়ে মেপে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, সে সকলের মাপ জোখও প্রায় সমান, অথচ যাঁর চোখ আছে তিনিই জানেন যে, সুন্দরী ও অ-সুন্দরীর ভিতর একটি স্পষ্ট, শুধু স্পষ্ট নয়, একটি জাজ্বল্যমান প্রভেদ আছে। একটিকে দেখে মানুষে চমৎকৃত হয়, আর একটিকে দেখে তা হয় না। আমাদের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে যে, যে লেখা পড়ে মানুষে চমৎকৃত হয়—সেই লেখাই কাব্য অর্থাৎ সাহিত্য।

শ্রী কিসের উপর নির্ভর করে তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব—তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মানুষের মুখশ্রী যেমন মুখের প্রতি অংশের পূর্ণবিকাশ, এবং সকল অংশের সঙ্গতি ও সুষমার উপর নির্ভর করে, কাব্যশ্রীও তেমনি ভাষার পূর্ণবিকাশ ও শব্দের সঙ্গতি ও সুষমার উপর নির্ভর করে। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, এতদতিরিক্ত লাবণ্য বলে আর একটি জিনিষ আছে, যা না থাক্‌লে কাব্যের বাহ্য-শ্রী থাক্‌তে পারে কিন্তু তার চমৎকারিত্ব থাকে না। এ কথায় আমিও সায় দিই, যদিচ এই লাবণ্য বস্তুটি কি তা যিনি জানেন না, তাঁকে তা বুঝিয়ে দিতে পারা কঠিন। এ হচ্ছে সেই জাতীয় বস্তু যার অস্তিত্ব আমরা জানি কিন্তু সে অস্তিত্বের রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটন করতে পারিনে। তবে এ জিনিষের মূল যে কোথায় তা আমরা অনুমান করতে পারি। যা জীবন্ত নয়, সে পদার্থের অর্থাৎ জড়পদার্থের দেহে লাবণ্য নেই, এই থেকে আন্দাজ করা যায়, রূপের ভিতর দিয়ে প্রাণের যে দিব্য আলো ফুটে ওঠে, তারই নাম

লাবণ্য। যে-লেখা লেখকের প্রাণে প্রাণবন্ত—সেই লেখার মধ্যেই শুধু লাবণ্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাবে, অন্যত্র নয়। এই লাবণ্যই যে সাহিত্যের ভাষার সর্ব্বপ্রধান গুণ, এ জ্ঞান সে-সব লেখকদেরও আছে, যাঁরা রচনার ভিতর নিজের প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে পারেন না, কিম্বা কর্‌তে চান না। জড়বস্তুর লাবণ্যের অভাব আমরা যেমন পালিসের সাহায্যে পূর্ণ কর্‌তে চাই—উক্ত শ্রেণীর লেখকেরাও তাঁদের রচনার লাবণ্যের অভাব তেমনি পালিসের প্রসাদে পূর্ণ কর্‌তে চান। তার কারণ মাজাঘসার বলে আমরা ভাষাকে লাবণ্য না দিতে পারি—ঈষৎ চক্‌চকে করে তুল্‌তে পারি। ভাষার জলুস যদি ভাষার ভিতর থেকেই বার করা যায়, লোহাকে যদি ইস্পাত করা যায়, সেটা অবশ্য দুঃখের কারণ হয় না।

(২)

মুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার যোগাযোগ সম্বন্ধে এই দীর্ঘ বক্তৃতা কর্‌বার একটু বিশেষ কারণ আছে। সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে আমার মত আগে থাক্‌তেই জানিয়ে না রাখ্‌লে, আমি যে সব বইয়ের হয়ে তোমাদের কাছে সুপারিস কর্‌ব, তাতে তোমরা একটু বিস্মিত হয়ে যেতে পার। তোমরা যখন বাঙলা ভাষার উপর একটু পাকা রকমের অধিকার লাভ কর্‌বার জন্যই বাঙলা বই পড়্‌তে চাও, তখন আমি তোমাদের বাঙলার চর্চ্চা "মেঘনাদ বধ" থেকে সুরু কর্‌তে বলব না—ও-কাব্যে শেষ কর্‌তে বল্‌ব, আর গোড়ায় এমন সব বই পড়্‌তে অনুরোধ কর্‌ব, যে সকল পুস্তকের এদেশের স্কুল কলেজে প্রবেশের অধিকার নেই।

বোধহয় তোমরা জান যে, আমি সাধু-বাঙলার পক্ষপাতী নই ; কেননা আমি শুদ্ধ-বাঙলার পক্ষপাতী। সাধু-বাঙলার সঙ্গে শুদ্ধ-বাঙলার প্রভেদটা যে কোথায়, সে বিচার আমি পরে কর্‌ব। আপাতত একটি কথা মনে রাখলে আমার মত গ্রাহ্য কর্‌বার পক্ষে না হো'ক্‌, বোঝ্‌বার পক্ষে তোমাদের কতকটা সাহায্য হবে। তোমরা সবাই জান যে, ভাষা মাত্রেরই একটি বিশেষ সুর, একটি বিশেষ ছন্দ, একটি বিশেষ মতি, একটি বিশেষ গতি, এক কথায় একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে ; এবং আমার বিশ্বাস, সাহিত্যের ধর্ম্ম হচ্ছে, ভাষার সেই সুরকে ভরাট করা, সেই ছন্দকে জমাট করা, সেই মতিকে প্রসন্ন করা, সেই গতিকে প্রমুক্ত করা,—এক কথায় তার প্রকৃতিকে প্রকৃত করা। প্রকৃতিকে প্রকৃত করার প্রস্তাব, হঠাৎ শুন্‌তে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। বহুকাল পূর্ব্বে আরিষ্টল বলে গেছেন যে, বস্তুমাত্রেরই প্রকৃতির পরিচয় আমরা তখনই পাই—যখন সে বস্তুর অভিব্যক্তি পূর্ণ হয়। আর ভাষা একমাত্র সাহিত্যেই তার পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে অর্থাৎ প্রকৃত হয়ে ওঠে।

(৩)

এ যুগের বাঙলা-সাহিত্য আজ পর্য্যন্ত যে-ভাষার দখলে রয়েছে, সে ভাষা সংস্কৃত শব্দের গুরুভারে ভারাক্রান্ত, যুগপৎ ইংরাজি ও সংস্কৃত অন্বয়ের বন্ধনে তা আবদ্ধ। সুতরাং যাঁরা বাঙলা ভাষার মুল উপাদান ও মুল প্রকৃতির পরিচয় লাভ কর্‌তে চান, তাঁদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হচ্ছে, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, প্রতি ভাষারই একটি বিশেষ সুর আছে, এবং যে লেখার ভিতর সে সুর বাজে না, তা দর্শন বিজ্ঞান যা খুসি তাই হতে পারে; কিন্তু সাহিত্য নয়। বাঙলা গদ্যের ভাষা অত্যধিক সাধু হয়ে যে শুধু জড়ভরত হয়ে পড়েছে, তাই নয়,—সেই সঙ্গে তা নিতান্ত বেসুরোও হয়ে পড়েছে। আমাদের কানে যে তা বেসুরো লাগে না, তার কারণ আমাদের নব শিক্ষার প্রসাদে, বাঙলা ভাষার নিজস্ব সুরটি শিক্ষিত বাঙালীর কান থেকে আল্‌গা হয়ে গিয়েছে।

এ কথা যদি সত্য হয়, ত অপর কোনও কারণে না হোক্‌, যাতে বাঙলা ভাষার সুর আবার আমাদের কানে ফিরে আসে, অন্তত সে কারণেও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের পঠন পাঠন শ্রবণ ও মনন প্রভৃতি আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

যেমন সঙ্গীতের সুর আদায় কর্‌তে হলে, যত না তা এস্তমাল্‌ করা দরকার, তার চাইতে ঢের বেশি তা শোনা দরকার। তেমনি কোনও ভাষার সুর আদায় কর্‌তে হলে, যত না তা বলা দরকার তার চাইতে ঢের বেশি তা শোনা দরকার। ক্রমান্বয়ে শুন্‌তে শুন্‌তে সে সুর আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদের কানে গেঁথে যায়—মনে বসে যায়। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের কাছে যত জিনিষ না ধরা পড়ে, আমাদের মগ্ন চৈতন্যের কাছে তার চাইতে ঢের বেশি জিনিষ ধরা পড়ে। আমরা যাকে জ্ঞান বলি, তার যে অংশ আমরা সজ্ঞানে শিক্ষা করি, তার চাইতে তার যে অংশ অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়, তার মূল্য কম নয়। অপর বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা খাটুক আর না খাটুক, আর্টের শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ খাটে।

এই কারণে তোমাদের সঙ্গে আমি আমাদের প্রাচীন কবিদের সর্ব্বপ্রথমে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

(৪)

আমরা যাকে বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য বলি, সে হচ্ছে বাঙলার নবাবী আমলের সাহিত্য।

হিন্দু যুগের যদি কিছু বাঙলা সাহিত্য থেকে থাকে তা আজ পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কাটামুণ্ডু থেকে কতকগুলি গান ও শ্লোক সংগ্রহ করে এনেছেন, যা না কি বাঙলা সাহিত্যের আদিম নমুনা। এ ছাড়া 'শূন্যপুরাণ' বলে একখানি বই আছে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে, যার জন্মকাল হচ্ছে পাল রাজাদের কাল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পদাবলী সম্ভবত হিন্দুযুগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু এ গান ও এ শ্লোকের ভাষা বাঙলা কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অপরপক্ষে "শূন্যপুরাণ"-এর ভাষা অবশ্য বাঙলা এবং খাঁটি বাংলা কিন্তু ও গ্রন্থ যে মুসলমান আমলে রচিত হয়েছিল সে বিষয়েও কোনই সন্দেহ নেই। কেন?—সে তর্ক এখানে তুল্‌ব না। 'শূন্যপুরাণ' তোমরা ইচ্ছে কর্‌লে পড়্‌তে পার কিন্তু না পড়্‌লেও ক্ষতি নেই।

গৌড়ের তক্তের মালিক যখন বাদশা, বাঙলা সাহিত্য যে সেই সময়ে জন্মলাভ করে, এই হচ্ছে—মামুলি মত। এবং এই মত শিরোধার্য্য করে এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক্।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের রত্নাবলী হচ্ছে পদাবলী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা

বাঙলার গীতিকাব্যের আছে। সুতরাং একথা বলাই বেশি যে, বাঙালী পাঠক মাত্রেরই প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে সে সাহিত্যের রসাস্বাদ করা।

তবে এ ক্ষেত্রে একটু মুস্কিল আছে। ঐ সাহিত্যের দর্শনলাভ করা সুকঠিন। পদাবলী সাহিত্য বটতলায় পাওয়া যায়, পটলডাঙ্গায় পাওয়া দুষ্কর। আর বটতলার ছাপা যেমন বিশ্রী তেমনি ভুল। ভদ্রলোকের হাতে দেওয়া যায়, এমন একখানি চণ্ডিদাস খুঁজে বার কর্‌তে অন্তত সাতদিন লাগে। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ চণ্ডিদাসের একটি নবসংস্করণ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার উপর নির্ভর করা আদপেই চলে না। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় চণ্ডীদাসের নামে কত বাজে কবির কত খেলো পদ যে চালিয়ে দিয়েছেন, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। এ সংস্করণে তিনি মণি-কাঁচের যে যোগসাধন করেছেন, পাঠককে তাহার বিয়োগ সাধন কর্‌তে হবে। এই পোকা বাছবার মজুরি ক'জনের পোষায় ?

পদাবলীর ভাষা হচ্ছে, ইংরাজীতে যাকে বলে poetic diction. এ সাহিত্যের যে সুর সে হচ্ছে বাঁশীর সুর, মানুষের গলার আওয়াজ নয়। সুতরাং বাঙলার কথার সুরের সন্ধান নিতে হলে, আমাদের অপর সাহিত্যের কাছে যেতে হবে। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য আগাগোড়া পদ্যে লেখা, তাই বলে তা অবশ্য আগাগোড়া কবিতা নয়। সুতরাং বাঙলা ভাষায় কান তৈরি কর্‌তে হলে, আমাদের সেই পদ্য সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা করা আবশ্যক—যা গদ্যে লিখ্‌লেও চল্‌তে পার্‌ত।

কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" ও কাশিদাসের "মহাভারত" যে সকলেরই পড়া দরকার এ বিষয়ে আমি সকলের সঙ্গে একমত। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের

মতে কৃত্তিবাস ও কাশিদাসের যে কাব্য আমরা পড়ি তার ভাষা যথেষ্ট প্রাচীন নয়। যুগে যুগে তা পরিবর্ত্তিত হয়ে, এখন তা প্রায় আধুনিক হয়ে এসেছে। এ কথা আমিও মানি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। চলতি রামায়ণ ও চলতি মহাভারতের ভাষা খুব সেকেলে না হলেও একেবারে একেলে নয়। ও-দুই গ্রন্থের ভাষা খাঁটি বাঙলা। "পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি" প্রভৃতি দু' এক টুকরো ওর ভিতর এখানে ওখানে প্রক্ষিপ্ত হলেও, ও-দুই কাব্যের সুর, খাঁটি দেশীই রয়ে গিয়েছে। এখানে একটি কথা বলে রাখি, বাঙলা রামায়ণ মহাভারত আমি বহুকাল পড়িনি। বাল্যস্মৃতির উপর নির্ভর করেই আমি তার সুখ্যাতি করছি।

(৫

এর পর আমি এমন একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করব, যার সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের অল্প লোকেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আমার মতে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" বাঙলা সাহিত্যের একখানি অপূর্ব্ব ত বটেই উপরন্তু অমূল্য গ্রন্থ। আগেভাগেই বলে রাখি যে, ও-গ্রন্থ যদিচ পদ্যে লেখা তবুও কাব্য নয়। চৈতন্যদেবের এই জীবন চরিত লেখক, মহাপ্রভুর জীবনেরই পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন, নিজের কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করতে চান নি। এর জন্য আমাদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য, কেননা সে শক্তি তাঁর শরীরে ছিল না। এ গ্রন্থ গদ্যে লেখা হলে আমার বিশ্বাস এর মর্য্যাদা আরও বেড়ে যেত। বৃন্দাবন দাস ছিলেন অতি সরল প্রকৃতির লোক, তাই ভাষার ও

ভাবের অপূর্ব্ব সরলতাই হচ্ছে তাঁর গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান গুণ। তা ছাড়া তিনি তাঁর জ্ঞান বিশ্বাসে যা সত্য বলে মনে করেছেন তাই বলেছেন। সহজ ভাষায় সত্য ঘটনার বিবরণ দিতে পার্‌লে, সে বিবরণ যে সাহিত্য হয়ে ওঠে—এই গ্রন্থই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস স্বেচ্ছায় লেখেন নি, নিত্যানন্দের আদেশে লিখেছিলেন। তিনি সাহিত্য রচনা কর্‌তে চান নি বলে, তাঁর রচনা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এ রকম ঘটনা সাহিত্য জগতে মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। "চৈতন্য ভাগবত" কাব্য নয়, কিন্তু বাঙলার একটি নব-যুগের এবং সেই নব-যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের ইতিহাস। এবং আমার বিশ্বাস প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে এই হচ্ছে একমাত্র ইতিহাস, এবং ইতিহাসের যে সকল গুণ থাকা উচিত এ গ্রন্থে সে সকল গুণের সাক্ষাৎ মিলবে। এস্থলে বলে রাখি যে, ইতিহাস শব্দ chronicle অর্থে ব্যবহার কর্‌ছি, history অর্থে নয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে এ জাতের লেখাকে কর্‌চা বলে।

চৈতন্যদেবের অপর সকল জীবন চরিতের স্থান "চৈতন্য ভাগবত"-এর অনেক নীচে। "চৈতন্য-মঙ্গল"-এর রচয়িতা লোচন-দাস ছিলেন কবি, সে কারণ তার গ্রন্থে ইতিহাস উপন্যাসের সঙ্গে মিশে একেবারে ঘুলিয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবন দাস চেষ্টা করেছেন—মহাপ্রভুর ছবি তুলতে আর লোচন দাস চেষ্টা করেছেন তাঁর ছবি আঁক্‌তে, কাজেই তাঁকে ও-ক্ষেত্রে রঙ চড়াতে হয়েছে। তাঁর কল্পনার চাইতে চৈতন্য দেবের জীবনের সত্য যে ঢের বেশি মহৎ ও অপূর্ব্ব ছিল, এ জ্ঞান তাঁর থাক্‌লে তিনি মহাপ্রভুকে তাঁর স্বহস্ত রচিত অলঙ্কারে ভূষিত কর্‌তে গিয়ে আবৃত করে

ফেল্‌তেন না। চৈতন্য দেবের জীবন চরিতে, মহাপ্রভুকে দেখে নবদ্বীপের নারীগণের পতিনিন্দাটা, ভেবে দেখ দেখি, কি বেখাপ্পা শোনায়! তবুও এ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য—তার ভাষার গুণে।

তারপর আসে "চৈতন্য চরিতামৃত"। এ গ্রন্থের বস্তু প্রথমত সাহিত্য নয়, এর ভাষা দ্বিতীয়ত বাঙলা নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখেছেন দর্শন এবং যে ভাষায় তা লিখেছেন, তার নাম আমি ঠিক জানিনে। এ ভাষাকে আধ-আধ বাঙলাও বলা যেতে পারে, বাধো-বাধো বাঙলায়ও বলা যেতে পারে। এই ভাষা-বিভ্রাটের জন্য তাঁকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। তিনিও এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন গুরুর আদেশে। এবং গুরু যখন তাঁর প্রতি এ আদেশ কর্‌লেন, তখন কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের বয়েস চৌরাশী বৎসর এবং বহু-কাল ব্রজবাসের ফলে, বাঙলা ভাষা তিনি এক রকম ভুলেই গিয়ে-ছিলেন। "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনা কর্‌বার জুড়ি heroic act পৃথিবীর সাহিত্যে আর নেই। "চৈতন্যচরিতামৃত"-এর মাহাত্ম্য আমি সম্পূর্ণ বুঝি, ধর্ম্মগ্রন্থ হিসেবে এর যথেষ্ট মুল্য আছে। তবুও ঐ গ্রন্থ পড়্‌তে আমি তোমাদের অনুরোধ কর্‌ব না, কেননা সে পাঠের ফলে বাঙলা শেখার বিশেষ সাহায্য হবে না।

একটা সুখবর দিই। "চৈতন্য-ভাগবত"-এর একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আছে। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে গ্রন্থের সম্পাদক সে গ্রন্থ যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ও-সংস্করণটি আজকাল বাজারে মেলে কিনা জানিনে, আর যদিও বা মেলে, তাহলে তার দাম চার পাঁচ টাকার কম হবে না। আমার মতে যে বই প্রতি বাঙালীর পড়া উচিত, সে বই এমন দুর্ল্লভ

ও দুর্মূল্য হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যের আদর হালে শিক্ষিত সমাজের এক সম্প্রদায়ের কাছে শুন্‌তে পাই যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। যাঁরা এ সাহিত্যের গুণগানে শতমুখ, তাঁদের কাছে আমার সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁরা "চৈতন্য-ভাগবত"-এর একটি সুলভ ও সুদৃশ্য সংস্করণ প্রকাশ করুন। পদাবলীকে রগড়ে কচলে তার ভিতর থেকে রসতত্ত্ব বার করবার চেষ্টা, কাব্য নিঙড়ে দর্শন বার করবার চেষ্টা যে, শুধু নিস্ফল তাই নয়,—ঐ রগ্‌ড়ানি কচ্‌লানির ফলে, তার মধুর রস দেশের লোকের কাছে তিতো হয়ে উঠ্‌তে পারে। অপর পক্ষে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটায় সমাজ ও সাহিত্য দুয়েরই যথেষ্ট উপকার করা হবে। তবে এ অনুরোধ যে কেউ রক্ষা কর্‌বেন, সে ভরসা আমার নেই—কেননা যাঁরা পদাবলীমুগ্ধ তাঁরা পদাবলীরও ত কৈ, অদ্যাবধি কোনও সুলভ ও সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ কর্‌লেন না!

(৬)

এতক্ষণ যে সব বইয়ের নাম কীর্ত্তণ করা গেল সে সবই গৌড়ের পাঠান বাদশাদের সময় লেখা হয়েছিল। এইবার মোগল যুগের দুখানি বইয়ের কথা বল্‌ব, এক মুকুন্দরামের "চণ্ডী" আর এক ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"।

"চণ্ডী"র বিশেষত্ব এই যে, এ হচ্ছে খাঁটি বাঙলা কাব্য। আজকাল দেখ্‌তে পাই একদল লোক খাঁটি বাঙালীর সন্ধানে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের রাজ্যে হাঁৎড়ে বেড়াচ্ছেন। ও-জীবটিকে আন্‌কোরা অবস্থায়

যদি কোথাও আবিষ্কার করা যায়, ত সে হচ্ছে চণ্ডীর উপাখ্যান ও মনসার উপাখ্যানের মধ্যে। রামায়ণ ও মহাভারত, প্রাচীন আর্য্য-জাতির বীরকাহিনী। তারপর বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর একদিকে ভাগবতের, আর একদিকে, বিদ্যাপতির পদাবলীর পূর্ণ-প্রভাব রয়েছে, এমন কি, সে প্রভাব পদাবলীর ভাষার অন্তরেও প্রবেশ করেছে। আমরা যাকে ব্রজবুলি বলি, তা ব্রজভাষা নয়, কিন্তু মৈথিলীর বাঙলা সংস্করণ। আসল কথা এই যে, খাঁটি বাঙালীর সাক্ষাৎ মানুষে তখনই পাবে, যখন বাঙালীজাতি তার পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে, অতীতে নয়।

"চণ্ডী"র কথা বাঙলা কথা, সুতরাং সে কথা প্রায় খাঁটি ঘরো বাঙলা-তেই বলা হয়েছে। এই "ঘরো" বিশেষণটি আমি অবশ্য নিন্দার্থে ব্যবহার করিনি। গার্হস্থ্য জীবন যেমন সামাজিক জীবনের মুল, গার্হস্থ্য ভাষাও তেমনি সামাজিক ভাষার মুল। কবিকঙ্কন ছিলেন গ্রাম্য কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে এমন ঢের শব্দ আছে যা সেকালে একমাত্র রাঢ় দেশের পল্লিগ্রামে প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবত একালেও আছে। এই অপরিচিত এবং অবোধ্য শব্দগুলি, ও-কাব্য পাঠের পক্ষে আমাদের অনেকের কাছে একটা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরিজ্ঞাত, এমন কি অশ্রুতপূর্ব্ব অসংখ্য সংস্কৃত শব্দে গৌরবান্বিত বলে, বাঙালী পাঠকের জন্য "মেঘনাদবধ"-এর যেমন সটীক সংস্করণ বার করা হয়েছে, কবিকঙ্কনের "চণ্ডী"রও তেমনি একটি সটীক সংস্করণ বার করা উচিত। "মেঘনাদ বধ" অন্তত, "প্রকৃতিবাদ অভিধান"-এর, না হয়ত "শব্দ-কল্পদ্রুম"-এর সাহায্যে পড়া যায় কিন্তু "চণ্ডী" যে কোন্ অভিধানের সাহায্যে পড়তে হয় তার সন্ধান নিতে হলে "সাহিত্য পরিষদ"-এর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর

নেই। অথচ সে পরিষদে শিলালিপির অভিধান পাওয়া যেতে পারে, বাঙলার পাওয়া যাবে না।

এ কাব্যে যে বাঙলা-ভাষা শেখ্‌বার বিশেষ সাহায্য করে তার কারণ শুধু এ নয় যে, এর ভাষা অকৃত্রিম বাঙলা, এ কাব্যের শব্দ-সম্পদ প্রচুর। পদাবলীর ভাষা অতি সঙ্কীর্ণ, তার সকল কথা জড় কর্‌লেও একমুঠোর বেশি হবে না, কেন না এ সাহিত্যের মুখ্য বিষয় হচ্ছে sex-love, এবং সে বিষয়ও পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ, মান ও পুনর্মিলনে পর্য্যবসিত। একখানি বড় কাব্য লিখ্‌তে হলে কিন্তু বহু বিষয়ের অবতারণা কর্‌তে হয়, সুতরাং বহুশব্দ ব্যবহার কর্‌তে হয়। কবিকঙ্কন সে কালের বাঙালী সমাজের ও বাঙালী জীবনের পট এঁকেছেন,—সুতরাং আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের নানা কথা তাঁকে বল্‌তে হয়েছে। তাই বলে তাঁর কাব্য একমাত্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে আবদ্ধ নয়। পরিবারের বাইরে যে বড় সমাজ রয়েছে, সে সমাজের প্রায় সকল অঙ্গের বর্ণনাই, "চণ্ডী"র ভিতর পাওয়া যায়। চাষবাস, জমিদারী মহাজনী, শিল্প বাণিজ্য, এ সকলের কথাবার্ত্তা ও-কাব্যের মধ্যেত আছেই, কিন্তু তার চাইতে একটি ঢের বড় কথাও আছে,– সে হচ্ছে বাঙালী বণিকের সমুদ্র-যাত্রার কথা। এত ব্যাপারের বিবরণ অবশ্য একমুঠো কথায় দেওয়া যায় না।

যখন সাহিত্যের সাহায্যে ভাষা শিক্ষা কর্‌বার পদ্ধতির সার্থকতা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তখন এ প্রশ্ন সহজেই ওঠে যে, "চণ্ডীর" উপাখ্যান সাহিত্য কি না, আর যদি তা সাহিত্যও হয়, ত তা কাব্য কিনা ?—

আমার মতে ও-গ্রন্থ সাহিত্যও বটে, কাব্যও বটে। কবিকঙ্কন উঁচুদরের কবি না হলেও কবি। এ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও

শব্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, এবং বীণাপাণির গুণগান করতে যাঁর মুখ দিয়ে, "বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি", এই সমস্ত শব্দ বেরিয়েছে, বাণীর কৃপায় তিনি বঞ্চিত নন। কবিকঙ্কনের ভাবের মধ্যে শক্তি নেই কিন্তু স্বাস্থ্য আছে, তাঁর ভাষার গায়ে যেমন রঙ নেই, তেমনি ঢঙও নেই, সে ভাষা সাদা। সে ভাষা শুধু সাদা নয়, সেই সঙ্গে সিধেও বটে। এই সাদাসিধে ভাবটাই কবিকঙ্কনের কাব্যের প্রধান গুণ।

(৭)

নবাবী আমলের শেষ কবি এবং চরম কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে-বস্তুর কণামাত্র নেই সে হচ্ছে সাদাসিধে ভাব। মুকুন্দরাম বাঙলার গ্রাম্য কবি, আর ভারতচন্দ্র নাগরিক। কবিকঙ্কন যেমন সরল, রায় গুণাকর তেমনি চতুর। তাঁর ভাব চতুর, তাঁর ভাষা চতুর, তাঁর ভঙ্গী চতুর। চাতুরীই হচ্ছে তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ। তাঁর বাক্‌চাতুরি অনন্য সাধারণ, কিন্তু তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিতে সদাই ব্যগ্র, তার বাঙলা নাম হচ্ছে চতুরালি।

"বিদ্যাসুন্দর" যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই, এবং থাকতেও পারে না; তার কারণ নিজের এ দোষ সম্বন্ধে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; তাই না তিনি তাঁর অশ্লীলতাকে সাধুভাষার আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেকালে তিনি কাব্য রচনা করেন, সেকালে এদেশে কুরুচিতে বোধহয় সভ্যসমাজের অরুচি ধরে নি। কিন্তু দেখতে পাই যে, কারও কারও মতে ভারতচন্দ্রের এই

রুচি বিকারের কারণ তিনি পার্শীনবিশ ছিলেন। পারসিক সাহিত্য থেকেই নাকি তিনি অশ্লীলতা বঙ্গ-সাহিত্যে আমদানি করেন। এ অনুমান অমূলক কি সমূলক সে কথা আমি বল্‌তে পারিনে, কেননা পার্শী-ভাষা আমি জানিনে, তার এক বর্ণও নয়। আমার বিশ্বাস যাঁরা এ মত প্রচার করছেন, পার্শী-ভাষা তাঁরাও জানেন না, তার এক বর্ণও নয়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমান প্রমাণ অভাবে অসিদ্ধ। তবে এ কথা আমি বল্‌তে বাধ্য যে, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার নজির পার্শী দপ্তরে খুঁজতে যাবার কোনই প্রয়োজন নেই। এ সম্পদ তিনি সংস্কৃত কবিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী স্বত্বে লাভ করেছেন। যে দোষে ভারতচন্দ্র দোষী সে দোষ উত্তর-কুমারে আছে, "শিশুপাল বধে" আছে, "কিরাতার্জ্জুনীয়"তে আছে আর "নৈষধ"-এর অষ্টাদশ সর্গে ত ও-বস্তু তার শেষ সীমায় পোঁচেছে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী কবিরাও কাব্যের এ দোষকে গুণ বলেই যে মনে কর্‌তেন তার প্রমাণ "গীত-গোবিন্দ" ও পদাবলী। ভারতচন্দ্র যে একা চোরদায়ে ধরা পড়েছেন, তার কারণ "বিদ্যাসুন্দর"-এর অদ্যাবধি কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। আর এক কথা, "বিদ্যাসুন্দর"কে কাব্যে স্থানও তিনি প্রথম দেন নি। এ বিষয়ে রামপ্রসাদ তাঁকে পথ দেখান। রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" ও ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর"-এর চাইতে, এক তিল কম অশ্লীল নয়। তবে আজকের দিনে, রামপ্রসাদ যে পরম ধার্ম্মিক ও ভারতচন্দ্র যে চরম ইয়ার-কবি হিসেবে গণ্য তার কারণ, ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্য ছিল, রামপ্রসাদের ছিল না, তাই রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আর ভারত-

চন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" আজও বেঁচে আছে এবং সম্ভবত আরও বহুকাল থাকবে। "গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে। অপর পক্ষে রচনাশক্তির একান্ত অভাবটা রামপ্রসাদের "দোষ হয়ে গুণ হয়েছে"। ইতিহাসের আদালতের এ হেন বিচারকেই বোধ হয় ইংরাজরা বলেন—poetic justice!

কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান দোষ তার স্পষ্ট অশ্লীলতা নয়। "বিদ্যাসুন্দর"কে কাটছাঁট করেও তাকে নিষ্কলুশ করা যায় না। ভারতচন্দ্র বলেছেন :—

—"গিয়েছিনু নাগরীর হাতে
তারা কথায় মনের গাঁঠি কাটে।"

ভারতচন্দ্র এই নাগরীদেরই স্বজাতি। তাঁর কথাতেও মনের গাঁঠ কাটে, কেননা সে কথার মুখে হীরার ধার আছে, এবং সেই সঙ্গে তাদের বাঁকা চাহনিও আছে। তিনি সকল কথা একটু কটাক্ষ করেই বলেন, এবং তাঁর সে কটাক্ষ শুধু মানুষের উপর নয়, দেবদেবীর উপরেও পড়েছে। সমাজ বলো, নীতি বলো, ধর্ম্ম বলো, এ সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর ঠাট্টার সম্পর্ক। যেখানে তিনি মন খুলে হাস্‌তে সাহস করেন নি সেখানে তিনি মুচ্‌কে হেসেছেন। তাঁর সরস্বতীর এই চোরা হাসি, এই চোখ-ঠারা ভাবটাই হয়ত আমাদের মনকে তার প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল হতে দেয় না। গোটা "অন্নদামঙ্গল" অবশ্য সুকুমার মতি বালক বালিকার পাঠ্যপুস্তক নয়, কিন্তু যাদের মন কচিও নয় কাঁচাও নয়, তাঁদের কাছে এক ভাষার গুণেই ভারতচন্দ্রের কাব্য চির-শ্রদ্ধার ও চির-আদরের সামগ্রী।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সম্বন্ধে যেমন দ্বিমত নেই, তাঁর ভাষার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও তেমনি দ্বিমত নেই। কি গুণে এ ভাষা এত চমৎকার, সেই বিষয়ে, কিঞ্চিৎ আলোচনা করায় আমার বিশ্বাস সময়ের বৃথাব্যয় করা হবে না।

(৮)

ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রথম গুণ এই যে, তাঁর ভাষা হচ্ছে বিশুদ্ধ বাঙলা। আমি তাঁর ভাষাকে এই কারণে বিশুদ্ধ বিশেষণে বিশিষ্ট করেছি যে, তা শুধু খাঁটি বাঙলা নয় সেই সঙ্গে শুদ্ধ ভাষা। ভাষা সম্বন্ধে এই শুদ্ধ শব্দটি সাধুবাদীরা যে অর্থে বোঝেন সে অবশ্য তার প্রকৃত অর্থ নয়। "ঘরের কথা"কে "গৃহের শব্দ" যিনি বলে সুখ পান তিনি বলুন, তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই কিন্তু "তদ্ভব"কে "-ৎসম"-এ ফিরিয়ে দেওয়া মাত্র ভাষা যে উল্টো লাফে একদম শুদ্ধ হয়ে ওঠে, এই ভুলটা দেশশুদ্ধ লোক না কর্‌লেই আমরা খুসি থাক্‌ব।

তবে এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, সাহিত্য রচনা কর্‌তে বস্‌লে, মৌখিক ভাষাকে শোধন করে নিতে হয়, কিন্তু রূপান্তরিত কর্‌তে হয় না। যে সকল সাধুরা রূপোকে সোনাতে রূপান্তরিত কর্‌বার কৌশল জানেন, তাঁরা অতি কৌশলী হলেও যে সাধু নন, এ সত্যের পরিচয় ত আমরা পুলিশ কোর্টেও পাই। তবে শোধন ক্রিয়ার ফলে ভাষা যখন নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনই সে ভাষা শুদ্ধ হয়। কবিকঙ্কনের ভাষার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ভাষার তুলনা কর্‌লেই এই শুদ্ধতা কি বস্তু, তা সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পার্‌বেন। কবিকঙ্কনের ভাষার অনেক

গ্রাম্য শব্দ, ও প্রাদেশিক শব্দ, অনেক শ্রুতিকটু শব্দ ও অসঙ্গত শব্দ বাদ দিয়ে, এক কথায় সে ভাষার গাদ কেটে নিয়ে, ভারতচন্দ্র তাঁর পরিষ্কার ও টলটলে ভাষা লাভ করেছেন। হাতের লেখার সৌন্দর্য্য যেমন অক্ষরের সরলতা, বিরলতা, সমতা ও সমশীর্ষতার উপর নির্ভর করে, রচনার সৌন্দর্য্যের তেমনি শব্দের সরলতা, বিরলতা, সমতা ও সমশীর্ষতার উপর নির্ভর করে। ভারতচন্দ্রের হাতে পড়ে বাঙলা-ভাষা ছাপার অক্ষরে পরিণত হয়েছে। ছাপার অক্ষরের সঙ্গে ছোট বড় অক্ষরের জড়ানো হাতের লেখার যে প্রভেদ, ভারতচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে কবিকঙ্কনের ভাষার সেই প্রভেদ। "চণ্ডী"র ভাষা খাঁটি বাঙলা কিন্তু সেই বাঙলা "অন্নদামঙ্গল"-এ তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

(৯)

তোমরা সবাই জানো যে, ভাষার মূল উপাদান পদ নয় বাক্য, word নয় sentence, এবং জীবের যেমন দেহের গঠন ভেদেই তার জাতিভেদ হয়, ভাষারও তেমনি বাক্যের গঠন ভেদই তার জাতি-ভেদের কারণ। ভাষার জাতরক্ষা করার অর্থ হচ্ছে তার গঠন সাব্যস্ত রাখা। আজকাল আমরা বিজ্ঞানের প্রসাদে ভাষাকেও এক শ্রেণীর জীব বল্‌তে শিখেছি, কেননা হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক বিষয়ে দেহীর সঙ্গে, আপাতদৃষ্টিতে ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে; জীবের মত ভাষারও একটা ইভলিউসান আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা আমাকে মাপ কর্‌বেন, এই জীবধর্ম্ম ভাষার উপর আরোপিত হয়েছে—ও ধর্ম্ম তার প্রকৃতিগত নয়। সাদৃশ্য ও সাম্য যে এক বস্তু নয়, এ জ্ঞান সকল বৈজ্ঞানিকের থাক্‌লে, তাঁরা জড়ের ধর্ম্ম

জীবে এবং প্রাণের ধর্ম্ম মনে আবিষ্কার কর্‌তেন না এবং তাঁদের হাতে পাকা বিজ্ঞান কাঁচা দর্শন হয়ে পড়্‌ত না। জীবদেহের গঠন ও ক্রমপরিবর্ত্তন হয় নৈসর্গিক নিয়মে, কিন্তু ভাষা গড়ে মানুষে; সুতরাং মানুষে ইচ্ছামত তার গঠনও পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে, সে পরিবর্ত্তনের ফলে তার রূপ কখনও বা খুলে যায় কখনও বা ঢাকা পড়ে, কিন্তু তাতে তার প্রাণ নষ্ট হয় না।

ইংরাজরা বলেন, "তাঁরা খান ভাত", আমরা বলি "আমরা ভাত খাই"। অর্থাৎ আমাদের কর্ম্মটা আসে আগে আর ক্রিয়াটা পড়ে শেষে। অপর পক্ষে ইংরাজদের ক্রিয়া আসে আগে আর কর্ম্ম তাকে অনুসরণ করে। এদেশের জনৈক নামজাদা পেট্রিয়ট এই ক্রিয়াকর্ম্মের পূর্ব্ব পশ্চাৎ ব্যবস্থা থেকে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য জাতির মন ও চরিত্রের অবস্থা নির্ণয় কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। ঐ বাক্যের গঠনের প্রভেদ থেকে তিনি ইংরাজ ও বাঙালীর মনের গঠনেরও ভেদ আবিষ্কার করে-ছিলেন। তিনি বলেন ভাতকে যখন আমরা অগ্রগণ্য করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই বেশি Spiritual, আর ইংরাজরা যখন খাওয়াটাকে অগ্রগণ্য করে, তখন তারা নিশ্চয়ই বেশি materialistic. আহার যে matter, এ জ্ঞান আমার ছিল না। আমি ও-ব্যাপারকে এক রকম ক্রিয়া অর্থাৎ motion বলেই জান্‌তুম ও সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করি যে, ভাত বস্তুটী যে Spirit সে জ্ঞানও আমার ছিল না। তবে এ কথা অবশ্য জান্‌তুম যে ভাত থেকে একরকম spirit জন্মায় ভাষায় যাকে বলে "ধেনো"। এ জাতীয় spirit যে আমাদের দেশের চাইতে ইউরোপে লক্ষ গুণে বেশি আছে, সে কথাও অস্বীকার কর্‌বার যো নেই। সে যাইহোক, আমার বক্তব্য এই

যে, বাক্যের গঠন, জীবদেহের গঠনের, অনুরূপ হলেও এক জাতীয় নয়। আমরা জীব নামক অবয়বীর এক অবয়বের স্থানে, আর এক অবয়বের সংস্থান করতে পারি নে, কিন্তু "আমি ভাত খাই" না বলে "আমি খাই ভাত" অনায়াসে বলতে পারি, এবং আবশ্যক হলে বলেও থাকি। স্থল বিশেষে গঠনের এ হেন বিপর্য্যয়ে বাক্যের যে তেজবৃদ্ধি হয় তার একটি চলতি উদাহরণ দেওয়া যাক্। "আমি খাই ঘাটে জল, তুমি খাও ভাঁড়ে"—এ বচন প্রসিদ্ধ। এ কথা বল্‌লে বঙ্গ-সরস্বতীর জাত মারতে একমাত্র তাঁরাই উদ্যত হবেন, যারা ভাষার তোলা জল ব্যাকরণের ভাঁড়ে খান। এত কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, রচনায় স্বভাষার গঠন বজায় রাখ্‌বার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, সে গঠন পরিবর্ত্তণ করাতে লেখকেরা জীবহত্যার পাপে লিপ্ত হন না। তবে ভাষার মৌখিক গঠন লেখায় যতদূর সম্ভব রক্ষা করবার সার্থকতা এই যে, তাতে করে রচনা প্রথমত দুর্ব্বোধ হয় না, দ্বিতীয়ত তা শ্রুতিকটু হয় না। ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মন ও কান দুই-ই যে ধরণের বাক্য শোনায় চিরদিন অভ্যস্ত, যতদূর সম্ভব রচনায় সেই ধরণের বাক্যই ব্যবহার করা শ্রেয়। ভাষা জিনিষটে বক্তার একলার সম্পত্তি নয়, শ্রোতাও তার অংশীদার। শ্রোতা ও বক্তা এ দু'য়ের দু' হাত না মিল্‌লে তাতে ভাষার তালি বাজে না। তা ছাড়া লেখকদের পক্ষে, লেখার চাল মুখের চালের অনুরূপ করাই নিরাপদ। ডিগবাজি খেতে গিয়ে লোকে সাহিত্যক্ষেত্রেও চিৎপাৎ হয়।

একজাতীয় সকল জীবের গঠন এক হলেও সকলের গড়ন এক নয়, কারও গড়ন সুন্দর কারও বা কুৎসিৎ, আবার কারও বা না-এদিক না-ওদিক। ভাষার মূল গঠন এক হলেও প্রতি লেখকের লেখার গড়ন

এক নয়। কোন রচনার গড়ন সুন্দর, কোনটির বা কুৎসিৎ আবার কোনটির বা চোখে পড়্‌বার মত দোষ গুণ কিছুই নেই।

ভাষার গড়নের সৌন্দর্য্য অবশ্য তার রচনার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে শব্দের বন্ধন, তাদের পরস্পারের সঙ্গতি, সুষমা ও ঐক্যের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অতুল। প্রাচীন লেখকদের মধ্যে কেউ বাঙলা-ভাষাকে তাঁর তুল্য সুন্দর ও সুঠাম গড়ন দিতে পারেন নি। এই আর এক কারণ যার জন্যে নির্ভয়ে বলা যায় যে, বাঙলা-ভাষার প্রকৃতি ভারতচন্দ্রের হাতে প্রকৃত হয়ে উঠেছে। যাকে আমরা ভাষার গঠন বলি, সে হচ্ছে তার মোটা গড়ন, তার অন্তরে ঢের জড়তা ঢের আড়ষ্টতা আছে। ভারতচান্দ্রর লেখনীর স্পর্শে সে ভাষার হাত-পায়ের খিল খুলে গিয়েছে, তার গতি পূর্ণমাত্রায় স্বচ্ছন্দ হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রতিভার বলে বাঙলা-ভাষার matter শুদ্ধ হয়েছে, তার motion মুক্ত হয়েছে, এক কথায় সে ভাষা তার স্বরূপ লাভ করেছে।

(১০)

যাঁদের করস্পর্শে ভাষা তার স্বরূপ লাভ করে, তাঁদেরই আমরা আর্টিষ্ট বলি। এবং এই সূত্রেই, আমরা ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান নয়, একমাত্র আর্টিষ্ট বলি। কিন্তু এ কথা বলায় যে কি বলি, সে বিষয়ে আমাদের যে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা আছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সাহিত্যরাজ্যে আর্ট শব্দের পরিষ্কার অর্থ আমাদের যদি জানা থাকৃত, তাহলে কে কবি আর কে

আর্টিষ্ট, এ নিয়ে পরস্পরের এত মতভেদ হত না। আমরা বলি, যাঁর ভাবের ঐশ্বর্য্য বেশি তিনি কবি, আর যাঁর ভাষার সৌন্দর্য্য বেশি তিনি আর্টিষ্ট। এ উক্তি কিন্তু সন্তোষজনক নয়। যাঁর ভাব আছে, কিন্তু ভাষা নেই, এমন ব্যক্তি কবি হতে পারেন না, আর যাঁর ভাষা আছে অথচ ভাব নেই, এমন ব্যক্তিও আর্টিষ্ট হতে পারেন না। মন নামক পদার্থ এবং সেই মনকে প্রকাশ করবার সামর্থ্য, এই দুয়ের গাঢ় মিলন না হলে, সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। তারপর মনের ভাবেরও যেমন অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে, ভাষার রূপেরও তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে, শুধু তাই নয়, বিশেষ বিশেষ ভাবের আবার বিশেষ বিশেষ রূপ আছে।

যে কবি কাব্যে আত্ম-প্রকাশ করেন, অর্থাৎ যে কবি subjective তাঁর ভাষা এক ধাঁচের, আর যে কবি বাহ্যবস্তু নিয়ে কারবার করেন, (অপর লোকও সব বাহ্যবস্তুরও অন্তর্ভূত),— অর্থাৎ যে কবি objective, তাঁর ভাষা আর এক ধাঁচের। এঁদের একজন রচনা করেন গীতি-কাব্য আরেকজন কথা-কাব্য। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর কবির আর্টও স্বতন্ত্র।

এই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করা যাক। গায়ক-কবির আর্ট সঙ্গীতের কোঠায় পড়ে। আর কথক-কবির আর্ট হচ্ছে, মূর্ত্তি গড়বার আর্ট, তাই কথক-কবিদের আর্ট, ইংরাজিতে যাকে বলে plastic art, তারই কোঠায় পড়ে। এ জাতীয় কবিরা কাব্যের গড়নের উপরই বেশি ঝোঁক দেন। এ হিসেবে অবশ্য তাঁদের আর্টিষ্ট এবং অন্যদের কবি বলা যেতে পারে। এবং এই হিসেবেই ইংরাজ কবিরা বড় কবি, আর ফরাসী কবিরা বড় আর্টিষ্ট, এবং এই হিসাবেই, ভারতচন্দ্র অপেক্ষা চণ্ডিদাস বড় কবি, আর ভারতচন্দ্র চণ্ডিদাসের চাইতে বড় আর্টিষ্ট। এ দুয়ের ভিতর আর একটি প্রকাণ্ড প্রভেদ

আছে। Lyric কবিতার ধর্ম্ম গদ্যের ভিতর আনা যায় না। এ ক্ষেত্রে একের ধর্ম্ম অপরে আরোপ কর্‌বার চেষ্টা যে কেবল বৃথা তা নয়, বিপজ্জনকও বটে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের আর্টের গদ্যেও স্থান আছে, কেন না এ কাব্যের মুখ্য বস্তু হচ্ছে কথা, আর তার ভাষা গদ্য-ঘেঁসা।

আর এক কথা। এ আর্ট কতক পরিমাণে শেখাও যায়, শেখানোও যায়, লিরিকের আর্ট কিন্তু প্রতি কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মত কবির রসনা, "মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে"। এ আর্টের উপাদানও আমাদের হাতে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। কোনও কোনও রাগিণীতে মধ্যমের বদলে কড়িমধ্যম লাগালে তার শ্রী কেন ফিরে যায়, এবং কোন কোনও রাগিণীতে কোমল রেখাবের বদলে শুদ্ধ রেখাব লাগালে তার স্বর কেন আরও কোমল হয়ে আসে, তার কারণ কি কেউ নির্দ্দেশ কর্‌তে পারেন? এ ক্ষেত্রে মানুষের instinct-ই হচ্ছে যথার্থ আর্টিষ্ট, এবং গান রচনায় রচয়িতার কানই হচ্ছে আসল গুণী। যাঁর কান ও মন একই বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ নয়, তার হাতে আর যে কবিতাই হোক লিরিক জন্মলাভ করে না। কথক-কবিদের আর্টের সন্ধান আমরা কতকটা জানি, কি কি গুণে তাঁদের লেখা আর্ট হয়েছে তা আমরা ধর্‌তে পারি। বস্তুর মত ভাষারও গড়ন অবশ্য তার উপাদান সাপেক্ষ। সঙ্গীতের উপাদান ত হাওয়া কিন্তু মূর্ত্তি গড়্‌বার জন্য স্থূল পদার্থ চাই। রাগ-রাগিণী অশরীরী, ও মূর্ত্তি-শরীরী। দুয়ের ভিতর এই মূল প্রভেদ, এবং এ প্রভেদ যথার্থই আসমান জমিন প্রভেদ।

পাষাণের মূর্ত্তির গড়ন যতটা পরিচ্ছন্ন হয়, মাটির মূর্ত্তির তা হয় না, তারপর যে-সে মাটিতে মূর্ত্তি গড়া যায় না, তার জন্য চাই এটেল মাটি

অর্থাৎ গড়নের জন্য, উপাদানের কাঠিন্য হচ্ছে তার একটি মহাগুণ। বাঙলা-ভাষার একটি মহাদোষ এই যে তা বাঙলার মাটির মত কতকটা জলো ও এলো। এ ভাষাকে ইচ্ছে কর্‌লে নমনীয় কমনীয়, প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বিশেষণে অভিহিত কর্‌তে পারো, কিন্তু তাতে তার প্রকৃতি সমানই থেকে যাবে। এই নরম ভাষাকে বৈষ্ণব কবিগণ, আরও নরম করে নিয়ে এসেছেন, যা স্বভাবতই কোমল তাকে অতি কোমল করে এনেছেন। বৈষ্ণব কবিরা "খানি", "টুকু" প্রভৃতি উপসর্গের অতিপ্রয়োগে বাঙলাকে একটি আদুরে ভাষা করে তুলেছেন। যে ভাষার "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনি বহিয়া যায়" সে গড়ানো ভাষার কোনও গড়ন দেওয়া যায় না, কিন্তু তাতে গান গাওয়া যায়। যে ভাষায় "রামায়ণ" "মহাভারত" "চণ্ডী" প্রভৃতি লেখা হয়েছে, সে ভাষা কিন্তু তরল হলেও অতিতরল নয়, পারার মত তা তরল পদার্থ হলেও স্থূলপদার্থের কোঠাতেই গিয়ে পড়ে। এই ভাষাই হচ্ছে ভারতচন্দ্রের কাব্যের মূল উপাদান। শুন্‌তে পাই সন্ন্যাসীরা পারার শিব গড়িয়ে পূজো করেন। ভারতচন্দ্রও এঁদের মত পারা জমাবার সন্ধান জান্‌তেন। এর জন্য বাঙলা-ভাষার সঙ্গে তাঁকে কতক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের খাদ্‌ মেশাতে হয়েছে, কিন্তু সে খাদ এত উচিতমাত্রায় এত বেমালুম করে মেশান হয়েছে যে, তাঁর ভাষার অন্তরে কি বাহিরে, কোনরূপ ধাতুবৈষম্য ঘটে নি। তাঁর কাব্যে বাঙলা ভাষার সুর পুরো বজায় আছে। তাঁর বীণার মূল-তার হচ্ছে বাঙলা, সংস্কৃত ও ফার্সির তরফের তার চড়ানোতে সে বীণার সুরের সুধু বেশি খোল্‌তাই হয়েছে। আনাড়ীর হাতে এই বাঙলা সংস্কৃতের সংযোগে ভাষা যে কতদূর উৎকট হয়ে উঠ্‌তে পারে তার প্রমাণ রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর"-এ দেখ্‌তে পাবে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের সুরের অবশ্য কোনও গাম্ভীর্য্য নেই, তার কারণ তাঁর কাব্যের বিষয়েরও কোনরূপ গাম্ভীর্য্য নেই। তাঁর ভাষা তাঁর ভাবের মতই হাল্কা, এত হাল্কা যে সময়ে সময়ে তা ছিবলেমির কাছ ঘেঁসে যায়, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তার বিশিষ্টতা নষ্ট হয় না, তা ইতর হয়ে পড়ে না। তাঁর ভাষা ফুর্‌ফুরে কিন্তু জ্যালজেলে নয়, ঝর্‌ঝরে ; কিন্তু খট্‌খটে নয়। এটা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে ভারতচন্দ্র গৎ-তোড়ায় তাঁর হাত তৈরি করেছিলেন, রাগের সাধনা তিনি কখনো করেন নি। ইচ্ছে কর্‌লে তিনি যে আলাপেও সিদ্ধ হস্ত হতে পার্‌তেন, তার ইঙ্গিত তার কাব্যের ভিতরই পাওয়া যায়। সে যাই হোক্ বাঙলা ভাষার সুর ও ছন্দের গুণের পরিচয় নিতে হলে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ভারতচন্দ্র ছাড়া আর দ্বিতীয় গুণী নেই, যার শরণ আমরা গ্রহণ কর্‌তে পারি।

এ প্রবন্ধ শেষ কর্‌বার আগে আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে রামপ্রসাদের গান ক'টি বাঙলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। এ গানের ভাষা ভাব, সুর সবই হচ্ছে খাঁটি বাঙলা। এর ভাষার ভিতর ব্রজবুলির ভেজাল নেই, এর ভাবের অন্তরে বৃন্দাবনের প্রভাব নেই, এর সুরের গায়ে হিন্দুস্থানী ঢঙ নেই ; অথচ গান হিসেবে ভাবে ও ভাষায় এর তুল্য অকৃত্রিম ও অকপট ও জোরালো-সাহিত্য প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে আর নেই। রামপ্রসাদের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এ সাহিত্য আগাগোড়া মর্দ্দানা—এ গুণ বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ।

ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" প্রকাশিত হবার পর রামপ্রসাদের জ্ঞান হল যে, ও-শ্রেণীর কাব্য রচনা করা তাঁর কর্ম্ম নয়। এই সুবুদ্ধি

হওয়াতে তিনি, একসঙ্গে কথা-কাব্য ও সংস্কৃত-ভাষা এ-দুয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের মনের কথা, নিজের মুখের কথায় বল্‌তে কৃতসংকল্প হলেন। ফলে বাঙালীর চির আদরের ধন রামপ্রসাদের "গান" জন্ম-লাভ করলে।

"বিদ্যাসুন্দর"-এর রচনা শেষ হবার পর, ভারতচন্দ্রেরও যদি এরূপ সুমতি হত, তাহলে আমার বিশ্বাস তিনি বাঙলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে কতকগুলি অমূল্য লিরিক রেখে যেতে পার্‌তেন। যাঁর হাত থেকে "ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে, অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে"—এই গান বেরিয়েছে তাঁর লিরিকে গড়ন ও দরদ দু'-ই সমান থাক্‌ত। যে "বিদ্যাসুন্দর" লেখে তারও যে আত্মা থাকতে পারে, তার প্রমাণ ত স্বয়ং রামপ্রসাদই রয়েছেন। "অন্নদামঙ্গল"-এরও সাক্ষাৎ সহজে মিল্‌বে না, ও-গ্রন্থেরও আবিষ্কার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তারপর বাজার হাঁট্‌কে যা পাওয়া যাবে, তার কাগজ খারাপ, ছাপা খারাপ, বানান ভুল ও পাঠ-অশুদ্ধ। সে কালের যে-বই একালেও পাঠ্য তার বাইরের চেহারা যে সুন্দর হওয়া উচিত, এ জ্ঞান আমাদের আজও হয় নি। ইংরাজিতে যাকে বলে classics, তার আদর আমাদের কাছে যে নেই, তার পরিচয় তার চেহারা থেকেই পাওয়া যায়।

শুধু ছাপার রূপে অবশ্য classics-এর ভাল সংস্করণ হয় না। টীকা ভাষ্যের গুণেই তার আসল মর্য্যাদা। আমাদের পক্ষে টীকার সাহায্য বিনা "অন্নদামঙ্গল"-এর আদ্যোপান্ত মর্ম্ম উদ্ধার করা কঠিন। প্রথমত ও-কাব্যে বহু ফার্সি ও আরবি শব্দ আছে যার অর্থ এ যুগের বাঙালী ভুলে গিয়েছে। তারপর ভারতচন্দ্র বহু ঐতিহাসিক ঘটনার

উল্লেখ করেছেন, যার সত্যাসত্যের বিচার সাধারণ পাঠকের পক্ষে করা অসম্ভব। সুতরাং এ-কাব্যে টীকাকারের বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগের যথেষ্ট অবসর আছে। শুন্‌তে পাই, একখানি সটীক "অন্নদামঙ্গল" ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে টীকা যে কতদূর নির্ভরযোগ্য দুটি একটি কথার ব্যাখ্যা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও একটি বন্ধুর মুখে শুনেছি যে টীকাকার "কজল্‌বাস" শব্দের অর্থ করেছেন "কজ্জলবাস" অর্থাৎ যে কাজলের মত কালো কাপড় পরে। "কজল্‌বাস" অবশ্য সংস্কৃত নয় "যাবনী" শব্দ এবং ও-হচ্ছে একটি বিশেষ পাঠান জাতির নাম। তারপর টীকাকার "আলেমান" শব্দের অর্থ করেছেন "আক্কেলমান। "আলেমান" শব্দ অবশ্য ফার্সি নয় ফরাসী এবং ও হচ্ছে একটি বিশেষ ইউরোপীয় জাতির নাম, ইংরাজিতে যাদের বলে "জর্ম্মাণ"। "আলেমান" যে "আক্কেলমান" নয়, তার পরিচয় ত আজ পৃথিবীশুদ্ধ লোক পেয়েছে!

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের চর্চ্চা থেকে তোমরা এই জ্ঞান লাভ করবে যে, বাঙলা-ভাষার মূল উপাদান এমন পদার্থ, যার সাহায্যে সাহিত্যের যা চরম বস্তু অর্থাৎ গীতিকাব্য ও কথাকাব্য—সে দুই সমান গড়া যায়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

একখানি ছোট্ট উপন্যাস।

—:০:—

নামটি হল তার বিজলী। কিন্তু বিধাতা তার যে দেহখানি গড়েছিলেন, তাতে বিদ্যুতের আভা আদৌ ছিল না। বরং সে অঙ্গে মিলিয়ে ছিল নিবিড় মেঘেরই তিমির ছায়া।

বিজলী ছিল একটি মুন্‌সেফের মেয়ে। মুন্‌সেফবাবুর দু'টি পক্ষ, প্রথমটি হল তাঁর কৃষ্ণপক্ষ, আর দ্বিতীয়টি শুক্লপক্ষ। মুন্‌সেফবাবুর বাপ কৌলীন্য বস্তুটিকে বড়ই সমিহ করতেন। তিনি যখন পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলেন, ভাবী পুত্র-বধূর রূপে তখনও তাঁর লক্ষ ভ্রষ্ট হয় নি। সে দিনও ক'নের বাপের কুলটা ছিল তাঁর বড়ই একটি আকর্ষণের বস্তু। আর মুন্‌সেফবাবু ছিলেন পিতৃ-ভক্ত সন্তান, তিনি পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে একটি কালো মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু যখন কালের একটি ক্ষুব্ধতরঙ্গ তাঁর বাপকে চোখের সুমুখ থেকে অনন্ত কোটি যোজন দূরে এক অজানা দেশে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, মুন্‌সেফবাবু তখন তাঁর পিতার ভ্রমটি সংশোধন করে নিতে আর কিছুমাত্র কালক্ষেপ করলেন না। তাঁর অন্তর-পুরুষটি এতদিন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে হাঁপিয়ে মরছিল। এবার যেন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাতে তাঁর ধড়ে নবীন প্রাণ ও নব-রসের সঞ্চার হল।

কৃষ্ণপক্ষ যে বিজলীকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেটা তার দেহের কৃষ্ণবর্ণেই ধরা পড়বার কথা। গোড়াতেই বৃহস্পতি হয়তো প্রতি-কূলে দাঁড়িয়েছিল; নতুবা বিজলীর এমন দুর্ভাগ্য যে, মুন্‌সেফবাবুর বড় গিন্নি, উমাতারা হল তার গর্ভধারিণী। বড় গিন্নির প্রতি মুন্‌সেফবাবুর যে কতটা অনুরাগ ছিল, এই একটি ঘটনা তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবে,—বড় বৌয়ের উমাতারা নামটি যেমন তেমনিই রয়ে গেছল। আর যদিচ মুন্‌সেফবাবু পৌরাণিক বিধি-বিধানের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখ্‌তেন, তাঁর ছোট বৌয়ের যোগমায়া নামটির পৌরাণিকত্ব কোন্ কালে ঘুচে গেছল। আদরের অত্যধিক চাপে সে নামটি ভেঙ্গে-চুরে নানা ঢংএ, নূতন নূতন ছাঁদে গড়ে উঠেছিল। কত রকম অভিব্যক্তি তার ঘটেছিল, যথা—মায়া, মায়ারাণী, রাণী ইত্যাদি।

জন্ম থেকেই বিজলী যে পাপের বোঝা বয়ে এনেছিল, তার গুরু-ভার আরো বাড়াবার জন্য গ্রহগণ হয়তো কুপিত হয়ে তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করেছিল। বিজলীর পিঠ পিঠ আরো দু'টি কন্যা-সন্তান যেন কোন গৃহ-দেবতার অভিশাপের মতোই এসে উমাতারার কোলটি জুড়ে নিয়েছিল। আর মায়ারাণী পূর্ব্বজন্মে যে সতী সাধ্বী রমণী ছিল, এইটে যেন প্রতিপন্ন করে তার আর জন্মের পুণ্যের জের, এজন্মে তার মাণিক-জোড়, দু'টি পুত্র-সন্তানে এসে ঠেকেছিল।

বড়গিন্নির বড় মেয়ে বিজলী যখন যৌবনের প্রথম ধাপে পা দেবে দেবে এমন হল, মুন্‌সেফবাবু ত ভেবে সারা হতে লাগ্‌লেন। মেয়ের প্রতি মুন্‌সেফবাবুর যে একান্ত প্রাণের দরদ ছিল, এটা অনুমান করবার বড় বেশি সঙ্গত হেতু অবশ্য ছিল না। কিন্তু মুন্‌সেফবাবুর মান-মর্য্যাদার ত একটা দাবী ছিল। একজন মুন্‌সেফ হয়ে তিনি ত পথের একটি

ভিখারী ধরে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না! কোন সৎ-পাত্রে যদি তিনি কন্যাকে সম্প্রদান না করেন, লোকে তবে বল্‌বে কি? এইরূপ নানা কারণে মুন্‌সেফবাবুর কালো মেয়েটি তাঁর বিষম একটি গলগ্রহ হয়েই উঠ্‌ল। বিজলীর রূপের আকর্ষণ ত আদৌ ছিল না। তারপর যথেষ্ট টাকা ছড়িয়ে বর-পক্ষকে যে প্রলুব্ধ কর্‌বেন, মুন্‌সেফ-বাবু তাতেও ছিলেন নারাজ।

উমাতারা কতকগুলো মেয়ে প্রসব করে মুন্‌সেফবাবুর সুখ শান্তি হরণ করে তাঁকে বড়ই যে ভাবিয়ে তুলেছিল, এইটে উপলক্ষ্য করে মায়ারাণী বড়গিন্নিকে খোঁচা মার্‌তে কসুর কর্‌ত না। উমাতারার মুখে অবশ্য কোন জবাব ছিল না। সে বরং তার মেয়েদেরই গালিগালাজ কর্‌ত,—ছাইকপালী, অাভাগী, পোড়ামুখী, তোরা আমার কাল হয়ে জন্মেছিস, তোদের জন্যই আমাকে বুকে নোড়ার ঘা মেরে আত্মহত্যা কর্‌তে হবে, ইত্যাদি। আর বিজলীর মনের ভিতর তখন যে কি রকম হত, সেটা বলা বড় শক্ত। সে থাক্‌ত চুপ্ করে। হয়তো তার প্রাণের বেদনা এমনভাবেই জমাট বেঁধে গেছল যে, কোন কথাটি আর বেরোবার পথ পাচ্ছিল না।

অমনতর বিপদের দিনে যেন একটি দেবতা এলেন, তাদের শাপ মুক্ত কর্‌তে। কুমারীশের জ্যেষ্ঠ সহোদর তখন যশোহরের একজন সব্-ডেপুটী কালেক্টর। একটি বড় বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে বাস কর্‌তেন, আর তার অপর অংশের ভাড়াটে ছিলেন মুন্‌সেফবাবু। কুমারীশ এম্, এ, পরীক্ষা দিয়ে কিছু দিনের জন্য যশোহরে এসে তার দাদার বাসাতে ছিল।

কুমারী স্নেহলতা এর কিছুদিন পূর্ব্বেই সনাতন হিন্দু-সমাজের

অটল প্রথার কঠিন নাগপাশে আত্ম-বলিদান দেয়। আর সেইটে উপলক্ষ্য করে দেশে তখন ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। যুবকদের প্রাণে একটি কর্ত্তব্য বোধ জাগিয়ে তোল্‌বার জন্য দেশের বক্তারা তাঁদের গলার আওয়াজ একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে আকাশের বুক বিদীর্ণ কর্‌ছিলেন ; আর কাগজের সম্পাদক মহাশয়রা তাঁদের কলমের ডগাতে যেন ভাবের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন। কুমারীশ আশৈশব কর্ত্তব্য পালনেই রত ছিল। পাঠশালার গুরুমহাশয়, ইস্কুলের শিক্ষক এবং কলেজের অধ্যাপক থেকে সুরু করে, যেখানে যার কাছে তার যতটুকু কর্ত্তব্য, সেটা ষোল আনা চুকিয়ে দেওয়াই তার জীবনের ছিল চরম লক্ষ্য। এহেন কর্ত্তব্যপরায়ণ কুমারীশের অন্তরে, সেই আন্দোলনের দিনেও কর্ত্তব্যের একটি সুমহান মূর্ত্তি দেখা দিয়েছিল, যার পুজো জোগাতে কুমারীশের সমগ্র মন সর্ব্বতোভাবেই প্রস্তুত ছিল। একটি উপলক্ষ্যও এবার জুটল।

কুমারীশ বাড়ীতে গিয়ে বৌদিদিকে চিঠি লিখ্‌লে, বিজলীকে সে বিয়ে কর্‌বে। এতে যদিচ সকলেই কিছু বিস্মিত হলেন, কোনরূপ আপত্তি করবারও কোন হেতু কারুর ছিল না। মুন্‌সেফ্‌বাবু আর সব্‌-ডেপুটী বাবু উভয়েই জাতিতে ছিলেন কায়স্থ, এবং একই শ্রেণীর। আর দুটি ঘরও ছিল প্রায় সমতুল্য। যদি কুমারীশের মা জীবিত থাক্‌তেন, তিনি হয়তো তাঁর অমন পাশ-করা ছেলেকে একটি কালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে নারাজ হতেন ; কিন্তু কুমারীশের মাও বেঁচে ছিলেন না।

একদিন এক শুভক্ষণে মুন্‌সেফবাবু কুমারীশের হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌লেন। বিজলীর এ সৌভাগ্যকে বাঙালী-ঘরের তরুণী-

মাত্রই হয়তো ঈর্ষ্যা করবেন। কিন্তু তার মনের খবরটা তাঁরা যদি একবার পান, তাহলে তাঁদের মনোভাবের হয়তো বিপর্য্যয় ঘটবে। ভাগ্যদেবতার যে দান আর দশজনে হয়তো তা পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে গ্রহণ করতেন, কিন্তু বিজলীর হাতে তার মর্য্যাদা যেন কতকটা ক্ষুণ্ণই হয়েছিল।

প্রথম পরিচয়েই বিজলী বুঝ্‌ল, কুমারীশ যে আপনা হতে সেধে এসে তাকে তার জীবনের সঙ্গিনী করে নিয়েছে, প্রাণের দরদই এর মূল কারণ নয়।

কুমারীশের ভিতরের প্রাণটি শুকিয়ে কর্ত্তব্যের কঠিন-মূর্ত্তিই ধারণ করেছিল। নানা প্রসঙ্গে কুমারীশও এই কথাটিই বিজলীকে জানিয়ে দিল। অপ্সরীতুল্য কত সুন্দরী নারী তার মতো একটি সৎপাত্রের শ্রীকরকমলে সমর্পিত হলে আপনাদের জীবন ধন্য জ্ঞান কর্‌ত; কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে না পেরে, সে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়েছে। এমন দেবতুল্য যে স্বামী, দ্বৈতবাদীর পূজোর দেবতার মতো সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়িয়ে তাকে পূজো করাই বেশ চলে; অদ্বৈতবাদীর জীবন-দেবতা হয়ে সে প্রাণের প্রীতিভরা শতদলটির উপর ভ্রমরের মতো এসে এক দণ্ডও বসে না। বিজলী তার পূজোর দেবতাকে পেল, কিন্তু প্রাণটি তার অনাদরেই পড়ে রইল। বিজলীর অন্তরের প্রতি অণু-পরমাণুকে স্পন্দিত করে রয়েছিল তার যে প্রাণের বেগ, সে যদি একটি প্রাণের পথ খোলা পেত, সৌদামিনীর মতো তা আলোক দানেই হয়তো নিঃশেষ হত; কিন্তু বদ্ধতার অন্তরে নিবিড় মেঘের স্তব্ধনীড়ে, ঝড়ের একটি প্রচণ্ড বেগের মতোই যেন তা লীন হয়ে রইল।

বিবাহের পর বহুদিন বিজলী তার স্বামীর পল্লি-ভবনেই বাস করেছিল। সে বাড়ীতে থাক্‌তেন কুমারীশের একটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা— তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে। বিজলীর হল তখন নদীর অবস্থা। নদী ধায় আপনার প্রেমাস্পদের উদ্দেশে। যদি তার উদ্দাম গতিবেগ প্রতিহত হয়, নদী তখন আপনার প্রাণের আবেগে দু'ধারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনদীগুলোকেই ভরে তোলে। বিজলী তার বড় জায়ের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে এম্‌নি আবেগের সঙ্গে ভালবাস্‌তে লাগ্‌ল, যেন তার ঐ ভালবাসাতেই আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে, সে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাক্‌তে চায়। গৃহকর্ম্মে যে বিজলীর মন না ছিল, তা নয়; কিন্তু যার জীবনের মুখ্য ধারাই হল প্রাণের প্রেমের ধারা, সংসারের খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয়গুলোর স্বার্থের বন্ধনে প্রাণটি তার কোনকালে কি বাঁধা পড়বে? গৃহকর্ম্মে বিজলীর যেটুকু আগ্রহ ছিল, তার চাইতে ঢের বেশি উৎসাহে বিজলী তার ভাশুর-কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীর খেলাঘরের কাজকর্ম্ম কর্‌ত। আট বছরের বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী তার নতুন খুড়িমাকে বেশ একজন খেলার সঙ্গিনী পেয়েছিল।

জ্যোতিকে বিজলী বড় বেশি ভাল বাস্‌ত। একদণ্ড তাকে সে চোখের আড়াল হতে দিত না। আর জ্যোতিও খুড়িমার ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছিল। মেয়েটি যেন ছিল প্রাণেরই একটা ঢেউ। একদণ্ড সে স্থির হয়ে বস্‌তে পারত না। একমুহূর্ত্তও তার মুখটি বন্ধ থাকত না। একটি তরঙ্গের মতই জ্যোতি সদাসর্ব্বদা খল্‌খল্‌ করে নেচে-কুঁদে বেড়াত। হাত নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, মুখের প্রতি শব্দটিকে র উচ্ছ্বাসে ভরে তুলে জ্যোতি যখন কথা

কইত, বিজলী একেবারে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌ত। কখন বা ছুটে গিয়ে জ্যোতিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বিজলী আবেগ-ভরে তার চোখে-মুখে চুম্বন বর্ষণ করত। আবার থেকে থেকে এক একদিন বিজলীর ভিতর প্রাণের জোয়ার এমন প্রবল হয়ে আস্‌ত, ক্ষুদ্র এক বালিকা তার বেগ আর সাম্‌লে নিতে পারত না।

রূপ-রাজ্যের কোন বিরহিণীর অন্তর-বেদনা, স্তব্ধরাত্রের মাঝি-মাল্লারা তাদের গানের সুরে যখন ভরে তুলে, আকাশের গায়ে ঢেলে দিত, আর সেই এক নারী-প্রাণের বিচ্ছেদ-বেদনা নিশীথ প্রকৃতির তিমির-গড়া দেহখানি চুইয়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে বিজলীর প্রাণের উপর এসে ঝরত, তখন জ্যোতিকে বিজলী যদিও তার বুকের ভিতর রাখত, স্বপ্নদ্রষ্টার মনের মতো প্রাণটি তার দেহের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে, কার যেন প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে ছুটাছুটি কর্‌ত—যার বস-বাস বিজলীর কল্পনার ত্রিসীমানার ভিতর কোথায়ও ছিল না। এক এক-দিন বিজলী তার শোবার ঘরের জান্‌লার গরাদে হাত দুখানি রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ত, সুমুখের বিস্তীর্ণ মাঠ জ্যোৎস্নাতে একেবারে ভরে গিয়েছে; আর প্রকৃতি তার সমগ্র আকাশ দিয়ে সেই উন্মুক্ত ক্ষেত্রের একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষকে বেষ্টন করে ধরে হাসি-ভরা মুখখানি নিয়ে তার উপর যেন ঝুঁকে পড়েছে। গাছের কচি কচি পাতাগুলো মন্দ মন্দ বাতাসে থর্ থর্ করে কাঁপছে, সে কাঁপুনি যেন প্রিয়জনের আলিঙ্গন-বদ্ধ কোন নারীরই প্রাণের শিহরণ। এ-দৃশ্যটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিজলী একেবারে আত্মহারা হয়ে যেত, কার যেন সন্ধানে তার প্রাণটি কোথায় নিরুদ্দেশ-যাত্রা কর্‌ত।

কুমারীশের শাস্ত্র মতে নারীর কর্ত্তব্য, পুরুষের ইচ্ছায় বাহনটি হয়ে

পতির পদ-সেবা করা, এবং গৃহ-কার্য্যে বিশেষভাবে মন দেওয়া। বিজলীর সে কর্ত্তব্য-সাধনে কিছুমাত্র অমনোযোগ ছিল না। কিন্তু বিজলী যখন দেখ্‌ত, নদী-পারের তরু-শ্রেণীকে ছাড়িয়ে আরো দূরে—বহু দূরে, আকাশের একেবারে শেষ প্রান্তে মেঘের শ্যামল বক্ষে মাথা রেখে তিন চারটি তালগাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আরো উর্দ্ধে মেঘের শ্যামলতায় শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে, একটি বিহগ আর বিহঙ্গিণী মনের উল্লাসে এঁকে-বেঁকে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে; বিজলীর বদ্ধঘরে অর্গল-বদ্ধ প্রাণটি তখন আর স্থির থাকৃত না, কার যেন প্রত্যাশী হয়ে মুক্তির অবাধ আকাশে ছুটে যেতে চাইত। বিজলী তার প্রাণের বেগ সংযত করবার উদ্দেশ্যে হয়তো জ্যোতিকে তখন সুমুখে নিয়ে এক নতুন ঢং-এ তার চুলের খোপাটি বেঁধে দিতে বস্‌ত; অথবা তার ছোট ভাইটিকে কোলে করে তার মুখখানিতে অবিরাম চুম্বন বর্ষণ করৃত।

এইত ফুরালো বিজলীর পল্লিজীবনের ইতিহাস। এবার সুরু হল তার জীবনের আর একটি ধারা। কুমারীশ তখন ডেপুটী কালেক্টরের পদে কার্য্য করৃত। বিজলী স্বামীর সঙ্গে তার কর্ম্মস্থলে এল। সেখানে বিজলী হয়ে পড়্‌ল বড়ই একৃলা। কুমারীশের নিত্য সাহচর্য্য বিজলী সেখানে লাভ করেছিল, কিন্তু কুমারীশ ত আর ঝড়ের মতো একেবারে প্রাণের উপর এসে তার রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, আপনার বিহ্বলগীতি ভরে দিল না। সবিতা-দেবের মতো অন্তরের দূর আকাশে অবস্থান করে হৃদয়ের ভক্তি-রস নিঃশেষ করে শুষে নেওয়াই, স্ত্রীর প্রতি তার হল প্রধান কর্ত্তব্য। কুমারীশের বিশেষ উৎসাহ ছিল স্ত্রীর সেই কর্ত্তব্য পালনে। বিজলীর প্রাণটি সেখানে এক বিজনঘরে বদ্ধ হয়ে হাঁপিয়ে মরৃবার মতই

হয়েছিল, এমন দিনে একদিকের একটি আকাশের পথ কিঞ্চিৎ যেন উন্মুক্ত হল। গুমট্-ধরা দিবসের স্তব্ধ তরুরাজির মতো বিজলীর যে প্রাণে স্পন্দনমাত্র ছিল না, তার শাখায় প্রশাখায় আবার যেন একটু বাতাস খেল্‌লে। একদল সঙ্গী বিজলীর সেখানে জুটল। তারা সকলেই ছিল শিশু। কর্ত্তব্যের তাড়না তাদের কারুর ছিল না। প্রাণের খেলাতেই তাদের ছিল অভিরুচি। বিজলী তাদেরই সঙ্গে ছেলেমানুষটি হয়ে সব রকমের ছেলেমানুষীর অভিনয়ে যোগ দিলে। টাকা-কড়িতে আসক্তি বিজলীর কোন কালেই ছিল না, টাকা হাতে পেলেই তার সঙ্গিনীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণে, অথবা পাঁচ রকমের উপাদেয় সামগ্রী নিজহাতে তৈরী করে তাদের খাওয়াতে, সে-টাকা সে নিঃশেষ করে দিত। আর তার হাত থেকে তার সঙ্গিনীরা যে দান গ্রহণ কর্‌ত, তার যথেষ্ট প্রতিদান বিজলী পেত, তার প্রাণে। বেগবতী স্রোতস্বিনীর একান্ত উদ্যম, যেদিকে তার প্রাণের গতি, সেই পথে তার যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে ঢেলে দেওয়াতে। বিজলীর ছিল নদীটির মতোই অদম্য প্রাণের বেগ, যে সঙ্গীরা তার প্রাণের পথ উন্মুক্ত করেছিল, তার যথাসর্ব্বস্ব তাদের বিলিয়ে দেওয়াতেই তার ছিল প্রাণের উল্লাস। আর বিজলীর কাছে তার সঙ্গীদের ত সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না। নেচে, গান গেয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, কত রকমের আব্‌দার অভিযোগ করে তারা বিজলীর প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্‌ত। তাদের কাউকে কাউকে বিজলী এতই ভালবাস্‌ত, সারাদিন অন্তে সাঁঝের আগে বিজলীর কাছে বিদায় নিয়ে তারা যখন বাড়ী যেত, সেই এক রাত্রের ব্যবধান যে কোন অসীমের নাগাল ধরত! আবেগে তার প্রাণটি যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠত। বিজলীর

প্রাণের উচ্ছ্বাস, অজস্র চুম্বন বর্ষণে সে যেন একেবারে ঢেলে দিত।

বিজলীর জীবনের ধারা হয়তো এম্‌নি ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে ভবিষ্যতের পথে আরো বহুদূর অগ্রসর হতে পার্‌ত, কিন্তু একটি ঘটনার চাপে তার জীবনের পাড় যেন একেবারে ভেঙ্গে এসে এক ঐরাবতের মত তার চল্‌বার পথ রোধ কর্‌ল। ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—কুমারীশ গিয়েছিল তার এজলাসে। বিজলী তার সঙ্গীদের প্রতীক্ষায়, একখানি মাসিক কাগজ হাতে করে বসে ছিল। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এসে তার পায়ের উপর একেবারে কেঁদে পড়লে। স্ত্রীলোকটির পরণের যে কাপড়, তাতে ছিল শত গ্রন্থি। আর শোক-তাপ-অনশন তার জীবন শেষের পথে তাকে যে অনুধাবন করেছিল, তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল তার কঙ্কালসার দেহ-খানিতে। স্ত্রীলোকটির একমাত্র পুত্র, তারও মৃত্যু হয়েছিল। থাক্‌বার মধ্যে তার ছিল, বিধবা পুত্রবধূ আর ক'টি নাতি-নাতনী। বড় নাতিটির বয়স উনিশ কি কুড়ি বছর, সে রেল-ইষ্টেশনে ন'টাকা বেতনের একটি কার্য্য কর্‌ত। ঐ ক'টি টাকাতে কোনক্রমে কায়ক্লেশে খেয়ে না-খেয়ে তারা সংসার চালাতো। আশ্বিন মাসে পূজোর সময় পাড়ার এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের নতুন নতুন সাজসজ্জা দেখে ছোট ছোট ক'টি ভাই-বোন দাদার কাছে পূজোর কাপড়ের জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিলে। যুদ্ধ উপলক্ষ্যে এদিকে কাপড়ের বাজার ত একেবারে আগুন। তেমন চড়া দামে কাপড় কিনে পরবার সঙ্গতি তাদের আদৌ ছিল না। কিন্তু যারা শিশু, তাদের সে সদ্বিবেচনা কোথায়? দাদা দু'বেলা রেল-ইষ্টেশন থেকে যখন বাড়ী ফির্‌ত,

তার সাড়া পাওয়ামাত্র ক'টি ভাই-বোন পরম উল্লাসে ছুটে আস্‌ত; আর দাদার হাত দু'খানি যখন শূন্য দেখ্‌ত, মন বড়ই ক্ষুণ্ণ করে তারা সরে পড়ত। আজ নয় কাল, এ-বেলা নয় ও-বেলা,—এমনি করে অষ্টমীর দিন পর্য্যন্ত দাদা তার ভাই-বোনদের ভুলিয়ে রেখেছিল। সেই দিন সে একটি কাণ্ড করে বস্‌লে। রেল-ইষ্টেশনে যাবার পথেই এক ঘর তাঁতির বাস ছিল। ইষ্টেশনে যাবার সময়, এবং বাড়ী ফিরবার পথে সেই বাড়ীতে দাদার এক শিলেম করে তামাকের বরাদ্দ ছিল। ক'খানি কাপড়ের অভাবে ক'টি শিশু ভাই-ভগ্নির মনের দুঃখ একদিকে তার প্রাণে যেমন আঘাত কর্‌ছিল, অপর দিকে সেই তাঁতির বাড়ীতে স্তরে স্তরে কত রঙ্গীন তাঁতের কাপড় সে সাজানো দেখ্‌লে। সে তার প্রবৃত্তিকে আর দমন করে রাখতে পারলে না, সাঁঝের পর বাড়ী ফিরবার পথে সুযোগ দেখে ক'খানি কাপড় সে হস্তগত কর্‌লে। সারারাত তার মনের ভিতর ভারি ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চল্‌ল। পরদিন প্রত্যুষে তার কর্ম্মস্থলে যাবার পথে তাঁতি বুড়োর পায়ের উপর সে আবার কেঁদে পড়লে। তাঁতি বুড়ো, তাকে নিষ্কৃতি দেবে এই আশা দিয়ে, দশ জনের সমক্ষে তার স্বীকার উক্তিটি বের করে নিয়ে, তাকে পুলিশের হাতে হাওলা করে দিলে। সে হাজতে আবদ্ধ ছিল, কুমারীশের উপরই তার বিচারের ভার ন্যস্ত।

বড় নাতিটিই ছিল পরিবারের একমাত্র আশ্রয় স্থল, তার অভাবে বিধবা পুত্রবধূ আর তার ক'টি অপগণ্ড শিশু-সন্তানকে নিয়ে বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটির কষ্টের আর অবধি থাক্‌ত না। কুমারীশের উপর নাতির বিচারের ভার আছে জেনে, তার মুক্তির জন্য ঠাকুরমা বিজলীর কাছ এসেই কেঁদে পড়ল। আইন বিজলী বুঝত না, আর বোঝবার প্রবৃত্তিও

তার ছিল না। কিন্তু যে অপরাধীর অপরাধের মূলে ছিল তার প্রাণের একান্ত দরদ, বিজলীর কাছে তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। তারপর আবার অনুশোচনার পবিত্র সলিলে এবং সত্যবাদিতার বিমল বাতাসে সে অপরাধের পাপ ত কেটেই গেছল। স্ত্রীলোকটিকে বিজলী আশ্বাস দিল, তার নাতিটি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবে।

পরহিত-সাধন-ধর্ম্মের আলোকের স্পর্শে বিজলীর প্রাণ ভরে উঠেছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে একটি চিন্তা তার অন্তরের মাঝে উদয় হয়ে, তার প্রাণের আলো রাহুর মত গ্রাস কর্‌তে লাগ্‌ল। স্ত্রীলোকটিকে বিজলী আশা দিল, কিন্তু কিসের বলে? তার প্রাণের এজলাসে যার স্বপক্ষে রায় বেরোল, কুমারীশের কর্ত্তব্যবুদ্ধি তার প্রতিকূলে কি দাঁড়াতে পারে না? তাই যদি হয়, কুমারীশের কাছে কোনরূপ আব্দার যে করবে, সে অধিকার তার কোথায়? স্বামীই যার মুক্তির বিধাতা, তার কোন হিত কর্‌বে, এ ক্ষমতাটুকু বিজলীর নেই। যদি বিজলীর প্রীতি-ধারা কুমারীশের প্রাণের পথটি উন্মুক্ত পেত, তার কত অনুনয়-বিনয়, মান-অভিমান, হাসি-কান্না কুমারীশের হৃদয়-মন্দাকিনীতে তুফান তুল্‌ত। বিজলীর আব্দার শত সহস্রবার অন্যায় হোক, তবু কুমারীশের প্রাণের আসনটি যদি তার দখলে থাক্‌ত, তার কাছে বিজলীর কোনরূপ সঙ্কোচ হত না। যদি বা কোনক্ষেত্রে তার বিষবৎ প্রতিক্রিয়া হত, সে বিষের জ্বালা বিজলীকে সইতে হত না। তার প্রতি কুমারীশের ভালবাসা তারপক্ষে শিব হয়ে সে বিষ নিঃশেষে পান কর্‌ত। কিন্তু প্রাণের পথ যে একেবারে রুদ্ধ। প্রাণের পরিচয়ে যে তার নিতান্ত পর, তার কাছে প্রাণের কোন প্রার্থনা যে নিবেদন কর্‌বে, এ হীনতাটুকু স্বীকার কর্‌তে বিজলীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌বার মতো

হল। যার প্রাণে আশার সঞ্চার করা হল, তার আশা-ভঙ্গের অপরাধ আশঙ্কায় বিজলীর অন্তর যদিচ বড়ই সঙ্কুচিত হল, তবু স্বামীর কাছে কোন কথাটি জানাতে বিজলীর প্রবৃত্তি হল না। আরো তার মনে এই খেদ জন্মালে, বিশ্বমানবের চোখে যে তার বড়ই আপন, তার প্রাণের নাগাল কোন দিনই সে পেল না। প্রাণের সম্বন্ধে যে তার এমনি পর, বাইরের পরিচয়ে তার যে সে কতদূর আপনার হয়ে আছে, এই চিন্তাটি আজ যেন বিজলীর অস্তিত্বের মূল পর্য্যন্ত ছেদন করতে উদ্যত হল। যে সঙ্গীদের চিন্তা বিজলীর মন থেকে মুহূর্ত্তের জন্য অন্তর্হিত হত না, একটা ঝড়ের আবর্ত্তে তার অন্তরে তাদের প্রতিবিম্বও যেন আর পড়তে পাচ্ছিল না। সঙ্গিনীরা তখনও আসৃত কিন্তু বিজলীর কেমন একটি ভাবান্তর দেখে অধিকক্ষণ তার সাহচর্য্য তারা আর বাঞ্ছণীয় মনে করত না। আর বিজলীর কাছে বাইরের অস্তিত্বটা ত লোপ পেয়েছিল, তার প্রাণের ভিতরই লড়াইএর বিরাম ছিল না। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির আশা-ভঙ্গের অতি বিকট একটা করুণ ছবি বিভীষিকার মতো তার অন্তরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দেখা দিয়ে তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলছিল। বিজলীর ঐ সন্ত্রস্তভাব দিন দিন আরো বাড়তে লাগল। অবশেষে বিচারের নির্দ্দিষ্ট তারিখে, একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে, বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ভিতরের প্রাণটিকে কিঞ্চিৎ যেন নুইয়ে এনে, বিজলী স্বামীর কাছে কোনক্রমে তার প্রাণের কথাটি ব্যক্ত করলে। কুমারীশ কোন কথাটি বললে না, নীরবে ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হাসলে। সে হাসির মর্ম্ম বুঝি এই, পনেরো বৎসরের কঠোর সাধনার ফলে যে পদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা আমি লাভ করেছি, আর যে পদের কঠিন কর্ত্তব্য পালনে রত থেকে আমি তার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি,

সামান্য নারী হয়ে সে পদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কোন্ সাহসে তুমি নির্দ্ধারণ করতে চাও? যে পৃথিবীর দিক্‌চক্ররেখা ঘরকন্নার সীমা অতিক্রম করেনি, সেই হল তোমার পৃথিবী; তার বাইরে দৃষ্টি দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়।

হাসির এই মর্ম্ম বিজলী ঠিক প্রণিধান করতে পারুক বা না পারুক, সে হাসির তূণে যে শর ছিল তার প্রাণের ভিতর গিয়ে তা বিঁধ্‌ল। বিজলীর মনের অস্থিরতা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেড়েই চল্‌ছিল, তার এমন অবস্থায় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি এসে তার পায়ের উপর যেন একেবারে টাল্ খেয়ে পড়লে। কুমারীশ তার নাতিটির উপর ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল।

যার অপরাধ বিজলী দণ্ডযোগ্যই মনে করেনি, তার যে আবার এতদূর কঠিন সাজা হতে পারে, এমন ধারণা যে বিজলীর কল্পনা-তেও স্থান পাবার অযোগ্য। বিজলীর মনে হল, তাকেই যেন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কুমারীশ তার উপর এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেছে। বিজলীর সর্ব্বাঙ্গের শিরা উপশিরায় বিদ্রোহের বহ্নি যেন জ্বলে উঠ্‌ল। যদি সেই দণ্ডেই কুমারীশের হুকুম বাতিল করে তার আসামীকে মুক্তি দেবার কোন উপায় উদ্ভাবন হত, বিজলী তার জীবন পণ করে সেই কার্য্যই সমাধা করত। বিজলীর দেহের প্রতি অণু-পরমাণু আজ কুমারীশের শাসন উল্‌টিয়ে দিয়ে তার বিপক্ষতা সাধন করতে যেন চায়। কুমারীশের ঘর-বাড়ীতে, অশোকবনের সীতাদেবীর মতো বিজলীর আজ তাই হল বন্দিনীরই অবস্থা। তার নিজের অবস্থাই যেখানে এতদূর নিঃসহায়, যে স্ত্রীলোকটি তার পায়ের তলায় পড়ে মাথা ভাঙ্গতে লাগ্‌ল, তার সেখানে সে কোন্ হিত সাধন করবে?

বিজলীর কাছে টাকা সেদিন ছিল, কিন্তু যে সূত্রে সে টাকার উপর তার অধিকার জন্মিবার কথা, সে অধিকার সূত্র ছিন্ন কর্‌বার অভিলাষই যখন তার প্রাণে একান্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে টাকা দান বা গ্রহণ করবার প্রবৃত্তিকে বিজলী চৌর্য্যবৃত্তির মতো জঘন্য জ্ঞান কর্‌লে। বিজলীর সেখানে একমাত্র নিজ সামগ্রী ছিল, তার গলার একটি হার। সে হারটি তার বিবাহের দান-যৌতুকের তালিকাভুক্ত নয়। মায়ের মৃত্যুকালে বিজলী তার মায়ের হাত হতে সেই হারটি তাঁর শেষ দান গ্রহণ করেছিল। আজ একটি দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে বিজলী তার গলার হারটি খুলে স্ত্রীলোকটিকে দান কর্‌লে।

আর বিজলীর প্রাণের উপর অবজ্ঞা-অনাদরের তুষারপাতে তার বুকের রক্ত যখন হিম হয়ে এসেছে, তখন যে মৃত্যুর দূত বারবার এসে বিজলীকে অতি সঙ্গোপনে তার প্রেমবার্ত্তা জানিয়ে গেছল, আজ সাগরের পার হতে সেই মৃত্যুর রথ এল বন্দিনীকে উদ্ধার কর্‌তে।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

বাঙলা ভাষার কুলজী। *

—:*:—

ভাষাতত্ত্বের কোন্ অঙ্গ নিয়ে' আপনাদের সুমুখে কিছু নিবেদন ক'রবো তা আমি ঠিক ক'র্‌তে পারি নি। ভাষাতত্ত্ব আর তার শাখা উচ্চারণতত্ত্ব—এই দুটো নোতুন ‡ বিদ্যার মোহে প'ড়ে গিয়ে'ছি—সবে মাত্র এই বিদ্যার আস্বাদ পেয়ে'ছি, আগ্রহের সঙ্গে কিছু কিছু পড়্‌ছি, শিখ্‌ছি, আপনাদের কিছু নোতুন কথা শোনাবো এমন যোগ্যতা এখন আমার হয় নি। এই বিদ্যাটাকে নোতুন ব'লেছি, কিন্তু এটা বিশেষ ক'রে আমাদের দেশেরই বিদ্যা—তাহ'লেও অনেক দিন ধ'রে আমাদের দেশে, বাঙলায়, এর চর্চ্চা নেই—ইউরোপ থেকে ফের একে নোতুন ক'রে আমদানী ক'র্‌তে হ'য়েছে। পাণিনি, প্রাচীন শিক্ষাকার আর সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরা আমাদের নমস্য; সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চ্চায় এই গুরুদের ছাড়লে চ'ল্‌বে না—কিন্তু আমরা এখন যে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যা শিখ্‌বো, যে উচ্চারণতত্ত্ব বা শিক্ষাশাস্ত্র প'ড়বো সেটি হচ্ছে একটা মস্ত ব্যাপক জিনিস; কেবল ভাষাশিক্ষা আর শুদ্ধভাবে শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারণ করানো তার উদ্দেশ্য নয়—সেটি

* কৃষ্ণনগর নদীয়া-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে

‡ এই বানান দেখে' কেউ চ'ট্‌বেন না—কথাটা পুরানো বাঙলায় আর হিন্দীতে 'নৌতুন', সংস্কৃতের 'নবতন'। আমরা 'নোতুন' বলি, কিন্তু লেখ্‌বার বেলায় 'নূতন' লিখে' একটু পণ্ডিতী মূর্খতা করি।

একাধারে মানব-ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ধ্বনিতত্ত্ব। এই বিদ্যা পশ্চিমের কাছ থেকে নোতুন যুগের এক দান হিসাবে আমাদের কাছে উপস্থিত; সমস্ত জীবন ধ'রে এর সাধনা ক'রতে পারা যায়; এর সাধনায় মানবমাত্রই অধিকারী, এর সাহায্যে অনেক বিষয়ের মোহ কাটিয়ে' উঠতে পারা যায়, এই বিদ্যা ভাষার ভিতর দিয়ে' প্রাচীনের যথার্থ স্বরূপটি দেখিয়ে' দেয়। ভাষা মানবের বিশেষ গৌরব; আধুনিক জগতে জাতি ও সভ্যতা অর্থে ধর্ম্ম নয়, কৌলিক উৎপত্তি নয়, গণ-মণ্ডলী নয়, জাতি ও সভ্যতা অর্থে ভাষা। আমরা বাঙালী—আমাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, আর্য্য আছে, দ্রাবিড় আছে, কোল মোঙ্গোল আছে, ফিরিঙ্গী আছে—কিন্তু আমাদের জাতীয়তার সূত্র হচ্ছে আমাদের বাঙলা-ভাষা। এই ভাষার জাত ঠিক হ'লে, এর পিতৃকুল মাতৃকুলের সমস্ত খবর জানা গেলে, বাঙালী জাতির বাঙালীর ধর্ম্মের সভ্যতার সমাজের সমস্ত লুকানো কথা বেরিয়ে' প'ড়বে। আমার ঘরের কথা, অথচ এত লুকানো, এত রহস্যময় হ'য়ে র'য়েছে! ভাষাতত্ত্বের প্রদীপ এই রহস্যের অন্ধকার দূর করবার জন্য তৈরী র'য়েছে। লোকে এই বিদ্যাকে বিশেষ নীরস ব'লে মনে করে—সাধারণ লোককে সেজন্য দোষ দেওয়া যায় না—কারণ এটি প্রথমত শুষ্ক বিশ্লেষণের কাজ—প্রতিপদে একে মাটি ছুঁয়ে' যেতে' হয়। এতে কল্পনার হাওয়ায় উড়ে' বেড়াবার পথ নেই—নানান্ সূত্র একসঙ্গে ধ'রে থাক্‌তে হয়। এই বিদ্যায় মনের উপর যে ধকল পড়ে তা সকলে বরদাস্ত ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু এর থেকে বার করবার জিনিস এত র'য়েছে—যথানিয়ম কাজ ক'রে গেলে এত নোতুন ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে যে, যাঁরা এর আস্বাদ পে'য়েছেন, তাঁরা পরিশ্রমকে পরিশ্রমই মনে

করেন না, এর চর্চ্চায় এক অপূর্ব্ব আনন্দ পান। ইউরোপের লোকেরা তাঁদের ভাষায় কিছুই গুপ্ত অজ্ঞাত থাকতে দেন নি,—ইংরিজি, ফরাসী জর্ম্মান প্রভৃতিতে যা কাজ হ'য়েছে, তার শতাংশের এক অংশও আমাদের দেশ-ভাষাগুলিতে হয় নি। অথচ আমাদের দেশের ভাষা-গত সমস্যাগুলি আরও জটিল। জমি বিস্তর প'ড়ে র'য়েছে, আবাদ করবার লোক চাই। যাঁরা এদেশের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজ ক'রছেন, তাঁদের মধ্যে দেশী লোক খুবই কম। বাঙলা-ভাষার কথা যাঁরা আধুনিক রীতিতে আলোচনা ক'রছেন, এক আঙুলে গুণে' তাঁদের সংখ্যা শেষ ক'রতে হয়। কিন্তু এ সব কাজে ডাকাডাকি ক'রে লোক সংগ্রহ ক'রতে পারা যায় না—যে মনে মনে এর টান অনুভব করে সেই লে'গে যায় আর সে-ই বেশী কাজ করে। কিন্তু তবুও কার মনে কোথায় এ বিদ্যার দিকে একটু প্রবণতা প্রচ্ছন্ন র'য়েছে, সেটা চাপা পড়বার পূর্ব্বেই জীইয়ে' রাখবার চেষ্টা করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে ফল হ'তে পারে। সেটি করবার একমাত্র উপায়,—গোড়া থেকেই এই বিদ্যার সঙ্গে একটু পরিচয়—যাতে জান্‌বার শোন্‌বার শেখ্‌বার আগ্রহ জে'গে ওঠে। অর্থাৎ বাঙালীর ছেলে যখন ইস্কুলের উঁচু শ্রেণীতে পড়ে, তখন বাঙলা-ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা জ্ঞান তার পাওয়া উচিত। এটা ক'রতে পারলে এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে কাজ করবার জন্য রিক্রুট পাওয়া সহজ হয়—আর দেশের মধ্যে নিজের ঘরের সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধিরও সহায়তা হয়। আপনাকে না জানলে অপরকে জানবার ক্ষমতা জন্মে না।

ভাষাতত্ত্ব, বিশেষ করে ভারতবর্ষের আর্য্যভাষাগুলির ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ক'রতে ক'রতে দেখি যে, আমাদের অনেক পূর্ব্ব-সংস্কার আর

বিশ্বাস ঘা খায়। সকল পুরানো জাতির বংশধর বা সভ্যতার উত্তরাধিকারী নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে একটা স্পর্দ্ধা রাখে। ইটালীর লোকেরা মনে করে, তারা বিশ্ববিজয়ী রোমানদের সন্তান; গ্রীসের লোকেদের বিশ্বাস যে তারা লেওনিদাস সোক্রাতেস-এর জাতি,—তারা যে স্লাভ বংশের লোক, গ্রীসে এসে' গ্রীক জাতির ভাষা আর সভ্যতা নিয়ে'ছে সে কথাটা ব'ললেই তারা চ'টে যায়। সব জায়গায় দেখা যায় যে, নিজের জাতি সম্বন্ধে একটা না একটা সংস্কার জাগ্রত র'য়েছে। সত্যের অনুসন্ধান ক'রতে হ'লে এসকল সংস্কারের উপরে উঠতে হ'বে। কুক্ষণে এদেশে বিলেত থেকে নোতুন ক'রে 'আর্য্য' শব্দের আমদানী হ'য়েছিল; মাক্সমুলারের লেখা প'ড়ে, আর নব্য হিন্দুয়ানীর দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদ্‌হজমের ফলে, একটা নোতুন গোঁড়ামি এসে' আমাদের ঘাড়ে চে'পেছে, সেটার নাম হচ্ছে "আর্য্যামি"। এই গোঁড়ামি আমাদের দেশে নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি ধ'রেছে—স্বাধীন চিন্তার শত্রু এই বহুরূপী রাক্ষসকে নিপাত না ক'র্‌লে ইতিহাস চর্চ্চা বা ভাষতত্ত্বের আলোচনা—কোনটারই পথ নিরাপদ হয় না। এই গোঁড়ামির মূলসূত্র হচ্ছে এই—

১। যা-কিছু ভাল তা প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে ছিল (অথচ এই আর্য্য যে কারা, সে সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান কারুর নেই—একটা আবৃছা আবৃছা রকমের ধারণা আছে যে মুসলমানদের আসবার পূর্ব্বের কালের হিন্দুরাই আর্য্য)। ২। অতএব যা-কিছু খারাপ, সমস্তই আর্য্যেতর—'অনার্য্য'। সংস্কৃত ভাষায় আর্য্য শব্দের যে মানে, ইংরিজি Aryan-এর মানে ঠিক তা নয়; non-Aryan-এর অর্থ সংস্কৃতের 'অনার্য্য' দাঁড়-করানোতে যত কিছু বিভ্রাট ঘ'টেছে। ৩। প্রাচীন হিন্দুরা

আর্য্য, আমরা হিন্দু, এঁদের বংশধর; সুতরাং আমাদের মধ্যে অনার্য্য কিছুই নেই। যদি বা কিছু থাকে—সে-সব কথা তোলা উচিত নয়। আমাদের মধ্যে অনধিকারী ঐতিহাসিকের অন্ত নেই। এঁদের সকলেই এই তিন বিশ্বাসের খোঁটায় আপনাদের বেঁধে' মনের আনন্দে চোখ বুজে' ঘুরপাক খাচ্ছেন—মনে ক'রছেন, ঐতিহাসিক গবেষণা ক'রছি। ভাষাতত্ত্বেও উৎকট আর্য্যামি বিদ্যমান। তবে সৌভাগ্যের বিষয় সেটা আস্তে আস্তে চ'লে যাচ্ছে। প্রাকৃতকে এখন অনেকে মানছেন। বাঙলা-ভাষাটা যে অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য ভাষা, সেটাও ক্রমে ক্রমে লোকে মানবে; কিন্তু আর্য্যামি যতদিন বাধা দিতে থাকবে ততদিন বাঙলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে।

কথাটা একটু খুলে' বলা যাক্। বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য্য জাতি—মোঙ্গোল কোল মোখের দ্রাবিড় এই সব মিলে' সৃষ্ট খিচুড়ী, যাতে আর্য্যত্বের গরম-মশলাটুকু উপরে প'ড়েছে মাত্র। একথাটা স্বীকার ক'রতে যেন কেমন লাগে। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নাকি শত-করা ১৩ জন মাত্র; যাঁরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির, তাঁদের মধ্যে দু'চার জন বড় গলায় "বাঙালী অনার্য্য" এ কথাটা বলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁরা মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ, অতএব আর্য্যত্বের গরম মশলার একটা কণা, অনার্য্য চাল-ডাল ন'ন। আমি নিজে ব্রাহ্মণ বংশীয়; কিন্তু আমার বিশ্বাস, গরম মশলাটুকুতেও ভেজাল আছে। প্রচ্ছন্ন আর্য্যামিটুকুর হাতথেকে অনেকেই একেবারে মুক্ত হ'তে পারেন না। Scientific disinterestedness যাকে বলে, সেটা বড় দুর্লভ। জাতের পাঁতি নিয়ে আলোচনা ক'রে আপাতত ঝগড়া তোলবার ইচ্ছে নেই, তবে ভাষা-

তত্ত্বের দিক দিয়ে' এইটুকু বলা যায় যে, বেদের সময়থেকেই আর্য্যভাষা অনার্য্যের ঘরে জাত দিয়ে'ছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে' শুদ্ধ ক'রে জাতে তোলা যায় না। আদি কালের আর্য্যজাতি উত্তর মেরুতেই থাকুন আর মধ্য-এশিয়ায় থাকুন, দক্ষিণ রুষেই থাকুন আর স্কাণ্ডি-নেভিয়াতেই থাকুন, বা এদেশের লোকই হ'ন, তাঁদের নিদর্শন কোথাও মেলে না; কিন্তু তাঁদের ভাষা আর চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে, আর তাই অবলম্বন ক'রে তাঁদের সভ্যতা ও রীতনীতি সম্বন্ধে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যা অনেক খবর দিয়ে'ছে। দেখা যায় যে, বেদে যে ভাষার নিদর্শন আমরা পাই, কেবল সেটাতেই অনেকটা মূল আর্য্যত্বের ছাঁচ বর্ত্তমান; তার পরের অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কৃতে, প্রাকৃতে আর আধুনিক ভাষা-গুলিতে সে ধাঁচা নাই—পুরানো ধাতু আর শব্দ অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু কোথাথেকে অনেক নোতুন শব্দ এসে' জুটে'ছে, বাক্য-রচনা-রীতি আর পুরানো বা বিশুদ্ধ আর্য্যচিন্তার অনুরূপ নয়, অন্য ধরণের। এক-দিকে বেদের আর প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষা—আর একদিকে বাঙলা প্রভৃতি; এদের যদি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায় যে, তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাঙলারও সেই ছাঁচ; যদিও বাঙলার ধাতুগুলি আর শব্দগুলি মুখ্যত তদ্ভব, অর্থাৎ বৈদিকথেকে উৎপন্ন। বৈদিক ক্রমে প্রাকৃত হ'ল,—প্রাকৃত বাঙলা প্রভৃতিতে দাঁড়াল। এই পরিবর্ত্তন কিন্তু একটানা ভাবে হয় নি। বাঙলা প্রভৃতির উৎপত্তি আর প্রকৃতি বিচার ক'রলে এইটুকু বোঝা যায় যে, বৈদিক কালের 'জাত্' আর্য্যভাষীর বংশধরের মুখে মুখে বদ্‌লে' এলে' যে রকমটি এর রূপ দাঁড়াত, এর এখনকার রূপটি সে রকম নয়। আর্য্যভাষা অন্-আর্য্য-ভাষীর দ্বারা গৃহীত হওয়াতেই এর পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হয় নি।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। খ্রীষ্টীয় পাঁচের শতে ইংরিজিভাষী টিউটনেরা ব্রিটেনে বাস ক'রতে আরম্ভ করে—ব্রিটেন-দ্বীপে ইংলাণ্ডে আর দক্ষিণ-স্কট্লাণ্ডে ছড়িয়ে' গিয়ে' এরা নিজেদের জাতির আর ভাষার প্রসার করে। ইংলাণ্ডে আর দক্ষিণ-স্কট্লাণ্ডে লোকেদের পূর্ব্বপুরুষ মূলত ইংরিজি-ভাষী, এদের মুখে ইংরিজির পরিবর্ত্তন একরকম নিয়মে হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইংলাণ্ড আর স্কট্লাণ্ড থেকে ইংরিজি-ভাষী লোকেরা আয়র্লাণ্ডে অল্প অল্প ক'রে উপনিবেশ ক'রতে থাকে ; রাজশক্তির প্রভাবে আয়র্লাণ্ডের অধিবাসী লোকেরা ক্রমে ক্রমে ইংরিজি গ্রহণ ক'রতে থাকে। আইরীশ লোকেরা আগে কেল্টিক্ ভাষা ব'লত ; এখন এরা প্রায় সকলেই ইংরিজি বলে। এখানে দেখছি যে একটা বিদেশী ভাষা অন্য জাতের উপর চ'ড়ে ব'সল ; সে জাতের পুরানো ভাষার অনেক ধাঁজ আর ঢঙ, অনেক রীতি নীতি, শব্দ, বিশেষত্ব, তাদের নোতুন-ক'রে নেওয়া ভাষায়ও এসে' গেল। আয়র্লাণ্ডে ইংরিজি ভাষার যে রূপ, সেটা হচ্ছে বিদেশীর মুখের ইংরিজির রূপ 'জাত্' ইংরিজি-ভাষীর মুখের রূপ সেটি নয়। ভারতে আর্য্য ভাষার সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাও খাটে। "আর্য্যীকৃত" দ্রাবিড়, কোল ও মিশ্র জাতিদের মুখে আর্য্যভাষা আপনার স্বরূপ বজায় রাখতে পরাল না। আর্য্যভাষার মালমশলা, পুরানো দেহটা—রইল বটে, কিন্তু তার চেহারা বদ্‌লে' গেল।

ভাষায় যা দেখা যায়, ভারতবর্ষের ধর্ম্মের আর সভ্যতার ইতিহাসেও তা দেখা যায়। আকাশের দেবতার উপাসক বৈদিক বা বৈদিক-পূর্ব্ব যুগের আর্য্য একদিকে—আর একদিকে পৃথিবীর দেবতার উপাসক দ্রাবিড় ; আর্য্য আর দ্রাবিড় সভ্যতা আর চিন্তা মিলিয়ে'ই

হিন্দু সভ্যতা আর চিন্তা। আর্য্যভাষা দ্রাবিড়ের ও অন্য অন্‌-আর্য্যের মুখে বদ্‌লে'ই প্রাকৃত; আর অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে ধ্বনি-গত পার্থক্য থাকলেও উভয় ভাষা একই জাতির চিন্তার ফল। একথা তাদের বাক্যরীতির সাম্যে দেখা যায়। আমরা আর্য্যভাষা বলি, কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্য্য ধরণে আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি দ্রাবিড় ভাবে। Syntax-এ বৈদিক একদিকে, প্রাকৃতগুলি, আধুনিক ভাষাগুলি আর দ্রাবিড় ভাষাগুলি আর একদিকে। অন্‌-আর্য্য ভাষীর মুখে না প'ড়লে আর্য্যধ্বনিগুলির ভারতে যে গতি দাঁড়িয়ে'ছে সে গতি হ'ত না।

ভাষা ব'ললে বুঝি, মানুষের কণ্ঠের স্বরের ধ্বনি মিলিয়ে' শব্দ সৃষ্টি ক'রে তার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ। দুটো জিনিস এতে আছে—একটার স্থিতি শারীরিক যন্ত্রের উপর—সেটা হচ্ছে ধ্বনি, আর একটির উৎপত্তি চিন্তা থেকে—ভাব। বাক্য—অর্থ, পরস্পর জড়িত। আদিম কালে যখন মানুষ প্রথম ভাষা প্রয়োগ করে, তখন শারীরিক অবস্থার বাহ্য প্রকাশ হ'ত ব্যক্ত ধ্বনি দিয়ে'; যেমন ইতর জীবেদের মধ্যে এখনও দেখা যায়। তারপর যখন মানুষ চিন্তা ক'রতে শিখলে, তখন এই সকল ধ্বনি মিলিয়ে' ধাতু-বা মূল শব্দ হ'ল, সেই শব্দগুলি এক একটি ভাবের মূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়াল। পরে মনের চিন্তার অনুবর্ত্তী হ'য়ে সেই শব্দগুলি বাক্যে' sentence-এ সংযুক্ত হ'ল। দেখা যায় যে, ধ্বনিগুলো বদ্‌লাতে পারে, তাদের সমষ্টি ধাতু শব্দগুলো আর প্রত্যয়গুলোও বদ্‌লায়; কিন্তু কোনও জাতের মধ্যে তার চিন্তাপ্রণালীটি সহজে বদ্‌লায় না—কারণ সেটা হচ্ছে মস্তিষ্কের জিনিস, ধ্বনি বা শব্দের মত সহজে অনুকরণীয় নয়। অন্য জাতির প্রভাবে প'ড়ে এক জাতি নোতুন ধ্বনি, শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় শিখে'ছে, আত্মসাৎ ক'রেছে, কিন্তু

যেরূপ চিন্তায় তারা অভ্যস্ত, সেরূপ ভাবে চিন্তা-করা-টা শীঘ্র ছাড়তে পারে না—সাধারণত তাদের নৌতুন-করে-শেখা অন্য জাতির ভাষার শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় তারা নিজ ভাষার বাক্য রচনার অনুরূপ ক'রে নেয়। অর্থাৎ syntax-টি বিশেষ প্রবল থাকে, এটাই জাতি-বিশেষের মানসিক প্রবণতার বিশেষ চিহ্ন। ভারতে আর্য্যভাষার গতি ধরা যাক্। বৈদিক-পূর্ব্ব ভাষার উচ্চারণের, ধ্বনি-সমষ্টির যা বিশেষত্ব, ভারতে দ্রাবিড়ের সঙ্ঘাতে এসে' অনেকটা বদ্‌লে' গিয়েছে। প্রথম—বৈদিক-পূর্ব্ব ভাষায় কতকগুলি উষ্ম ধ্বনি ছিল, সেগুলি বৈদিকে মেলে না; আবার এটাও দেখি যে, দ্রাবিড়ে উষ্ম ধ্বনির একান্ত অভাব। তারপর, আদি আর্য্য ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ছিল না; এখন মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি হচ্ছে বিশেষ ক'রে দ্রাবিড় ভাষার ধ্বনি, সেগুলি অন্য প্রাচীন ভাষায় মেলে না। যত এদিকে আসি, ততই দেখি ভারতের আর্য্য-ভাষায় মূর্দ্ধণ্যের বৃদ্ধি হ'তে চ'ল্‌ছে। এটি একটা লক্ষ্য করবার জিনিস।

দ্রাবিড় আর কোল উচ্চারণের বিশেষত্ব—কথার গোড়ায় দুই ব্যঞ্জন একত্র থাকতে পারে না; হয় তাদের ভেঙে' নেওয়া হয়, নয় একটিকে লোপ করা হয়। প্রাকৃতেও তাই, আমাদের ভাষাতেও তাই। অথচ ও-দিকে ইউরোপে দেখি, কথার গোড়ার সংযুক্ত ব্যঞ্জনের কোনও হানি হয় নি। ঈরানের ভাষায়, আফ্‌গান্‌দের ভাষায়, কাফিরদের ভাষায় দেখি, এখনও সংযুক্ত বর্ণ কথার আদিতে জোরের সঙ্গে চ'লছে। বৈদিকে কত রকমারি tense বা ক্রিয়ার কালবাচক রূপ। সংস্কৃতে সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বজায় আছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতে, প্রাচীন ভারতের জনসাধারণের

ভাষায়, সাধারণত তিনটিতে ঠেকে'ছে। প্রাচীন দ্রাবিড়ে মোট দুটি কালবাচক রূপ ছিল, পরে আর কতকগুলির উদ্ভব হয়। ও-দিকে গ্রীসে রোমে কিন্তু প্রাচীন কালবাচক রূপের বিশেষ হানি হয় নি। দ্রাবিড়ে, কোলে আর ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় prefix-এর হাঙ্গামা নেই, সবই suffix, আমাদের ভাষাগুলিতে তাই, কিন্তু বৈদিকে তা নয়। বৈদিকে preposition ছিল, সেগুলি সংস্কৃতে ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত উপসর্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে'ছে। ত-তবৎ প্রত্যয় দিয়ে' তিঙন্ত ক্রিয়ার কাজ সারা ত সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে সাধারণ। যেমন সঃ গতঃ, অশ্বম্ আরূঢ়বান্। দ্রাবিড়েও ঠিক সেইটি দেখি। বৈদিকে তা নয়—স জগাম, অশ্বম্ অরুক্ষাৎ। বাঙলার যে অতীত আর ভবিষ্যতের প্রত্যয়, তা এই 'ত' আর 'তব্য' থেকে হ'য়েছে, কোনও বৈদিক তিঙ্ থেকে নয়। এ ছাড়া, অনেক বাঙলা idiom-এ দ্রাবিড়ের ছাপ পাওয়া যায়। বাঙলায় অসমাপিকা-ক্রিয়ার ঘটা, সহায়ক-ক্রিয়ার ব্যবহার প্রভৃতি আর নানা চল্‌তি বাক্য-রীতি দ্রাবিড় ভাষার অনুযায়ী।

দ্রাবিড় শব্দ আধুনিক বাঙলায় অনেক আছে, আর সেগুলি একেবারে ঘরোয়া শব্দ, যা লোকে বই প'ড়ে শেখে না, যা পরিবারে ধারাবাহিকরূপে চ'লে আসে। সংস্কৃতেও বিস্তর দ্রাবিড় শব্দ আছে। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হ'য়ে গে'ছে। Kittel-এর কন্নাড়ী ভাষার অভিধানের ভূমিকায় প্রায় ৪৫০ সাধারণ সংস্কৃত শব্দ দেওয়া আছে, যেগুলি দ্রাবিড় থেকে নেওয়া। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও বাঙলা ভাষায় অনেক দ্রাবিড় কথা বের ক'রেছেন।

এই সকল বিষয় বেশী উদাহরণ দিয়ে' বোঝাতে গেলে, পুঁথি বেড়ে যায়।

আমার ধারণা এই—খালি সংস্কৃত আর প্রাকৃতের দিকে নজর রাখলে চ'লবে না, বাঙলা ভাষার ইতিহাস ঠিক ক'রে জানতে গেলে অন্-আর্য্য ভাষাগুলির দিকেও নজর রাখতে হবে। আর এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রতে গেলে শিক্ষার দরকার, সাধনার দরকার—ঘরে ব'সে খোষখেয়ালী গবেষণায় চ'লবে না। আমাদের মাল মশলা সমস্ত হাতের কাছে নেই। মাটি খুঁড়ে' পাথর কাঠ কেটে' আনবার সময় এখন। সব ঠিক হ'লে তবে ইমারত উঠবে। একজনকে সব দিককার উপাদান জোগাড় ক'রতে গেলে চ'লবে না—এক একটা বিষয় এক একজনকে নিতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ—এটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উৎসাহী লোকেদের যোগাড় ক'রে দিতে হবে। এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ এগিয়ে'ছে—সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়—কিন্তু ঢের বাকী। ছাত্রদের দ্বারায় এরূপ অনেক কাজ হ'তে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ—technical terms—সেগুলির আলোচনায় অনেক নোতুন খবর বেরুতে পারে, এটার সম্বন্ধে অনেকেই নিজের নিজের প্রদেশের ভার নিতে পারেন। যাঁদের বাঙলার প্রান্ত জেলায় বাস—যেখানে অন্-আর্য্যভাষী জাতি এখনও বিদ্যমান, তাঁদের উচিত সেই প্রান্তের অন্-আর্য্য ভাষা শিখে' নেওয়া। সাঁওতালী আর কাছাড়ীর প্রভাব যে পশ্চিম বাঙলার আর উত্তর বাঙলার ভাষায় আছে তা সহজেই অনুমান ক'রতে পারা যায়; কারণ রাঢ়ের জন-সাধারণ—masses এর মধ্যে কোল-জাতির উপাদান আছে, উত্তর-বঙ্গ আর কামরূপের লোকেরা ত সেদিন পর্য্যন্ত কাছাড়ী বা বড ভাষা ব'লত, এখন বাঙলা-ভাষী হচ্ছে, মুসলমান আর হিন্দু হ'য়েছে,

এমন কি অনেকে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এ কাজ ততটা সহজ নয়। বাঙলা-ভাষা যখন জন্মগ্রহণ করে, তখনকার দিনের অনার্য্য-ভাষার প্রভাবটাই বেশী প'ড়েছিল। কিন্তু অনেক অনার্য্য-ভাষা লোপ হ'য়েছে, আর অনেকের পূর্ব্ব স্বরূপটি জানবার উপায় নেই। তবুও, এদিক দিয়ে' কিছুই জানবার চেষ্টা হয় নি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় বাঙলার পশ্চিম প্রান্তের অন্-আর্য্য জাতদের ভাষা, ইতিহাস, রীতি নীতি আলোচনা ক'রছেন; তাঁর মত আরও কর্ম্মী দরকার, যাঁরা এই সকল অন্-আর্য্যদের সঙ্গে তাদের আশ্‌পাশের হিন্দু বাঙালীদের সম্বন্ধ কি, নৃ-তত্ত্ব-বিদ্যার দিক থেকে সেটা চর্চ্চা ক'রবেন। বাঙলা দেশের প্রত্যেক জেলার মহকুমা থানা নির্ব্বিশেষে গ্রাম ও ভূসংস্থানের নামের তালিকা সংগ্রহ হওয়া উচিত, এমন সকল নামের তালিকা, যেগুলির মানে বোঝা যায় না, আর সংস্কৃত বা বাঙলার সাহায্যে, ব্যাখ্যা ক'রতে পারা যায় না। নাম থাকলেই তার একটা মানে আছে, বা ছিল; অথচ সমস্ত বাঙলা-দেশে (কেবল বোধ হয় দক্ষিণ সমতট-টুকু বাদ, কারণ এ অঞ্চলটায় নোতুন ক'রে লোকের বাস হ'য়েছে) এমন সব স্থানের নাম আছে, যার মানে খুঁজে' পাওয়া যায় না—কথাগুলি বাঙলার কথা মনেই হয় না, যদি আমরা এগুলোকে একটু বিচার করে দেখি। নিশ্চয় যখন এই সকল নাম দেওয়া হ'য়েছিল, তখন লোকে তার মানে বুঝত; কিন্তু নামগুলি ত বাঙলা নয়। তা হ'লে পূর্ব্বে এদেশে অ-বাঙালী লোক ছিল, যারা অন্য ভাষা ব'লত; তারা গেল কোথা? কপ্পূরের মত উবে' গেল—যাতে আর্য্য-বংশধরেরা এসে' দয়া ক'রে বাস ক'রে, পাণ্ডব-বর্জ্জিত বাঙলা দেশকে পবিত্র ক'রতে পারেন?—না তারাই আর্য্যভাষী বৌদ্ধ প্রচারকদের কাছ থেকে, পশ্চিম থেকে আগত

মৌর্য্য আর গুপ্ত রাজাদের প্রেরিত রাজপুরুষদের কাছথেকে, উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ বেনিয়া সৈনিকের কাছথেকে আর্য্যভাষা শিখে' তাকে নিজেদের ভাবের উপযুক্ত ক'রে নিয়ে', রাঢ় বরেন্দ্র আর বঙ্গের বাঙলায় বদ্‌লে' ফেললে, বাঙালী-ভাষী জাতিতে পরিণত হ'ল? এবিষয়ে বাঙলায় মোটেই আলোচনা হয় নি; এক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেখিয়ে'ছেন যে উড়িষ্যা অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামাদির নাম দ্রাবিড় ভাষার; তা থেকে প্রমাণ হয় সেখানে দ্রাবিড় ভাষা আগে চ'ল্‌ত। F. Hahn সাহেবও ছোট-নাগপুরে কোল ও দ্রাবিড় নাম দেখিয়ে'ছেন; উত্তর-বঙ্গের ও আসামের অনেক নাম তেমনি ভুটিয়া ও ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষা থেকে হ'য়েছে। অনেক সময়ে আবার এই সকল নামকে সংস্কৃত ক'রে আর্য্য ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু মিহিজাম, জামতাড়া, হাব্‌ড়া, চুঁচুড়া, সোমড়া, রিষড়া, মগরা, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা, দোয়ার্‌পা, জান্‌পা, গুর্‌পা, পর্‌শা, পাণ্ডুয়া, মুড়ি, নাড়াজোল, জাগুলিয়া, শালিখা, জালিখা, নড়াইল, নন্দাইল, টাঙ্গাইল, কাঁথি, দেবড়া, ইগ্‌ড়া, কোলা, সাম্থিয়া, সাঁইতিয়া, উলা, হাটবয়্‌রা, ভাদুড়িয়া, কান্দি, ভীলাকান্দি সরিয়াকান্দি, হাইলাকান্দি, ঝিঁকড়াগাছী, ঝাকৈর, জামুর, শিলিগুড়ী, জলপাইগুড়ী, ময়নাগুড়ী, ধুপগুড়ী, দীমরা, আটী, সাভার, জয়রা, ঝিটকা, জামুর্কী, বাসাইল, ছাপ্‌ড়া—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—এই সকল গ্রামের নামের মানে কি? অথচ এদেরই ইতিহাস ত আমাদের জাতের ইতিহাস। গ্রামের নামে প্রায় বাঙলাদেশময় একটা প্রত্যয় মেলে—সেটা 'ড়া' বা 'রা' বা 'লা'—এই প্রত্যয়ের মানে কি, আর এ কোন্‌ ভাষার কথা? বাঙালী জাতি, অর্থাৎ বাঙলা-ভাষী জাতি সৃষ্টি ক'র্‌তে যে যে জাতির উপাদান লেগে'ছিল, তাদের ভাষা চর্চ্চা না ক'রলে এ-সবের

সমাধান হ'তে পারে না। আমাদের হাতে এখন মাল মশলা নেই। এইরূপ নামের লিস্‌ট্‌, বিশেষভাবে, যাঁরা এদিকে কাজ ক'রবেন, তাঁদের না হলে চ'লবে না। কিন্তু গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে' কোথায় অজানা-মানে কোন্ পাড়া বা নদীর বা জঙ্গলের নাম আছে, তাঁরা তা সংগ্রহ ক'রতে গেলে কাজ এগো'বে না। বাঙলার প্রত্যেক মহকুমা বা থানা থেকে ইস্কুলে কলেজে কত ছেলে পড়ে, তাদের কাজ হচ্ছে এইরকম সমস্ত নাম সংগ্রহ করা, আর তার যদি কোনও স্থানীয় ব্যাখ্যা থাকে, তাও যোগাড় করা। ক'রে, সাহিত্য পরিষদের মত স্থানে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে' দেওয়া—সেগুলি প্রকাশ হ'লে পর তার বিচার চ'ল্‌তে পারে।

এ ত গেল বাঙলা-ভাষার পুরানো ইতিহাসের কথা। চল্‌তি বাঙলার স্বরূপটি নানা দিক দিয়ে' বিশ্লেষ ক'রে দেখবার বিষয়। সেদিন ঢাকা থেকে বিরাট এক ব্যাকরণ বেরিয়ে'ছে দেখলুম—প্রায় ৮০০ পাতার বই। বাঙলার ব্যাকরণ দেখে' আগ্রহের সঙ্গে পাতা উল্‌টে' দেখি, লেখক বাঙলা কাকে বলে জানেন না। আগাগোড়া একখানি সংস্কৃতের ব্যাকরণ তিনি লিখে' গিয়েছেন। বাঙলার প্রত্যয়াদি তিনি দু'ভাগে ভাগ ক'রেছেন—সাধু অর্থাৎ সংস্কৃত, আর অসাধু। তিনি যা অসাধু মনে ক'রেছেন, সঙ্কুচিত-ভাবে আলগোছে, যা কোন রকমে বর্ণনা ক'রে ছেড়ে' দিয়েছেন, তাই যে খাঁটী বাঙলা, সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। বাঙলার বিশুদ্ধ রূপটি হচ্ছে এর তদ্ভব উপাদানটি। এটি বৈদিক থেকে উদ্ভূত, কিন্তু অন্-আর্য্য বা দ্রাবিড়ীয় ঢঙে এর বাক্য-রচনায় প্রয়োগ। বাঙলার এই নিজ রূপটি সংস্কৃতের অলঙ্কারের চাপে ঢাকা প'ড়েছে—একে বা'র ক'রে, এর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন কার সঙ্গে কতটা মেলে, এর যথার্থ

গোত্র-পরিচয় এর গুণাগুণ থেকে কতটা পাওয়া যেতে' পারে—এই সব নির্দ্ধারণ করাই হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বাঙলা ব্যাকরণের কাজ। কিন্তু পণ্ডিতেরা এর অলঙ্কারের যাচাই নিয়ে'ই ব্যস্ত,—সংস্কৃতের সোনা কতটা আর কতটা খাদ। সংস্কৃতের চাপে পড়ে বাঙলা কতটা যে অকর্ম্মণ্য ও অসহায় হ'য়েছে, কতটা একে সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হ'তে হচ্ছে, তা হিন্দীর সঙ্গে তুলনা ক'রলে বুঝতে পারা যায়। বাঙলার কৃৎ, আর তদ্ধিত আর প্রত্যয়গুলি পঙ্গু; নোতুন শব্দ বাঙলায় সৃষ্টি করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি সাধারণ ইংরিজি কথা দিচ্ছি; singer, childhood, goer, current, redness, silence, manufacture, earning, goodness, 84th; এগুলির খাঁটি বাঙলা অনুবাদ কি? singer 'গায়ক' নয়, 'গায়ক' ত সংস্কৃত শব্দ; 'গাইয়ে' ব'ললে, যে ভাল গায় তাকে বুঝায়, 'হিন্দীতে গবহিয়া'; childhood—শৈশব—হিন্দী 'বচ্‌পন্‌'; goer—গমনকারী—'চল্‌নেহারা'; current—প্রচলিত—'চালূ' ('চল্‌তি' শব্দ হিন্দী থেকে নেওয়া); redness—বাঙলায় কি? হিন্দী 'লালী'; silence—স্তব্ধতা—'সন্নাটা'। ('নিঝুম' বললে ঘুমের ভাব আসে); manufacture—নির্ম্মাণ, 'বনাবট'; earning—উপার্জ্জন, রোজগার—হিন্দী 'কমাঈ' goodness—'ভলাঈ'; 84th.—'চৌরাসীবাঁ'—বাঙলায়—চতুরশীতিতম। সংস্কৃতের অলঙ্কার বাঙলার বোঝা হ'য়েছে, বাঙলাকে জীবন্মৃত করেফেলেছে। যতই আমরা আমাদের সাহিত্যের বড়াই করি না কেন, হিন্দীর কাছে সংস্কৃতের প্রেত-ঘাড়ে-করা বাঙলা দাঁড়াতে পারে না—হিন্দী যতটা জোরের ভাষা, বাঙলা ততটা নয়। বাঙলার 'নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণাগার' 'কৌতুকাগার', 'তাপমান যন্ত্র' প্রভৃতি

দাঁত-ভাঙা শব্দ অচল ; হিন্দীর 'তারাঘর', 'জাদুঘর', 'গরমী মাপ', রাস্তার লোকেও বোঝে। আজকালকার 'সাধু' হিন্দীর মন্দিরে বাঙলার অনুকরণে সংস্কৃতের অশথ গাছের বীজ চূড়োয় বসানো হ'য়েছে, কিন্তু তার জড় এখনও বেশী দূর যায় নি ; 'ঠেট-হিন্দী' ব'লে এক রকম রচনা রীতি হিন্দীতে এখনও চ'লচে, যাতে চেষ্টা ক'রে সংস্কৃত শব্দ পরিহার করা হয়, কেবল তদ্ভব আর প্রাকৃত ধাতু আর প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদই ব্যবহার করা হয়। হিন্দীতে হালে তিনখানা বই লেখা হ'য়েছে, সে তিনখানাতে একটিও পণ্ডিতী বা সংস্কৃত শব্দ বা ফারসী শব্দ নেই—সমস্তটাই খাঁটী দেশী আর তদ্ভব শব্দে পূর্ণ। তিনখানি বই-ই উপন্যাস—একখানি এক মুসলমানের লেখা, আর দুখানি এক হিন্দুর। তিনখানারই স্টাইল সকলেই প্রশংসা করেন ; এর একখানা বইকে আবার কাশীর নাগরী-প্রচারিণী-সভা, হিন্দীর ২২ খানি শ্রেষ্ঠ গদ্য বইয়ের মধ্যে একখানি ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। আজকালকার বাঙলায় এ রকম একটা ব্যাপার অসম্ভব। যাঁরা বাঙলা ব্যাকরণ আলোচনা করেন, তাঁরা যেমন বাঙলার নিজ স্বরূপটিরই ইতিহাসের পুনর্গঠন ক'রবেন, সেইরকম যাঁরা বাঙলা ভাষা সৎসাহিত্যে প্রয়োগ ক'রবেন, তাঁদের চেস্টা করা উচিত যাতে বাঙলার এই পঙ্গু-ভাব দূর হয়—খাঁটী বাঙলা ধাতু প্রত্যয় সিদ্ধ পদের প্রচলন যেন বেশী হয়। যেখানে খাঁটী বাঙলা পদ মেলে না, বা না মিললে সৃষ্টি করা চলে না, সেখানেই যেন সংস্কৃতের কাছে কথা ধার করা হয়। চলতি ভাষায় প্রাদেশিক ভাষায় বাঙলার ঠিক মূর্ত্তির ফল্গু বইছে, এর অন্তঃসলিলা মূর্ত্তিকে প্রকট ক'রতে হবে। অসমীয়া-ভাষা বাঙলার বোন, বাঙলার কাছে অসমীয়া এখন দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু অসমীয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল।

বাঙলার প্রাকৃত বা তদ্ভব রূপটিই যে এর আসল রূপ, একথা রামমোহন রায় মেনে' গিয়ে'ছেন। কিন্তু ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের আর শ্রীরামপুরের পণ্ডিতদের হাতে প'ড়ে বাঙলা ভাষা ভোল ফিরিয়ে' ব'সল, বাঙলা ব্যাকরণ ব'লে লোকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি আর কৃৎ তদ্ধিত শব্দসিদ্ধি প'ড়তে লাগল। বিদেশী পণ্ডিত বীম্স্ আর হ্যর্ণলে বাঙলার আসল রূপটি বের করবার প্রথম চেষ্টা ক'রলেন। ১২৮৮ সালে (ইংরিজি ১৮৮১) চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "ইংরাজী বাঙ্গলা ও নর্‌ম্যাল বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ" একখানি বাঙলা ব্যাকরণ লেখেন। আমার বোধ হয়, বাঙালীর হাতে তার মাতৃভাষার যথার্থ ব্যাকরণ লেখবার এই প্রথম প্রয়াস। গ্রন্থকারের নাম এখন অজ্ঞাত, প্রায় চল্লিস বছর পূর্ব্বে তিনি লিখে'ছেন অথচ তিনি তাঁর মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা এখনও দুর্লভ। তিনি পূর্ব্বভাষে ব'লেছেন; "সংস্কৃত এবং দেশজ বাঙ্গলা এই উভয়বিধ শব্দই বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষার উপাদান; এতদ্বিধ ভাষার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে হইলে যেরূপ ভাষাগত সংস্কৃতশব্দসম্বন্ধে বৈয়াকরণ নিয়মবিধান করা কর্ত্তব্য, দেশজ বাঙ্গলা শব্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ কর্ত্তব্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এতাদৃশ বাঙ্গলাব্যাকরণ বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহা আমি জানি না; প্রত্যুত আমার বিশ্বাস এই যে এতাদৃশ কোন ব্যাকরণ বঙ্গভাষায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং একখানি হওয়ারও প্রয়োজন আছে।" গ্রন্থকার বাঙলার তদ্ভব শব্দগুলির উৎপত্তি নির্ণয়ক সূত্র প্রণয়ন ক'রেছেন, তদ্ভব রূপটির বিশেষ আলোচনা ক'রেছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর "শব্দতত্ত্ব" তারপর খাঁটী বাঙলার সম্বন্ধে একখানি প্রধান মৌলিক

পুস্তক। রবিবাবুর পরে পূজনীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের "শব্দকথার" প্রবন্ধাবলীকে উল্লেখ করা যেতে' পারে। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর পরিষদের তরফ থেকে যে ব্যাকরণ বা'র ক'রেছেন, তা অতি চমৎকার জিনিস। তিনি তাঁর "বাঙ্গলা শব্দকোষ"-এ যতটা সংস্কৃতের দিকে ঝুঁকে'ছেন, বাঙলার প্রকৃতি ঠিক মত বুঝে' লেখার দরুণ তাঁর "বাঙ্গলা ব্যাকরণে" খাঁটী বাঙলাই বাহাল আছে। তিনি একখানি সুন্দর বাঙলা ব্যাকরণ লিখে'ছেন—কিন্তু কাজ এখনও ঢের বাকী। ঐতিহাসিক আর তুলনামূলক পদ্ধতিতে সবদিক বিচার ক'রে আমাদের ভাষার ইতিহাস এখনও লেখা হয় নি। বাঙলার ধ্বনি ও উচ্চারণ-তত্ত্ব এক অতি জটিল জিনিস—একে সহজে ধরা ছোঁয়া যায় না—নানান্ জাতের বিশেষত্ব এতে লুকিয়ে' আছে—ধাতু আর শব্দরূপের মত উপর উপর থেকেই এর আলোচনা শেষ হ'তে পারে না। অথচ এই ধ্বনি আর উচ্চারণ-তত্ত্বেই বাঙলা ভাষার আধেকের উপর গুপ্ততত্ত্ব নিহিত র'য়েছে। পূজনীয় রবীন্দ্র বাবু বাঙলা উচ্চারণের আর বাঙলার ছন্দের মূল সূত্রগুলি ধ'রে দিয়ে'ছেন। এ বিষয়ে অল্প স্বল্প কাজ চ'লছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত—বিশেষত শাস্ত্রী মহাশয় 'অকারতত্ত্ব' ব'লে সম্প্রতি যে প্রবন্ধটী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ ক'রেছেন, তা অপূর্ব্ব, তাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে'ছেন।

ভাষাতত্ত্ব জিনিসটা আলোচনা ক'রবার অধিকার সকলেরই আছে। ভাষা সকলেই ব্যবহার করেন। এই বিদ্যা বা বিজ্ঞান চর্চ্চা ক'রতে গেলে ল্যাবরেটরী আর যন্ত্রপাঁতির দরকার নেই—মনই হচ্ছে এর রসায়নাগার। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত উপায়ে চর্চ্চা না ক'রলে কোনও

লাভ নেই, বরং উল্টো উৎপত্তি হয়। এই বিদ্যার ব্যাকরণ শিখে' না নিয়ে' এতে হাত দিলে লোকে তাল ঠিক রাখতে পারে না—রকমারি হাস্যজনক ভুল ধারণায় প'ড়ে যায়। যাঁরা বাঙলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে' কিছু কাজ ক'রতে চান, তাঁরা আগে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যার মূলসূত্রগুলি পড়ুন, এদেশের আর্য্য অনার্য্য ভাষাগুলির সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খবর গুলি জানুন, বিদেশে আর্য্য ভাষাগুলির ইতিহাসেরও একটু পরিচয় ক'রে নিন। He knows not England who only England knows. যিনি কেবল বাঙলা, সংস্কৃত আর প্রাকৃতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত, অথচ প্রাচীন ঈরানীয় বা পুরানো গ্রীক, বা মধ্যযুগের রাজস্থানী, বা আনাম প্রদেশের ভাষা বা এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাগোষ্ঠীর কোনও খবর রাখেন না বা রাখা আবশ্যক মনে করেন না, তাঁর দ্বারা এ কাজ ভাল ক'রে হবে না। দু'রকমে একটি জিনিসকে বোঝা যায়—static আর dynamic—স্থিতিশীল বা আভ্যন্তরীন, আর গতিশীল বা বহির্মুখী হিসাবে। এ জ্ঞানে গভীরতা আর ব্যাপকতা দুই-ই চাই। নাড়ী নক্ষত্রের জ্ঞান চাই—ভিতরের সব খুঁটী-নাটীর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগতের খবরও সেই অনুপাতেই রাখতে হবে। অন্যথা আলোচনা একদেশদর্শী হ'য়ে প'ড়বে।

সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যরা বাঙলা ভাষার সেবায় কি কি কাজ ক'রতে পারেন তা পরিষদের পরিচালকগণ নিয়মাবলীতে ব'লে দিয়ে'ছেন। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কথা আমি ব'লতে পারি না—তবে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা সহজেই অনেক কাজ ক'রতে পারেন। যাঁদের এদিকে ঝোঁক আছে, তাঁদের বিশেষ ভাবে আমি ব'লছি, সংগ্রহের কাজে লেগে' যান। গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ, (শব্দগুলির

প্রয়োগের দৃষ্টান্তের সঙ্গে); বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে প্রযুক্ত শব্দ-সংগ্রহ (যেমন তাঁতীর কাজের যন্ত্রপাঁতির আর তার পা'টের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের শব্দ, কিম্বা নৌকা-ঘটিত সমস্ত শব্দ); নিজ নিজ থানা বা মহকুমার মধ্যে যে সকল নাম মিলে, যার মানে কেউ ক'রতে পারে না, সেই সকল নাম সংগ্রহ। এগুলি যোগাড় করা বিশেষ পরিশ্রমের কাজ নয়, এতে খুব বিদ্যার দরকার করে না, এর জন্যে কেবল কান একটু খাড়া রাখতে হয়, আর একখানা নোটবুকে যা শুনলুম আর অসাধারণ ব'লে মনে লাগল, সেগুলিকে টুকে রাখলেই হ'ল। এটি হচ্ছে বুনিয়াদ-কাটা-মজুরের কাজ, কিন্তু এর সাহায্য না হ'লে দালান-কুঠী উঠতেই পারে না।

মুরুব্বিয়ানা চালে, যাকে ex-cathedra বলে, অনেকগুলি কথা ব'ললুম। এ বিষয়ে আমরা কি রকম ভাবে কাজ ক'রতে পারি, সে সম্বন্ধে আমার মনে যা এসে'ছে তাই আপনাদের গোচর ক'রলুম। এরূপ ভাবে ফরমাইস ক'রে যাওয়া আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, কারণ আমি এই পথের একজন সামান্য যাত্রী মাত্র; কিন্তু অনুরোধে প'ড়ে এই অনধিকার চর্চ্চা ক'রেছি, আপনারা আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাম ও শ্যাম।

শ্রীমান চিরকিশোর,

কল্যাণীয়েষু—

আর পাঁচজনের দেখাদেখি আমিও অতঃপর গল্প লিখতে সুরু করেছি, কেননা গল্প না লিখলে আজকাল সাহিত্য-সমাজে কোনরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে যে লিখি নি তার কারণ লেখবার এমন কোনও বিষয় দেখতে পাই নি, যা পূর্ব্ব-লেখকরা দখল করে না নিয়েছেন। শেষটা আবিষ্কার করলুম, বাঙলার গল্প-সাহিত্যে আদর্শ পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করা বড়ই দুর্লভ, যা দুর্লভ তাই সুলভ করবার উদ্দেশ্যেই আমার এ গল্প লেখা। আমার হাতের প্রথম গল্পটি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমার মতে সেটি উৎরে থাকে, তাহলে পরে ঐ বিষয়ে একটি বড় গল্প লিখব, ক্রমে সাহস বেড়ে গেলে অবশেষে এই একই বিষয়ে চাই কি একটি মহাকাব্যও লিখতে পারি। একটা কথা বলে রাখি, মানুষে যাকে সুন্দর বলে এ গল্পের ভিতর তার নাম গন্ধও নেই—যদি কিছু থাকে ত, আছে শিব। আর সত্য?—গল্পের ভিতর ও-বস্তু সেই খোঁজে, যে ইতিহাস ও উপন্যাসের ভেদ জানে না। তোমার দৃষ্টির জন্য এইসঙ্গে গল্পটির জাবেদা নকল পাঠাচ্ছি।

গল্প।

প্রথম অঙ্ক।

স্বভাব।

বাঙলা দেশের একটি পাড়াগেঁয়ে-সহরে দু'কড়ি দত্তের সহধর্ম্মিণী যখন যমজ পুত্র প্রসব করলেন, তখন দত্তজা মহাশয় ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এ দুই ছেলে বড় হলে যে কত বড় লোক হবে, সে কথা জানলে তাঁর আনন্দের অবশ্য আর সীমা থাকত না। কিন্তু কি করে তিনি তা জানবেন? এই কলিকালে কারও জন্মদিনে ত কোনও দৈববাণী হয় না, অতএব বলা বাহুল্য তাদের জন্মদিনেও হয় নি।

তবে ছেলে দুটির বিষয়বুদ্ধি যে নৈসর্গিক এবং অসাধারণ, তার পরিচয় সেইদিনই পাওয়া গেল। তারা ভূমিষ্ট হতে না হতেই, তাদের জননীকে আধাআধি ভাগ বাটোয়ারা করে নিলে। একটি দখল করে নিলে তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ, আর একটি দখল করে নিলে তাঁর বাম অঙ্গ, এবং এই সুবন্দোবস্তের ফলে, মাতৃদুগ্ধ তারা সমান অংশে পান করতে লাগল। মাতৃদুগ্ধ পান করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির নামই যদি হয় মাতৃ-ভক্তি, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে,—এই ভ্রাতৃযুগলের তুল্য মাতৃভক্ত শিশু ভারতবর্ষে আর কখনো জন্মায় নি। ফলে, তারা দুধ না ছাড়তেই তাঁদের মাতা দেহ ছাড়লেন—ক্ষয়রোগে।

এখানে একটি কথার উল্লেখ করে রাখা আবশ্যক। এরা দু'ভাই এমনি পিঠ পিঠ জন্মেছিল যে, এদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট তা কেউ স্থির করতে পারলেন না। এইটেই রয়ে গেল এদের জীবনের আসল রহস্য, অতএব এ গল্পেরও আসল রহস্য। সে যাইহোক, কার্য্যত

দুই ভাই শুধু একবর্ণ একাকার নয়, এক-ক্ষণজন্মা বলে প্রসিদ্ধ হলো।

শুভদিনে শুভক্ষণে তাদের অন্নপ্রাশন হলো, এবং দত্তজা তাঁদের নাম রাখলেন—রাম ও শ্যাম। পৃথিবীতে যমজের উপযুক্ত এত খাসা খাসা জোড়া নাম থাকতে,—যেমন নকুল-সহদেব, হরি-হর, কানাই-বলাই প্রভৃতি, রাম শ্যামই যে দত্ত মহাশয়ের কেন বেশি পছন্দ হল, তা বলা কঠিন। লোকে বলে দত্তজা পুত্রদ্বয়ের আকৃতির নয়, বর্ণের উপরেই দৃষ্টিরেখে এই নামকরণ করেছিলেন। এই যমজের দেহের যে বর্ণ ছিল তার ভদ্র নাম অবশ্য শ্যাম। সে যাইহোক এটা নিশ্চিত যে, তাঁর পুত্রদ্বয় যে একদিন তাদের নাম সার্থক করবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। এতে তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। কারণ রাম-শ্যামের নাম-করণের সময় আকাশ থেকে ত আর পুষ্পবৃষ্টি হয় নি।

অনেকদিন যাবৎ রাম শ্যামের কি শরীরে, কি অন্তরে, মহাপুরুষ-সুলভ কোনরূপ লক্ষণই দেখা যায় নি। তারা শৈশবে কারও ননিচুরি করে নি, বাল্যে কারও মন-চুরি করে নি। তাদের বাল্যজীবন ছিল ঠিক সেই ধরনের জীবন যেমন আর পাঁচ জনের ছেলের হয়ে থাকে। ছেলেও ছিল তারা নেহাৎ মাঝারি গোছের, কিন্তু তা সত্বেও কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতে তারা স্কুলের ছেলেদের একদম দলপতি হয়ে উঠল। তাদের আত্মশক্তি যে কোন্ ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হবে, তার পূর্ব্ব সূচনা এইখান থেকেই সকলের পাওয়া উচিত ছিল।

সকল বিষয়ে মাঝারি হয়েও তারা সকলের মাথা হল কি করে? এর অবশ্য নানা কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তারা ছিল চৌকোশ। যে সব ছেলেরা পড়ায় ফার্ষ্ট হত—তারা খেলায়

লাষ্ট হত, আর যে সব ছেলেরা খেলায় ফাষ্ট´ হত—তারা পড়ায় লাষ্ট হত। পাছে কোন বিষয়ে লাষ্ট হতে হয়, এই ভয়ে তারা কোন বিষয়েই ফাষ্ট´ হয় নি। চৌকোশ হতে হলে যে মাঝারি হতে হয়, এ জ্ঞান তাদের ছিল; কেননা বয়েসের তুলনায় তারা ছিল যেমন সেয়ানা তেমনি হুঁসিয়ার।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাদের শরীরে এমন একটি গুণ ছিল, যা এদেশে ছোটদের কথা ছেড়ে দেও—বড়দের দেহেও মেলা দুষ্কর। তারা ছিল বেজায় কৃতকর্ম্মা ছেলে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে energetic. স্কুলের যত ব্যাপারে তারা হত যুগপৎ অগ্রগামী ও অগ্রণী। চাঁদা, সে ফুটবলেরই হোক আর সরস্বতী পুজোরই হোক, তাদের তুল্য আর কেউ আদায় করতে পারত না। উকিল মোক্তার-দের কথা ত ছেড়েই দাও, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদের বাড়ী পর্য্যন্ত তারা চড়াও করত এবং কখনো শুধু হাতে ফিরত না। তারা ছিল যেমনি ছটফটে তেমনি চটপটে। একে ত তাদের মুখে খই ফুটত, তার উপর চোখ কোথায় রাঙাতে হবে ও কোথায় নামাতে হবে, তা তারা দিব্যি জানত। স্কুলের ছেলেদের যত রকম ক্লাব ছিল, এক ভাই হত তার সেক্রেটারি আর এক ভাই হত তার ট্রেজেরার। তারপর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে যত প্রকার আবেদন নিবেদন করা হত, রাম শ্যাম ছিল সে সবের যুগপৎ কর্ত্তা ও বক্তা। উপরন্তু মাষ্টারদের অভিনন্দন দিতেও তারা ছিল যেমন ওস্তাদ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও তারা ছিল তেমনি ওস্তাদ। এক কথায় সাবালক হবার বহুপূর্ব্বে তারা দুজনে হয়ে উঠেছিল, স্কুল-পলিটিক্সের দুটি অ-তৃতীয় নেতা।

এই নেতৃত্বের বলে, তারা স্কুলটিকে একেবারে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে

চাগিয়ে তুলেছিল। যতদিন তারা দু'ভাই সেখানে ছিল ততদিন স্কুলটির জীবন ছিল, অর্থাৎ আজ নালিশ কাল সালিশ, পরশু ধর্ম্মঘট এই সব নিয়েই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। ফলে কত ছেলে বেত খেলে, কত ছেলের নাম কাটা গেল, কিন্তু রাম শ্যামের গায়ে যে কখনও আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগল না, সে তাদের ডিপ্লোমাসির গুণে। ডিপ্লোমাসি যে পলিটিক্সের দেহ, সে সত্য তারা নিজেই আবিষ্কার করেছিল।

তারপর পলিটিক্সের যা প্রাণ, অর্থাৎ পেট্রিয়টিজম সে বিষয়েও, আর কেউ ছিল না যে, রাম শ্যামের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে। স্ব-স্কুল সম্বন্ধে তাদের মমত্ববোধ এত অসাধারণ ছিল, যে আমি যদি জর্ম্মান দার্শনিক হতুম তাহলে বলতুম যে সমগ্র স্কুলের "সমবেত আত্মা" তাদের দেহে বিগ্রহবান হয়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাদের স্কুলের সঙ্গে অপর কোন স্কুলের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচ হলে রাম শ্যাম তাতে যোগ দিত না বটে—কিন্তু সকলের আগে দাঁড়াত এবং প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমান বাক্যবর্ষণ করত,—কখনো স্বপক্ষকে উৎসাহিত করবার জন্য, কখনো বিপক্ষকে লাঞ্ছিত করবার জন্য। স্বপক্ষ জিৎলে তারা ইংরাজিতে "ব্র্যাভো" "হিপ হিপ হুর্‌রে" বলে তারস্বরে চিৎকার করত। আর বিপক্ষদল জিৎলে তারা প্রথমেই রেফারিকে জুয়োচোর বলে বসত, তাতে কেউ প্রতিবাদ করলে, রাম শ্যাম অমনি, my school right or wrong বলে এমনি হুঙ্কার ছাড়ত যে স্বদলবলের ভিতর সে হুঙ্কারে যাদের স্কুল পেট্রিয়টিজম প্রকুপিত হয়ে উঠত, তারা বেপরোয়া হয়ে, বিপক্ষদলের সঙ্গে মারামারি করতে লেগে যেত। মারামারি বাধবামাত্র রাম শ্যামের দেহ অবশ্য

এক নিমেষে সেখান থেকে অন্তর্ধান হত কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের আত্মা বিরাজ করত। জানো ত আত্মার ধর্ম্মই এই যে, তা যেখানে আছে সেখানে সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু কোথায়ও তাকে ধরে-ছুঁয়ে পাবার যো নেই।

রাম শ্যামের এই বাল্যলীলা থেকে বোধ হয় তুমি অনুমান করতে পেরেছ যে, এরা দু'ভাই কলিযুগের যুগ ধর্ম্মের অর্থাৎ পলিটিক্সের—যুগল অবতার স্বরূপে এই ভু-ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শিক্ষা।

রাম শ্যাম ষোল বৎসরও অতিক্রম করলেন, সেইসঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হলেন, অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। যেমন তেমন করে হোক্ হাতের পাঁচ রাখতে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

এরপর তাঁরা কলকাতায় পড়তে এলেন। এইখান থেকেই তাঁদের আসল পলিটিক্সের শিক্ষা-নবিসি সুরু হল। কলেজে ভর্ত্তি হবামাত্র নিজের প্রতি তাঁদের ভক্তি যথোচিত বেড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁদের উচ্চ আশা সিমলাস্পর্দ্ধী হয়ে উঠল। সহসা তাঁদরে হুঁস হল যে, স্কুল কলেজের মোড়লী করা-রূপ তুচ্ছ ব্যবসায়ের মজুরি তাঁদের মত শক্তি-শালী লোকের পোষায় না। তাই তাঁরা মনস্থির করলেন, তাঁরা হবেন দেশ-নায়ক। এবং পলিটিক্সের মহানাটকের অভিনয়ে যাতে সর্ব্বাগ্রগণ্য হতে পারেন, তার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন।

মহানগরীর আবহাওয়া থেকে এ তথ্য তাঁরা দু'দিনেই উদ্ধার করলেন যে, এ যুগে ধর্ম্মবলও বল নয়, কর্ম্মবলও বল নয়, একমাত্র বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, ওরফে বাক্যবল। এ বল যে তাঁদের শরীরে আছে, তার পরিচয় তাঁরা স্কুলেই পেয়েছিলেন। স্বাক্ষরিত অভিনন্দনপত্র এবং বেনামী দরখাস্ত লিখে, জিভের জোরে একদিকে বড়দের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে, আর একদিকে ছোটদের কাছ থেকে ভয়ভক্তি আদায় করে তাঁরা বাক্যবলের কতকটা চর্চ্চা ইতিপূর্ব্বেই করেছিলেন, এবার তার সম্যক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন।

রাম শ্যাম যেমন এ ধরাধামে প্রবেশ করা মাত্র, তাঁদের জননীকে, আপোষে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে ভোগ দখল করে ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করামাত্র, তাঁরা তদ্রূপ আপোষে মা-সরস্বতীকে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে, ভোগ-দখল করতে ব্রতী হলেন। বাণীর একালে দুটি অঙ্গ আছে, এক রসনা আর এক লেখনী। রাম ধরলেন বক্তৃতার দিক, আর শ্যাম ধরলেন লেখার দিক। এর কারণ, স্কুলে থাকতেই তাঁরা প্রমাণ পেয়েছিলেন যে, অভিনন্দন জবর হত রামের মুখে আর অভিযোগ জবর হত শ্যামের কলমে।

বলা বাহুল্য নৈসর্গিক প্রতিভার বলে, অচিরে রাম হয়ে উঠলেন একজন মহাবক্তা আর শ্যাম হয়ে উঠলেন একজন মহালেখক। যা এক কথায় বলা যায় রাম তা অনায়াসে এক-শ' কথায় বলতেন, আর যা এক ছত্রে লেখা যায়, শ্যাম তা অনায়াসে এক-শ' ছত্রে লিখতেন! রাম শ্যামের বক্তব্য অবশ্য বেশি কিছু ছিল না। তার কারণ যারা অহর্নিশি পরের ভাবনা ভাবে তারা নিজে কোন কিছু ভাববার কোন অবসরই

পায় না। ফলে, অনেক কথা বলে কিছু না বলার আর্টে তাঁরা Gladstone-এর সমকক্ষ হয়ে উঠলেন।

রামের মুখ ও শ্যামের কলম থেকে অজস্র কথা যে অনর্গল বেরত তার আরও একটি কারণ ছিল। জ্ঞানের বালাই ত তাঁদের অন্তরে ছিলই না, তার উপরে যে ধর্ম্ম শরীরে থাকলে, মানুষের মুখে কথা বাধে, কলমের মুখে কথা আটকায় সে ধর্ম্ম, অর্থাৎ সত্যমিথ্যার ভেদ-জ্ঞান, দুকড়ি দত্তের বংশধর যুগলের দেহে আদপেই ছিল না! এ জ্ঞানের অভাবটা যে পলিটিটিক্সে ও গল্প-সাহিত্যে কত বড় জিনিষ, সে কথা কি আর খুলে বলা দরকার?

যদি জিজ্ঞাসা করো যে তাঁরা এই অতুল বাক্-শক্তির চর্চ্চা কোথায় এবং কি সুযোগে করলেন, এক কথায়, কোথায় তাঁরা রিহার্সেল দিলেন?—তার উত্তর, কলেজের ছাত্রদের কলিকাতা সহরে, যতরকম সভাসমিতি আছে, রাম তাতে অনবরত বক্তৃতা করতেন এবং শ্যাম সে সবের লেখালেখির কাজ দু'বেলা করতেন, তার উপর নানা কাগজে নানা ছদ্ম-নামে নানা সত্যমিথ্যা পত্রও লিখতেন। সে সকল অবশ্য ছাপাও হত। বিনে পয়সায় লেখা পেলে কোন্ কাগজ ছাড়ে!

পূর্ব্বেই বলেছি, রাম শ্যামের বক্তব্য বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু যেটুকু ছিল তার মূল্য অসাধারণ। মাণিকের খানিকও ভাল, এ কথা কে না জানে? একেত তাঁদের ভাষা ছিল গালভরা ইংরেজি তার উপর ভাব আবার বুকভরা পেট্রিয়টিক, এই মাণকাঞ্চনের যোগ দেখলে, প্রবীনদেরই মাথার ঠিক থাকে না,—নবীনদের কথা ত ছেড়েই দেও। তাঁদের সকল কথা সকল লেখার মূলসূত্র ছিল এক। তাঁরা একালের ইউরোপের সঙ্গে সেকালের ভারতের তুলনা করে দেখিয়ে দিতেন যে,

একালের আর্থিক সভ্যতা সেকালের আধ্যাত্মিক সভ্যতার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত হেয়। তাঁরা এই মহাসত্য প্রচার করতেন যে, অতীত ভারতই পতিত ভারতকে উদ্ধার করবে, অপর কোনও উপায় নেই। রামের মুখে একথা শুনে, শ্যামের লেখায় এ কথা পড়ে, আমাদের সকলের চোখেই জল আসত, আর দু'চারজন উৎসাহী লোক ঘর ছেড়ে বনেও চলে গেল—অতীতের সন্ধানে। এরপর, রাম শ্যামের পেট্রিয়টিজমের খ্যাতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীর টপ্‌কে যে সমগ্র সহরে ছড়িয়ে পড়ল তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে ত হবারই কথা।

রাম শ্যাম দেশের অতীত সম্বন্ধে যতই বলা কওয়া করুন না কেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিন্তু সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। দেশের ভবিষ্যতের উপায় যাইহোক্, নিজের ভবিষ্যৎ যে বর্ত্তমানের সাহায্যেই গড়ে তুলতে হয়, এ জ্ঞান তাঁরা ভুলেও হারান নি। পাশ না করলে যে পয়সা রোজগার করা যায় না, আর বাক্যের পিছনে অর্থ না থাকলে তার যে কোনও বলই থাকে না,—এ পাকা কথাটা তাঁরা ভাল রকমই জানতেন। তাই তাঁরা যথাসময়ে বি এ এবং বি এল পাস করলেন, দুই-ই অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করলে লোকে বলত, খুব মুখস্থ করেছে আর থার্ড ডিভিসনে পাস করলে বলত, ভাল মুখস্থ করতে পারে নি। এই দুই অপবাদ এড়াবার জন্যই তাঁরা সেকেণ্ড ডিভিসনে স্থান নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন! মুখস্থ অবশ্য তাঁরা ঢের করেছিলেন, সে কিন্তু সেই সব বড় বড় ইংরেজি কথা, যা বক্তৃতার আর লেখার কাজে লাগে।

সংসারের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের তাঁরা যে কোন ক্ষেত্র দখল করবেন, সে বিষয়ে তারা একদম মনস্থির করে ফেললেন। রাম ঠিক করলেন

তিনি হবেন একজন বড় উকিল, আর শ্যাম ঠিক করলেন তিনি হবেন একজন বড় এডিটার। এরথেকে তুমি যেন মনে করোনা যে তাঁরা পলিটিক্সের দিকে পিঠ ফেরাবার বন্দোবস্ত করলেন। রাম শ্যাম অত কাঁচা, অত বে-হিসাবী ছেলে ছিল না। তারা বেশ জানত যে পেট্রিয়-টিজমের সাহায্যে তারা ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করবে আর একবার ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে পারলে, দেশের লোক ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পলিটিক্সের নেতা করে দেবে।

এইখানে একটি কথা বলে রাখি। আকৃতি প্রকৃতিতে রামের সঙ্গে শ্যামের পোনেরো আনা তিন পাই মিল থাকলেও এক পাই গরমিল ছিল, যে গরমিল একবৃন্তে দুটি ফুলের মধ্যে চিরদিনই থেকে যায়।

প্রথম রামের ছিল মোটার ধাত, আর শ্যামের রোগার ধাত। দ্বিতীয়ত, রামের কণ্ঠস্বর ছিল ভেরীর মত, আর শ্যামের তুরীর মত, জোর অবশ্য দু'য়েরি সমান ছিল, কিন্তু একটা খাদের দিকে, আর একটা জিলের দিকে।

কালিদাস বলে গেছেন যে বড়লোকের প্রজ্ঞা তাদের আকারের সদৃশ হয়। এক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কবির কথা মিথ্যে নয়। দু'জনের মধ্যে রাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত সুস্থ, আর শ্যাম অপেক্ষাকৃত ব্যস্ত। রাম ছিল বেশি দরবারী, আর শ্যাম ছিল বেশি তকরারী। রামের কৃতীত্ব ছিল হিক্‌মতে, শ্যামের হুজ্জুতে। রাম সিদ্ধহস্ত ছিল দল পাকাতে, আর শ্যাম দল ভাঙাতে। এক কথায় দলাদলী ছিল রামের পেশা, আর শ্যামের নেশা। রামের motto ছিল আগে ভেদ তারপরে সাম, আর শ্যামের motto ছিল আগে ভেদ তারপরে বিগ্রহ; কেন না রাম চাইতেন লোকে তাঁকে ভক্তি করুক আর শ্যাম চাইতেন লোকে তাঁকে ভয়

করুক। তাঁদের চরিত্রের প্রভেদটা একটি ব্যপার থেকেই স্পষ্ট দেখান যায়। আগেই বলেছি যে, স্কুলকলেজে যত প্রকার সভাসমিতি ছিল, এই ভাতৃযুগল সে সবের সেক্রেটারি ও ট্রেজারের পদ অধিকার করে বসতেন। কিন্তু রাম বরাবর ট্রেজারারই হতেন আর শ্যাম সেক্রেটারি।

এহেন চরিত্র এহেন বুদ্ধি নিয়ে রাম ও শ্যাম যখন সংসারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, তখন সকলেই বুঝল যে, তাঁরা জীবনে একটা বড় খেলা খেলবেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

পেট্রিয়টিজম।

যিনি মহাপুরুষ-চরিতের চর্চ্চা করেছেন তিনিই জানেন যে, তাঁদের জীবনের একটা ভাগ তাঁরা অজ্ঞাতবাসে কাটান; সে সময় তাঁরা কোথায় ছিলেন, কি করেছেন, সে খবর কেউ জানে না।

কলেজ ছাড়বার পর রাম শ্যাম দশ বৎসরের জন্য লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। এ কয় বৎসর তাঁরা যে কোথায় ছিলেন, এবং কি করেছেন, সে খবর কেউ জানে না।

তারপর স্বদেশী যুগে তাঁদের পুনরাবির্ভাব হলো। "বন্দে মাতরম"-এর ডাক শুনে তাঁদের সুপ্ত মাতৃভক্তি আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না, অমনি অজ্ঞাতবাস ছেড়ে প্রকাশ্য মাতৃ-সেবায় লেগে গেলেন। যে অগাধ মাতৃ-ভক্তি শৈশবে তাঁদের গর্ভ-ধারিণীর হৃদয়ের উপর ন্যস্ত ছিল, পূর্ণযৌবনে তা তাঁদের জন্মভূমির পৃষ্ঠে গিয়ে ভর করলে। লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

বাতাসের স্পর্শে জল যেমন নেচে ওঠে, আগুণের স্পর্শে খড় যেমন জ্বলে ওঠে, রামের রসনা আর শ্যামের লেখনীর স্পর্শে, আমাদের হৃদয় তেমনি উদ্বেলিত আন্দোলিত হয়ে উঠল, আমাদের উৎসাহ তেমনি সংধুক্ষিত প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

এবার তাঁরা ধরলেন এক নতুন সুর। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অতীতকে তাঁরা টেঁকে গুঁজে, ভারতবর্ষের আর্থিক ভবিষ্যতের তাঁরা ব্যাখ্যান সুরু করলেন। তাঁদের বাক্যবলে সে ভবিষ্যৎ অন্নবস্ত্রে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ছবি দেখে সকলেরি মুখে জল এল। যারা পূর্ব্বে বনে চলে গিয়েছিল তারা আবার ঘরে ফিরে এল।

রাম যখন স্পষ্ট করে বললেন যে, "আমি দেশের চিনি খাব" আর শ্যাম যখন স্পষ্ট করে লিখলেন যে, "আমি দেশের নুন খাব"—তখন আর কারও বুঝতে বাকী থাকল না যে, তাঁরা দু'জনে একালের যুগধর্ম্ম প্রচার করতে এসেছেন, অমনি আমাদের মনে তাঁদের প্রতি ভক্তি উথলে উঠল।

যুগধর্ম্মের প্রচারের যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য দেশের লোক চাঁদা করে টাকা তুলে শ্যামের জন্য একখানি ইংরেজি কাগজ বার করে দিলেন, সে কাগজের নাম হ'ল—Nationalist. শ্যামের হাতে পড়ে সেখানি হয়ে উঠল—একখানি চাবুক। শ্যাম সজোরে তা আকাশের উপর চালাতে লাগলেন, তার পটপটানির আওয়াজে, আকাশ-বাতাস ভরে গেল। সেই রণবাদ্য শুনে আমাদের বুকের পাটা দশগুণ বেড়ে গেল।

কথায় বলে, দিন যেতে জানে ক্ষণ যেতে জানে না। শ্যামের ভাগ্যে ঘটলও তাই। এই চাবুক দৈবাৎ একদিন একটি বড় সাহেবের

গায়ে লেগে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্যামের বিরুদ্ধে মানহানীর নালিশ করলেন। দেশময় রৈ রৈ হৈ হৈ পড়ে গেল।

যথাসময়ে ফৌজদারী আদালতে শ্যামের বিচার হল। এবং এই সূত্রে রাম তাঁর অ-সাধারণ আইনের জ্ঞান ও অ-সামান্য ওকালতি-বুদ্ধি দেখাবার একটি অ-পূর্ব্ব সুযোগ পেলেন। রামের জেরার জোরে বাহাজের বলে, আইনের হিক্‌মতে মামলা মাজপথেই ফেঁসে গেল। রাম নিম্ন আদালতে আইনের যে সব কূটতর্ক তুলেছিলেন, সে তর্ক এখানে তুললে তুমি ভেবড়ে যাবে, কেননা তার মর্ম্ম তুমি বুঝতে পারবে না; বেচারা মাজিষ্ট্রেটও তার নাগাল পায় নি। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কি রকম বুদ্ধি খেলিয়ে ছিলেন, তার একটা পরিচয় দেই। রাম এই আপত্তি তুললেন যে, ইংরেজের ইংরাজির যা মানে, শ্যামের ইংরাজির সে মানে করলে, আসামীর উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হবে। কেননা শ্যাম যে ভাষা লেখেন সে তাঁর নিজস্ব-ভাষা, এক কথায় সে হচ্ছে শ্যামের স্বকৃত-ভঙ্গ ইংরাজি! বাঙলা খুব ভাল না জানলে সে ইংরাজির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ফরিয়াদির সাহেব-কৌঁচুলি এ আপত্তির আর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না, কেননা তিনি একথা অস্বীকার করতে পারলেন না যে, শ্যামের ইংরাজি ইংলণ্ডের ইংরাজি নয়। শ্যাম খালাস হলেন। লোকে রাম শ্যামের জয় জয়কার করতে লাগল।

শ্যাম যে দিন খালাস পেলেন, বাঙলার সেদিন হ'ল—ইংরাজরা যাকে বলে, একটি লাল হরফের দিন। লোকের অমন আনন্দ অমন উল্লাস, সেদিনের পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নি।

এমন কি এই কচ্‌কে কলকাতা সহরের লোকরাও সেদিন যে কাণ্ড

করেছিল তা এতই বিরাট যে বীরবলী ভাষায় তার বর্ণনা করা অসাধ্য, তার জন্য চাই মেঘনাদবধের কলম। রাম শ্যামকে একটি ফিটানে চড়িয়ে হাজার হাজার লোক বড়রাস্তা দিয়ে সেই ফিটান যখন টেনে নিয়ে যেতে লাগল, তখন পথ ঘাট সব লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, এত লোক বোধ হয় জগন্নাথের রথ যাত্রাতেও একত্র হয় না। লোক বললে রাম শ্যাম কৃষ্ণার্জ্জুন। তারপর এই যুগলমূর্ত্তি দেখবার জন্য জনতার মধ্যে এমনি ঠেলাঠেলি মারামারি লেগে গেল যে, কত লোকের যে হাত পা ভাঙ্গলে তার আর ঠিক ঠিকানা নেই।

আমি ভিড় দেখলে ভড়কাই—ওর ভিতর পড়লে বেঁহোস হয়ে যাবার ভয়ে, এবং সেই ভয়ে চড়কের সং দেখাছাড়া অপর কোনও শোভাযাত্রা দেখতে কখনও ঘর থেকে বার হইনে। কিন্তু সেদিন উৎসাহের চোটে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম। চোর-বাগানের মোড়ে গিয়ে যখন দেখলুম যে, চিৎপুরের দুধার থেকে রাম শ্যামের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, তখন আমার চোখেও জল এসেছিল। আর কোনও গুণের না হোক পেট্রিয়টিজমের সম্মান যে বাঙালী করতে জানে, সেদিন তার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেল।

এইখান থেকেই দেশ আবার মোড় ফিরলে; অর্থাৎ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই স্বদেশী আন্দোলন উপরের চাপে বসে গেল। কত ছা-পোষা লোকের চাকরি গেল, কত ছেলের স্কুল থেকে নামকাটা গেল, কত যুবক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হল, বাদবাকী আমরা সব একদম দমে গেলুম। রাম শ্যামের গায়ে কিন্তু আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগল না। অনেক কথা বলে কিছু না বলার আর্টের যে কি গুণ, এবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁরা অবশ্য দমেও গেলেন না। এ দুই ভাই

এই হাঙ্গামার ভিতর থেকে শুধু যে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলেন তাই নয়—তাঁদের মনেরও কোন জায়গায় আঘাত লাগল না; কেননা স্বদেশীর সকল কথাই দিবারাত্র তাঁদের মুখের উপরই ছিল, তার একটি কথাও তাঁদের বুকের ভিতর প্রবেশ করবার ফুরসৎ পায়নি!

রামের ওকালতির সনন্দ আর শ্যামের খবরের কাগজ দুই-ই অবশ্য তাঁদের হাতেই রয়ে গেল। তারপর দেশ যখন জুড়ল, তখন রামের ওকালতির পশার ও শ্যামের কাগজের প্রসার, শুক্ল-পক্ষের চন্দ্রের মত দিনের পর দিন আপনা হতেই বেড়ে যেতে লাগল। শেক্সপিয়র বলেছেন যে, মানুষমাত্রেরই জীবনে এমন একটা জোয়ার আসে, যার ঝুঁটি চেপে ধরতে পারলে তার কাঁধে চড়ে যেখানে প্রাণ চায়, সেখানেই যাওয়া যায়। যে স্বদেশীর জোয়ারে আমরা সকলেই হাবুডুবু খেলুম এবং অনেকে একেবারে ডুবে গেল, রাম শ্যাম তার কাঁধে চড়ে একজন বড় উকিল আর একজন বড় এডিটার হতে চললেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

ইভলিউসান।

অবতারের কথা হচ্ছে—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। মহাপুরুষদের লীলাও নিত্য-লীলা নয়। তাঁরা অনাবশ্যকে দেখা দেন না, যখন দরকার বোঝেন তখনই আবার আবির্ভূত হন।

স্বদেশী আন্দোলন চাপা পড়বার ঠিক দশ বৎসর পরে রাম শ্যাম রাজনীতির আসরে আবার সদর্পে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু সে এক নব মূর্ত্তিতে, যুগল রূপে নয়—স্ব স্ব রূপে। তাঁদের উভয়ের-ই চেহারা

আর সাজগোজ ইতিমধ্যে এতটা বদ্‌লে গিয়েছিল যে, তাঁদের দু'জনকে যমজভ্রাতা ত অনেক দূরের কথা, পরস্পরের ভ্রাতা বলেই চেনা গেল না।

রামের দেহটি হয়েছিল ঠিক ঢাকের মত আর শ্যামের হয়েছিল তার কাটির মত, এর কারণ রামের হয়েছিল বহুমূত্র আর শ্যামের শ্বাসরোগ।

তাদের বেশভূষাও একদম বদ্‌লে গিয়েছিল। এবার দেখা গেল, রামের দাড়ি-গোঁফ দুই-ই কামানো, মাথার চুল কয়েদিদের ফ্যাসানে ছাঁটা এবং পরণে ইংরেজি পোষাক। হটাৎ দেখতে পাকা বিলেত ফেরত বলে ভুল হয়। অপরপক্ষে শ্যামের দেখা গেল, দাড়ি গোঁফ চুল সবই অতি প্রবৃদ্ধ, পরণে থানধুতি, গায়ে আঙরাখা, পায়ে তাল-তলার চটি, হঠাৎ দেখতে ঘোর থিয়জফিষ্ট বলে ভুল হয়।

এ হেন রূপান্তরের কারণ, ইতিমধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন এক-জন বড় উকিল আর শ্যাম হয়ে উঠেছিলেন একজন বড় এডিটার! এই বড় হবার চেষ্টার ফলেই তাঁদের এতাদৃশ বদল হয়েছিল। রামের পশার যেমন বাড়তে লাগল, তিনি চালচলনে তেমনি সাহেবি-আনার দিকে ঝুঁকতে লাগলেন, আর যত তিনি সেই দিকে ঝুঁকতে লাগলেন, তত তাঁর পশার বাড়তে লাগল। অপরপক্ষে শ্যামের কাগজের প্রসার যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে ঝুঁকতে লাগলেন; আর যত তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে ঝুঁকতে লাগলেন—তত তাঁর কাগজের প্রসার বাড়তে লাগল।

তাঁরা যে দুটি রোগ সংগ্রহ করেছিলেন, সেও ঐ বড় হবার পথে। এদেশে মস্তিষ্কের বেশি চর্চ্চা করলে যে বহুমূত্র হয়, আর হৃদয়ের বেশি চর্চ্চা করলে হাঁপানি হয়, একথা কে না জানে।

বাইরের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনের চেহারাও ফিরে গিয়েছিল।

এই দশ বৎসরের মধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন একজন রিফরমার, আর শ্যাম একজন নব্য-হিন্দু। সমাজ সংস্কার ছাড়া রামের মুখে অপর কোনও কথা ছিল না, আর বেদান্ত ছাড়া শ্যামের মুখে অপর কোনও কথা ছিল না। রাম বলতেন বাল্য-বিবাহ বন্ধ না হলে দেশের কোনও উন্নতি হবে না, আর শ্যাম বলতেন "অথাতো ব্রহ্ম" জিজ্ঞাসা না করলে দেশের কোনও উন্নতি হবে না। রাম বলতেন যে দেশের লোক যদি শক্তিশালী হতে চায় ত তাদের Eugenics মেনে চলতে হবে, আর শ্যাম বলতেন, ওর জন্য "শাস্ত্রযোনীত্বাৎ" মেনে চলতে হবে। রাম বলতেন জাতিভেদ তুলে দিতে হবে, শ্যাম বলতেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ফিরে আনতে হবে। এক কথায় রাম দোহাই দিতেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আর শ্যাম প্রাচ্য দর্শনের।

এর থেকে অবশ্য মনে করো না যে, আচারে বিচারে রাম শ্যামের ভিতর কোনরূপ প্রভেদ ছিল। যে কৌশলে কথা মুখে রাখলেও তা পেটে যায় না—সে কৌশলে তাঁরা চিরাভ্যস্ত ছিলেন। রাম তাঁর মেয়েদের যথাসময়ে অর্থাৎ দশ বৎসর বয়েসেই পাত্রস্থ করতেন,—প্রধানত পাত্রের জাত ও কুল দেখে, আর নিত্য মুরগি না খেলে শ্যামের অম্বল হত, আর চায়ের বদলে Bovril না খেলে তিনি জোর কলমে লেখবার মত বুকের জোর পেতেন না। সুরা অবশ্য দুজনেই পান করতেন, উভয়ে কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক রসের রসিক ছিলেন না। রাম খেতেন হুইস্কি আর শ্যাম ব্রাণ্ডি।

রাম শ্যামের কথার সঙ্গে কাজের এই গরমিলটা ইউরোপে অবশ্য

দোষ বলে গণ্য হ'ত—তার কারণ ইউরোপের মোটা বুদ্ধি, সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক-সত্যের প্রভেদটা ধরতে পারে নি। রাম এ সত্য জানতেন যে, সত্য কাজে লাগে অপর লোকের, আর শ্যাম জানতেন যে ও-বস্তু কাজে লাগে পরলোকের। নিজের ইহলোকের জীবন সুখে যাপন করতে হলে যে ব্যবহারিক সত্য মেনে চলতে হয়, এ জ্ঞান রাম শ্যাম দুজনেরই সমান ছিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

পলিটিক্‌স।

এবার অবশ্য দুজনে দু-দলের নায়ক হয়েই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। রাম হলেন দক্ষিণ মার্গের মহাজন ও শ্যাম বাম মার্গের। এর কারণ শৈশবে রাম লালিত-পালিত হয়েছিলেন মা'র ডান কোলে আর শ্যাম তাঁর বাঁ কোলে।

দু'দলে যুদ্ধের সূত্রপাত হল সেই দিন, যেদিন তারে খবর এল যে, জর্ম্মানরা চাই কি ভারতবর্ষের উপরেও চড়াও হতে পারে।

এই সংবাদ যেই পাওয়া অমনি রাম প্রকাশ্য সভায় বজ্রগম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করলেন,—"আমি যুদ্ধ করব"। দেশের বাতাস অমনি কেঁপে উঠল। শ্যাম তার ঠিক পরের দিনই নিজের কাগজে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখলেন "আমি যুদ্ধ করব না"। দেশের আকাশ অমনি চমকে উঠল।

রাম শ্যামের এই দৃঢ় সংকল্পের সংবাদ শুনে, যুদ্ধের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভীত কিম্বা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, অদ্যাবধি তার কোনও পাকা খবর

পাওয়া যায় নি; সম্ভবত আগামী Peace Conference-এ সে কথা প্রকাশ পাবে।

কিন্তু এর প্রত্যক্ষ ফল হল এই যে, স্বদেশ রক্ষা আগে না স্ব-রাজ্য লাভ আগে এই নিয়ে দেশময় একটা মহাতর্ক বেধে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যারা রক্ষণশীল তারা হল রাম-পন্থী আর যারা অরক্ষণশীল তারা হল শ্যাম-পন্থী। রামের দল হল ওজনে ভারি আর শ্যামের দল হল সংখ্যায় বেশি? তার কারণ যারা মোটা তারা হল রামের চেলা, আর যারা রোগা তারা হল শ্যামের চেলা। বাঙলাদেশে মোটাদের চাইতে রোগারা যে দলে ঢের বেশি পুরু—সে কথা বলাই বেশি। এর পর দু'দলে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যে বেধে যাবে, সে কথা সকলেই টের পেলে। দেশের জন্য যারা কেয়ার করে তারা মনমরা হয়ে গেল; যারা করে না তারা তামাসা দেখবার জন্য উৎসুক হল; যারা ঘুমিয়ে আছে—তারা একবার জেগে উঠে আবার পাশ ফিরে শুলে। আর বিলেতি কাগজ-ওয়ালারা মহানন্দে বলতে লাগল,—"নারদ" "নারদ"।

যুদ্ধের প্রস্তাবে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল, রিফরমের প্রস্তাবে সে যুদ্ধ দস্তুরমত বেধে গেল।

রিফরমের প্রতি রাম হলেন দক্ষিণ আর শ্যাম হলেন বাম। এ দেশের মেয়েরা বাড়ীতে ছেলে হলে যে রকম আনন্দে নৃত্য করে, রাম সেই রকম নৃত্য করতে লাগলেন,—আর মেয়ে হলে তারা যে রকম হা-হুতাশ করে, শ্যাম সেই রকম হা-হুতাশ করতে লাগলেন। রাম বললেন, "রিফরম গ্রাহ্য কিন্তু তার বদল চাই"। শ্যাম অমনি বলে উঠলেন—"রিফরম অগ্রাহ্য, কেননা তার বদল চাই"।

এই দুটি বাক্যের ভিতর এক syntax ছাড়া আর কি প্রভেদ আছে—দেশের লোকে প্রথমে তা ঠাহর করতে পারে নি; তারা মনে করেছিল যে, একই কথা রাম বলছেন—positive আকারে আর শ্যাম বলছেন negative আকারে। তাঁদের সে ভুল তাঁরা দু'দিনেই ভাঙ্গিয়ে দিলেন।

রাম যখন বুঝিয়ে দিলেন যে, শ্যামের মত "নেতি মূলক" আর শ্যাম এখন বুঝিয়ে দিলেন যে, রামের মত "ইতি-অন্ত", তখন আর কারও বুঝতে বাকী থাকল না যে, রিফরমার ও বৈদান্তিকে যা প্রভেদ এ উভয়ের মধ্যে ঠিক সেই প্রভেদ আছে; অর্থাৎ দক্ষিণ মার্গ হচ্ছে পাশ্চাত্য আর বাম মার্গ হচ্ছে প্রাচ্য।

এর পর দু'দলে প্রকৃত লড়াই লাগল। রাম শ্যাম উভয়েই কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়ে গেলেন। স্বদেশী যুগে একজন করতেন বক্তৃতা আর একজন লিখতেন কাগজ। কিন্তু স্বরাজের যুগে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুন প্রত্যেককেই অগত্যা যুগপৎ লেখক ও বক্তা হতে হ'ল। অর্থাৎ দু'জনেই আবার বাল্য-জীবনে ফিরে গেলেন। শ্যাম বক্তৃতা সুরু করে দিলেন, আর রাম কাগজ বার করলেন। সে কাগজের নাম রাখা হল Rationalist.

বলা বাহুল্য Rationalist-এর সঙ্গে Nationalist-এর তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বেধে গেল। Rationalist খুলে দেখো তাতে Nationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই, আর Nationalist খুলে দেখো তাতে Rationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই।

নির্ব্বিবাদী লোক বাঙলাতেও আছে এবং নির্ব্বিবাদী বলে তারা

যে একেবারে নির্ব্বোধ কিম্বা পাষণ্ড, তাও নয়। ব্যাপার দেখে শুনে এই নিরাহের দল তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু বিরক্ত হয়ে ঘরে বসে থাকার ফল হচ্ছে শুধু ঘরের ভাত বেশি করে খাওয়া, এতেকরে দেশের যে কোনও উপকার হয় না, সে জ্ঞান এই নিরপেক্ষ দলের ছিল। শেষটা তাঁরা রাম শ্যামের ভিতর একটা অপোষ মীমাংসা করে দেবার জন্য হরিকে তাঁদের কাছে দূত পাঠালেন। হরিকে পাঠাবার কারণ এই যে, তারতুল্য গো-বেচারা এদেশে খুব কমই আছে, তার উপর সে ছিল রাম শ্যামের চিরানুগত বন্ধু।

হরি প্রস্তাব করলে যে, দু'জনে মিলে যদি Rational-nationalist কিম্বা National-rationalist হন তাহলে দুদিক রক্ষা পায়। এ প্রস্তাব অবশ্য উভয়েই বিনা বিচারে অগ্রাহ্য করলেন, কেননা দু'জনের-ই মতে rationalism এবং nationalism হচ্ছে, দিনরাতের মত ঠিক উল্টো উল্টো জিনিষ; একটি যেমন সাদা আর একটি তেমনি কালো, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ও-দুই কিছুতেই এক হতে পারে না। হরি মধ্যস্থতা করতে গিয়ে বেজায় অপদস্থ হলেন! রামের চেলারা তাঁকে বললেন কবি, আর শ্যামের চেলারা দার্শনিক। হরির লাঞ্ছনা দেখে, আর কেউ সাহস করে মিটমাট করতে অগ্রসর হল না।

দলাদলী থেকেই গেল, শুধু থেকে গেল না, ভয়ঙ্কর বাড়তে লাগল। ঢাকে কাঠিতে যখন মারামারি বাধে তখন মানুষের কান কি রকম ঝালাপালা হয়, তা ত জানই। দেশের লোক মনে মনে বললে, এখন থামলে বাঁচি, কিন্তু এই গোল থামা দূরে থাক ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেও কতকটা রাম শ্যামের চালের গুণে।

এতদিনে রাম শ্যামের এ জ্ঞান জন্মেছিল যে, বাঙলাতে কোনও

বাঙালীকে বড় লোক বলে মানে না, যতক্ষণ না সে মরে। অতএব পরস্পরের সঙ্গে পলিটিক্সের লড়াই নিরাপদে লড়তে হ'লে উভয়ের পক্ষেই এক একটি বিদেশী শিখণ্ডি সুমুখে খাড়া করা দরকার। কেননা বাঙালীর বিশ্বাস মানুষের মত মানুষ দেশে নেই, আছে শুধু বিদেশে।

রাম তাই মুরুব্বি পাকড়ালেন বোম্বাইয়ের চোরজি ক্রোড়জি কলওয়ালাকে। Rationalist অমনি লিখলে,—কলওয়ালার মত অত বড় মাথা ভারতবর্ষে আর কারও নেই।

অপরপক্ষে শ্যাম মুরুব্বি পাকড়ালেন মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্ত্তি গৌরীপাদং আইনআচারিয়ারকে। Nationalist অমনি লিখলে,—"আইনআচারিয়ারের মত অত বড় বুক ভারতবর্ষে আর কারও নেই।

এর জবাবে Rationalist লিখলে,—"অব্রাহ্মণের যে ছায়া মাড়ায় না, সেই হ'ল শ্যামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দ্দার"। পাল্টা জবাবে Nationalist লিখলে—"কলের কুলির রক্ত চুষে যে জোঁকের মত মোটা ও লাল হয়েছে—সেই হ'ল রামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দ্দার। বেচারা কলওয়ালা—বেচারা আইনআচারিয়ার! দু'জনেই সমান গাল খেতে লাগল।

যে সব বাঙালী দলাদলীর বাইরে ছিল, তারা এক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। কেননা বাঙলার নেতাদ্বয় স্বজাতকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বাঙালীর মাথাও নেই, বুকও নেই, যে ক'জনের আছে তারা হয় এ-দলে নয় ও-দলে ভর্ত্তি হয়েছে। এ কথার পর আমাদের আর মুখ থাকল না। লজ্জায় আমরা অধোবদন হয়ে গেলুম।

কিন্তু সব দেশেই এমন দু'চার জন অবুঝ লোক থাকে—যারা কোনও জিনিষ সহজে বোঝে না। তারা ধরে নিলে যে, মেড়া লড়ে খোঁটার

জোরে, সুতরাং তারা সেই খোঁটার অনুসন্ধানে বেরল, এবং দু'দিনেই তার খোঁজ পেলে। রাম ও শ্যাম দুজনেই তাদের কানে কানে বললেন যে, তাঁদের পিছনে আছে,—বিলেত। রামের বিশ্বাস তিনি হাতিয়েছেন বিলেতের capital আর শ্যামের বিশ্বাস তিনি হাত করেছেন বিলেতের labour। এই ভরসায় দু-পক্ষেরই বড়েরা মনে করলে যে তারা নির্ঘাত মন্ত্রী হবে। এর পর দুদলের কি আর মিল হয়? যা হতে পারে সে হচ্ছে একদম ছাড়াছাড়ি এবং হলও তাই।

রাম স্বদলবলে দ্বারিকায় গিয়ে এক মহাসভা করলেন, আর শ্যাম রামেশ্বরে গিয়ে আর এক মহাসভা করলেন। ফলে একদিকে মোটা ভাই চোটাভাই বাটুলিওয়ালা কাথ্লিওয়ালাদের আনন্দে বাক্‌রোধ হয়ে গেল, অন্য দিকে বেঙ্কট কেঙ্কট জম্বুলিঙ্গম কোটিলিঙ্গমদেরও উৎসাহে দশা ধরলে।

রামের চেলারা বললেন—"আমরা ভারতবর্ষে রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করব", শ্যামের চেলারা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"আমরা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-রাজ্যের সংস্থাপন করব"। Nationalist বিপক্ষের উপরে এই বলে চাপান দিলে যে, তোমরা যা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছ "তার নাম রাম-রাজ্য নয়, তোমাদের আরাম-রাজ্য"। Rationalist উতোর গাইলে —"তোমরা যার স্থাপনা করতে চাচ্ছ—তার নাম ধর্ম্মরাজ্য নয়—তোমাদের ধর্ম্মঘট"।

লাভের মধ্যে দাঁড়াল এই যে, বাঙলায় রিফরমের কথাটা চাপা পড়ে গেল, তার পরিবর্ত্তে রাম বড় না শ্যাম বড় এইটে হয়ে উঠল আসল মীমাংসার বিষয়। ছেলেবেলায় রাম শ্যামের জীবনের যেটা ছিল রহস্য, সেইটে হয়ে উঠল এখন সমস্যা।

এ সমস্যার মীমাংসা আজ করা কিন্তু অসম্ভব, কেননা "স্বরাজ" এখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত আকাশে ঝুলছে, অতঃপর তা উড়ে স্বর্গে যাবে, কি ঝরে মর্ত্ত্যে পড়বে, সে কথা রামও বলতে পারেন না শ্যামও বলতে পারেন না। হরি বলে, ও এখন অনেক দিন ঐ মাথার উপরেই ঝুলবে। কিন্তু ধরো যদি যে, রিফরম-স্কিমটি যেমন আছে ঠিক তেমনি এদেশে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেই যে এ সমস্যার মীমাংসা হবে, তাই বা কি করে বলা যায়? হয়ত তখন দেখা যাবে যে, রাম হয়েছেন বাঙলার Finance minister, আর শ্যাম হয়েছেন তার Chief-secretary! তাহলে?—

তবে একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, ভারত-মাতা রাম শ্যামের টানা-টানিতে নিশ্চয়ই খাড়া হয়ে উঠবেন, যদি ইতিমধ্যে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, এবং তা ঘটবার সম্ভাবনা যে নেই, সে কথা চোখের মাথা না খেলে বলবার যো নেই। মা এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক মারাত্মক ক্ষয়রোগে যে-রকম আক্রান্ত হয়েছেন, তাতেকরে, তাঁর পক্ষে হঠাৎকারে রাম শ্যামের হাত এড়িয়ে চলে যাবার আটক কি?— "আমার কথা ফুরল নটে গাছটি মুড়ল"।

বীরবল।

পুনশ্চ।

এ গল্প পড়ে আমার গৃহিণী বললেন—"কৈ গল্প ত শেষ হল না"? আমি কাষ্ঠহাসি হেসে উত্তর করলুম—"এ গল্পের মজাই ত এই যে, এর শেষ নেই। এ গল্প এদেশে কবে যে সুরু হয়েছে—তা কারও স্মরণ নেই, আর কখনও যে শেষ হবে তারও কোন আশা নেই। এ গল্প যদি কখনো শেষ হত, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পৃথিবীর সব চাইতে বড় ট্রাজেডি হত না।——

"একতারা"।

(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রণীত)

দরদীর আঙুলের স্পর্শে একতারা যে সেতারকেও হার মানাতে পারে, দ্বিজেনবাবু তা দেখিয়েছেন—কিন্তু দাম্পত্য-প্রেমের স্থর বক্তৃতার সভায় যতই উচ্চ হোক্ না কেন, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তা এখনো মাথা নীচু করে আছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, ও-স্থর বড় বেশি সংকীর্ণ, বড় বেশি গাঁ-ঘেঁসা। ও-স্থরে যে-যন্ত্রী যত প্রাণ-পণেই মূর্চ্ছনা দিন না কেন, অপরের হৃদয় তাতে মূর্চ্ছিত হয় না। পদাবলীর স্থর যে একদিন বিশ্বের মরমে পৌঁছেছিল, তার কারণ, অন্যত্র যাই হোক্, রস-সাহিত্যে পরকীয়া, পত্নীর চেয়ে বড়। সে পরকীয়া রাধাই হোন আর রজকিনীই হোন্।

সোজা কথায় বলতে গেলে কবির পার্থিব প্রিয়া যে পরিমাণে মানসী সেই পরিমাণে তিনি কাব্যের বস্তু—যে পরিমাণে তাঁর ব্যক্তির রূপটি ধর্ম্মের রূপে মিলিয়ে যায়, সেই পরিমাণে তিনি বিশ্বের চোখে সুন্দর। তবে একথা জোর করে বলা যায় যে; যে তারে দাম্পত্য-প্রেম স্ফুরিত, সেই তারেই কবি মাঝে মাঝে ব্যঞ্জনার বিদ্যুৎ এমন ভাবে সঞ্চারিত করতে পারেন যে, আমাদের সীমাবদ্ধ মন চুম্বকের মত অসীমের দিকে ফিরে যায়, দ্বিজেনবাবুর 'একতারা'য় সেই বিদ্যুতের প্রবাহ আছে।

এ যুগের প্রায় সমস্ত কবির রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছাপ দেখা যায়। এটা সজ্ঞান অনুকরণ না হলেও অনুকরণ এবং অনুকরণ আর কিছু না করুক্ ব্যক্তিত্বকে লোপ করে দেয়। অবশ্য এ অনুকরণ খুবই স্বাভাবিক, খুবই ক্ষমার্হ—কারণ অত বড় কবির জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রজাল ভেদ করা যে-সে শক্তির কাজ নয়; কিন্তু এটাও ঠিক যে, তা না করা পর্য্যন্ত কোন লেখক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে না। দ্বিজেনবাবু সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিক ভাবে সে ইন্দ্রজাল থেকে মুক্ত।

গোড়াতেই বলেছি 'একতারা' ভাবের গুণে সুন্দর। কিন্তু ভাবের রূপ কেবল মানসী নয়—শব্দের নির্ব্বাচন ও সংযোজনকে আশ্রয় করেই তা স্ফূর্ত্ত। অতএব কাব্যের ভাষাও দেখা দরকার।

দ্বিজেনবাবুর কবিতার ভাষা খুবই মোটা, খুবই সাদাসিদে—মনে হয় এ পরিচ্ছদ দিয়ে তিনি কোন্ সাহসে তাঁর বড় বড় ভাবগুলিকে সাজিয়েছেন; কিন্তু ঠিক সংকুলান হয়েচে—বেমানান হয় নি। দ্বিজেন-বাবুর হেলাফেলার ভাষা যতই আটপৌরে হোক্—তা নিখুঁত, যতই অসতর্ক হোক্—তা অবাধ, ভাবের স্বচ্ছন্দতাকে তা আড়ষ্ট করে ফেলে নি।

নমুনা তুললেই দেখতে পাবেন।

"আইন দিয়ে যতই বাঁধো তুমি
প্রাণ-সাগরের বিপুল বেলাভূমি
সহজ মনের যতই রচো কারা,
নিমেষে সব বাঁধন ফেলে টুটি

গতির সুখে উধাও যাবে ছুটি
বে-আইনির হাজার নতুন ধারা।"

ধর্ম্মে বল, সাহিত্যে বল, সমাজে বল, জীবনে বল, এত বড় সত্য আর কি আছে? কিন্তু যতবার পড়ি, আরব্য-উপন্যাসের সেই ধীবরের মতই সন্দেহ হয়—এতটুকু শিশির মধ্যে অত বড় দৈত্য ছিল কি করে'। আর একটি উদাহরণ দিই।

বিরহ সম্বন্ধে কবি বলেছেন:—

"যে বেদনা মোর তোমার বিরহে
সকল ব্যথার সার।
তুমি বিনে বল সে ব্যথার ব্যথা
মরমে পশিবে কার?
কানে পশে শুধু কথার কাকলী,
ভাব নেয় ভাব চিনে,
তোমার অভাবে যে ভাব মরমে
কে বুঝিবে তোমা বিনে?"

জানিনে, এত সাদা কথায়, চণ্ডীদাস এর চাইতে কি ভাল লিখতে পারতেন।

দ্বিজেনবাবু সম্বন্ধে এ কথাটি বলা যায় যে, প্রাণের তারটি না বেঁধে তিনি গান জাগাতে সাহস করেন নি।

দ্বিজেনবাবুর কবিতায় সত্য-সন্ধতা ছাড়াও এমন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় আছে, যা প্রত্যেক বড় কবির নিজস্ব। যা সকলেই

দেখে, সকলেই শোনে, যা সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তার অতীত কিছু কবির ইন্দ্রিয়ে পৌঁছান চাই; উদাহরণ—

"ও-পার হতে ব্যথা তব এ-পার হতে মম
আঘাত করি, কাঁপিয়ে তুলে সব
না পড়ে আর বস্তু চোখে ব্যাথার লহর সম
সবই প্রাণে হয় গো অনুভব।"

এই যে অনুভব, এ কখনই প্রাকৃত জনের হতে পারে না। বিরহের ক্লেশ প্রায় সব লোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু বিরহের বেদনার আঘাতে যে ব্যবধানের নদী, ক্ষেত, লোকালয় বস্তুহীন ব্যাথার লহর হয়ে দাঁড়ায়, এটা কেবল কবিই অনুভব করতে পারেন।

দ্বিজেনবাবুর সব অনুভূতিই যে ভাষায় পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায়, তা নয়, তবে তাঁর কণ্ঠের অপরিস্ফুট কাকলীতেও একটা উচ্চ সঙ্গীত প্রকাশের প্রাণপণ প্রয়াস আছে।

কবির বিচিত্র কল্পনাও (fancy) সুন্দর। প্রথমেই তিনি প্রিয়াকে করেছেন দেউলের দেবী। তীর্থ-যাত্রীর মত ঘুরে ঘুরে যেদিন তিনি দেখতে পেলেন—

"ঐ রাঙ্গা পা দুটী
দীর্ঘ পথের মৃণাল শিরে রক্ত কমল ফুটি"

সেদিন তাঁর পথ-চলা ধন্য হলো; আবার কখনো প্রিয়াকে করেছেন "জীবন পথে পড়ে পাওয়া কুড়িয়ে নেওয়া বাঁশী। সে বাঁশী কবির "আপন হাতে গড়া" নয়, "বাঁশীর হাটে বেছে নেওয়া

নয়, এমন কি তার জন্য কবিকে কানা কড়াও দিতে হয় নি। কবি ভাবতে পারেন নি যে, তার কিছুমাত্র মূল্য থাকতে পারে। তিনি খেলার ছলে তাকে অধরে ছুঁয়েছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! "সুরের ফুলে ভারে ভারে উঠ্‌লো বাঁশী মুঞ্জরি", আর সে যে-সে সুর নয়, একেবারে "ভুবন ভোলানো" সুর। কাজেই কবির মনে এই উদার আশা জাগ্‌লো—

"সকল আকাশ ভরবো আমি
তোমার ও সুর দিয়ে।"

দ্বিজেনবাবুর চিত্রণ শক্তির পরিচয় দিতে বড় বেশি আয়োজনের প্রয়োজন নেই—দু'চার ছত্রই যথেষ্ট—

"ফেলিয়ে সকল ভূষা, এলে নিশীথে,
এলে ধীরে, চুপে চুপে, এলে চকিতে,
একেবারে বুকে নিলে, বাহুপাশে জড়াইলে,
চিরতরে জুড়াইলে চির-তৃষিতে।"

একটা গোটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল; প্রত্যেক শব্দটির মুখে একটি বর্ণ, একটি রেখা।

যেখানে কবির চিত্র অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুট, সেখানে তা আরো সুন্দর, আরো জীবন্ত।

"দেহের কূলের ভাঙ্গন যত,
মনের কূলে গড়বে তত"

বা

"ছল ছল আঁখির মত পরাণ উঠে উথলি"

"তারার আলো নিশার প্রাণের স্বপন সম ভার"

দু-টানে এমন ছবি ক'জন চিত্রকর আঁকতে পারেন ?

"একতারা"য় এমন একটু দার্শনিক সুবাস আছে, যা বিশেষ করে' ভাবুকদেরই উপভোগ্য। দার্শনিকতার সঙ্গে যে কবিত্বের একান্ত বিরোধ, একথা আমি অস্বীকার করি। সুকবির হাতে ও-দুই-ই যে রত্নের আকর, তার প্রমাণ দ্বিজেনবাবুই দিয়েছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন—

"হাওয়ায় যে বীজ উড়ে এসে লাগে মনের উপর দেশে
তার সে ক্ষণিক ফুলের নেশায় পরাণ আমার ভুলবে না,
প্রাণের গোপন গভীর তলে রসের চির ধারা চলে
সেথায় যদি না রহে মূল সুধার ফল যে ফলবে না।"

সেখানে বুঝতে পারি না তাঁর জ্ঞানকে কি কবিত্বকে বেশি প্রশংসা করবো।

"মুকুল ছুটে যে পথ দিয়ে সমুখ পানে ফলের মাঝে
আমার এ সুর ধরিয়ে দিতে চায় গো তা যে,
পিছন সনে সমুখের ভাই সত্য কোথাও বিরোধ নাই
একই বাঁশীর সুরটী সবার বক্ষে বাজে।"

একটি ঘরের কোণের উপমা দিয়ে কবি সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কালের একটানা স্রোতে যা অতীত তাই বর্ত্তমান; অতীত মরে না, বর্ত্তমানের ভিতর বেঁচে থাকে। নূতন পুরাতনের চিরপ্রসিদ্ধ বিরোধ কেবল স্থূল দৃষ্টিতে।

দ্বিজেনবাবুর দার্শনিক মতের পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দু'টি থেকেই পুরোপুরি পাওয়া যায়—

"মুক্ত রেখেই ফেল্‌লো সে যে বিষম ঘোরে

* * * *

বাঁধন-সৃজন-নেশায় এ মন উঠল ভরে"

বোঝা গেল কবি freedom-বাদী; বাইরের বন্ধনই তাঁর কাছে একমাত্র বন্ধন—আবার তিনি লিখবেন।

"যেখানে মোর প্রাণের বাঁধন মুক্তি আমার সেইখানে"। বোঝা গেল কবি একজন মস্ত বড় optimist. শৃঙ্খলার শৃঙ্খল তাঁর কাছে মুক্তিপাশ।

আর একটি দার্শনিক কবিতার দু' ছত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না—যার ভিতর একটি বড় সত্য ফুটে উঠেছে।

"ভয় ত শুধু আপন মাঝে আপন পরে অবিশ্বাস,
ভয় ত শুধু মূঢ় প্রাণের প্রেমের প্রতি পরিহাস।"

দ্বিজেনবাবুর "একতারা" সম্বন্ধে এবং "একতারা"র মধ্য দিয়ে যে কবি মানুষটি ফুটে' উঠেছে তার সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যা বলেছি—তা প্রায়

সমস্তই নিক্তির একদিকে পড়েছে—এবার অন্যদিকে কি পড়তে পারে দেখা যাক্।

"একতারা"র কতকগুলি কবিতা একেবারে দুর্ব্বোধ। কথায় কথায় অর্থ হয়ত করা যেতে পারে কিন্তু তাতে আগাগোড়া একটা সুস্পষ্ট সুসঙ্গত ভাবের একান্ত অভাব। কষ্টকল্পনার সাহায্যে হেঁয়ালির অর্থ করা যাঁদের অভ্যাস আছে তাঁরা কি বলবেন জানি না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে ও-গুলো কুয়াসার মতই ঝাপসা।

দ্বিজেনবাবুর কবিতাসুন্দরীর দেহও স্থানে স্থানে ছন্দ দোষে দুষ্ট। যদিও সে দোষ তিলের মতই ক্ষুদ্র। তিলকে তাল করে' লোকের চোখে ধরে দেওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করিনে। কবি অনুসন্ধান করে' নিজেই সেগুলি বের করে নেবেন এবং চাইকি ইচ্ছা করলে একটা তুলির টানে তা বেমালুম মুছে ফেলতে পারবেন। আমার বিশ্বাস এ তাঁর অসাবধানতার দোষ, কানের দোষ নয়।

তারপর আর একটি কথা। একটা কবিতা একটা গোটা কাপড়ের মত। সে কাপড়ের খানিকটা সুতি, খানিকটা রেশমী, খানিকটা মোটা, খানিকটা মিহি, খানিকটা সাদা, খানিকটা রঙীন হলে বড়ই দুঃখের কথা। দ্বিজেনবাবুর কবিতার এ দোষটুকু প্রায়ই দেখা যায়। তাঁর দিব্যি রঙীন মিহি কথার পর হয়ত এমন মোটা সাদা কথা এল যে, ইচ্ছে হয়, সেটুকু কেটে ফেলে দিই।

তবে মোটের উপর দ্বিজেনবাবুর 'একতারা' এতই সরস, এতই উপাদেয় হয়েছে যে, তার দোষগুলিকেও অপকর্ষক বলতে ইচ্ছা হয় না —এ সম্বন্ধে কবির ভাষাতেই আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি—

"ফুলের ত্রুটী নয় গো কাঁটা
কাঁটাই সফল হয় গো ফুলে।"

এবং আর যেই ভুলুক

"মরম-মধুর সন্ধানীরা
এ কথাটা যায় না ভুলে।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

সাহিত্য ও নীতি।

——:০:——

দার্শনিক অদার্শনিক, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, কবি অকবি—সবাই এ কথা স্বীকার করিবেন যে, মানুষের মধ্যে সব-চেয়ে বড় না হোক্, সব-চেয়ে উঁচু আর খাড়া হইয়া আছে যে সত্যটা, সেটা হচ্ছে তার অহং। আমাদের কাহাকেও মুখের উপর অহংকারী বলিলে আমাদের মধ্যে যে অতিবড় ধার্ম্মিক, তার-ও পক্ষে সেটা ভালমানুষের মত মানিয়া লওয়া যে তত সহজ-সাধ্য হয় না, এই প্রমাণ যে অর্ব্বাচীন জনসাধারণের চেয়ে তার "অহং" কিছু কম উগ্র নয়। প্রতি নিমেষে সযত্নে আমরা একেই লালন করিয়া থাকি; আমাদের সমুদয় জীবনবৃত্তান্ত হচ্ছে ইহারই চারিপাশে ঘুর্ণি নাচের একটি ছবি। এমন কি, মেথরদেরও সর্দ্দার আছে। যে ধূলার তলে দলিত বিদলিত হইয়াছে, তার সমস্ত রিক্তার মধ্যেও মনের এক কোণে ইনি যে জাগিয়া নাই তা কেমন করিয়া বলা যায়?

অথচ নিজেকে অহর্নিশ মন্দিরচূড়ার মত শূন্যের মধ্যে খাড়া করিয়া ধরিয়া রাখার জন্য মানুষের এই যে চিরন্তন দুর্নিবার ঝোঁক, ইহার চেয়ে কম সত্য নয় মানুষের মধ্যে আর একটি প্রবলতর প্রবণতা, সে হচ্ছে তার নুইয়া পড়ার প্রবৃত্তি। মানুষ এ বিশ্বে কা'কে যে প্রণাম করে নাই তা বলা শক্ত। আকাশের মেঘ, নিশীথের

তারা, সমুদ্রের হাওয়া, জঙ্গলের আগুন, বনের সাপ, বানর, বাঘ—শেষে বাস্তব জগতেও সাধ না মেটার দরুণ কল্পনার দেশের ভূত পিশাচ যক্ষ দানব—কার কাছে মানুষ "মাথা নত" করে নাই? কার্লাইল্ দেখাইয়াছেন, সমগ্র মানুষের সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ইতিহাস।

জনসমাজ প্রতীক্ষা করিতেছে, কবে অবতার আসিবেন, তারা অনুসরণ করিবে, সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া তারা তাঁকে গ্রহণ করিবে, পূজা করিবে। জনসমাজ হচ্ছে একটি অশ্ব, যে ছুটিতে জানে কিন্তু গন্তব্য জানে না—নেপোলিয়ান আসিলে তবেই ফরাসী ঘোড়া তার গন্তব্যে পৌঁছিতে পারে—তাঁর বাহন হইয়া। মানুষের শ্রেষ্ঠ আর্ট হচ্ছে বন্দনার আর্ট। বাদশার যোড়হাতের এক অঞ্জলি ফুল, সে পাথর হইয়া গিয়া তাজমহল হইয়া উঠিল। মানবের সমস্ত যুগযুগান্তরের কাব্য-সাহিত্যের গুঞ্জন দূর হইতে দাঁড়াইয়া শুনিলে কেবল এই ধ্বনি শুনিতে পাই—"নমো নমো নমঃ"। মানুষের শ্রেষ্ঠ গান হচ্ছে—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।"

(২)

জল যে সমুদয় ভূমণ্ডলে এ ভাবে ওতপ্রোতরূপে সঞ্চারিত হইতে পারিয়াছে, তার কারণই হইতেছে এই যে, "নীচু বিনা উঁচু পথে জল কভু যায় না"। বাইবেল বলেন, "The last shall be first." আরো বলেন, "পৃথিবীর উত্তরাধিকার তাদেরই—যারা নুইয়া পড়ে, যারা meek." নমস্কার-ই হচ্ছে সর্ব্বত্র প্রবেশের পথ। আপিশে ঢুকিবার প্রধান উপায় যে সেলাম, তা কে না জানে?

ধার্ম্মিকতা যদিও আজকাল দাম্ভিকতারই নামান্তর, তথাপি গোড়াতে ধর্ম্ম যে এতটা ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল, সম্ভবত তার কারণ, ধর্ম্ম তখন নম্র ছিল, এবং তাই নর্ম্মদা বা তাদৃশী কোনো নদীর পুলিনেই সে নিলীন ছিল না। কেবলমাত্র বিশেষ কোনো কাননের পথে পথে বেণু বাজাইয়া ধেনু চরানো নয়, প্রাতরুত্থান থেকে জীবনের সমুদয় কার্য্যাবলীকে ধর্ম্ম কি প্রকার শুভঙ্করের আর্য্যা দ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, তা যে-কোনো পঞ্জিকার পাতা উল্টালেই প্রত্যক্ষ হইবে। এইরূপ যে হইতে পারিয়াছিল, তার কারণ এই যে, তখন ধর্ম্ম ছিল একটি গানের সুর, যা চিরদিন-রজনী মনের মধ্যে গুমরিয়া মরিত—প্রকাশের বেদনায়, এবং তৎকালে বক্তৃতামঞ্চাদি না থাকায় তা অকস্মাৎ আগ্নেয়-গিরিদ্রাবরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িবার সুযোগ না পাইয়া, সমুদয় জীবনকেই একটি ছন্দে পরিণত করিত—ছন্দকে গান থেকে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে চিরকালই তা কুচ্‌-কাওয়াজের মত দেখায়। "তব গানের সুরে চিত্ত আমার রাখ হে রাখ ধরে—কভু দিয়ো না তারে ছুটি"—ধর্ম্ম ছিল সেই সুরের মধ্যে বিধৃত চিত্তের একটি "মনোভাব", একটি attitude, tendency, একটি spirit—দেয়ালে টাঙান একটি motto মাত্র নয়। যাকে ইংরাজিতে বলা যায় "leavening of the bread"—ধর্ম্ম সেই-রূপ সমস্ত জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

(৩)

সর্ব্ব-সংক্রামকতা, সর্ব্ব-সঞ্চারিতা ও সর্ব্বগতা পর্য্যায় শব্দ হইতে পারে, সর্ব্বগতা কিন্তু সর্ব্বগ্রাসিতা নয়। সমস্ত ভূতে যিনি আপনাকে

দেখেন, এবং আপনাতে সমস্ত ভূতদের দেখিতে পান তিনি সর্ব্বগ, কেননা তিনি সর্ব্বত্র গমন করেন—অব্যাহত তার প্রবেশ—"যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে, সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে—সোনার ঘটে সূর্য্য তারা নিচ্চে তুলে আলোর ধারা, অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে"—তিনিও সেইখানে তাঁর রূপার ঘট লইয়া হাজির। তিনি নিজের চৈতন্যকে দিগ্‌বিদিকে প্রেরণ করিয়াছেন—সমুদ্র যেমন মেঘদের প্রেরণ করে—মেঘ যেমন বিন্দুদের প্রেরণ করে—ত্যাগের দ্বারা, অহিংসার দ্বারা—তাঁর সাধনা গ্রাস করিবার সাধনা নয়। "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth"—একটু একটু করিয়া annex করিয়া নয়, একেবারে চক্ষু মেলিয়াই সে দেখিতে পাইল সমস্ত ভুবন তারই জন্য।

ধর্ম্মের ব্যাপকতা যখন সর্ব্ব-গ্রাসিতার রূপ ধারণ করিল তখন সে রাজদণ্ড হাতে লইল, পোপ হইল, ব্রাহ্মণ হইল। লুথরের প্রয়োজন হইল, বুদ্ধ আসিল।

(৪)

ধর্ম্ম এক সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল। সেই জন্যই যেমন বাইবেল তেমনি আমাদের পুরাণগুলিতেও দেখিতে পাই, সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যার একটা প্রকাণ্ড প্রচেষ্টা। বাসুকি একটু ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদের ঐ পুকুরটা আমাদিগকে কি রকম সাধু বাঙলার উচ্ছ্বাসের কতকগুলি উপকরণ জুটাইয়াছিল, তা'ত আমাদের

সকলেরই মনে আছে—অর্থাৎ "মত্তবিধুনিত উত্তাল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ" ইত্যাদি। ইংলাণ্ডে এই অনধিকার-প্রবেশ কি-রকম গলাধাক্কা খাইয়াছে ও-দেশের সাহিত্যে তার ফোটো রহিয়া গিয়াছে।

(৫)

সাহিত্যক্ষেত্রে আর্টের সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির বিবাদটি অপ্রসিদ্ধ নয়—এবং সাহিত্য আর যাই হোক্ বিজ্ঞান নয়—যদিও বিজ্ঞান সাহিত্য কিনা সে-সম্বন্ধে তর্ক আছে! সাহিত্য হচ্ছে আর্ট, আর এ-সম্বন্ধে যে দল যাই বলুক, সাহিত্য হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট। বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের তফাৎই এই যে বিজ্ঞান বলিয়া দেয় আর আর্ট বানায়—এবং আর যে আর্ট যা বানাক্, সাহিত্য যা বানায় তা হচ্ছে "মানুষ" এবং প্রকৃতির এই "fair defect"টি-ই নাকি আবার সৃষ্টির মধ্যে noblest thing. তারপর, অন্য সকল আর্টিষ্টের মালমসলা জড়—রং, পাথর, কাপড়, বড়-জোর বায়ু তরঙ্গ। আর সাহিত্যিকের কারবার হচ্ছে শব্দ লইয়া, আর শব্দ পদার্থটা আর কিছুই নয়—আইডিয়া-বাষ্পের জমাট টুক্‌রা। অন্য অন্য আর্টের মত মানুষের চক্ষু এবং শ্রোত্রকে সাহিত্য কিছুই যে আনন্দ দেয় না, তা নয়; কিন্তু সে গৌণভাবে। সাহিত্য হচ্ছে মনের সঙ্গে মনের সোজাসুজি আলাপ—যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়কে পিছনে রাখিয়া। আর এই মনই হচ্ছে মানুষের মধ্যে স্বর্গ থেকে চুরি-করা বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ। ম্যাথু আর্ণল্‌ড্ কাব্যকে "Criticism of life" বলিয়াছিলেন। যদিও সমালোচনা বলিতে আমরা বুঝি সমুদয় ভালকে যথাসম্ভব মন্দ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া মন্দটাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা,

উক্ত অধার্ম্মিক ও বৈধার্ম্মিক দেশের অধিবাসীটি কিন্তু ও-শব্দের অর্থ বুঝিতেন ঠিক উল্টা। জীবনের মধ্যে অনেক কুৎসিত ব্যাপার আছে—যেমন এই মুহূর্ত্তে আমাদের এই শরীরের মধ্যে এমন সব ব্যাপার চলিতেছে, যা অতি নক্কারজনক অথচ অপরিহার্য্য, তেমনি জীবনের কদর্য্য অংশ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শিকড় গাড়িয়া আছে। তারও একটা সৌন্দর্য্য যে নাই তা নয়—পরিপাক-ক্রিয়ার ইতিহাস পর্য্যালোচনা হয়ত উপভোগ্য। মহিষ-বলির পরে রক্ত মাখিয়া যে নৃত্য, তার বীভৎসতাও ত মানুষে উপভোগ করিয়াছে। তেমনি বায়রণ প্রভৃতি কবি জীবনের যে অংশকে অনাবৃত করিয়াছেন, তারও একটা মোহনীয়তা আছে, বরঞ্চ অনেকের কাছে তার আকর্ষণ অতি প্রচণ্ড। কিন্তু সাহিত্যের কার্য্য তা নয়, তার কাজ জীবনের মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা শাশ্বত, যা সত্য, যা মঙ্গল, তারই জয়গান করা, তাই সমুখে আনিয়া ধরা। সাহিত্যিক ম্যাক্‌বেথের দুরাকাঙ্ক্ষার বীভৎসতাও আমাদের দেখান, কিন্তু তা কেবল তার থেকে আমরা দূরে থাকিব বলিয়া। অথচ, সোজাসুজি নীতিকথা প্রচার সাহিত্যের কার্য্য নয়। সাহিত্য আর যাই হোক ইস্কুলমাষ্টার নয়। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প আর কথামালা বই বটে কিন্তু সাহিত্য নয়। এইখানেই সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম্মের সাদৃশ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। সাহিত্য এবং ধর্ম্মের মধ্যে সালোক্য নাই এইজন্য যে, যদিও তারা একই কার্য্য করে, তবু আলাদা "লোক" অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে। ধর্ম্ম হচ্ছে একটি বৈদ্যুতিক শক্তি, যা সমুদয় জীবনের মর্ম্মস্থলটিকে এক নিমেষে স্পর্শ করিয়া এমনি ধাক্কা দেয় যে, তার পর থেকে সেই মানুষই হয় আলাদা মানুষ। তার পর থেকে কি করা উচিত অনুচিত তার জন্য আর

তাকে দ্বিতীয় ভাগ ও কপিবুকের নীতিমালা অধ্যয়ন করিতে হয় না। সমস্ত দুর্নীতি সমস্ত মন্দের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে তার মনে, আর নীতির কুঠার দিয়া প্রতিদিন পাপের ডালপালার ছেদন করিতে হইবে না। ফ্রাঙ্কলিনের মতো রুটিন্ করিয়া এ সপ্তাহে মিথ্যা, ও সপ্তাহে চুরি, তার পরের সপ্তাহে বাচালতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মরিতে হইবে না। সাহিত্যও শিক্ষা দেয় কিন্তু আনন্দের মধ্য দিয়া। আসলে, আনন্দিত করাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর মানুষকে আনন্দিত করা হচ্ছে তাকে প্রকৃতিস্থ করা—আর সাহিত্যিক মানব-প্রকৃতির উপরে বিশ্বাসবান।

(৬)

কাব্য এবং ধর্ম্ম সহোদর ভাই। কেননা একই জায়গায় তাদের উৎপত্তি। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনির্ব্বচনীয় রহস্যের কাছে মানুষের বলবুদ্ধি হারিয়া গিয়া বলিল, "নমোনমঃ", তাইত বেদগান। বিশ্বের নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য, মানুষকে তার অধীন হইতেই হইবে নইলে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"—এই ত Old Testament. সমস্ত জীবনের দ্বারা উচ্চারণ করিতে হইবে এই মন্ত্র—"নমোনমঃ"—সমস্ত বিশ্বভুবন ত দিনরাত এই মন্ত্র জপ করিতেছেই—রবি শশী গ্রহ তারা ত মহাশূন্যে জপ মালা ঘুরাইয়া চলিয়াছেই—এই চারদিকের আকাশে বাতাসে প্রত্যেকটি অণুপরমাণু অমোঘ নিয়মকে এই মুহূর্ত্তে মানিয়া ত চলিতেছেই, মেঘেরা ছুটিয়াছে, বায়ু ছুটিয়াছে—মহাশাসনে বাধ্য হইয়া, কেবল মানুষের ইচ্ছা সে স্বাধীন, সে খুসি হইলেই এই নিয়মের প্রতিকূলেও

চলিতে পারে—তাইত তার এই নমস্কার-সঙ্গীত বিশ্বভুবনের আর সকল সঙ্গীতকে ছাপাইয়া উঠিল—সমস্ত জীবনের নমস্কার, একটি চিন্তা মনে উঠিবে না, কখনো কোনো মুহূর্ত্তে যা এই বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গী বিসংবাদী, ইহাই নীতি।

ফিলসফি কাব্যের বোন্ হইতে পারে, কিন্তু বৈমাত্র। কেননা এই বিশ্বের নিবিড় রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করিবার প্রবৃত্তি দর্শনের জননী—কাব্য কেবল বলে "যা দেখেছি তুলনা তার নাই"। তুচ্ছতম যা ঘটনা, প্রতিদিনের যা দৃশ্য, সাধারণতম মানুষ, ক্ষুদ্রতম ফুল—তারও রহস্য অপার। ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাই ঘাসের মধ্যে Celandine-কে আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা নক্ষত্র আবিষ্কার করুক্, আমি তোমাকে আবিষ্কার করিয়াছি, এই আমার গৌরব।

(৭)

সাহিত্য হচ্ছে একখানি দর্পণ, যার আশ্রয়ে নরসমাজ পুনঃপুনঃ আপনার মুখ প্রসাধন করিয়াছে, যা কুৎসিত তাকে দূর করিয়াছে। "Uncle Tome's Cabin"—নীগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদের চৈতন্য জন্মাইয়াছিল। রুশোর লেখাগুলি ফরাসীদেরকে তাদের কৃত্রিম সমাজের কদর্য্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেওয়ার পর যা যা ঘটিয়াছিল তা কে না জানে? আমাদের দেশে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলি আমাদের নারীদের অসীম দুঃখদুর্গতির চিত্র আঁকিয়া যুবকদের মধ্যে নারীজাতির প্রতি তাদের মনোভাবের অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র দর্পণের উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি দর্পণ হইতে পারে, কিন্তু অন্য গানগুলি তর্পণের মন্ত্র। আর, তারা এই দেশের মনের উপর কি কার্য্য করিয়াছে তা মাপিবার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই।

সেই দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—মানুষের হৃদয়ের কত কত আশা ভরসা, লজ্জা দৈন্য, ঘৃণা বিরক্তি, অবসাদ নিরাশা, বিস্ময় ক্রোধ, ভালবাসা ভক্তি। কিছুই বাদ যায় নাই, মানুষ ত পূর্ণ নয়, তার শত বিফলতা, শত অকৃতার্থতা, শত জঘন্যতা সহস্র গ্লানি। সাহিত্যকে তার সাক্ষ্য বহন করিতে হইতেছে। এ যেন একখানা "অদ্বৈতবাদী"র জগৎ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যেখানে যা আছে—যতকিছু পঙ্কিলতা, যত-কিছু পাপ, সমস্তকে লইয়া অগ্রসর হইতেছে এই জগৎ। স্থান আছে—সকলের জন্যই স্থান আছে। কেবল ফুলের গন্ধে আর মলয় বাতাসে আর জ্যোৎস্নায় ভর্ত্তি একখানি কল্পলোক নয়—ঘরে ঘরে বেদনার রাশ, নিখিলের ব্যথা, দিকে দিকে পুঞ্জে পুঞ্জে ভারে ভারে স্তূপীকৃত—মাতার প্রতি সন্তানের দুর্ব্যবহার, প্রেমের শূন্য গর্ভতা, দরিদ্রের ক্রন্দন—Les Miserables, এ সমস্তকে পান করিয়াছে যে সাহিত্য তারই হাতে দুর্জ্জয় ভৈরব পিনাক। তারই বিকট জটাজূটের মধ্যে অমৃত প্রবাহিনী।

(৮)

কিন্তু জীবনের মধ্যে যা আছে, হুবহু তার ছবি তোলা ফোটো-গ্রাফারের কাজ হইতে পারে, সাহিত্যিকের নয়। সাহিত্য জীবনের ছায়াচিত্র নয়, ভাবচিত্র। কোকিলের ডাকের নকল করিতে

পারে আমাদের হরবোলা, কিন্তু হরবোলা আমাদের যা দেয়, তা হচ্ছে কোকিলের ডাকের দেহখানি—কোকিলের ডাকের মর্ম্মগত যা বাণী, যা কুহুতানের অন্তর্লোকাধিষ্ঠিত বিদেহ আত্মা, যা যুগে যুগে কত গৃহে, পথে পথে, কত কান্তারে নিখিলের মনের ব্যাথাকে দেহ-দান করিয়াছে—তা আমরা হরবোলার নকলের মধ্যে পাই না, তা পাই কবির কাব্যে। কবি বলেন, "আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি, রাচয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী"। বাহিরের এই বিশ্ব কবির চিত্ত-বীণার তারে তারে ঘা দিতেছে—তার থেকে আমরা পাইতেছি এক অপরূপ সঙ্গীত। কোন কোনও ব্যক্তি যে কাব্যখানিকে "that Epic of Realism"—"বস্তুতন্ত্রতার মহাকাব্য" বলেন, বায়রণের সেই "Don Juan"-এর মধ্যে আমরা পাই নরনারীর যৌন-সম্বন্ধের অস্থিরতার একটি বিচিত্র বাস্তব চিত্র। পড়িয়া আমরা বলি, হাঁ ঠিক্, সমস্ত সামাজিক ভদ্রতা, পারিবারিক বন্ধন, ধর্ম্মনৈতিক বিধি-বিধানের তলে তলে সর্ব্বত্র ইহাই ত ঘটিতেছে—এ-সব কে না জানে? ইহা হইতেছে সংসারের এক-খানি জল-জীয়ন্ত ফোটোগ্রাফ্। ফোটোগ্রাফ্ হিসাবে ইহা উপভোগ্য। কিন্তু ইহার মধ্যে হৃদয়ের লাল রঙ্ কই? একটি মানুষের জন্য আর একটি মানুষের যে ক্ষুধা ইহা ত সনাতন সত্য। কিন্তু সেই ক্ষুধার সমস্ত প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও একটি মানুষ যে আর একটি মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকে আপন অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত, আত্মসাৎ—করিবার প্রয়াসে বিফলকাম হয়—এমার্সনের ভাষায় Marrige (in what is called the spiritual world) is impossible"—সমস্ত মানবীয় সম্বন্ধগুলি যে কেবল বাহিরের একটা সংঘর্ষ-মাত্র—নিকটতম হৃদয়টি যে লক্ষ যোজন দূর—এই যে একটি সত্য ইহা কি

বর্ণ-গন্ধ-স্বাদহীন একটি তথ্য মাত্র? ইহার কি কোনও "রস" নাই? ইহা কি কেবলই রঙ্গ-রসের রহস্যের ব্যাপার, ইহার মধ্যে কি এই বিশ্বের এবং জীবনের আর একটি রহস্যের নিবিড়তা নাই?

অর্জ্জুন যেমন তাঁর সুতীক্ষ্ণ সায়কের দ্বারা পৃথ্বীকে দীর্ণ করিয়া অতল হইতে রসের উৎসকে উৎসায়িত করিয়া পিপাসু মৃত্যু শয্যাশায়ী ভীষ্মকে তর্পণ করিয়াছিলেন, আর্টিষ্টের হাতে তেমনি এই সত্যটি হচ্ছে একটি শর, যা নিখিলেশের মর্ম্মকে ভেদ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু পিপাসু, আমাদের জন্য নিখিলেশের জীবন হইতে বাহির করিয়াছে সেই সুধা যা ক্ষতবিক্ষতচিত্ত গ্লানিক্লান্ত মানবের জন্য অতি-দুর্ল্লভ এক সঞ্জীবনী। নিখিলেশের সঙ্গে আমরাও জীবন এবং মৃত্যুর রহস্যকে নমস্কার করি—যে "দুঃস্বপ্ন" কোথা হ'তে এসে জীবনে বাধায় "গণ্ডগোল", তার থেকে অদ্ভুত ব্যাথার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া আমরা নিখিলেশের সঙ্গে দেখিতে পাই যাকে নিবিড় করিয়া ধরা গিয়াছে সে আয়না-মাত্র—সে আয়না বাঁকা বা ভাঙা আয়না হইলে তার সেই বক্রত্ব বা ভগ্নত্বই একান্তভাবে আমাদিগকে পীড়িত করিবার কারণ হওয়া ঠিক নয়—সে আয়নায় যাকে প্রতিফলিত করার কথা ছিল, তাকে পূর্ণ করিয়া বিম্বিত করার ব্যর্থতাই বেদনার জননী।

সে বেদনা সমস্ত বিশ্বেরই বেদনা—সে "অতি নিবিড় বেদনা বন-মাঝে রে, আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে", সে ব্যথাই ত "সারানিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়"। সমস্ত জড়জগতের যে সুবিপুল ব্যর্থতা—চৈতন্যকে স্পষ্ট করিবার, মূর্ত্তিমান করিবার বিফলতা—সে সম্বন্ধে জড় ত নিজে চেতনাহীন। তবু "বাতাস আসে হে মহারাজ গন্ধ তোমার মেখে"—মহারাজ নাই

গন্ধ আছে। অস্থিরতার আঘাত জড় চিত্তের মধ্যে যে ব্যথা দান করে, সেই ব্যথা নিজেকে জানে না, সে চেতনাহীন। তবু "সুদূরের পারের সুদূরের হাওয়াই" অপেক্ষা করিতেছে স্নিগ্ধ হাত বুলাইবার জন্য সে ক্ষতের উপরে।

(৯)

এই জীবনের "তৃষার পরে ভুখার পরে" "শ্রাবণের ধারা" ঝরিয়া পড়িবার জন্য "নিশিদিন" উন্মুখ। "এই জীবনেই জন্মজন্মান্তর" ঘটাইতে পারেন যিনি তিনি "সুন্দর"। সুন্দরের দৃষ্টি হচ্ছে সমগ্রের দৃষ্টি—সমগ্র হইতে ছিন্ন যে খণ্ড সে কদর্য্য। জীবনের সমস্ত খণ্ড ঘটনা, সমস্ত ছোটখাট কাজ, সমস্ত ব্যবহারকে জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে সুসমঞ্জস করা, বেখাপ হইতে না দেওয়া, তালভঙ্গ হইতে না দেওয়া—ইহাই নীতি। সসীম জীবনের উপরে অনন্তের আহ্বান—ইহাই ধর্ম্ম। মৃত্যুর দ্বারা অখণ্ডিত চির-প্রবহমান যে জীবনধারা তারই কুলুনাদ ধর্ম্ম। কবরের পরে কি হবে, এই চিন্তাই ত ধর্ম্মের জননী। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"—ধর্ম্ম হচ্ছে মধু, এবং মধু হচ্ছে এমন এক পদার্থ যে, ইন্দ্রিয়গ্রামকে সমগ্রভাবে অভিভূত করে। আলাদা আলাদা করিয়া সা-রে-গা-মা চেঁচাইলে তা কীদৃশ উৎকট, হার্ম্মো-নিয়াম-শিক্ষার্থীর কল্যাণে তা কারু অবিদিত নাই। নীতিকথা সেই কারণেই উৎকট। Didactic কবিতা সর্ব্বদেশেই কীদৃশ অনাদৃত তা কার অবিদিত? ম্যাথু আর্ণল্ড্ বলিয়াছিলেন, ওয়ার্ডসোয়ার্থের "bags & baggages" কেড়ে নিলেই তবে আমরা প্রকৃত ওয়ার্ড-সোয়ার্থকে পাব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

অবরোধের কথা।

——:*:——

চোখে-দেখা যে খুন সে-খুনের আসামীরও নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু-না-কিছু বল্‌বার থাকে—সুতরাং অবরোধ প্রথার স্বপক্ষেও যে কিছু বল্‌বার আছে, তা আইন আদালত সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁরাই স্বীকার কর্‌বেন। অবরোধটাকে খুনী আসামী বলে' মান্‌লেও, অবশ্য চোখে দেখা খুন নয়। এ-খুন হচ্ছে আধ্যাত্মিক মেথডে। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আধ্যাত্মিক মেথডে যে হত্যা তা চোখে দেখা যায় না। এমন কি হাজার করা ন'শ নিরনব্বই "কেসে" যে মরে, সে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না যে, সে মর্‌ছে। সুতরাং পর্দ্দা বিরোধী যাঁরা তাঁরা অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনেন, সে-সব অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি ওকালতি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

(২)

অবরোধ প্রথার বিপক্ষ দল অবরোধের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনেন, সে-সব অভিযোগ থেকে সকল প্রকারের অলঙ্কার, কবিত্ব, যুক্তিতর্ক, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সকল রকমের বাহুল্য বর্জ্জন করে' তার একটা চুম্বক কর্‌লে যা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই, প্রথমত—

এই অবরোধ প্রথার মধ্যে বঙ্গীয় মহিলারা অত্যন্ত কষ্টে কাল যাপন করেন; দ্বিতীয়ত—সমাজে স্ত্রী-জাতির অবরোধ সমগ্র সমাজের পক্ষে অকল্যানকর। এই দু'টি সিদ্ধান্ত কতদূর ঠিক তা আমাদের দেখ্‌তে হবে।

আমরা আজ সবাই দেশচর্য্যায় ব্রতী সুতরাং সমাজের দিক থেকেই জিনিসটাকে আগে দেখ্‌ব—কেননা ব্যক্তির চাইতে সমাজই হচ্ছে সকলের মতে দেশের বৃহত্তর রূপ। সিদ্ধান্তটা হচ্ছে যে, অবরোধ প্রথাটা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। কিন্তু আমাদের জাতীয় ও সামাজিক দুর্গতির জন্য অবরোধ প্রথা যে কতদূর দায়ী, সে বিষয়ে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা আছে বলেত আমার মনে হয় না।

সুতরাং আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবটির প্রতি নজর দেব। সেটা হচ্ছে এই যে, অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলারা অত্যন্ত কষ্টে কাল যাপন করে' থাকেন। দেখ্‌তে হবে কথাটা কতদূর সত্যি।

ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে মস্ত একটা প্রভেদ দাঁড়িয়েছে। ইতর প্রাণীর মধ্যে instinct প্রবল; মানুষ—কি পুরুষ কি স্ত্রী—instinct-কে ছাড়িয়ে উঠেছে। কথাটা বাঙলা করে' বল্‌লে এই দাঁড়ায় যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি একাধিপত্য কর্‌ছে; কিন্তু মনুষের মধ্যে পুরুষ আপনার সন্ধান পেয়েছে—এবং সে প্রকৃতির উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন কর্‌বার জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌ছে। সে যে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত কর্‌তে পেরেছে তা নয়, তবে মানুষ আর পশু নেই। মানবের মধ্যে পুরুষ আপনার সন্ধান পেয়েছে বলে', আপনার অধিকার, আপনার রহস্য জেনেছে বলে' মানবের স্বাধীনতাও বেড়েছে, তার সুখ দুঃখের ফরমুলা বদ্‌লেছে,

তার আশা আকাঙ্ক্ষার চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তার সমস্ত জীবনের ভঙ্গিমাটাই একটা নূতন ছাঁচে গড়ে উঠ্‌ছে।

মানবের মধ্যে পুরুষ জাগ্রত হয়েছে বলে' পুরুষ নারীর মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে—সেই পুরুষের ইচ্ছা শক্তির জোরে। প্রকৃতি হচ্ছে জ্ঞানহীনা। সে পুনরুক্তি ছাড়া, একই জিনিসকে, একই বিষয়কে বার বার একই ভাবে সৃষ্টি করা ছাড়া, আর কিছু পারে না। সেই জন্য দেখি যেখানে পুরুষের আবির্ভাব হয় নি সেখানে প্রকৃতির একই রূপ। বৈদিক যুগের গরুটা থেকে আজকার গরুটার কিছুই প্রভেদ নাই। শিশু যিশুকে পিঠে করে' যে গাধাটা ঈজিপ্টে পৌঁছিয়েছিল, সেটার সঙ্গে আমাদের অতি সাধারণ ধোপার গাধাটার কোনই অমিল নেই। তেমনি সকল প্রকার ইতর প্রাণী উদ্ভিদ ইত্যাদির কোনই পরিবর্ত্তন নেই। পাঁচ হাজার বছর আগে শাল্মলী তরুটা ঠিক যে ভাবে যে অবস্থার ভিতর দিয়ে যে নিয়মে গড়ে উঠেছে—আজকার শাল্মলী তরুটাও তাই। যে বট গাছটার তলায় শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন সেটাও যা— আর আজকার যে বট গাছটার তলায় পানওয়ালী পানের খিলি বেচ্‌ছে, ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষীরা তামাক খাচ্ছে—সেটাও তাই। কিন্তু এক মানুষের সম্বন্ধেই তা খাটে না। কারণ মানুষের মধ্যে পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, আর এই পুরুষের ইচ্ছা শক্তি বা Will বলে' একটা সম্পদ আছে।

আর সেই জন্যেই মানুষের—কি পুরুষ কি নারীর—সুখ দুঃখ শুধু একটা বাহিরের ধরাবাঁধা অবস্থা বিশেষে নয়, সেটা তার অন্তরের ইচ্ছার সার্থকতা বা ব্যর্থতা। মানুষের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ

subjective, একটা গরুর সুখের অবস্থাও যা, দশটা গরুর সুখের অবস্থাও তাই, দশ-যুগের গরুর সুখের অবস্থাও তাই। কিন্তু মানুষের সুখ তখনই, যখন তার অন্তরের অবস্থা বা মনের বাসনার সঙ্গে বাহিরের অবস্থা খাপ খায়।

উপরে যে কথাগুলো বলা গেল, আশা করি এ সম্বন্ধে সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এখন একটা জিনিস নির্দ্ধারণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব, সেটা হচ্ছে অবরোধ প্রথাটা বাঙলায় এল কি করে'। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি একটা বিজ্ঞান-সঙ্গত ঐতিহাসিক গবেষণা বা অনুসন্ধান কর্‌তে যাচ্ছি—আমার এ অনুসন্ধানের আশ্রয় হচ্ছে অনুমানখণ্ড ইংরেজিতে যাকে বলে—guess-work। এই guess-work এখানে কর্‌তে যাচ্ছি এই সাহসে যে, তার সিদ্ধান্ত যদি ডাহা ভুলও হয়, তবে এই প্রবন্ধের মূল কথার কিছুই আস্‌বে যাবে না।

বাঙলাদেশে আজকাল দু'রকমের লোক দেখা যায়। এক দলকে সেই দাঁড়কাকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়েছিল। কারণ তার ধারণা ছিল যে, গায়ে ময়ূরপুচ্ছ লাগালেই সে সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে। এই দলের মানুষও তেমনি বলে' বেড়ান যে, আমরা হচ্ছি আর্য্য সন্তান। তাঁদের মনের ভাবটা যে, আমরা আর্য্য-সন্তান প্রতিপন্ন হ'লে বর্ত্তমান "আমাদের" মহত্ত্বটাও বিনা ক্লেশে বিনা আয়াসে বেড়ে যাবে। তাই যখন এঁরা শোনেন কেউ বল্‌ছে যে, আমাদের শিরায় মঙ্গোলীয় বা দ্রাবিড় শোণিত আছে, তখন তাঁরা বেজায় খাপ্পা হ'য়ে ওঠেন। অন্যদল এ সবকে কিছুই কেয়ার করেন না। তাঁরা বলেন যে, থাক্‌লেই বা

আমাদের শিরায় দ্রাবিড় বা মঙ্গোলীয় শোণিত, আমাদের যা মহত্ত্ব তা কাগজে কলমে দেখালে চল্‌বে না, দেখাতে হবে তা হাতে কলমে। অতীতকে নিয়েই খালি হৈ চৈ কর্‌লে নিজেদের সুখ হ'তে পারে কিন্তু অপরের তাতে ভুল হবে না। কিন্তু যাহোক্ এঁদের এই বাদানুবাদের কোন বিচার আমরা কর্‌ব না—বিশেষত আমরা যখন নৃতত্ত্ববিদ নই। এঁদের দু'দলের মনস্তুষ্টির জন্যে ধরে নেওয়া যাক, বাঙালীর মধ্যে ও-তিন জাতের রক্তই আছে—আর্য্যেরও, মঙ্গোলেরও দ্রাবিড়েরও। এবং এ-কথাটা সত্য হবারও একটা সম্ভাবনা আছে। কেননা ভারতবর্ষের সকল জাতির মধ্যে বাঙালীর যেমন একটা adaptability আছে—আপনাকে পরিবর্ত্তিত হ'তে দেবার পক্ষে যেমন একটা অসঙ্কোচ ভাব আছে, এমন আর কারও নেই। আর মিশ্র রক্তেরই যে এ রকম চরিত্র হ'য়ে থাকে, এটা নৃতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু এই যে অবরোধ প্রথা, তা আর্য্যদের ছিল না; মঙ্গোলীয়দেরও নেই, দ্রাবিড়দেরও নেই। সুতরাং বাঙালী তা পেল কোথা থেকে? এ প্রশ্নে স্বভাবতই একটা উত্তর এসে পড়ে, সেটা হচ্ছে—মুসলমানদের কাছ থেকে।

এ সম্বন্ধে বাঙলাদেশে একটা প্রচলিত মত আছে সেটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা বঙ্গীয়-ললনার উপরে অত্যাচার কর্‌ত, তারই ফল হচ্ছে অবরোধ। কিন্তু অবরোধের এই কারণটা সত্যি নয় বলেই মনে করি। কেন করি—তার কারণ বল্‌ছি।

একথা আমরা সবাই জানি যে, বাঙলাদেশে মুসলমানদের আমলে সমস্ত দেশটা প্রত্যক্ষ ভাবে হাতে ছিল হিন্দুদের। মুসলমান নবাব বছর বছর নিয়মমত রাজস্ব পেলেই তুষ্ট থাক্‌তেন। কিন্তু দেশের

আভ্যন্তরিক শাসনের ভার ছিল হিন্দু-জমিদার বা রাজাদের হাতে। শাসন ও পালনের ভার প্রত্যক্ষ ভাবে ছিল তাঁদেরই হাতে। সুতরাং সেই হিন্দু-জমিদার বা রাজাদের এলাকায় মুসলমানেরা হিন্দু-ললনার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ কর্‌ল আর সমস্ত হিন্দুরা জোট বেঁধে তার প্রতিকার কল্পে বাঙলার সমস্ত নারী সমাজকে একদিন অন্তঃপুরে অন্তরীণ কর্‌ল, এটা মান্‌তে মন সরে না। আর যদি ধরেই নেও যে, মুসলমানরা হিন্দু-ললনার উপরে অত্যাচার কর্‌ত, তাহ'লেও ঐ অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে তারা তাদের গায়ের বল, হাতের অস্ত্র, বুকের সাহস—সব ঢেকে রেখে তাদের মা বৌ বোনদের উপরে হুকুম জারি কর্‌ল যে, তাদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ—এ যদি হয় তবে সেটা মানুষের সম্বন্ধে একটা ভীষণ রকমের নতুন Psychology বল্‌তে হবে—যা মান্ধাতার আমল থেকে মানুষের চরিত্র দেখে দেখে মানা কঠিন। বিশেষত মুসলমান কেবল বাঙলাদেশেই ছিল না—অন্য প্রদেশেও ছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, একথা নির্ব্বিঘ্নে বলা যেতে পারে যে, বাঙালী যদি মুসলমানদের কাছ থেকেই অবরোধ প্রথা পেয়ে থাকে, তবে সেটা সে পেয়েছে ভয়ের ভিতর দিয়ে ততটা নয়, যতটা ভক্তির ভিতর দিয়ে।

সে যাহোক্‌, ঐ যে ভাদুড়ী বংশের রাম ভাদুড়ী যিনি নবাবের অমুখ পরগণার দেওয়ান, বছরে মাইনে পান হাজার মোহর, দু-পা যেতে হলে যাঁর পাল্কী চাই, যাঁকে দেখে সাধারণ অসাধারণ গণ্য নগণ্য সবাই তটস্থ, তাঁর গৃহিণী কাত্যায়নী দেবীর ব্যবহারটা হওয়া চাই নবাব অন্তঃপুরবাসিনীদের মতো; কারণ সেইটেই যে আভিজাত্যের চিহ্ন, সেটাই যে বড়মানুষী চাল। তাই কাত্যায়নী দেবীর

মাথায় অবগুণ্ঠন চড়্‌ল। আর এই অবগুণ্ঠনের দুঃখের চাইতে একটা বড় সুখ কাত্যায়নী দেবীর মনে বাসা বাঁধল—সেটা হচ্ছে, ঐ আভি-জাত্যের গর্ব্ব – তিনি যে বড়ঘরের গৃহিণী সেই অনুভবের সুখ। আর এই সুখই কাত্যায়নী দেবীর আসল সুখ, কেননা আগেই বলেছি যে, মানুষের সুখ হচ্ছে তার অন্তরের বাসনা বা আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা, আরও বলেছি যে, মানুষের অন্তরের এই বাসনার পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে—তার ইচ্ছাশক্তির জোরে। সেইজন্যে মানুষের সুখ দুঃখ তার বাহিরের কোন অবস্থা বিশেষই নয়।

বাস্তবিক এ সত্যের উদাহরণ জগতে অসংখ্য মেলে। চীনে-রমণী যে লোহার জুতো পরে' পা ছোট করে' রাখে, যে-পা দিয়ে অবশেষে হাঁটাই যায় না, এর পিছনে রয়েছে চীনে-রমণীর পা ছোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দরী হ'য়ে উঠ্‌ছে—এই মনোভাব। এইজন্যে পা ছোট হওয়ার দুঃখ, হাঁটতে না পারার দুঃখ, তার দুঃখই নয়। আমি নিজ চোখে দেখেছি একটি ছোট মেয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে হাতে উল্কি পর্‌বার কালে। কিন্তু হ'লে হবে কি?—ঐ উল্কির সাথে সাথে যে, তার হাতখানি সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে, এই মনের ভাব মেয়েটিকে এমন একটা জগতে নিয়ে ফেলেছে, যেখানে শরীরের ব্যথা মোটেই আসন পায় না। হাতটা কাঁধ থেকে নীচের দিকেই নামা যে সুখের, তার প্রমাণ আবশ্যক করে না। কিন্তু ঊর্দ্ধবাহু যে, সেই হাতখানাকে উঁচু করে' ধরে তাকে শুকিয়ে ফেল্‌ল, তার পিছনে ঊর্দ্ধবাহুর মনের এই সুখটা রয়েছে যে, ঐ সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্ম্মজীবন লাভ হচ্ছে—ভগবানের কাছে যাবার পথ সরল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এমনি করেই হয়ত সেকালের ধনী-গৃহিণীবৃন্দের মাথায় অবগুণ্ঠন চড়্‌ল, তাদের অন্তঃপুরের দরজা জানালা বন্ধ হ'ল। আর তারপর "মহাজনো যেন গত স পন্থা" না মান্‌লেও ধনীলোকেরা যা করেন নির্ধনেরাও যে তাই করেন, অন্তত কর্‌তে চেষ্টা করেন এ সত্য আজও দেখা যায়। সুতরাং ঐ ফ্যাসান ক্রমে ক্রমে দেশে ছড়িয়ে পড়্‌ল—এবং দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে শতাব্দীতে শতাব্দীতে ওটা দেশের মাটী ও নারীর মনকে এমনি করে' জড়িয়ে ধরল যে, অবশেষে বঙ্গীয় মহিলাদের ওটাই সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল—সুতরাং এইটেই সুখের হ'য়ে উঠ্‌ল।

তারপর সুখ দুঃখের কথা। আসলে মানুষ যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সেখানেই সে আপনার সুখ দুঃখ সৃষ্টি করে' বসে। কারণ সুখ দুঃখটা মানুষের মনের ধর্ম্ম। মন যতদিন আছে, ততদিন সে যেখানেই যে-অবস্থাতেই থাক্ না কেন, সেখানেই সে আপনার সুখ দুঃখের আশ্রয় খুঁজে নেবে। মিস্ পাঙ্ক্‌হার্‌স্টের দুঃখ—নারীর ভোটে অধিকার মিলছে না বলে', শ্রীমতী শতদলবাসিনীর দুঃখ—তার দড়াহারটা ঠিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ের মতো হয় নি বলে'। যদি বল যে, মিস্ পাঙ্ক্‌হার্‌স্টের মধ্যে রয়েছে নারীর পূর্ণতর রূপ, পূর্ণতর প্রকাশ। তাহোক্। শতদলবাসিনী আজ যা, তার কাছে নারীর ঐ পূর্ণতার রূপ বা প্রকাশের কোন মূল্যও নেই মানেও নেই। সে এখন যা, তার কাছে মিস্ পাঙ্ক্‌হার্‌স্টের ভোট না পাওয়ার দুঃখ পাগ্‌লামি, আর মিস্ পাঙ্ক্‌হার্‌স্ট আজ যা, তার কাছে শতদলবাসিনীর দড়াহার সম্বন্ধীয় দুঃখ ছেলেমানুষী। আমি আগেই বলেছি যে মানুষের সুখ দুঃখ subjective, আসলে

সুখ দুঃখ বাহিরেও আছে, ভিতরেও আছে। বাঙালীর অন্তঃপুরেও হাজার হাজার সুখী গৃহিণী মিল্‌বে। সুতরাং অবরোধের ভিতরে দুঃখের একচেটে কার্‌বার—এ কথাটা ঠিক নয়, আর বাহিরে সুখের অবিরাম হিল্লোল, এত বড় মিথ্যে কথাটাও আজ আমরা বাঙলার নারী-সমাজকে বল্‌তে পার্‌ব না।

অবরোধের বিরুদ্ধে যে দুই অভিযোগের কথা প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি, সে দুই অভিযোগ থেকে অবরোধকে বাঁচাতে হ'লে এই সব কথাই বলা চল্‌তে পারে।

(৩)

আমরা অবশ্য অবরোধের স্বপক্ষে নই। আমরা নারীর অবরোধের বিরুদ্ধে এইজন্যে যে, যেমন পুরুষ তেমনি নারী তার পক্ষে দেহ বা মনের রুদ্ধ অবস্থা একটা ঘোর মিথ্যা অবস্থা। সাংসারিক সুখ দুঃখের চাইতেও মানুষের কাছে তাঁর আত্মা বড়, অবরোধ প্রথা নারীর আত্মাকে খর্ব্ব করে বলে'ই তা অসহ্য।

আসলে বাঙলার পুরুষ যেমন কেরাণীগিরি কর্‌বার জন্যেই জন্মে নি—বাঙলার নারীও তেমনি শাস্ত্রবাক্য "পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যাঃ" সত্ত্বেও কেবল গর্ভধারণের জন্যেই জগতে আসে নি। আকাশ বাতাসের সঙ্গে পুরুষের যে সম্বন্ধ, নারীরও সেই সম্বন্ধ। আমরা জন্মেছি এই জগতে। ভগবান আমাদের প্রাণ দিয়েছেন নড়্‌বার চড়্‌বার জন্যে—চোখ দিয়েছেন, কৌতূহল দিয়েছেন—ঢুঁড়্‌বার খুঁড়্‌বার জন্যে। কিন্তু এই খোলা জগতটা নারীর জন্যে একেবারে

বদ্ধ-পুঁথি করে' রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী, আর যেই হোন্—স্বাধীনতার মর্ম্ম যাঁরা একটুকুও অনুভব করেন তাঁরা হবেন না। আর ঐ হচ্ছে সবার চাইতে বড় যুক্তি।

যেটা মানুষের চোখে চোখে থাকে, সেই জিনিসটাই তার চোখে পড়ে না। সেই রকম, যে আচার ব্যবহারগুলো নিয়ে আমরা ঘরকন্না করি, তার কোন কোনটা ঘোর বীভৎস হলেও সেই বীভৎসতাটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু যখন একটুখানি নিজেকে আল্‌গা করে' দেখ্‌বার চেষ্টা করি—পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মনকে, আজন্মের সংস্কার থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করে' সহজ স্বাভাবিক চোখে দেখ্‌তে চেষ্টা করি, তখন অদম্য হ'য়ে মনের পাতায় এই ভাব ফুটে ওঠে—কি অমানুষিক অত্যাচার! আমাদের মতোই রক্তমাংসের জীব, আমাদের মতোই যাদের মন আছে, বুদ্ধি আছে, কৌতূহল আছে, চোখ আছে, তাদের এ জগতটাকে সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়িয়ে দেখ্‌বার অধিকার নেই। যদি নেহাৎ তারা দেখতে চায় ত চোখের সাম্‌নে ঝিলিমিলি ঝুলিয়ে। যখন ঐ চার দেয়ালের কথা স্মরণ করি তখন নিজেরই নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌বার মতো হয়। যদি বল যে, তোমার কাব্যি-কল্পনা রাখ, বঙ্গ-নারীর ও-রকম কারও নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে না। তবে বলি যে, ঐ ত সবার চাইতে বড় দুঃখ, "হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু তাদের মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে"। আর এই পাথরের মুঠোকে চিরন্তন কর্‌বার জন্যে আমরা কেউ কেউ দেই যুক্তি এবং এই মুঠোকে আল্‌গা করবার জন্যে আমরা কেউ কেউ করি তর্ক। আমাদের যুক্তি তর্কের আর শেষ নেই।

কিন্তু নারীও যে পুরুষের মতো এ জগতের বুকে খোলা চোখে, মুক্ত মনে বিচরণ কর্‌বে, এটা এত সাদা রকমের সত্য যে, এর কোন যুক্তি খুঁজে পাইনে। আস্‌লে যখন সত্যকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাই, তখনই সত্যকে খাটো করি। সত্য সব সময়েই নিজগুণেই সত্য।

অবরোধকে চিরন্তন করে' রাখ্‌বার জন্যে যাঁরা অনেক অনেক যুক্তি দেন, তাঁদের একটা যুক্তি কেবল একটু প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন যে, অবরোধের ঐ পাথরের মুঠোকে আল্‌গা কর্‌লে, সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়্‌বে—চরিত্রহীনতা বাড়্‌বে।

প্রথমত—এ যুক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। এই ভারতবর্ষেই তামিল বলে' এক জাতি আছে। কি হিন্দু, কি ক্রিশ্চিয়ান তাদের নারী-সমাজে অবরোধ প্রথা নেই। কিন্তু তাই বলে' তাদের সমাজ ব্যভিচারের স্রোতে ভেসে যায় নি—তাদের সমাজ বিশৃঙ্খলায় ত উশৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয়ত—মানুষকে যতটা প্রকৃতিগত উশৃঙ্খল বলে' ধরে' নেই—মানুষ ঠিক ততটা উশৃঙ্খল নয়। মানুষের দেহ ছাড়িয়ে প্রাণ, প্রাণ ছাড়িয়ে মন, মন ছাড়িয়ে আত্মা। মানুষ তার দেহ থেকে যাত্রা সুরু করে' আত্মার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজকার মানুষ প্রায় মনের কাছকাছি এসে পৌঁছেচে। এই মনকে শিক্ষা দিয়ে শিষ্ট করা যায়। আর এই মনকে শিক্ষা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষকে চরিত্রবান করাই হচ্ছে পাকা কাজ। স্ত্রী-পুরুষকে আলাদা রেখে তাদের চরিত্রবান করা হচ্ছে গোঁজামিল। গোঁজামিলের পক্ষপাতী যাঁরা, তাজা মন তাদের কোন দিনই লাভ হবে না। তবে পুরুষের মধ্যে শতকরা

এক শ' জনাই যেমন ভীষ্ম হবেন না—তেমনি নারীর মধ্যেও শতকরা এক শ' জনাই সাবিত্রী হবেন না। মানুষের কিছুই চৌকষ হয় না—তার আর কি করা যাবে ? কিন্তু এই চৌকষ না হবার মানেও আছে ; কারণ যে অনুষ্ঠানের যেখানে চৌকষ নয় ঠিক সেই খানটায় তার অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত।

আসলে বুরোক্রেসি আজ আমাদের ঠিক ঐ কথাটাই বল্‌ছে। তারা বল্‌ছে যে, তোমরা স্বায়ত্ত-শাসন পেলে দেশে ঘোর বিশৃঙ্খলা হবে। আমরা কিন্তু সেটা মোটেও মান্‌ছি নে। আর আমাদের এই না-মানাটা ঐ বিশৃঙ্খলা-যুক্তির চাইতে বড়।

ঠিক তেমনি আজ যদি কয়েকজন বিদুষী বঙ্গীয়-মহিলা প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলার পুরুষের পার্লিয়ামেণ্টে এক আর্জ্জি পেশ করেন—বঙ্গনারীর পর্দ্দা তুলে দেবার জন্যে, আর আমরা যদি ঐ বিশৃঙ্খলার দোহাই দেই, তবে সেটাও কি ঠিক ঐ জাতীয় যুক্তি হবে না ?

আসল মেয়েরা স্বাধীনতা পেলে যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার বাড়ে, তবে তা থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে সমাজকে অন্য উপায় খুঁজে বের কর্‌তে হবে। ঐ আজুহাতে মানুষের প্রতি ভগবানের প্রথম দান যা—চোখ মেল্‌বার অধিকার—চোখ মেলে এই জগতটাকে সহজ রূপে দেখে নেবার অধিকার—তা থেকে স্ত্রী-জাতিকে অনন্ত যুগ বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌তে চায় যে, সে বর্ব্বর না হোক্, ঘোর স্বেচ্ছাচারী—অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে' despot. এই despotism কি আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী হবে ?—আজকের দিনে এ কথা বিশ্বাস করা আহম্মকি।

(৪)

কিন্তু আজ বঙ্গীয়-নারী-সমাজের পক্ষে সবার চাইতে আরামের খবর যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে, বাঙলার পুরুষ-সমাজের সবাই স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে নি। তা যদি হ'ত আর বাঙলার সকল পুরুষ যদি তাঁদের আত্মীয়াদের অবগুণ্ঠন টেনে ছিঁড়ে তাঁদের দীপ্ত আকাশের তলে নিয়ে আস্‌তেন তবে সেই আত্মীয়াদের আজ লাঞ্ছনার সীমা থাকৃত না। কেননা কোন জিনিসকেই বাহির থেকে পাওয়াই সত্য করে' পাওয়া নয়। ভিতরে যে সত্যের চিহ্ন-মাত্র নেই বাহিরের সেই সত্যের অনুযায়ী আচরণ কর্‌তে গেলে দুঃখই হয়, কারণ সেটা হচ্ছে তখন পরধর্ম্ম।

সুতরাং হাজার কাজ, হাজার চিন্তা, হাজার অনুষ্ঠানের মাঝে আজ যেন আমরা এই কথাটাকে অস্বীকার না করি যে—সত্যই সুন্দর, সত্যই শোভন, সত্যই সহজ। যতক্ষণ এই সত্যকে আমরা অন্তরে গড়ে' তুল্‌তে না পার্‌ব, ততক্ষণ সে-সত্যকে আমরা বাইরে সার্থক করে' তুল্‌তে কিছুতেই পার্‌ব না। আসলে কোন সত্যই বাহির থেকে পড়ে' পাওয়া যায় না', অন্তর থেকে গড়ে' তুল্‌তে হয়। জীবনে যেখানেই আমরা এই সত্যটাকে অস্বীকার কর্‌ব, সেখানেই আমাদের পরিণামে ঠক্‌তে হবে।

কাজেই আমাদের সমাজের অন্তরে স্বাধীনতা আগে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হ'বে—তখনই বাহির স্বাধীনতার পক্ষে সহজ হবে, সত্য হবে ও সুন্দর হবে।

এর জন্যে চাই স্ত্রী-পুরুষের মনের গঠন-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন—তাদের শতাব্দীব্যাপী সংস্কারের বিসর্জ্জন, আর তা হবে শিক্ষার ভিতর দিয়ে।

শিক্ষার ভিতর দিয়ে যখন মন, চিত্ত মুক্ত হ'বে তখনই বাহিরের স্বাধীনতা অমৃতময় হবে। কারণ এ প্রবন্ধের আগেই আমি বলেছি যে, মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দ তখনই, যখন তার ভিতরের অবস্থার সঙ্গে তার বাহিরের অবস্থা খাপ খায়।

কিন্তু সবার চাইতে মানুষের সত্য যা—তার স্বাধীনতা—তার চোখ মেলে সহজ ভাবে এই পৃথিবীর বুকে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াবার অধিকার—সেই অধিকারকে যে মানুষের জীবনে—তা সে মানুষ পুরুষই হোক বা নারীই হোক্—শিক্ষা দিয়ে সত্য করে' তুল্‌তে হয়—এর চাইতে মানুষের-জীবনে বড় পরিহাসের কথা আর কিছুই নেই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। *

১

রাত পোহালো—শুন্‌ছ সখি, দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক!
পূব গগনের দেব-সবিতার স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
পড়্‌ল এসে রাজ-প্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির।

২

স্বপ্নে যেন কণ্ঠ শুনি—রাত্রি জানি শেষ প্রহর—
পান্‌শালে মোর দৈববাণী—কর্ণেতে কার বাজ্‌ল স্বর!
বল্‌ছে হেঁকে—ওঠ্‌রে বাছা, ভরিয়ে নে তোর পেয়ালাটুক,
জীবন-সুরা শুকিয়ে না যায়, আপশোষে ফের ফাট্‌বে বুক!

* পারসী কবি ওমর খৈয়ামের কবিতার একটি বিশেষ গুণ এই যে, যিনি তা পড়েন তাঁরই তা অনুবাদ কর্‌বার লোভ হয়। ইউরোপে এমন ভাষা নেই যাতে ওমর খৈয়ামের রুবেইয়াতের অনুবাদ নেই। শুধু তাই নয়, প্রতি ভাষাতেই তার নানা হাতের অনুবাদ আছে। বহু লেখক বাঙলা ভাষাতেও ওমার খৈয়ামের কবিতা অনুবাদ কর্‌তে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু সে আংশিকভাবে। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ রুবেইয়াৎ-গুলো আগাগোড়া তরজমা করেছেন—এই জন্য বাঙলার পাঠক সমাজের কাছে সে-গুলি উপস্থিত কর্‌ছি।

সম্পাদক।

৩

রুদ্ধ-দুয়ার পানশালাটির সামনে সে কি হট্টগোল,
ভোরের ডাকে বলছে কারা—খোল্ রে ওরে দুয়ার খোল!
কতক্ষণ বা রইব হেথা, ছুট্‌ছে আয়ু ব্যস্ত পায়,
বিদায় নিলে ফিরব না আর—অন্তহীন যে সেই বিদায়।

৪

নওরোজেতে সেই পুরাতন ব্যর্থ যত মনের আশ
উঠ্‌ছে কত ভাবুক মনে, দিচ্ছে মোড়া স্মৃতির পাশ।
কোন্ দুখেতে যায় সে চলে' কোন্ নিরালা বনের মাঝ,
ঈশার শ্বাসে গুল্মলতার নবীন যেথা পত্র-সাজ।

৫

ঈরাম্ নিয়ে পালিয়েছে তার গর্ব্ব যা' সব গুল্-বাহার,
জাম্‌শিয়েদের খাস্-পেয়ালা—কোথায় গো আজ চিহ্ন তার!
তবু দ্রাক্ষা-বুকে তেমনি আজও জ্ব'ল্‌ছে চুনীর রক্তহার,
আর খুঁজ্‌লে আজও মিল্‌বে না কোন্ ফুল-বাগিচা নদীর ধার!

৬

দায়ুদ সাথে ফুরিয়েছে আজ সব পুরাতন ছন্দ-ফের,
বুলবুলেরি কণ্ঠে শুধু বাজ্‌ছে ভাষার সাবেক জের।
সেই সুরেতে চাইছে সে আজ গোলাপসখীর বর্ণ লাল—
রক্ত-রাঙা দ্রাক্ষাসারে রাঙিয়ে নিতে হলুদ-গাল।

৭

আজ ফাগুনের আগুন-জ্বালে হুতাশ-বোনা শীতের বাস
পুড়িয়ে সে সব ছাই ক'রে দাও—দাও আহুতি দুখের শ্বাস !
আয়ু-বিহগ—খোঁজ রাখ কি—মেলিয়ে ডানা উড়্‌ল হায়,
পেয়ালাটুকু শেষ করে' নাও, এক চুমুকেই ফাগুন যায় !

৮

কতই না আজ ফুল ফুটেছে, অযুত বরণ, ঊষার মাঝ,
লক্ষ ফুলের সমাধি'পর—তাদের স্মৃতি তুচ্ছ আজ !
এই ফাগুনের ফুলের বাসে দেখ্‌বে কোথা তলিয়ে যান
জাম্‌শিয়েদের অতীত স্মৃতি, কৈকোবাদের জীবন-গান !

৯

ভাগ্যলিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা' ফুরিয়ে যাক্ ;
কৈকোবাদ আর কৈখস্‌রুর ইতিহাসেই নামটা থাক্ ।
রুস্তম আর হাতেম তায়ের কল্পকথা স্মৃতির ফাঁস—
সে সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এসো আমার পাশ ।

১০

আমার সাথে আস্‌বে যেথায়—দূর সে রেখে সহর গ্রাম—
এক ধারেতে মরু তাহার, আর এক দিকে শষ্প শ্যাম ।
বাদ্‌শা-নফর নাইক সেথা—রাজনীতির চিন্তাভার ;
মামুদশাহ ?—দূরে থেকেই কর্‌ব তাঁরে নমস্কার ।

১১

সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায় !
মৌন ভাঙ্গি, মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর !

১২

রাজ্যসুখের আশায় বৃথা কেউবা কাটায় বরষ মাস,
স্বর্গসুখের কল্পনাতে পড়্‌ছে কারুর দীর্ঘশ্বাস।..........
নগদ যা' পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক—
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে ?—মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

১৩

সদ্য-ফোটা এই যে গোলাপ, গন্ধ-প্রীতি-উজল-মুখ,
ব'ল্‌ছে না কি—মিথ্যা এ সব, এই ক্ষণিকের দুঃখসুখ !
পৃথ্বী-বুকে উঠ্‌ছি ফুটে গর্ব্বে পরি' রঙীন্ সাজ—
পাপ্‌ড়ি টুটে ছড়িয়ে মোদের জীবন-রেণু পথের মাঝ !

১৪

কুহক-রাণী আশার পিছে দিল্‌টা ফিরে সর্ব্বদাই,
স্বপ্ন কারু সত্য বা হয়, কার ভাগে বা উঠ্‌ছে ছাই।
সব ক্ষণিকের—আসল ফাঁকি—সত্য মিথ্যা কিছুই নয়-
মরুর 'পরে তুষার মতো চিক্‌মিকিয়ে পায় সে লয়।

১৫

জীবন-জমির 'পরে যারা যত্নে বোনে সোনার বীজ,
হাওয়ায় বুনে ফুৎকারেতে কর্‌ছে যারা সব খারিজ ;—
খতম যে সব এইখানেতেই—বীজ না ফলে পুনর্ব্বার,
গোরের ভিতর যে জন, সে কি জীবন নিয়ে ফিরবে আর !

১৬

জীর্ণভাঙ্গা সরাই-খানার রাত্রি দিবা দুইটি দ্বার,
তারির ভিতর আনাগোনা—দুনিয়াদারি চমৎকার !
রাজার পরে আস্‌ছে রাজা, সজ্জা কতই বাদ্য ধূম—
তুচ্ছ সে সব—কয়দিনই বা ?—তার পরে তো সব নিঝুম !

১৭

জাম্‌শিয়েদের পেয়ালা-মুখর্‌ খাস্‌-দেয়ালের খিলানমাঝ
বাস বেঁধেছে আজকে সেথায় টিক্‌টিকি আর সিংহরাজ !
রাজার সেরা রাজ-শিকারী বরাম্‌ কোথায় ঘুমিয়ে রয়—
আজকে তো তার মাথার 'পরে চাট্‌ মেরে যায় বন্য-হয় !

১৮

দীর্ণ-হিয়া কোন্‌ সে রাজার রক্তে-নাওয়া এই গোলাপ—
কার দেওয়া সে লাল্‌চে আভা, হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত-ছাপ !
ফুল-বাগিচায় ওই যে ফোটে রঙের বাহার আশ্‌মানির—
কোন্‌ রূপসী সীমন্তিনীর সুনীল আঁখির দৃষ্টি স্থির !

১৯

আর এই যে কোমল দূর্ব্বা গো, যার বুকের ঘেরা আঁচল টুক্
সন্ধ্যশীতল শয়ন মোদের—সব্‌জিয়েছে নদীর মুখ—
আস্তে সখি পাশ ফিরে নাও—কি জানি এর ব্যথার ফের—
কোন্ রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ান্-রসে জন্ম এর!

২০

অতীত যা' তার দুখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর—
দিল্-পিয়ারা শাকী গো আজ পেয়ালা ভরে' ঘুচাও মোর।
আসছে যে কাল, তার কথা থাক্—মিশ্‌ব গিয়ে হয়ত আজ
তুচ্ছ স্মৃতির সৌরভেতে লক্ষ অতীতকালের মাঝ!

২১

গর্ব্বে যারা বইত শিরে ভাগ্যদেবীর আশীষ্-ভার,
বক্ষে যাদের দুলিয়েছিনু সর্ব্ব স্নেহপ্রীতির হার;—
আজ দুনিয়ায় কোথায় তারা?—পেয়ালাটুকু আর সবার
একটু আগে শূন্য ক'রে ঘুমিয়ে ঘোচায় শ্রান্তি-ভার!

স্ফূর্ত্তি যে আজ ক'র্‌ছি মোরা সেই পুরাতন ঘরের মাঝ,
বসন্ত সেই দিচ্ছে বাহার—নূতন ফুলের রঙীন্ সাজ;—
ভাগ্যে সবার সেইতো লিখা—মাটীর নীচে মরণ-পুর,
পুনঃ মোদের পরে ক'র্‌বে কারা সেই পুরেতে শ্রান্তিদূর!

২৩

মিশ্‌ব ধূলোয়—তার আগেতে সময়টুকুর সদ্‌-ব্যাভার
স্ফূর্ত্তি ক'রে নাই করি কোন্—দিনকয়েকেই সব কাবার!
পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাব মৃত্যু-পারের কোন্ সে দেশ—
সেথা নাইকো সুরা, নাই সুকণ্ঠ—সেই অজানার নাইকো শেষ!

২৪

সদ্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রিদিন,
মরণ-পরের ভাব্‌না ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হ'তে মুয়েজ্জিনের সাড়া পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই!

২৫

তর্ক তুলে কর্‌ত যারা দ্যুলোক ভূলোক নস্যসাৎ—
কোথায় তাদের কণ্ঠ আজি—নির্ব্বিবাদে কিস্তিমাৎ?
বিধান তাদের ফুৎকারেতে উড়িয়ে সবাই দিচ্ছে আজ,
আর মুখটি তাদের ধূলোয় ঠাসা—বন্ধ এখন জিভের কাজ!

২৬

বচন-বাগীশ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞভাবে নাড়ুক শির,
স্মরণ রেখো বন্ধুগো মোর—জীবন কভু নয়কো স্থির।
এই কথাটাই সত্য ভবে, বাকী যা' সব মিথ্যা, ভুল;
সৃজন-বোঁটায় আর ফোটে না, ঝরলে পরে আয়ুর ফুল!

২৭

কতই না সে মাড়িয়ে আসা পণ্ডিতেদের টোলের দোর,
বয়স তখন নেহাৎ কাঁচা—কাজটা শোনা তর্ক ঘোর;
বিচার-ঘটে বিশ্ব পোরা—মুণ্ডমাথা নাইকো যার—
তর্ক-ধাঁধার ফির্তি-দুয়ার—ঠিক্ যেথা তার প্রবেশ-দ্বার!

২৮

তাদের সাথে ক'রনু রোপন বীজটি গোপন জ্ঞান-তরুর,
জলটি সেচন আপন হাতে—ফল্‌ল ফসল হৃদ্-মরুর;
যত্নে সে মোর চায়নে করা জ্ঞান-ফসলের অর্থ-জের—
স্রোতের মতই ভাস্‌তে আসা, হাওয়ার সম উধাও ফের।

২৯

কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ,
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে—হেথায় বা মোর কিসের কাজ!
কোথায় পুনঃ—কেই বা জানে—ফির্‌তে হবে কোনও দিন—
উধাও সে কোন্ মরুর 'পরে হাওয়ার মতন লক্ষ্যহীন!

৩০

কোথায় ছিলাম, কেনই আসা—এই কথাটা জান্‌তে চাই,
জন্ম-কালে ইচ্ছাটা মোর কেউ তো কেমন সুধায় নাই!
যাত্রা পুনঃ কোন্ লোকেতে?—প্রশ্নটা মোর মাথায় থাক—
ভাগ্যদেবীর ক্রূরপরিহাস পেয়ালা ভ'রে ভোলাই যাক্!

৩১

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগ্রহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রিদিন।
বিদ্যাটা মোর উঠ্‌ল ফেঁপে, কাট্‌ল কত ধাঁধাঁর ঘোর—
শুধু মৃত্যুটা আর ভাগ্য-লিখন, এই দুটো গোল লাগ্‌ল মোর!

৩২

রুদ্ধ-দুয়ার সৃজন-ঘরের কুঞ্জিকাঠির নাইকো খোঁজ,
দেখ্‌তে না পাই ভাগ্য-বধূর ঘোম্‌টা-ঢাক্‌া মুখ-সরোজ;
বারেক দুবার কণ্ঠে কাহার শুন্‌ছি শুধু নামটা মোর—
কয়দিনই বা?—সাঙ্গ তো হয় সর্ব্বনামের নেশার ঘোর!

৩৩

তিমির পথের যাত্রী মোরা—দীপ্ত আশার রশ্মি কই?
মর্ত্ত্যে হ'য়ে লক্ষ্যহারা—স্বর্গ পানে চাহিয়া রই।
কর্ণে পশে দৈববাণী—কোথাও যে নেই আলোক-পথ,
অন্ধ-নিয়ত চালিয়ে বেড়ায় বিশ্বনেমির ভাগ্যরথ!

৩৪

তখন আবার মুখটি চুমি মাটীর গড়া পেয়ালাটির,
সুধাই তারে—রহস্যটার অর্থ সে কি খুব গভীর?—
অধর 'পরে রাখ্‌তে অধর, বাজ্‌ল কানে অস্ফুট স্বর—
য'দিন বাঁচো পান ক'রে নাও, ফিরবে না আর মরণ পর!

৩৫

এই যে আমার পেয়ালা-বঁধু জীবন-সাড়া দিচ্ছে আজ—
কোন্ অতীতের সাক্ষী এ জন, কোন্ সেকালের স্ফূর্তিবাজ!
আজ পরিচয় ভিন্নরূপে—মৃত্যু-শীতল মাটীর চাপ—
তবু স্মৃতির নিশান নাই কি আঁকা ওই অধরে চুমোর ছাপ!

৩৬

সাঁঝের ঝোঁকে দেখ্‌নু সেদিন হাটের মাঝে কুম্ভকার
নিঠুর হাতে ঠাস্‌ছে সে এক পিণ্ড ভিজা মৃত্তিকার।
মাটীর ঠোঁটে ফুট্‌ল বাণী—আওয়াজটা তার বেজায় ক্ষীণ—
আস্তে ভায়া আস্তে পেশো, নেহাৎ এ'জন ভাগ্যহীন!

৩৭

পেয়ালাটুকু ভরিয়ে নেগো, এতই কিসের চিন্তা তোর?
সময়টা সব কাট্‌ছে বৃথা—ভাব্‌না কি তাই দিনটা ভোর!
একটা 'কাল'তো মরণ-পারে, আস্‌ছে যে 'কাল' কোথায় 'আজ'?
তাদের কথা ভাব্‌চি ব'সে এই ক্ষণিকের স্ফূর্ত্তি মাঝ!

৩৮

এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মাঝে তোর—
ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর্ শেষ নিমেষটা নেশায় ভোর!
আয়ুর তারা প'ড়ছে খ'সে মরণ-ঊষার চরণ'পর—
যাত্রা যে আজ ক'র্‌তে হবে—ফুরিয়ে নে সব, ত্বরিৎ কর্।

৩৯

কোন্ সে রসের আশায় বঁধু ম'র্‌ছ ঘুরে রাত্রিদিন—
ঘূর্ণী পথের নাইক সীমা, অনন্ত সে কোথায় লীন।
সে সব ছেড়ে স্ফূর্ত্তি কর, দ্রাক্ষারসে হও বিভোর,
ব্যস্ত তুমি যে রস আশে—মিথ্যা, নাহয় তিক্ত ঘোর!

৪০

জানিস্ তো সব বন্ধু তোরা—কাণ্ডটাই বা কয়দিনের—
মোর বাস্তুভিটায় উথ্‌লে ওঠা নূতন বিয়ের স্ফূর্ত্তি-জের।
বন্ধ্যা-প্রিয়া যুক্তিদেবী, সেই রাতে তার নির্ব্বাসন,
আর সেই বাসরে নূতন বধূ আঙুরলতার সম্ভাষণ!

৪১

অস্তি-নাস্তি শেষ ক'রেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান,
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।
বিদ্যারসে যতই ডুবি—মনটা জানে মনে স্থির—
মোর দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রস-জ্ঞানটা নয় গভীর!

৪২

এই তো সেদিন সাঁঝের বেলা, পেয়ালা হাতে, গোপন পায়
স্বর্গ-দূতী এল সে মোর মুক্ত-দুয়ার পানশালায়;
ব'ল্‌লে মোরে—পাত্র-সুধায় চুমুক দে' নাও একটি বার—
দেখ্‌নু চেখে—আর কিছু নয়, সেই পুরাতন দ্রাক্ষাসার!

৪৩

সেই পুরাতন দ্রাক্ষা গো—তার ন্যায়-বিধানের হউক্ জয়,
অমোঘ যাহার সূত্রেতে হয় সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়।
আঙুর-চোয়া অল্‌কিমিয়া রসের সেরা রসান্-ভূপ,
জীবন-কাঁশার পাত্রখানা স্পর্শে ধরে সোনার রূপ!

৪৪

সেই পুরাতন দ্রাক্ষাবঁধু—মামুদশাহের মতন যেই,
দুঃখ-কাকের মূর্ত্তিগুলোয় বীরদর্পে তাড়ায় সেই।
ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রটি যার দীর্ণ করে সকল ভাণ,
আত্মারে যে করায় পুনঃ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান!

৪৫

বিজ্ঞ যিনি বিজ্ঞ আছেন—তর্ক নিয়ে থাকুন ঘোর,
সৃষ্টি-বিচার, তত্ত্ব-কথা ঘুচিয়ে এস সঙ্গে মোর।
একটি কোণে ব'স্‌ব দোঁহে, হট্টগোলের ঢের তফাৎ,
ভাগ্য—যাহার খেল্‌না মোরা—ক'র্‌ব তারেই পাত্রসাৎ!

৪৬

ঊর্দ্ধে, অধেঃ, ভিতর, বাহির, দেখ্‌ছ যা' সব—মিথ্যা ফাঁক—
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক।
পৃথ্বীটাতো মায়ার খেয়াল—সূর্য্য-বাতির ফানুস-খোল—
ছায়ার পুতুল আমরা সবাই চৌদিকে তার ক'র্‌ছি গোল!

৪৭

রক্ত অধর এই যে চুমি, পান করি লাল মদির টুক্—
মিথ্যা এ সব শূন্য স্বপন—আপ্‌শোষে তাই ফাট্‌বে বুক ?
কাল্‌টা অসীম শূন্যে ঘোরে, শূন্যে ঘেরা মায়ার জাল—
শূন্যে খেলা শেষ ক'রে আজ মিশ্‌ব নাহয় শূন্যে কাল।

৪৮

নদীর ধারে ফুট্‌বে যবে, ফুট্‌বে গোলাপ রঙ-বাহার—
পিওগো এসে কবির সাথে রক্ত-রাঙা দ্রাক্ষাসার ;......
কাল্‌-সাকীটি পেয়ালা ভ'রে আস্‌বে যবে সর্ব্বশেষ—
নিওগো তাহা হাস্য-মুখে, বিনা দ্বিধার চিহ্নলেশ।

৪৯

ছক্‌টি আঁকা সৃজন-ঘরের, রাত্রি দিবা দুই রঙের,
নিয়ত্‌-দেবী খেলছে পাশা, মানুষ ঘুঁটি সব ঢঙের।
প'ড়্‌ছে পাশা, ধ'র্‌ছে পুনঃ, কাট্‌ছে ঘুঁটি, উঠ্‌ছে ফের—
বাক্সবন্দী সব পুনরায়, সাঙ্গ হ'লে খেলার জের।

৫০

নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন—যেই নিয়েছে খেলার ভার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেল্‌ছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য-খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু,—জয়-পরাজয় তাঁরই হাত।

৫১

ললাট 'পরে নিয়ত্ দেবীর ভাগ্যলিপির হস্তছাপ,
উঠ্‌বে না সে—চেষ্টা বৃথা, মিথ্যা এ সব মনস্তাপ।
উঠুক না সে গভীর শ্বাস, আর ক'লুজে-ফাটা অশ্রুধার—
ভাগ্যদেবীর হস্তটি না ধ'রবে লেখন পুনর্ব্বার।

৫২

মাথার পরে উপুড়-করা পেয়ালা, যারে স্বর্গ কয়,
যার নীচেতে চুপটি করে চক্ষু বুজে দিনটা বয়;
হস্ত জুড়ে তার কাছেতে চাইছ কিবা ভাগ্য-দীন ?
নিয়ত্-সুতোয় বদ্ধ ও-যে, তোমার মতই শক্তিহীন!

৫৩

মৃত্তিকাতে তৈরী যেদিন মূর্ত্তি মানব পৃথ্বীতল,
সেই মাটীতেই বীজটি বপন—ভবিষ্যে যা ধ'রবে ফল।
সেই সৃজনের প্রথম ঊষার ভাগ্যলিপির অঙ্কপাত
ফুট্‌বে পুনঃ শেষ বিচারের প্রলয়-উষার জন্মসাথ!

৫৪

তোমায় না হয় ব'লেই রাখি—প্রথম যেদিন যাত্রা মোর,
চোখের জলে বিদায় নিয়ে পেরিয়ে এনু স্বর্গ-দোর;
কোন্ শাপেতে হেথায় আসা, ভাগ্য-দেবীর অনুজ্ঞায়—
আস্‌তে পথে দেখ্‌নু যে মোর অস্থিতে কার চিহ্ন ভায়।

৫৫

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটী—তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর—দরবেশী-সাঁই যাই বলুন ;
গগন-ভেদী চীৎকারে তাঁর খুল্‌বে নাকো মুক্তি-দ্বার,
মোর অস্থি মাঝেই মিল্‌বে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার !

৫৬

এই তো জানি বন্ধুগো মোর—সত্যজ্যোতির প্রকাশ টুক্
—রাগেই কিম্বা প্রেমেই ফুটে ভরায় যা' মোর আঁধার বুক—
নিমেষ তরে পাই যদি তার আভাসটা মোর পানশালায়,
আঁধার-ঘেরা মন্দিরেতে কেনই যাব—কোন্ জ্বালায় !

৫৭

তুমিই প্রভু পথটিতে মোর গর্ত্ত, বোঝাই রাখ্‌লে পাপ,
ক'র্‌লে সেটি সুরায় পিছল—তুমিই প্রভু ক'রবে মাপ ;
আপন হাতেই খুলবে না কোন্ ভাগ্য-সুতোর পাকটা ঘোর,
পতনটা সেই পাপের ফলে—ব'ল্‌বে কিগো দেবতা মোর ?

৫৮

মানব সৃজন ক'র্‌লে, দিয়ে মৃত্তিকাতে পাপের ছাপ,
মহান্ তোমার বিশ্ব-বাগে খেলাও পঞ্চ-রিপুর সাপ।
পাপের কালো মূর্ত্তি নিয়ে জীব জগতে ঘুর্‌ছে হায়—
মানুষ তোমায় ক'রছে ক্ষমা—তুমিও, হে দেব, ক্ষমিও তায় !

৫৯

শুন্‌ছ বঁধু—উপোস্ ভেঙে, রাত্রি যবে এক প্রহর,
রম্‌জানেরি পর্ব্বশেষে উঠ্‌নু গিয়ে কুমোর-ঘর,
চাঁদের দেখা নাই আকাশে, ঘরটিতে কেউ নাইকো আর—
শুধুই কেবল ভাঙ্গা-গড়া সুরাই যত মৃত্তিকার।

৬০

শুন্‌লে বঁধু অবাক্ হবে—সেই সাজানো মাটীর তাল—
তার মাঝে কেউ কথা শোনে, কেউবা বোনে কথার জাল।
ব'ল্‌লে কে এক হঠাৎ রোষে—ব্যস্তবাগীশ কণ্ঠ তার—
কেইবা এ সব কুম্ভ মোরা—কেইবা সেজন কুম্ভকার?

৬১

ব'ল্‌লে সে এক কুম্ভ ধীরে—নয় বৃথা এ জীবন-শ্বাস,
কর্‌লে যে জন বুদ্ধি খরচ—সৃষ্টি আপন ক'র্‌বে নাশ?
এ সব কি আর অম্‌নি যাবে—ফির্‌তে হবে পুনর্ব্বার,
সেই পুরাতন মাটীর ঘরে, সেই কবেকার জন্মাগার!

৬২

ব'ল্‌লে আর এক পেয়ালা তারে—তত্ত্ব এটা খুব গভীর,
বালক—সেও পানের পরে খোঁজটা রাখে পাত্রটির।
গ'ড়্‌লে যে জন আপন হাতে কতই স্নেহ-কল্পনায়—
আর কি পারে রাগের ভরে নষ্ট কভু ক'র্‌তে তায়!

৬৩

সেই কথাতেই শান্ত হ'ল উঠ্‌ছিল যে তর্কজাল ;
মৌন ভেঙে ব'ল্‌লে পরে বিশ্রী সে এক কাদার তাল—
বক্র ব'লে সই পরিহাস, চিন্তে না পাই দিখ্বিদিক,
গড়ন-কালে কুম্ভকারের হস্তটা কি প'ড়্‌তো ঠিক ?—

৬৪

ব'ললে আর এক—কেউ বা তারে ব'ল্‌ছে পাজী যাচন্‌দার,
মুখখানা তার আঁক্‌ছে দিয়ে নরক-ধোঁয়ার অন্ধকার।
যাচাই মোদের ক'র্‌বে সে জন ?—কথার কথা ফক্কিকার—
লোকটা কিন্তু মন্দ সে নয়—মন্দ কি হয় তার বিচার !

৬৫

কোণটি হ'তে সুরাই সে এক বল্‌লে ফেলে নিশাস-ভার—
মাটীর দেহ শুকিয়ে গেছে—অনেক দিন তো নেই ব্যাভার ;
মোর পুরাতন দ্রাক্ষা-বঁধু—পাই যদি আজ স্বাদটি তার—
হচ্ছে মনে—জীর্ণ দেহে বলটা ফেরে পুনর্ব্বার।

৬৬

পাত্রগুলো কথার মাঝে আকাশ 'পরে দেখ্‌তে পায়
চন্দ্র নবীন—যাঁর লাগিয়া সব আছিল প্রতীক্ষায় ;
কে কার ঘাড়ে পড়্‌ল তখন, ব'ল্‌লে দিয়ে টিপ্‌নি এক—
খাণ্ডেতে আর মণ্ডে বোঝাই মুটিয়াগুলোর কাণ্ড ছাখ্‌ !

আজ

৬৭

চেতিয়ে তুলো মরণকালে দ্রাক্ষাসুধায় প্রাণটা মোর,
মদির-স্নানটা করিয়ে দিও, ঘুচ্‌বে যবে মায়ার ঘোর
পরিয়ে দিও যত্নে স্নেহে আঙুর-পাতার বহির্বাস,
আর গোর দিও এক বাগান-ধারে, সজীব যেথায় ফুলের চাষ।

৬৮

সৌরভেতে ক'র্‌বে আকুল, থাক্‌বে যা' মোর ভস্মসার—
জাল পেতে সে থাক্‌বে ব'সে, হাওয়ায় বুনে গন্ধ তার ;
ভণ্ড যত ভক্ত বিটেল পড়্‌বে ধরা চ'লতে পথ,
মদিরগন্ধ পাগল হাওয়ায় উল্টাবে তার বিধান-রথ।

৬৯

খেয়াল-পূজোয় পুতুল-খেলায় কাট্‌ল কতই দিন যে মোর,
লোকের চোখে দোষের ভাগী—র'টলো খারাপ নামটা ঘোর ;
মূর্ত্ত-খেয়াল-দেব্‌তাগুলোই খাতির ডোবায় পেয়ালা মাঝ—
সুনামটা মোর সস্তা বিকোয় শুন্‌লে মিঠে সুরের ভাঁজ !

৭০

দিব্যি দিয়ে ত্যাগ করিনু—চক্ষুজলও প'ড়ল ঢের—
তবে শপথকালে হয়না মনে গিছ্‌লো কেটে নেশার জের !
তারপরে যেই ফাগুন এল, বাড়িয়ে গোলাপ-রঙীন হাত—
কোথায় গেল ক্ষীণ অনুতাপ, গন্ধ-আকুল মলয় সাথ !

৭১

খাতির খিলাৎ কাড়্‌লে সে মোর—খেয়ালমাফিক কার্য্য তার,
দ্রাক্ষাদেবীর নাই মহিমা—কাকের মতই সব ব্যাভার!
তবু প্রশ্ন ওঠে মনটাতে এই—দ্রাক্ষাফলের চাষটা যার—
কোন্ মহার্ঘ্য পণ্যলোভে বিকোয় এমন সুধার ভার!

৭২

হায়, গোলাপ সাথে প'ড়্‌বে খ'সে বসন্তেরি সব বাহার,
মিশ্‌বে কোথা যৌবনেরও পাগল-করা গন্ধভার!
পাতার মাঝে চ'ম্‌কে ওঠে আজ পাপিয়ার উচ্চতান—
কোন্ বিদেশের কণ্ঠটি ওই—কোথায় সে কাল গাইবে গান!

৭৩

নিয়ত্‌-দেবীর চর্‌কা-সূতোর ধর্‌তে পারি খেঁইটা আজ,
ভাগ্য সাথে ষড়্‌ ক'রে তার পাইগো খোলা দুয়ার-মাঝ;
নিঠুর পায়ে চূর্ণ করি বিশ্ব-সৃষ্টি কল্পনায়
নূতন সৃষ্টি গ'ড়তে প্রিয়া পারব নাকি দুই জনায়!

৭৪

দেখ্‌ছ প্রিয়া—পূব গগনের পূর্ণ-কিরণ চাঁদটি আজ
দিচ্ছে উঁকি পাতার ফাঁকে মোদের মিলন-কুঞ্জ মাঝ;—
তোমার কবি সেই যেদিনে ভুল্‌বে ধরার মিলন-সুখ,
কার খোঁজে ওর প'ড়্‌বে হেথায় অস্ত-মলিন দৃষ্টি-টুক!

৭৫

বিভোর প্রাণে আসবে যেদিন আমার মিলন-প্রতীক্ষায়,
তৃণাসনে অতিথ-সভা ছড়িয়ে যেথা তারার প্রায়।
উজল পায়ে আসবে যখন আমার যেথায় ছিল স্থান,
উপুড় করে' রেখো সেথায় আমার শূন্য পাত্রখান!

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

দেশের কথা।

——০*০——

বাঙলার জনৈক নেতার মুখে সেদিন শুনলুম যে, বম্বে ও মাদ্রাজের লোকেরা পলিটিকাল হিসেবে, আমাদের চাইতে ঢের বেড়ে গিয়েছে। এ সত্য তিনি দিল্লিতে আবিষ্কার করে, এসেছেন, অতএব বলা বাহুল্য যে, তিনি বামমার্গের একজন মহাজন।

একথা যদি সত্য হয়, তা'হলে আমরা লজ্জিত হ'তে বাধ্য কিন্তু এর জন্য আমাদের দুঃখিত হবার কোনই কারণ নেই। ইংরাজের অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হিসেবে একদেশ হয়ে উঠেছে এবং ইংরাজি শিক্ষার গুণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের যে কোনও প্রদেশ মনে কিম্বা জীবনে এক ধাপ উঁচুতে চড়ে' যাবে, সে প্রদেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে' তুলবে, এবং প্রতিবেশীর সাহায্যে আমরা বাঙালীরাও জাতি হিসেবে একটু উঁচুতে উঠে যাব! ইংরাজের আইন আমাদের জীবনকে এবং ইংরাজের ভাষা আমাদের মনকে একসূত্রে এমনি গেঁথেছে যে, একের টানে অপরে চলতে বাধ্য। সুতরাং বম্বে মাদ্রাজে যদি নবজীবনের আত্যন্তিক স্ফূর্ত্তি হয়েই থাকে—তাহ'লে সে জীবনী-শক্তি আমাদের মন প্রাণকেও ধাক্কা দেবে। এ ত সু-সংবাদ!

তবে কথাটা একেবারে সত্য বলে গ্রাহ্য করবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা আছে। প্রথমত, পলিটিকালি বেড়ে যাবার অর্থটা কি ?—যদি কেউ বলেন যে, আমাদের তুলনায় অপর দেশের লোকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনটা বেশি মাত্রায় ও বেশি জোরে চালাচ্ছে, তাহ'লে তার উত্তর, সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনটাই যে জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষণ, তা অবশ্য নয়। বাঙলার বেশির ভাগ লোক আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নারাজ বলে' বাঙলার জাতীয় আত্মা যে ঘুমিয়ে পড়েছে, এ রকম অনুমান একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীরাই করতে পারেন—যাঁরা বাঙালীর মনের খবর রাখেন, তাঁদের পক্ষে ও-রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, সে মনের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে ?—তার সহজ উত্তর, এক পলিটিক্স ছাড়া জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রেই। যে শিক্ষার ফলে, আমাদের নব মনোভাব জন্মেছে, সে শিক্ষা বাঙলা থেকে অন্তর্হিত হয় নি; বরং তার প্রসার ও প্রভাব বাঙলাদেশে দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলেছে। সুতরাং বাঙালীর চৈতন্য ইতিমধ্যে জড়ীভূত হয়ে যাবার কোনও কারণ ঘটে নি। তারপর সে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ যিনি খুসি তিনি ইচ্ছা করলেই সাহিত্যে বিজ্ঞানে ও কর্ম্মক্ষেত্রে দেখতে পাবেন। অবশ্য রাজনীতির কর্ত্তা-ব্যক্তিরা এ সব জিনিষের বড় বেশী খোঁজ রাখেন না, তাঁদের ধারণা যে, রাজনীতিই হচ্ছে জাতীয় জীবন গড়ে' তোলবার একমাত্র উপাদান ও উপায়। লোকের সামাজিক জীবন দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের কতটা অধীন, আর দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র লোকের সামাজিক জীবনের কতটা অধীন, এবং এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণের কি সম্বন্ধ আছে, সে সব তর্ক এক্ষেত্রে

তোলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা দেশের কথা বলতে আজকাল অনেকে রাজনীতির কথাই বোঝেন, সে কথার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য করে নিয়েই আমি এ বিষয়ে দু'টি চারটি কথা বলতে উদ্যত হয়েছি।

আজকালকার দিনে মানুষের পক্ষে তার রাজনৈতিক অবস্থা যে উপেক্ষা করা চলে না—একথা বলাই বাহুল্য। তারপর রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন যে, একটি প্রকৃষ্ট অন্তত প্রচলিত উপায়, সে-কথাও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। তবে যে বাঙালী জাতি এ বিষয়ে কতকটা ঔদাসিন্য প্রকাশ করছে তার কারণ, একমাত্র বক্তৃতার উপর বাঙালীর আস্থা কমে এসেছে। কেন কমে এসেছে তার কারণ কি আর খুলে বলা দরকার? কে না জানে যে, ইতিমধ্যে বাঙ্গালীর মন পলিটিকালি কিঞ্চিৎ পোড় খেয়েছে—সুতরাং সে মন সহজে আর কারও কথায় ভেজে না। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, বহুলোকের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে তোলবার সমস্যাটা এতই জটিল ও গুরুতর যে-কোন সহজ উপায়ে তার সমাধান করা যেতে পারে না।

আর এক কথা, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের উপর আমরা অনেকে একান্ত নির্ভর করতে পারিনে। তার একটি কারণ, তাঁদের সকল কথা, সকল ব্যবহার আমাদের সকলের কাছে সমান সু-বোধ নয়। এই ধরুণ না, বাঙলার রাজনৈতিক দলে কেন যে একটা দলাদলীর সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ আমরা সকলে খুঁজে পাইনে। আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, রিফর্‌ম্ নিয়ে সকলের একমত হওয়ার কোনই বাধা ছিল না। বাঙলার নেতারা আজ দেড় বৎসর ধরে পরস্পরের সঙ্গে যে রকম জ্ঞাতি-শত্রুতা সুরু করেছেন,

তার থেকে তাঁরা নিজেদের মন নিজেরা জানেন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ হয়। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁরা এমন এক একটা ব্যবহার করে বসেন যে, আমাদের মনে সে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য একমাত্র কথার সাহায্যেই করতে হয়, এবং কথারও যে একটা শক্তি আছে, সে সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বাক্‌যুদ্ধও ত একটা যুদ্ধ বটে এবং এ যুদ্ধে কথাই হচ্ছে মানুষের অস্ত্র-শস্ত্র, এমন কি স্থল বিশেষে তা poisonous gas-ও হতে পারে! তবে কথার কোনই শক্তি থাকে না, যদি না তার কোনও অর্থ থাকে। রাজনীতিতে আমরা বিলেতি কথা নিয়ে কারবার করি, সম্ভবত সেই কারণে আমাদের দেশী নেতাদের মুখে সে সব কথা অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে। এবং এই কারণেই তাদের কথার প্রতি আমাদের আস্থা দিন দিন কমে আসছে। যদি liberty এবং equality শব্দের পুরো অর্থ আমাদের নেতা মহাশয়দের সর্ব্বদা স্মরণ থাকত তাহ'লে, তাঁরা বম্বে কংগ্রেসে, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নকল করে "Rights of man" declare করে', তার দু'দিন পরেই সিমলার লাট দরবারে উপস্থিত হয়ে প্যাটেল বিল সম্বন্ধে, না-হুঁ, না-হুঁ করতেন না। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নাম শুনে যাঁদের বুক ফুলে' ওঠে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নাম শুনে' তাঁদের যে মুখ শুকিয়ে যায়, এই স্পষ্ট প্রমাণ যে, liberty প্রভৃতি শব্দ তাঁদের কথা মাত্র, ভাষায় যাকে বলে 'বুলি'।

আমাদের নেতাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে কথা দ্বারবঙ্গ, গিধড় প্রভৃতি রাজা-মহারাজাদের মুখে শোভা পায়, সে কথা তাঁদের মুখে শোভা পায় না, কেননা আমরা আশা করি যে, কি বিদ্যায় কি বুদ্ধিতে,

কি জ্ঞানে, কি চরিত্রে তাঁরা উক্ত রাজা-মহারাজাদের দলভুক্ত নন। বম্বে মান্দ্রাজের তুলনায় আমাদের আত্মা যতই ঘুমিয়ে থাক্ না, একথা বোধ হয় জোর করে বলা যায় যে, বেহারী জমিদারদের চাইতে আমাদের পলিটিকাল আত্মা কিঞ্চিৎ বেশি প্রবুদ্ধ। কিন্তু যখন দেখি যে, দ্বারবঙ্গের মহারাজা ধুয়ো ধরলে আমাদের কোন কোন নেতা অমনি দোহার দিতে সুরু করেন, তখন তাঁদের রাজনীতির বর্ণপরিচয় হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

রাজনীতির নেতাদের যে রাজনীতির বর্ণপরিচয় হয় নি এমন কথা আমরা বল্‌তে চাই নে। তাঁরা যে উল্টো উল্টো কথা বলেন, এবং উল্টো উল্টো ব্যবহার করেন, সে হয়ত চাল হিসেবে। কিন্তু আমরা যেহেতু নেতাদের চালের গূঢ় অর্থ বুঝি নে, সে কারণ আমরা তাঁদের কথার সাদা অর্থ বুঝতে চাই, এবং যতক্ষণ তা না বুঝতে পারি, ততদিন তাঁদের কথায় নেচে উঠতে পারি নে, যদি কিছু পারি ত হেসে উঠতে। যাঁরা প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁদের এ যুগের রাজনীতির কোন কথা মুখে আনবার পর্য্যন্ত যে অধিকার নেই, এই সহজ কথাটা যতদূর সম্ভব সহজ কথায় বোঝাতে চেষ্টা করব। কথাটা সহজ এই কারণে যে, বর্ত্তমান রাজনীতির মূল কথাগুলির জন্ম যদিচ ইউরোপে হয়েছে; কিন্তু তা সকল দেশের সকল মানবের প্রাণের কথা, কেননা যেখানেই মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আছে— সেখানেই স্বাধীনতা ও সাম্যের ধর্ম্ম মানুষের মনকে অধিকার করে বসবে।

(২)

আজকাল আমাদের রাজনীতির রাজ্যে দু'টি কথা নিত্যই শোনা যায় এবং তা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সে দু'টি হচ্ছে self-determination এবং democracy. আমাদের হাল পলিটিক্সের সকল বলা-কওয়া, সকল আশা-ভরসা ঐ দু'টি শব্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের নেতারা ঐ দু'টি শব্দের মন্ত্র-শক্তিতে এতদূর আস্থাবান যে, এবারকার কংগ্রেস Peace Conference-এর জন্য delegate নির্ব্বাচন করেছেন! কংগ্রেস যদি self-determination শব্দের মোহিনী-শক্তিতে মোহপ্রাপ্ত না হ'তেন,—তাহ'লে কি এমন বাহ্যজ্ঞান শূন্যতার পরিচয় দিতেন? সে যাই হোক, আমাদের পলিটিকাল বল-বুদ্ধি-ভরসা সকলই যখন ঐ দু'টি শব্দের উপর নির্ভর করছে, তখন কথা দু'টির অর্থ বোঝবার চেষ্টা করা যাক। ভুলে' গেলে চলবে না যে, কথা দু'টি শুধু বিলেতি নয়, তার অর্থও বিলেতি।

প্রথমত ডিমোক্রাসি বলতে কি বোঝায়, তার সন্ধান ডিমোক্রাসির স্রষ্টা এবং দ্রষ্টাদের কাছে নেওয়া যাক, কেননা self-determination মতটা ঐ ডিমোক্রাসি হতেই উদ্ভূত। এই ডিমোক্রাসি শব্দের তিনটি সংজ্ঞা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

1. "Everybody is to count for one and nobody for more than one"—*Bentham.*

2. "Democracy is the government of the whole people by the whole people"—*Mill.*

3. The progress of all through all"—*Mazzini.*

মধ্যপথ অবলম্বন করা পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই নিরাপদ ; সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মিলের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য করা যাক। ম্যাটসিনির সূত্র গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা এই যে, তা দর্শনের কোঠায় পড়ে এবং আর বেন্থামের সূত্র গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা এই যে, তা পাটীগণিতের কোঠায় পড়ে। সংক্ষেপে ম্যাটসিনির সংজ্ঞাকে অনেকটা সঙ্কুচিত এবং বেন্থামের সংজ্ঞাকে অনেকটা প্রসারিত না করলে তা রাজনীতির সূত্র হয়ে দাঁড়ায় না। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক যে, সকলের দ্বারা সকলের শাসন-পদ্ধতির নামই ডিমোক্রাসি।

কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। সকলের দ্বারা সকলের শাসনের কি কোনও অর্থ আছে, রাজা প্রজার কি অধিকার ভেদ নেই, রাজ্য-শাসন বিষয়ে সকলেই কি সমান অধিকারী ? আর যদিই বা তা হয়, তাহ'লে সকলের দ্বারা সকলের শাসন যে সু-শাসন হবে তারই বা মানে কি ?

ডিমোক্রাসির প্রতিবাদীরা এ প্রশ্ন ইউরোপে একবার নয়, হাজার বার তুলেছেন এবং ডিমোক্রাসির বিরুদ্ধে এই তর্ক তুলে এক আধখানা নয়, হাজার হাজার বই লিখেছেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে ডিমোক্রাসির স্বপক্ষের যে কি বক্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান যুগের একটি বড় ঐতিহাসিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"One theory regards the definite purpose of the government to be the assurance of liberty to the individual. * * * Such is the theory of the Liberal Radicals"—*Seignobos*

অর্থাৎ ডিমোক্রাসি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রতন্ত্র, কেননা এই তন্ত্রের প্রসাদে প্রতি ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য যে, ডিমোক্রাসির ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে,—

Individuals should be allowed to develop without restraint. They will be happier and more active, they will be able to make more progress, society will regulate itself better than under established rules"—*Seignobos.*

অতএব দাঁড়াল এই যে, যিনি individual liberty অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না করেন, ডিমোক্রাসির নাম উচ্চারণ করবার তাঁর অধিকার নেই। এখানে আর একটি কথা বলে রাখি, ডিমোক্রাসি এ যুগে ইউরোপে একটি দার্শনিক মত মাত্র নয়, এখন তা সমাজের ধর্ম্ম। ডিমোক্রাসি সে দেশে এখন শুধু বইয়ের ভিতর নেই,—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি একটি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে Seignobos-এর ইতিহাস থেকে ইউরোপের বর্ত্তমান সমাজের ধর্ম্মকর্ম্মের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করে দিই, এখানে তা পুনরুদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"বর্ত্তমানে সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুগে মানুষের উপর মানুষের কোনও অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইউরোপে মানুষ আজ মানুষের দাস নয়।"

অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই

হচ্ছে ডিমোক্রাসির গোড়ার কথা, আর শেষ কথা এবং ঐ স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির ভিত্তি ও চূড়া।

স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির মূলমন্ত্র; কিন্তু এই স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি? ফ্রান্সের যে declaration-এর নকলে আমাদের নেতারা বম্বেতে নিজেরা এক declaration করেছেন, সেই দলিলেই liberty শব্দের অর্থ পাওয়া যাবে। সে declaration of Rights-এর চতুর্থ দফাটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

" Liberty consits in the power to do anything that does not injure others ; thus, the exercise of the natural rights of every man has only such limits as to assure to other members of society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law."

এ সংজ্ঞার অনেক খুঁত ধরা যায়, কিন্তু liberty-র এ ব্যাখ্যা মোটামুটি সত্য এবং এই সত্যের উপরেই ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাঁরা রাষ্ট্রতন্ত্রে ডিমোক্রাসি চান, তাঁদের পক্ষে প্যাটেল-বিলের বিরুদ্ধাচরণ করাটা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে বিবাহ করবার অধিকার হচ্ছে মানুষের একটি স্বাভাবিক অধিকার, এবং এ অধিকার যত দিন আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন সে অধিকারে প্রতিলোক বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মনীতি এবং সমাজের দোহাই দেওয়াটা ডিমোক্রাসি-বিদ্বেষীদের চিরকেলে স্বভাব। ইউরোপের লোকেরা যখন খৃষ্টীয় শাসন-তন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে

বিবাহ করবার অধিকার দাবী করে, তখনও সে দেশের absolutist-রা বরাবর ঐ ধর্ম্ম নীতি ও সমাজ রক্ষার দোহাই দিয়ে এসেছে। জর্ম্মানীর উদাহরণ নেওয়া যাক। জর্ম্মানীর লিবারলরা চিরকালই বিবাহ সম্বন্ধে এই স্বাধীনতার দাবী করত, কিন্তু সে দেশের ধর্ম্মযাচকেরা এবং রাজ-পুরুষেরা চিরদিনই তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষটা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মান-সম্রাট দেশের লোককে এ অধিকার দিতে বাধ্য হন। সে সময় কন্সারভেটিভের দল গভর্ণমেণ্টকে এই বলে' আক্রমণ করেন, যে, গভর্ণমেণ্ট "প্রুসিয়াকে ইউরোপ করে তুলছে এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম এবং সমাজের মূলচ্ছেদ করছে"। প্যাটেল-বিলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এই যে, তার ফলে হিন্দুসমাজ ইউরোপীয় সমাজ হয়ে দাঁড়াবে এবং ধর্ম্ম ও সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। একথা যাঁরা বলেন তাঁদের মুখে ডিমোক্রাসির নাম, জীববিশেষের মুখে রাম নামের মতই শোনায়।

শেষে self-determination অর্থ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলতে চাই। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা democracy-র মূলমন্ত্র, সেই ব্যক্তি-গত স্বাধীনতাই হচ্ছে self-determination-এর গোড়ার কথা। যে স্বাধীনতা পূর্ব্বে সভ্য-সমাজের কাছে ব্যক্তিগত হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছিল, সেই স্বাধীনতা এখন জাতিগত হিসেবে গ্রাহ্য হচ্ছে। এক একটি জাতিকে এক একটি ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে', সে জাতির যে নিজের ইচ্ছা রুচি ও চরিত্র অনুসারে জীবন গঠন করবার অধিকার আছে, এই মতটারই বিলেতি নাম হচ্ছে self-determination. বেন্থামের কথায় বলতে গেলে এ মতে প্রতি জাতিই is to count for one এবং কোন জাতিই is not to count for more than one এবং declaration of

rights-এর ভাষায় বলতে গেলে, প্রতি জাতিরই স্বাধীনতা আছে—to do anything which do not injure others, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি কথা সকলকে স্মরণ রাখতে বলি যে, একটি জাতির কোনও self নেই—ব্যক্তির ধর্ম্ম জাতিতে আরোপ করে' আমরা জাতিকে ব্যক্তি বলি। Self-determination ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত জাতির পক্ষে আরোপিত মাত্র। সুতরাং ব্যক্তিগত self-determination-য়ে যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের মুখে national self-determination-এর কথা কাকাতুয়ার বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। ডিমোক্রাসি, লিবারালিজম প্রভৃতি শব্দ যাঁদের পক্ষে মুখের কথা নয় কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের সামিল তাঁদের কাছে ও সকল শব্দের অর্থ যে কি, একটি উঁচুদরের ইংরাজ লেখকের কথায় তার পরিচয় দিচ্ছি:—

"Liberalism is the belief that society can safely be founded on this self-directing power of personality, that it is only on this foundation that a true community can be built, and that so established its foundations are so deep and so wide that there is no limit that we can place to the extent of the building. *Liberty then becomes not so much a right of the individual as a necessity of society*" :—L. T. Hobhouse.

যাঁরা সমাজ হিতের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে পঙ্গু করতে চান,—তাঁদের উপরোক্ত কথা ক'টি একটু মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নীতিশিক্ষা।

(প্রথম প্রস্তাব)

কোনো ব্যক্তির জন্মমুহূর্ত্তে বৃহস্পতিগ্রহ আকাশের কোনো এক বিশেষ জায়গায় ছিলেন বলিয়া সে ব্যক্তি জজসাহেব হইলেন, আর এবৎসর শনৈশ্চর কোন্ রন্ধ্র-পথে বিশেষ কোনও স্থানে প্রবেশ করিলেন বলিয়া, বনপথে-পথে কাব্যচর্চ্চা করিবার কালে অকস্মাৎ পুঞ্জ পুঞ্জ ভীমরুলের হুল খাইয়া আর এক ব্যক্তি শয্যাগত হইয়া গেল, কার্য্য এবং কারণের এত বিষম দূরত্বকেও যাঁদের মন আশ্চর্য্য ডিগ্‌বাজি-বলে কুমারিকা ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী জলপ্রণালীর মতো অনায়াসেই ডিঙাইয়া যায়—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক্ তাঁদেরই পক্ষেই এই সত্যটিকে নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া কঠিন যে, সমুদয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার গোড়ায় আছে আধ্যাত্মিক সমস্যা। অথচ পথে ঘাটে স্নানে পানে গল্পে ও গুজবে সাহিত্যে ও সমালোচনায়—কোথাও ধর্ম্মের কাহিনীর আর অন্ত নাই এবং মৃদঙ্গের বোলে রাত্রে ঘুমান দায়। ধর্ম্মেরই নাম করিয়া পেটেল-বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হইতেছে, অথচ বিবাহ নাকি দুইটি অমর আত্মার অবিনশ্বর যোগ, আর আত্মা নাকি "নৈনং-ছিন্দন্তি-শস্ত্রানি" ইত্যাদি, এবং বিকাররহিত, এবং লিঙ্গ এবং জাতি-বিবর্জ্জিত। ধর্ম্মের কথা এখানে এত বেশি যে, ধর্ম্ম

এখানে কথার কথা। তাই এখানে যদি এই কথাটি বলা যায় যে, ঘটনা শুধুই ঘটনামাত্র নয়, প্রতিদিনের তুচ্ছতম ঘটনাও আধ্যাত্মিক ঘটনা, তাহা হইলে এই বিপদ হইবে যে, "তত্ত্বমসি," "সচ্চিদানন্দ" প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই-বিরাজিত অসংখ্য বুলির সঙ্গে আর একটি বাঙলা বুলি মাত্র যোগ করা হইবে—যা কারো মনের উপরে তিলমাত্র দাগ কাটিবে না। "Every man, I am with thee, and shall be with thee even unto the end of the world"—এই আশ্বাসবাণী যাদের জপের মন্ত্র, তারাই যে কেবল পৃথিবীর শেষ প্রান্ত দৃষ্টিগোচর করিবার মতো অকাজে বরফের তলে বেহুদা প্রাণ খরচ করিতে পারে, তাহা আমাদের দেশীয় "আধ্যাত্মিক"-দের জানা না থাকিলেও, রেলে ইষ্টিমারে এবং কাছারীতে উক্ত জীবদের প্রাণের বেগের ধাক্কা নিতান্তই জাজ্জ্বল্য-রূপে তাঁদের গোচরীভূত না হইয়া যায় না। অথচ তাঁদেরই ঐ "তত্ত্বমসি", "I am with thee"-রও এক কাঠা উপরে, তথাপি একটি হচ্ছে উত্তেজক মাদক, আর একটি অবসাদক আফিং। "সোঽহং" যে ঐজাতীয় উদ্‌ভিদ্‌-বিশেষের ধূম্রের সঙ্গে কি প্রকার ঘনিষ্ট বন্ধনে জড়িত তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কোনো মেলায় যাইবার আয়াস-স্বীকার অনাবশ্যক। এদেশে জীবন যদি চিন্তাকে তালাক না দিত, তবে এ প্রকার অঘটন ঘটিত না। ন্যায়-দর্শনের কচ্‌কচিরও অন্ত নাই, অথচ "রামবাবু একজন সাধু উকিল" ইত্যাকার বিরোধাভাসও—ইংরাজিতে যাকে বলে Contradiction in terms—অহরহ শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবে। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"—যোগস্থ হইয়া আর যাই করা যাক্‌, আদালতে কাজ করা চলে না, কেন না মাম্‌লাবাজি রাজযোগ নয়।

জীবনের সঙ্গে চিন্তার এই যে বিচ্ছেদ, এ হচ্ছে একটা বাতব্যাধি, যা একেবারে অসাড় করিয়া রাখিয়াছে এই জাতের will-কে। স্নায়ু-মণ্ডলী মস্তিষ্কের বার্ত্তাকে হস্তপদের পেশীর কাছে বহন করিতে নারাজ—দর্শনের সিদ্ধান্ত দর্শনেরই সিদ্ধান্ত—জীবনের ক্ষেত্রে তার কোনো কর্ষণ নাই, তার সমুদয় আকর্ষণই নিছক intellectual. তাই যে জাত পৃথিবীর সকল সম্পদকে "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" বলিয়া, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে যেমন হাসিয়া তার কাঠের পুতুলকে ছোট ভাইয়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলে, তেমনি করিয়া ছুড়িয়া ফেলিল,—সমস্ত উপকরণ-জালকে ছিন্ন করিয়া বিচিত্রের মধ্যে এককে আবিষ্কার করিবার হৃদয়-ভরা মহানন্দে,—সেই জাত শেষকালে বসন্তরোগের আক্রমণের মহাভয়ে গর্দ্দভ-বাহিনীর কাছে পাঁঠা বলি দিল; একই ব্যক্তি মহোৎসাহে একই সময়ে অদ্বৈতবাদ ও জাতিভেদের স্তুতিগানে মাতোয়ারা!

"Moral Faculty" হইতেছে কর্ম্মের সেই প্রেরণা, যা যুগ হইতে যুগান্তরে জাতিদের লইয়া যায় খাদ কাটিয়া কাটিয়া, যার প্রসাদে দেশ দেশান্তর ফুলে ফলে হাসিয়া ওঠে, যে জাতির মধ্যে তাহা মরিয়া গেল, সে জাতি জগৎ-জোড়া এই দৌড়-খেলায় হঠাৎ থামিয়া গেল। কর্ম্ম-চেতনার এই atrophy, আর আমাদের দেশব্যাপী এই পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ কিংবা আমাদের দুর্গতির আর যে-কোন-এক বিভাগই ধরা যাক্—এ দুইয়ের মধ্যে যথাক্রমে কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধের আরোপ, এ হইতেছে এমন একটি লম্ফ, যা ত্রেতাবতারের বন্ধুবরেরও ঈর্ষা-উৎপাদক, কিন্তু তথাপি ইহা সত্য।

(২)

আজ সকলেই সকলকে বলিতেছেন, "প্রতীকার শ্চিন্ত্যতাং তাবৎ" অথচ কোথা হইতে যাত্রা সুরু করিতে হইবে, নানা হট্টগোলে তা'র ঠাহর পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের নাই সেই প্রতিভার তেজ, যা বস্তুপুঞ্জকে গলাইয়া এক নিমেষে স্বচ্ছ করিয়া লয়, সেই খরধার বুদ্ধি, যা কঠিন প্রস্তরকে ভেদ করিতে পারে, সেই মনীষা, যা এক ডুবে সমুদয় ব্যাপারের তলদেশে গিয়া পৌঁছায়। আমরা হুতাশে ছুটাছুটি করি, আমাদের হাতে সবই হইতেছে জোড়াতাড়া, কেননা কোন সমস্যার মুল আমরা খুঁজিয়া পাই না। শত শতাব্দী ব্যাপিয়া জীবন হইতে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে সত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া এই লাভ করিয়াছি যে,না পারি সে কোথায় তাহা বলিতে,না পারি তাকে চিনিতে, যদি বা কোনো শুভ লগ্নে সে দেখা দেয়। রাজনৈতিক ভ্রাতৃদ্বয়, রাম ও শ্যামের, জীবনের মধ্যে আর যাই থাক, সত্য ছিল না। সত্য অতি অভিমানী, এতটুকু অনাদর সে সহিতে পারে না। আমাদের জীবন হইতে সত্য পলায়ন করিয়াছে, তাই আজ আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ। নিজেরই তৈরি দেয়ালে নিজেকে ঘেরিয়াছি, সেই দেয়ালই বাহিরে বিস্তীর্ণ হইয়া সকল দিক হইতে আমাদিগকে ঠেকাইতেছে, সেই দেয়ালকে কটুকাটব্য বলিলে সে একচুল নড়িতেছে না, মাঝে হইতে Cervantes-এর সেই নভেলের নায়কের অভিনয় হইতেছে।

(৩)

আমরা কিনা "অল্প লইয়া থাকি", অন্ত-ই হইতেছে আমাদের কারবারের মুলধন, তাই অন্ত-র উল্টা করিয়া আমরা অনন্তকে লাভ

করিতে চাই। অথচ অনন্তই যে সত্য, সেই যে আমাদের সমস্ত ভাবনার মূল আশ্রয়। যা মিথ্যা নয় তাই আমাদের কাছে সত্য। সত্য কিন্তু আসলে নিজেতে নিজে প্রতিষ্ঠিত, স্বরাট্; সে আলো; মিথ্যা তার অবরোধ, ছায়া। আমাদের দেশ "নেতি"-র দেশ; Nay nay করিতে করিতে "yea"-তে পৌঁছিবার চেষ্টা আমাদের অভ্যাসগত, "শুদ্ধম্" আমাদের কাছে "অপাপবিদ্ধম্।" শুদ্ধ সত্য এই কারণে আমাদের কাছে কেবলমাত্র দার্শনিক তত্ত্ব—তিনি হচ্ছেন "তৎ সৎ"। সেইজন্য নীতি আমাদের কাছে এমন একটা খাল, যা কাটা হইয়াছে কিন্তু তার মধ্যে জলের প্রবাহ ছোটে নাই। "Holy Holy" করিয়া য়ীহুদী প্রফেটের চোখে জল কেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। তত্ত্ব আমাদের জীবন হইতে ঐ কারণেই বিচ্ছিন্ন—মনের আবেগ তত্ত্ব এবং জীবনের মধ্যে সেতু—অথচ আমাদের দার্শনিক আলোচনায় মনের আবেগের স্থান নাই। আমাদের সমুদয় ভাবোচ্ছ্বাস তাই স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চেরই মধ্যে নিষ্ফলীভূত। প্রবল ভাবাবেগ—যার কথা ছিল কর্ম্ম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার, সে ক্রমে গড়গড়া হইতে গড়াগড়িতে বিবর্ত্তিত হইয়া শয্যাকেই সুখকর করিয়া তুলিল।

(৪)

ইংল্যাণ্ডের ভৌগলিক সংস্থান, তার খনিগুলি, তার কলকব্জা—এই সকলই কি ইংল্যাণ্ডের এই আশ্চর্য্য ঐহিক উন্নতির মুলে? খনিকে খুঁড়িল কে? কলকব্জা কি "আকাশ হইতে ঝুপ্ করিয়া পড়িল"? তার জাহাজগুলির "অমল ধবল পালে" কি কেবল "মন্দ মধুর হাওয়া"

লাগিয়াই দিকে দিকে তারা বলাকার মত ছুটিয়া সপ্তসাগর ছাইয়া গেল ?

কিপ্‌লিঙের পিতামহ ওআর্ডসোআর্থ্, তাঁর পিতামহ মিল্‌টন্।

ইংল্যাণ্ড যদি অতীতে * * "Stern Duty—The daughter of the Voice of God"-কে নমস্কার করিয়া থাকে, আজও তার সমুদয় মদোদ্ধততার মধ্যে—তার সমুদয় ইম্পিরিয়ালিজমের ব্যাণ্ডের বাছের মধ্যে এই সুর একেবারে চাপা পড়ে নাই।

"Hold ye the Faith—the Faith our Fathers sealed us,
Whoring not with visions—overwise and overstale.
Except ye pay the Lord
Single heart and single sword,
Of your children in their bondage shall He
ask them treble-tale !

Keep ye the Law—be swift in all obedience—
Clear the land of evil, drive the road and bridge
the ford.
Make ye sure to each his own
That he reap where he has sown ;
By the peace among Our peoples let men
know we serve the Lord !"

Body-politic-এর যে integrity—তার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিদের চারিত্রনৈতিক অবস্থা। পরকীয়া রাষ্ট্রশক্তির ঔদাসীন্য,

এমন-কি বৈরিতা-ই, কটন্ মিল্‌স্ বা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বৈকল্যের কারণ হয়ত নয়।

(৫)

একথা সবাই স্বীকার করিবেন যে, এ ব্যাধির চিকিৎসার হাস্পাতাল হইতেছে ইস্কুল। ইস্কুলেই ইংরাজেরা ক্রিকেট খেলে, পরে সাম্রাজ্যের খেলা খেলিবে বলিয়া। আমরা কি, আমাদের কি হওয়া চাই, তার নির্ণয়, আর আমাদের নীতিপথের নির্দ্ধারণ, এ দুই-ই হচ্ছে একত্র জড়িত।

আজ এদেশে দিকে দিকে যত কলরব উঠিয়াছে—তা যতই পরস্পরবিরোধী হট্টগোল হৌক্—"হাটের মাঝে বাটের মাঝে" সকল কোলাহলের অন্তরে এই মূল একটি তানকে—তা সে যতই ভাঙা আর যতই মোটা হৌক্, ধরিতে পারা যাইবে—

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।"

সেই জীবনকে বিভিন্ন প্রকৃতির মনীষা বিভিন্ন চিত্ত-বিচিত্র করিয়া আপনাদের বুদ্ধির মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাই এত তর্ক। যাঁদের বুলি পরস্পরের ঠিক উল্টা, তাঁদের চোখের সংস্কারের ঠুলি খুলিলেই তাঁরা দেখিতে পাইতেন, যার জন্য এত আকুলি-বিকুলি সে পদার্থ

একই "বহুধা" বিভাতি"। বিপ্রেরা "সৎ" হইলেই তা দেখিতে পাইতেন, সত্যানুসন্ধানেও সততার প্রয়োজন আছে, যুক্তির ধারা যেখানে লইয়া যাইবে সে স্থান মনোমত না হইলেও সেই সমস্ত পথ অতিবাহন করিবার জন্য যে প্রস্তুত থাকার ভাব, তা হচ্ছে intellectual honesty এবং সততা সর্ব্বত্রই যে সব চেয়ে ভালো নীতি, সেকথা প্রবাদেও বলে।

(৬)

সেই ভারতবর্ষে ইস্কুলমাষ্টার ছিল না, ছিল গুরু। "ইস্কুলমাষ্টার" আর "ইস্কুলবয়ের" সমবেত প্রার্থনা ছিল—"সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্য্যং করবাবহৈ, মা চিদ্বিষাবহৈ।" অদৃষ্টের পরিহাসক্রমে আমাদেরই এখানে বর্ত্তমান সিষ্টেমের সুর ইহার ঠিক উল্টা। "সহ নাববতু"—গুরু এবং ছাত্র একে অন্যকে যেন রক্ষা করি, কেবল বিদ্যাদান ও বিদ্যাগ্রহণ নয়, যে গ্রহীতা সেও উত্তমর্ণ—গুরু, শিষ্য হইতে স্বতন্ত্র স্বয়ংসিদ্ধ এক অপূর্ব্ব জীব নহেন, তারও সাধনা ছাত্রকে লইয়া, তাকে ছাড়িয়া তাঁর সিদ্ধি নাই, সেই কারণেই তাঁর যে মাহিয়ানা তা ছিল নিতান্তই আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষে তা দেখিবার জো ছিল না। ফ্যাক্টরিতে শ্রমজীবী যে জিনিসগুলি বানায়, বৎসরের পর বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলগুলি তার ক্লান্ত হাত হইতে গড়াইয়া বস্তাবন্দী হইয়া দিগ্‌বিদিকে চলিয়া যায়। ফ্যাক্টরির শ্রমজীবীর কৃতকার্য্যতার মধ্যে আনন্দ কোথায়? ইস্কুলমাষ্টারের কৃতকার্য্যতাও যা, অকৃতকার্য্যতাও তা। কিন্তু গুরু ছিলেন একটি মহীরুহ, আর

ছাত্রগুলি তাঁর পত্রাবলী। গুরু যদি শিষ্যের জন্য হন, শিষ্যও গুরুর জন্য। শিষ্যদের জীবনের মধ্য দিয়া গুরু তাঁর জীবনরস সংগ্রহ করিতেন, বাঙলা মাসিক কাগজের দর্শনে যাকে বলে "অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ", উভয়ের মধ্যে ছিল তাই। "সহ নৌ ভুনক্তু" —গুরু এবং শিষ্য আমরা যেন একে অন্যকে ভোগ করি, পুষ্ট করি। "সহবীর্য্যং করবাবহৈ"—কেননা Virtue আর বীরত্ব একই। যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন "না" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে যে বীর্য্যের আবশ্যক হয়, গোলা-গুলির সাম্‌নে দাঁড়াইতে তার চেয়ে বেশির দরকার হয় না। "অপার আকাশের তলে" সোজা হইয়া দাঁড়ানর মতো বড় মরালিটি আর কিছু নাই, আর জীবনের যাত্রায় দুর্ব্বাদল খাদ্য থেকে মুখ ফিরাইয়া পল্লব আর ফলের জন্য আকাশের দিকে যেদিন মানুষ ঘাড় সোজা করিল, সেদিন হইতেই যে সে প্রকৃত প্রস্তাবে "মানুষ" হইল, এ খবর কে না জানে। "Vir" এই কথাটির আসল মানে হচ্ছে "মানুষ"। "Righteousness tendeth to life"—একথা বাইবেলেও আছে।

(৭)

তপোবনের মধ্যে যে "মুক্ত" জীবন ছিল, তারই এক মাত্রা ছিটকাইয়া পড়িয়া রাজাসনের মধ্যে "দীপ্ত" হইয়াছিল। তাই হয়। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর আদিপুরুষ যে লূথর, এ কথা কে না জানে? খৃষ্টই নব-ফ্রান্সের স্রষ্টা। "Consider the lilies of the field" যাঁর অনুরোধ, তিনিই যে "Return to Nature"-এর ধুয়ার আদি গায়ক, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

সেই লিলির রাজ্যে বনমধ্যেই মানবের আদি স্কুল। নীতিকথা যদি কদাপি মনোরম হইতে পারে, তবে তা একবার মাত্র হইয়াছে—"vineyard" থেকে যে নীতিকথা পাওয়া গেছে তাহার মধ্যে। যাঁদের "চিত্ত মেঘের মাঝখানে হারায়" তাঁদের প্রত্যেক নিশ্বাসই নৈতিক। "পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে" যে কেবল তাদের "অঙ্গ"-ই জড়ায় তা নয়, "প্রাণে"-ও ছড়ায়। গোমুখী যেমন গঙ্গাকে ক্ষণিক ধারণ করিয়া পুনরায় শত সহস্র ধারায় ছড়াইয়া দিয়াছে, তেমনি তাঁরা যে আঁধার-সুধা জল পান করেন, তাঁদের দিনের রাত্রের সমুদয় ব্যবহার এবং কাজে তারই বহির্নির্ঝর। "সবার সঙ্গে যুক্ত" হন বলিয়াই তাঁরা "মুক্ত"। তাঁরা উদ্‌ভিদকেও ভেদ করেন। সুবিপুল বিশ্ব-নৃত্যের মধ্যে নিজদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার দরুণ তারই "শান্ত ছন্দ" তাঁদের "সকল কর্ম্মে"ও গিয়া সঞ্চারিত হয়। বাইরণ্ কি দুর্নীতি পরায়ণ?—"I live not in myself, but I become portion of that around me, and to me high mountains, are a feeling". অপিচ "Are not the mountains, waves and skies, a part of me and of my soul, as I of them?" নীতি আইন নয়, দস্তুরও নয়, সামাজিক ভদ্রতাও নয়। নীতি বাইরে-থেকে আরোপিত শিষ্ট পোষাক নয়। নীতি যদি তাই হয় তবে তা শৃঙ্খল এবং যে বীজের মধ্যে অনন্ত প্রাণের বেগ কারারুদ্ধ রহিয়াছে, সে যদি বহু শতাব্দীর বড় সাধের কারুকার্য্যময় ঐতিহাসিক প্রাসাদটিকে—যার আশ্রয়ের মধ্যে নিরাপদে শিষ্টতা, সভ্যতা ও সম্মান এবং ধার্ম্মিকতা বজায় থাকিতেছে, তাকে গভীর তলদেশ হইতে নিদারুণ ফাটল ধরাইয়া দিয়া তার অন্তঃসার-

হীনতাকে, জীর্ণতাকে প্রতিদিন নিষ্ঠুর বাস্তব-রূপে সুগোচর এবং স্পষ্টতর করিয়া তোলে, তবে তাকে গাল দিলে ঝাল মেটে বটে, কিন্তু নীতি এবং দুর্নীতির ভেদরেখাও ধরা পড়ে না, নীতিরও সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। নীতি কি নিয়ম? উচ্ছল ঝরণার নিয়ম কে আবিষ্কার করিবে? যে প্রাণ তার দুর্নিবার বেগে প্রতিমুহূর্ত্তে শত ফেনায়, লক্ষ বুদ্‌বুদে, সহস্র ঘূর্ণিপাকে আছড়াইয়া মারিতেছে, তার বেদনার তাপকে মাপিবার যন্ত্র কি নীতির থার্ম্মোমেটার? নীতিবাদী সমালোচকের জ্ঞাতি ভাই সজারু। সজারু তার কাঁটাগুলি খাড়া করিয়া ফলের গাছের তলে গড়াগড়ি দেয় যে ফলগুলি তার কাঁটায় বেঁধে, সেগুলি লইয়া সে দেয় এক দৌড়। ঘটনাকে আবহমান জীবন-থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, তার মানে কোথায়? বুদ্‌বুদকে হাতের মুঠার মধ্যে কে ধরিতে পারে? সকলেরই নিজ নিজ পছন্দ আছে—প্রেমিক পছন্দ করে গণ্ডের রক্তরাগকে।

"............the dilating soul, enrapt, transfused,
Into the mighty vision passing—there
As in her natural shape, swelled vast to Heaven"—

Mont Blanc দেখিয়া Coleridge-এর এই যে ভাব, ইহাই না তার Ancient Mariner-এর মৈত্রী-ভাবনার জনক? আসলে, "মানস-ভ্রমণ" মনের, আর "মাতা যথা নিজং পুত্তং" তদ্রূপ যে "ভাবনা" তা আত্মার, আর "righteousness" ইহার ব্যায়াম। Benevolence-ই Justice হইয়া দেখা দিতেছে কর্ম্মে। যে বুদ্ধি "হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, ঠিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া, শিহরিয়া, আলোকে

পুলকে সমস্ত ভূলোকে প্রবাহিয়া” চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, সে-ই কর্ম্মক্ষেত্রে বলিতেছে “সমুদয় আপনারে দিই একেবারে জগতের পায়ে বিসর্জ্জন”। হুইট্‌ম্যান্ তাঁর চার-পায়ার উপর বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, দূরে দূরান্তরে কোথায় অখলা অবলা তরুণীরা প্রতারিত হইতেছে, কোথায় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সমুদ্রগামী জাহাজে জুয়া খেলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইতেছে, নাবিকদের মধ্যে কা'কে সর্ব্বাগ্রে নিজের মাংস দিয়া সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে, কোথায় কোন্ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে শ্বেতাঙ্গ, আদিম-অধিবাসীদের শীকার করিতে বাহির হইয়াছে, বর্ব্বর গুলি খাইয়া মাটিতে পড়িল, কোনো কোনো কাজ করিবার পরে তরুণ-বয়স্কদের যে মর্ম্মদাহী গুপ্ত কান্না দেশে দেশে নগরে নগরে গুমরিয়া মরিতেছে, তা তিনি বসিয়া বসিয়া স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন। এই যে “দিগ্বিদিকে আপনারে......... বিস্তারিয়া” দেওয়া ইহাই যোগ। নীতি হচ্ছে জীবনের গতির ভঙ্গী, ড্রিল নয়। গুরু জীবনের গতিভঙ্গীর অনুসরণ করিতেন, ইস্কুলমাষ্টার জীবনকে ব্যবস্থা দেন।

প্রকৃতি এবং মানবের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলা, ইহাই নির্ব্বাণ। এইখানেই “die to live”-এর paradox. নির্ব্বাণ আর মুক্তির মধ্যে তফাৎই এই যে, নির্ব্বাণ কেবলমাত্র নিজেকে হারায়, মুক্তি নিজেকে হারাইয়া আবার ফিরিয়া পায় নব সম্বন্ধের মধ্যে—মুক্তি-দেবতা দ্বি-আনন দেবতা—তার এক মুখ মুক্তি, আর এক মুখ বন্ধ; তৃপ্তি এবং অতৃপ্তি সেখানে একই দণ্ডের দুই প্রান্ত। মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ কর্ম্মের ক্ষেত্রে বিচিত্ররূপে প্রকাশ। প্রকৃতির সাধনার মধ্যে নীতির কোনো প্রশ্ন নাই, কাব্যরাজ্যে নীতির প্রবেশ নিষেধ; কর্ম্মক্ষেত্রেই

নীতির ক্ষেত্র। অথচ পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে বড় নীতিসাধক জাতি যে য়ীহুদী জাতি, তার মুকুটমণি যে যীশু, তাঁর মতো কবিও ত দেখিতে পাই না। ক্রুশের উপরে বিদ্ধ হইয়া সমস্ত মানবের পাপপুঞ্জকে আপনার মধ্যে অনুভব করিবার যে কল্পনা, সে কল্পনা নিশ্চয়ই "মানস-ভ্রমণের" কল্পনা। আসলে কল্পনাই কর্ম্মের জননী। তাই যিনি "কবি" এবং "মনীষী", তিনিই "শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ", যুগ যুগ গ্রহ-তারাগণের এবং জীবপুঞ্জের প্রয়োজনসকল "যাথাতথ্যেন" ঠিক-ঠিক-রূপে বিধান করিতে পারিয়াছেন; মাতা যে-প্রকার বিদেশগামী পুত্রের সকল বন্দোবস্ত ঠিক-ঠাক করিয়া দেন। প্রেমই মানুষকেও কবি করে এবং মাতাও কবি।

ইস্কুলমাষ্টার।

ভারতবর্ষ সভ্য কিনা?

——:০:——

সেকালে ভারতবর্ষ ছিল মীমাংসার যুগ, একালে হয়েছে সমস্যার। কথা যে সত্য, এতগুলো কমিসনই তার প্রমাণ। এই আজকের দিনে পাঁচ পাঁচটা কমিসনের প্রসাদে পাঁচ পাঁচটা সমস্যা রাজ-দরবারে টাঙানো রয়েছে; যথা—(১) চাকরীর সমস্যা (২) স্বরাজের সমস্যা (৩) অরাজকতার সমস্যা (৪) শিল্পের সমস্যা (৫) শিক্ষার সমস্যা; তার উপর আবার এসে জুটেছে বিয়ের সমস্যা।

এর পর জন্ম মৃত্যু বাদে দুনিয়ার আর কোন্ সমস্যা বাকী রইল? ও-দুটির যে কোনও সমস্যা নেই, তার কারণ ও-দু'টিই হচ্ছে রহস্য। তবে এদেশে জন্মটা বড় রহস্য, না মৃত্যুটা বড়, এ বিষয়ে একটা তর্ক অবশ্য উঠতে পারে, কিন্তু ওঠে না এইজন্য যে, তার মীমাংসাও স্পষ্ট। আমাদের পক্ষে ও দু'-ই সমান।

এ যুগ সমস্যার যুগ বিশেষ করে' এই কারণে যে, এ যুগে অধিকারীভেদ নেই। জীবন, তা সে ব্যক্তিগতই হোক—আর জাতি-গতই হোক, চিরকালই একটা সমস্যা, কিন্তু সেকালে এ সমস্যা নিয়ে মাথা বকাত শুধু দু'চারজন; আর একালে কোনও বিষয়ে একটা সমস্যা উঠলে আমরা সকলে মিলে তার মীমাংসা করতে বাধ্য। যেকালে সকলের সকল বিষয়ে মত দেবার অধিকার আছে, সেকালে কোন বিষয়েই কারও চুপ করে থাকবার অধিকার নেই। যদি বলো, যার নিজের একটা মত গড়বার সামর্থ্য

নেই,—এক কথায় যার মত বলে' কোনও পদার্থই নেই—সে সে-পদার্থ দান করে কি করে ?—তার উত্তর, মনের ঘরে যার শূন্য আছে, সে শূন্যই দিতে পারে, শুধু যে দিতে পারে তাই নয়, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য তার পক্ষে তা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। একের পিছনে শূন্য বসালে তা যে দশগুণ বেড়ে যায়, এ কথা কে না জানে ? সুতরাং যার হোক একটা মতের পিছনে আমরা যদি ক্রমান্বয়ে শূন্য বসিয়ে যাই, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে তার দশগুণ করে মূল্য বেড়ে যাবে।

সত্য কথা বলতে গেলে, রাজনৈতিকপ্রমুখ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের পক্ষে কোনরূপ মত না থাকাটাই শ্রেয়। সকলেরই যদি একটা-না-একটা স্বমত থাকে, তাহ'লে নানা মতের সৃষ্টি হয় ; অপর পক্ষে অধিকাংশ লোক মতশূন্য হলে যা সৃষ্টি হয়, তার নাম লোকমত। আর এ কথা বলা বাহুল্য যে, একালে লোকমতই হচ্ছে একমাত্র কেজো মত, কেননা ও-মতের অভাবে হয় কোন বিলই পাস হয় না, নয় সকল বিলই পাস হয়।

এর কারণও খুঁজে বার করতে হবে না। নানা মত পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শূন্য, আর শূন্যে শূন্যে যোগ দিলে দাঁড়ায় গিয়ে বিরাট একে। এই সত্যই যে সার সত্য, তার প্রমাণ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক, দু'রকম অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমান পাওয়া যাবে।

(২)

উপরে যে-সব সমস্যার ফর্দ্দ দেওয়া গেছে, তার উপর সম্প্রতি আর একটি সমস্যা এসে জুটেছে, যার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তার কোনও মীমাংসা নেই—অথচ অনেক তর্ক আছে।

সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, "ভারতবর্ষ সভ্য কিনা"? দেখতে পাচ্ছেন সমস্যাটা কত ঘোরতর, কত গুরুতর! এ সমস্যা অবশ্য রাজনৈতিকও নয়, সামাজিকও নয়,—কিন্তু সকলপ্রকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা ওরই অন্তর্ভূত।

যদি জিজ্ঞাসা করেন - যার মীমাংসা নেই, এমন সমস্যা ওঠে কেন? তার উত্তর—একজনে এর পূর্ব্ব-মীমাংসা করে দিয়েছেন বলেই, আর পাঁচজনে তার উত্তর-মীমাংসা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে একটা বিষম তর্কে।

William Archer নামক জনৈক ধনুর্ধর ইংরাজি লেখক এবং প্রবীন ভাবুক, ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন করে' অবশেষে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে যে—

"ভারতবাসীরা হচ্ছে অসভ্য জাতিদের মধ্যে সব চাইতে সভ্য এবং সভ্য জাতিদের মধ্যে সব চাইতে অসভ্য"। অমনি আমরা অস্থির হ'য়ে উঠেছি।

এ কথায় কিন্তু বিচলিত হবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাইনে। William Archer-এর মত যদি সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা যদি সভ্যতার মধ্যপথ অবলম্বন করে, থাকি, তাহ'লে ত আমরা আরিষ্টটলের মতে ঠিক পথই ধরেছি, বৌদ্ধ মতেও তাই। আর সেকেলে দর্শন যদি বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে বলি হেগেলের মতেও দাঁড়ায় এই যে, সভ্যতা (thesis) + অসভ্যতা (anti-thesis) = সভ্যাসভ্যতা (synthesis). অর্থাৎ আমাদের সভ্যাসভ্যতাটা হচ্ছে synthetic civilisation, অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেশি অসভ্য হওয়া যে ভাল নয়, সে ত পুরোনো সত্য;

আর বেশি সভ্য হওয়াও যে মারাত্মক, এই নতুন সত্য ত ইউরোপে হাতে হাতে প্রমাণ হ'য়ে গেল। এক দিকে সভ্যতা আর এক দিকে অসভ্যতা এই দুই চাপের ভিতর পড়াটা অবশ্য সুখের অবস্থা নয় ; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে, সুখের অবস্থা, এমন কথা আর যেই বলুক, আমরা ত কখনো বলিনে।

আর এক কথা, কি সভ্যতা কি অসভ্যতা এ দু'য়ের কোনটিরই ভিতর মানুষের শান্তি নেই,—না দেহের না মনের। যারা নিজেদের অসভ্য বলে জানে, তারা সভ্য হবার জন্য লালায়িত হয় ; আর যারা নিজেদের সভ্য বলে জানে, তারা স্বাভাবিক হবার জন্য লালায়িত হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন অতিসভ্য হ'ল তখন ভারতবাসী সভ্যতার শিকলি কেটে বনে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, এবং একই অবস্থায় একই কারণে, গ্রীক্‌রা হলো ফিলজফার আর রোমানরা খৃষ্টান। তারপর যখন নব রোমক-খৃষ্টান-সভ্যতা পুরোপুরি গড়ে উঠল, তখন রুসো সকলকে পরামর্শ দিলেন, আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে—অমনি দেশসুদ্ধ লোক মেতে উঠল। অপর-পক্ষে যাদের জ্ঞান তারা অসভ্য, তারা যে সভ্য হবার জন্য আঁকুবাঁকু করে, তার প্রমাণ কি আর উদাহরণের অপেক্ষা রাখে ?—অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শান্তি যদি কোথায়ও থাকে ত সভ্যতা আর অসভ্যতার মিলনক্ষেত্রে ; কেননা ও ক্ষেত্রে অসভ্যতা সভ্যতার, এবং সভ্যতা অসভ্যতার তেজ বিলকুল ও বেমালুম মেরে দেয়। সুতরাং একাধারে সভ্য এবং অসভ্য হওয়াটাই বুদ্ধিমান জাতের কাজ ; আর আমাদের মাথায় যে মগজ নেই, এমন কথা William Archer-ও বলেন না।

আমার এ সব কথা যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, আমার মত কেউ গ্রাহ্য করবেন না। কেননা একদল প্রমাণ করতে যেমন ব্যস্ত যে, আমরা অতি সভ্য,—আর একদল প্রমাণ করতে তেমনি ব্যস্ত যে, আমরা অতি অসভ্য। সুতরাং এ দুই দলকে কেউ ঠেকাতে পারবে না; তাঁরা তর্ক করবেনই, শুধু William Archer-এর সঙ্গে নয়, পরস্পরের সঙ্গেও।

এ উভয়কেই আমি বলি স্থিরোভব। আমরা যে অসভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি? আর আমরা যে সভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি? কেউ যদি প্রমাণ করে' দেয় যে আমরা অসভ্য, তাহ'লেই কি আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে, না আমাদের জীবনের সকল সমস্যা উড়ে যাবে?—তা অবশ্য কখনই হবে না, উপরন্তু আর একটা সমস্যা বাড়বে,—সে হচ্ছে সভ্য হবার মহা সমস্যা।

অপরপক্ষে আমরা যদি প্রমাণ করে দিই যে আমরা সভ্য, তাহ'লেই কি আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, না আমাদের জীবনের সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে?—তা অবশ্য কখনই হবে না, কেননা নিজের সার্টিফিকেট নিজের কোনও কাজে লাগে না, ব্যক্তির পক্ষেও নয় জাতির পক্ষেও নয়। তা ছাড়া নিজের দরখাস্তের বলে, এক্ষেত্রে পরের কাছ থেকে ভাল সার্টিফিকেট আমরা কিছুতেই আদায় করতে পারব না। সভ্যতা সম্বন্ধে প্রতি জাত নিজেকে "সোঽহং" মনে করে, কিন্তু অপর কোনও জাতকে "তত্ত্বমসি" বলতে প্রস্তুত নয়। তবে প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে এ কথা অবশ্য খাটে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান-সভ্যতার সুখ্যাতি যে ইউরোপের মুখে আর ধরে না, এ কথা কে না জানে? তার কারণ এই যে, যে-সভ্যতা মরে ভূত হয়ে গেছে,

উঁচুগলায় তার গুণগান করবার ভিতর কোনও বিপদ নেই ; কেননা কোন জ্যান্ত সভ্যতার উপর ওসব মরা সভ্যতার কোনও দাবী নেই। প্রাচীন ও মৃত সভ্যতা কোনও বর্ত্তমান সভ্যতার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতা তার কাছ থেকে ঢের আদায় করে, এবং তার নুন খায় বলেই তার গুণ গায়। ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রীস-রোমের সভ্যতার মত প্রাচীন হলেও, প্রশস্য নয়—কেননা তা মৃত নয়—জীবিত। এ সভ্যতার অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে, তা আজও বেঁচে আছে, এবং বহুকাল বেঁচে আছে বলে আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে চায়, তাই তার দাবীর আর অন্ত নেই। এ সভ্যতার স্বপক্ষে ইউরোপের সার্টিফিকেট বার করা অসম্ভব। আর যদিই বা করা যায়, তাতেই বা কি লাভ ? আমাদের জাতীয় সমস্যার আশু মীমাংসা ততটা নির্ভর করবে না—আমাদের প্রাচীন সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতার উপর যতটা নির্ভর করবে, ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতার উপর।

যদি কেউ বলেন যে, ইউরোপের খাতিরে নয়—সত্যের খাতিরে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, ভারতবর্ষ সভ্য। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ও চেষ্টায় উল্টো উৎপত্তি হবারই সম্ভাবনা বেশি। মানুষ যেমন মুখের জোরে নিজেকে অপরের চাইতে বেশি ভদ্র প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অভদ্রতারই পরিচয় দেয়, জাতিও তেমনি নিজেকে অপরের চাইতে বেশি সভ্য প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অসভ্যতারই পরিচয় দেয়। এর প্রথম কারণ সভ্যতা প্রমাণ করতে হয় হাতে কলমে, কাগজে কলমে নয়,—কেননা ও-বস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির বলে নয়, কর্ম্মের ফলে। এর দ্বিতীয় কারণ, মানুষ সভ্য হলেও মানুষই থাকে,

সভ্য মানবেরও সত্তার মূলে রয়েছে আদিম মানব। সুতরাং মানুষ যখন অবিশ্বাসী লোকের সুমুখে নিজেকে সভ্য-মানব বলে খাড়া করতে যায়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ও-ক্ষেত্রে যাকে খাড়া করা হয়, সে হচ্ছে আদিম মানব; কেননা এরকম কাজ মানুষে এক রাগের মাথায় ছাড়া আর কোন অবস্থায় করে না। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা থাকলে মানুষে যে এ কাজ করে না, তার কারণ ও-কাজ করা হয় অনাবশ্যক, নয় নিরর্থক। সভ্যতা বলে যদি মানব-সমাজে কোনও এক বস্তু থাকে, তাহ'লে সভ্যসমাজ মাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত। যা প্রত্যক্ষ তার অস্তিত্বের প্রমাণ অনাবশ্যক। আর অসভ্যের কাছে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কেননা কোনও প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা অসভ্যের কাছে সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করে তোলা যাবে না।

মতান্তরে সভ্যতা এক বস্তু নয়, কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতা হরেকরকমের হয়ে থাকে; সভ্যতার ভিতরও বিশিষ্টতা আছে, এবং সভ্যতায় আর সভ্যতায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে পার্থক্য এত বেশি যে, তাদের মিলন কস্মিনকালেও হবে না। এ মতের চরমবাণী হচ্ছে—Kipling-এর এই কথা,—The East is East and the West is West, and never the twain shall meet. এ কথা দেশে বিদেশে অনেকে বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু আমার কাছে বরাবর তা নিরর্থক প্রলাপ বলেই মনে হয়েছে, কেননা ও-কথার অর্থ আমি কখনও বুঝতে পারি নি। সম্প্রতি বৃটিশ-সভ্যতার একটি অগ্রগণ্য মুখপত্রে তার ব্যাখ্যা দেখে নিশ্চিন্ত হলুম। Spectator লিখেছেন, Kipling-এর ও-কথার সাদা অর্থ হচ্ছে—Black is black and white is white.

এ ব্যাখ্যা যে অতি বিশদ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, Spectator বৃটিশ সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে, শুধু বৃটিশ অসভ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। এর পর নিজের সভ্যতার বিশিষ্টতার ব্যাখ্যান করতে সকলেরই ভয় পাওয়া উচিত।

কোনও সভ্যতার বিশিষ্টতার প্রতি বিশেষ করে নজর দেওয়াতেও বিপদ আছে। ও অবস্থায় বিশিষ্টতাকেই সভ্যতা বলে মানুষের সহজে ভুল হয়। অপর সমাজের সঙ্গে নিজের সমাজ যে অংশে বিভিন্ন, সেই অংশকেই নিজের সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বলে' অহঙ্কার করবার লোভ যায়। শুধু তাই নয়, তখন সেই অঙ্গকেই যেন-তেন-প্রকারেণ রক্ষা করবার জন্য মানুষ বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে ; আর তার ফলে যদি সমাজের সকল অঙ্গ পঙ্গু হ'য়ে যায়, তাতেও সমাজ তার নিজের গোঁ ছাড়েনা। উদাহরণ স্বরূপ, এই পাটেল বিলের বিপক্ষ দলের কথাই ধরা যাক না। এঁরা বলেন, জাতিভেদ প্রথা যখন হিন্দু সমাজ ছাড়া অপর কোনও সভ্যসমাজে নেই, তখন হিন্দু-সভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে জাতিভেদ-প্রথা। অতএব হিন্দু-সভ্যতার বিশিষ্টতা অর্থাৎ জাতিভেদ-প্রথা, বজায় রাখতেই হবে, তার জন্য যদি হিন্দুজাতি ধূলাশায়ী হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এ কথা বলাও যা, আর Spectator-এর কথায় সায় দেওয়াও তাই। Spectator-এর এ মত শুধু একমাত্র বর্ণভেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ওরকম ঢেরা সই দেওয়াতে, বর্ণ-ধর্ম্ম-জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বর্ণ-জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না ধর্ম্মজ্ঞানেরও নয়। জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের গোড়ার কথা হলেও, হিন্দু-সভ্যতার শেষ কথা নাও হতে পারে।

সভ্যতার অবশ্য নানা রূপ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আছে; কিন্তু তার ক্রিয়া এক। এবং সে ক্রিয়া হচ্ছে মানব-জীবনের মুখ্য ক্রিয়া to be. এ কথায় অবশ্য তাঁরা আপত্তি করবেন, যাঁদের বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির মূল ধাতু হচ্ছে to have,—কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, জীবনে কিছু পেতে হ'লে তার আগে কিছু হ'তে হয়। এক সভ্যতার সঙ্গে আর এক সভ্যতার গড়নের পার্থক্য ঘটে শুধু—বাহ্যবস্তুর আনুকূল্যে এবং প্রতিকূলতায়। এ পার্থক্য প্রাচীনকালে যেমন স্থূল ছিল, বর্ত্তমানে তেমনি সূক্ষ্ম হয়ে আসছে; তার প্রথম কারণ, একালে এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির দেশের ও সেই সঙ্গে দেহের এবং মনেরও ব্যবধান কমে আসছে। আর তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, বর্ত্তমানে মানুষ বস্তুজগতের ততটা অধীন নয়, বস্তুজগত মানুষের যতটা অধীন। জাতিতে জাতিতে মনের ও ব্যবহারের পার্থক্য কমে আসছে বলে' এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, মানবজীবন বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে পড়বে। জাতিতে জাতিতে প্রভেদ যেমন কমে আসছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ তেমনি বেড়ে চলেছে,—এক কথায় বিশিষ্টতা এখন জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতের মানব-সভ্যতা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গুণে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য লাভ করবে এবং এই বিচিত্রতাই হবে তার বিশিষ্টতা। অন্তত আমাদের সভ্যতার ওজন্যে ভাবনা নেই। ভারতবর্ষ যদি একদেশ হিসেবে ধরা যায়, তাহ'লে সে দেশের সভ্যতা যুগপৎ হরবোলা ও বহুরূপী হ'তে বাধ্য।

ভবিষ্যতে যা হবার সম্ভাবনা, তা নাও হতে পারে; কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে, তা যে হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই। এবং প্রতি প্রাচীন সভ্যতার যে একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সে

কথাও অস্বীকার করা অসম্ভব। অথচ এ সকল সভ্যতার সামাজিক ব্যবহার এবং মনোভাবের মিলও বড় কম নয়। পণ্ডিত ব্যক্তি-দের মতে গ্রীক রোমান এবং হিন্দু-সভ্যতার ভিতর ঠিক ততখানি মিল আছে, গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষার ভিতর যতখানি মিল আছে এবং সে মিল প্রথমত কম নয়, দ্বিতীয়ত তা ধাতুগত। যদিচ আমি পণ্ডিত নই, তবুও এ মত গ্রাহ্য করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। তার কারণ আমার বিশ্বাস সকল সভ্যতারই ধাতু এক, শুধু প্রত্যয় আলাদা। সে যাই হোক, যে ক'টি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে সে সব গুলিই আমার মনে হয় এক জাতীয় অর্থাৎ আমার কাছে তার প্রতিটি হচ্ছে এক একখানি কাব্য। কাব্যে কাব্যে যে প্রভেদ থাকে, এদের পরস্পরের ভিতর সেই প্রভেদ মাত্র আছে। আমার মতে গ্রীক সভ্যতা হচ্ছে নাটক, রোমান সভ্যতা মহাকাব্য, ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্ব্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট। আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে রূপকথা। সভ্যতার সঙ্গে কাব্যের তুলনা দেওয়ায় যদি কেউ আপত্তি করেন তাহ'লে বলি, ও-তুলনা একটা খাম-খেয়ালি ব্যাপার নয়। আমরা প্রাচীন সভ্যতার যে সব মূর্ত্তি গড়ি—হয় পূজা করবার জন্য, নয় মনের ঘর সাজাবার জন্য, অতীত শুধু তার উপাদান যোগায়, তাও আবার অতি স্বল্প মাত্রায় সেই উপা-দানকে আমাদের কল্পনা শক্তি গড়ন ও রূপ দেয়—এই সেই রূপকে আমরা আমাদের হৃদয়-রাগে রঞ্জিত করি। কাব্য রচনার পদ্ধতিও ঐ।

সত্যকথা এই যে, সভ্যতা হচ্ছে একটা আর্ট এবং সম্ভবত সব চাইতে বড় আর্ট, কেননা এ হচ্ছে জীবনকে স্বরূপ করে তোলবার

আর্ট, আর বাদবাকী যত কিছু শিল্পকলা আছে, সে সবই এই মহা আর্ট হতে উদ্ভূত এবং তার কর্তৃকই পরিপুষ্ট।

এ কথা অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এবং দার্শনিকেরা মানবেন না, কেননা বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, সভ্যতা জন্মে মাটির গুণে আর দার্শনিকের বিশ্বাস ও-বস্তু পড়ে আকাশ থেকে। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যের জন্মদাতা যেমন কবি, সভ্যতার জন্মদাতাও তেমনি মানুষ। এ বস্তুর তত্ত্ব বিজ্ঞান দর্শন কখনও আবিষ্কার করতে পারবে না, কেননা ও-হচ্ছে জীবনের একটি postulate, জ্ঞানের axiom নয় ;—অর্থাৎ মানুষের মন ছাড়া সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথায়ও নেই।

সে যাই হোক এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিশিষ্টতা প্রমাণ করবার কোনই প্রয়োজন নেই। William Archer প্রভৃতি সে বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ মানেন, আমাদের উপর তার রাগ এই যে, আমরা আমাদের প্রাচীনতা ত্যাগ করে নবীন হবার চেষ্টা করছি। ফলে আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীন-নবীন ওরফে সভ্যা-সভ্য। East এবং West যে ভারতবর্ষে meet করেছে, এই হচ্ছে আমাদের অপরাধ ; কেননা এই মিলনের ফলে কতকগুলো দুরন্ত সমস্যা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কি আমরা ?

পূর্ব্বাপর সভ্যতার এই মিলন ও মিশ্রন যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তার প্রমাণ ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতাও ত প্রবীন-নবীন, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যার নাম দিয়েছেন antico-modern. বর্ত্তমান ইউরোপীয়েরা যে অংশে ও যে পরিমাণে জ্ঞানে গ্রীক, কর্ম্মে রোমান

ও ভক্তিতে ইহুদি, সেই অংশে ও সেই পরিমাণে তারা সভ্য এবং বাদ-বাকী অংশে তারা হচ্ছে সাদা মানুষ।

যদি বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা antico-modern হ'তে পারে, ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা কেন যে antico-modern হ'তে পারবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে এ ক্ষেত্রে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটু প্রভেদ আছে। ইউরোপ তার নবীন সভ্যতার গায়ে প্রাচীন সভ্যতার কলম বসিয়েছে, অপর পক্ষে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতার গায়ে নবীন সভ্যতার কলম বসাচ্ছে। ফল কোন্‌টায় ভাল ফলবে, সে কথা বলতে পারে শুধু বৃক্ষায়ুর্ব্বেদীরা। তবে সহজ বুদ্ধিতে ত মনে হয় যে, নূতনের ঘাড়ে পুরাতনকে ভর করতে দেওয়ার চাইতে, নূতনকে পুরাতনের কোলেই স্থান দেওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

সুতরাং আমরা সভ্য কি অসভ্য সে বিষয়ে আমাদের মাথা বকাবার দরকার নেই, কেননা এখন আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য সমস্যার। প্রথমে যে ক'টি সমস্যার উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে যে তিনটি বিল আকার ধারণ করেছে তাদের সম্বন্ধেও বেশি কিছু ভাববার নেই, কেননা এ কথা নিশ্চিত যে, রাউলাট-বিল পাস হবে, প্যাটেল-বিল হবে না, এবং রিফরম-বিল পাস হবে ও হবে না। যে দু'টি বাকী থাকল, শিক্ষা ও শিল্প, সেই দু'টিই হচ্ছে এ যুগের আসল সমস্যা, কারণ এ দু'টির মীমাংসার ভার অনেকটা আমাদের হাতে এবং এ দু'টির আমরা যদি সুমীমাংসা করতে পারি, তাহ'লে আমরা সভ্য কি না, সে প্রশ্ন আর উঠবে না।

বীরবল।

নব-বসন্তে।

——:*:——

দীর্ঘ দিন ধরে বারন্দায় একলাটি আলোয় বসে চেয়ে চেয়ে আনমনে কতই দেখি। গাছের পাতা দোলে, প্রজাপতিরা হেলে দুলে চলে, ফুল মাথা নোয়ায়, আলগোছ হ'য়ে সরে দাঁড়ায়, ভঙ্গী করে' মুখখানি হেলিয়ে দেখে, আড়চোখে চায়, মুচকি হাসে, আবার বেজায় গম্ভীর হ'য়ে মাথা খাড়া করে দাঁড়ায়, রকম দেখে হেসে বলি, "সাবাস —সামান্যি মেয়ে নও তুমি"। কখনো ফুলগুলি, এ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কি বলাবলি করে, ছড়িয়ে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। দুটো সাদা প্রজাপতি ; ফুরে ফুরে সাদা মলমলের ডানার উপর সোণালি চুমকি বসান, ফুলবাবু দু'জন, গাঁদা ফুলের মজলিসে আসর জমাতে এসেছিল, আমলই পেলে না। সোণামুখী গাঁদা মুখ ভার করে ফিরে বসল—তার পর এলেন একটি কালো মাণিক, তার ডানার উপর রাঙা ছাপ। কালোর উপর যতটা বাহার চলে, সে তা করতে কসুর করে নি, তবে তাকে কেউ পুছলই না। তার পরে এলেন একজন কমলা রংএর, আয়তনে বৃহৎ, ডানা দুটি পুরু, যেন মখমলে গড়া, তার উপরে কালো কালো চোখের মত ছাপা আঁকা, মোটাসোটা, বড় মানুষের ছেলের মত, গজেন্দ্র গমনে! গাঁদা ফুলের মজলিসে গিয়ে স্বচ্ছন্দে বসে পড়ল, যেন তার ইজারা করা

মহল, কেউ মানা করলে না। অনেক্ষণ গল্প গুজব চলল, তারপর আয়েসী বাবুর মত আস্তে সুস্থে চলে গেলেন।

আমি ভাবলাম যুঁই, বেলা, চামেলি থাকলে হয়ত সাদা প্রজাপতি-টির আদর হ'ত, অপরাজিতা বোধ হয় কালো, লক্ষ্ণৌ ছিটের দোলাই পরা, কাঙাল প্রজাপতিটিকে বরণ করে নিতে পারত, কিন্তু গাঁদা এদের কারোকে পছন্দ করল না। আর সে ক্ষেত্রে হয়ত কমলা রং এর পতঙ্গমটি মান পেতেন না। ফুলের রাজ্যেই অসবর্ণ প্রথা (এ অসবর্ণ, সাদায় কালোয় হলদে লালে পাটেল বিলের বিরোধী নয়।) যখন চলল না, তবে আমরা মানুষেরা তা চালাবার চেষ্টা করা বৃথা! ওরা আমাদের চেয়ে, এ সব বিষয়ে বেশী সমজদার! যে যার নয় তার সাধ্য কি যে কাছে ঘেঁষে! এই কোমল স্বভাব কমল মুখীরা সজোরে প্রচার করেন—"দরওয়াজা বন্ধ"। বাড়াবাড়ি দেখলে কাঁটার আঁচড় আর পাতার চপেটাঘাত দেওয়াও বিচিত্র নয়! তবে এ বিষয় হলফ করে কিছু বলা চলবে না, এখনো স্বচক্ষে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি নি।

আমি যেন একখানা বাসর ঘরের দুয়োরের ফাঁকে আড়ি পেতে বসে আছি, চুপি চুপি বসে বসে কতই কি যে দেখছি আর মনে মনে হাসছি।

এক ঝাঁক মাটির রংএর নাক থেবড়া পাখী উড়ে এসে দেবদারু গাছের তালায় জুড়ে বসে কি খুঁটে নিয়ে খেতে লাগল। এ পাখী গুলির গায়ের কোন খানে একটুও সৌখীন রং নেই, শুধু নাকের দুধারে দুটি সোণালি টিপ, আঁচিলের মত উঁচু হয়ে আছে। সাতটি একসঙ্গে আসে যায়, ইংরাজীতে এদের নাম Seven Sisters, বাঙলায় ডাক নাম কি জানিনে। এরা সাত ভাই চম্পা নিশ্চয়ই নয়,

তিন জোড়া দম্পতি আর ঐ বাড়তি পাখীটি কে? কোন বিজোড় জীব, সঙ্গে সঙ্গে পাহারা দিয়ে ফেরেন, পাছে এই চটুলের দল কিছু একটা বেয়াদবী করে বসে! ঝুপ ঝুপ করে দেবদারুর রাশি রাশি পুরাণো পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে, এদের গায়ের উপর এসে পড়লেও এরা ভয় খাচ্ছে না। গাছের তলায় যা কিছুর সন্ধানে এসেছে তাই ঠোঁট দিয়ে ফুঁড়ে, পায়ের নখ দিয়ে আঁচ্ড়ে আঁচ্ড়ে একমনে আবিষ্কার করছে। পাতা ঝরার বেদনা, উত্তরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, খেদ বিলাপ, কিছুতেই আনমনা হচ্ছে না। ওদিকে আমার দুলালী হরিণীটি ঘাড়তুলে বড় বড় চোখ আরো বড় করে, এই পাতা ঝরার আওয়াজে বার বার চম্‌কে চম্‌কে উঠছে। মুখের কবলিত দুর্ব্বা খসে পড়ছে, গায়ের শিরায় শিরায় কম্পন দেখা দিচ্ছে, থেকে থেকে একটি কাণ খাড়া হচ্ছে আর শুয়ে পড়ছে। "পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপ যানং!" একেবারেই শাস্ত্র সঙ্গত বিরহিণীর দুর্দ্দশা! নব-বসন্তের সমাগমে আর ভরা বর্ষায় এই অবোলাটির এমনি দশা ঘটে —আমি আজ সাত আট বৎসর ধরে বরাবর লক্ষ্য করে আসছি, এই সময়ে হতভাগীর শুয়ে, বসে, উঠে, দাঁড়িয়ে, খেয়ে, ঘুমিয়ে কিছুতেই আর সোয়াস্তি থাকে না, ঘুমের মধ্যেও শিউরে শিউরে ওঠে।

* * * *

শীত চলে যাচ্ছে—বসন্তের আগমন আকাশে বাতাসে সূচিত হয়েছে। কোকিল কেবলি ডাকাডাকি করছে; নিখিলের বুক চিরে

দেওয়া এই ডাক নীলিমার গায়ে সোণালির আভা, বনের আঁধারে ফুলের রক্তিমা বিকাশ করছে। আমাদের দেশের ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, বর্ষশেষে ধরণীর নব যৌবন, বড় সুকুমার। কিশলয়ের কচি লালে, আম্র-মুকুলের মিষ্ট সুগন্ধে, শিরীষের গোলাপী আভায়, অশোকের তরুণ অরুণিমায় বড় চমৎকার। এত সুন্দর বলেই এমন আকস্মিক আর ক্ষণভঙ্গুর। এ যদি দীর্ঘ হ'ত, তাহ'লে এর আনন্দ এমন পরিপূর্ণ হ'ত না। ক্ষণিক বলেই এর স্মৃতি চিরস্থায়ী। চেতনার উপর এর আঘাত এমন প্রবল যে, অন্তরে তার সংবাদ বহুদিন ধরে সঞ্চিত থাকবে। তার পর আবার একদিন হঠাৎ কোকিলের একটু সাড়ায়, সুগন্ধের এতটুকু স্পর্শে বাতাসের ঈষৎ আন্দোলনে সমস্তটুকু সম্পূর্ণ উদ্বোধিত হয়ে উঠবে। পাতা ঝরবার বাতাস উঠেছে, দীর্ঘশ্বাস বটে, তবে শ্রান্তি ক্লান্তি তার মধ্যে নাই। যা' জীর্ণ হয়ে গেছে, যা' অযথা ভার মাত্র, তাকে মোচন করবার বর্জ্জন করবার ত্যাগ করবার, একটি সবল স্বাধীন আনন্দ সুর এই বাতাসের বুকে আছে।

* * * *

আজ শ্রীপঞ্চমী। দিনটিও বড় সুশ্রী। শেষ রাতে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল, তাই বাতাসটিও শীত-বায়ুর মতই হিম, তবে তার গতি উত্তর হতে দক্ষিণে নয়, দক্ষিণ হতেই সে উত্তরে চলেছে। সূর্য্যালোক এখনও তীক্ষ্ণ হয়নি, তার হিম-কাতর মূর্চ্ছাহত ভাবটি কেটে গেছে, তাকে সজাগ বলেই বোধ হচ্ছে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কুয়াশার আব-ছায়ার মধ্যে দিয়ে আসে নি, আকাশের পরিষ্কার পথ দিয়ে চারিদিকে

আলো ছড়াতে ছড়াতে এসেছে। আমগাছ মুকুলে ভরে গিয়েছে, বাতাস সুগন্ধে কখনো অভিভূত, কখনো বা চঞ্চল। দেবদারু এতদিন স্থির হয়েছিল, আজ ক'দিন এই বাতাসের সাড়া পেয়ে, তার জীর্ণ পাতাগুলি ঝরাতে আরম্ভ করেছে। সারাদিনই বাতাসের সঙ্গে ঝরে-পড়া, উড়ে-চলা পাতারাশের খেলা চলছে। পীতপত্রগুলি ঘুরে ঘুরে কত ভঙ্গীতেই আকাশ-পথে খেলা করে' তবে এসে মাটীর বুকে বিছানা বিছায়। দুয়ারের সম্মুখের বাদাম গাছদুটি, আজ কতদিন, পাতা সব ঝরিয়ে ফেলে, নাগা-সন্ন্যাসীর মত দাঁড়িয়েছিল, দু' তিন দিন হ'ল তাদের গায়ে, কচি পাখীর ছানার বুজে-থাকা পালকের মত পাতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এখনও রং বোঝা যাচ্ছে না, এখনও এদের নড়া-চড়ার শক্তি হয়নি, ডালগুলিকে আঁকড়ে ধরে, চুপটি করে' পড়ে আছে! এর পর যখন ক্রমে ক্রমে রং এর বাহার দেখা দেবে, পঙ্গু বাঁকা ভাব কেটে গিয়ে, দুলবার, নড়বার, কাঁপবার ক্ষমতা পাবে, তখন এদের সবুজের উপর সোণালির আমেজ, আর পাখীর পাখার মত ডানা নাড়াবার কত বিভিন্ন ভঙ্গী মনকে মুগ্ধ করবে। সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মর সঙ্গীতে বসন্তরাজের স্তুতি-গীতি গাওয়া হ'বে। আমি প্রতিদিন ভোরে বেড়াই, আর সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করি।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বর্গ-মর্ত্ত্য।

---:*:---

গান।

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখ্‌বে বলে॥
সেই আলোটি নিমেষ হত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌ল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশীষ আনি,
অমর শিখা আকুল হল মর্ত্ত্য শিখায় উঠ্‌তে জ্বলে'॥

ইন্দ্র। সুরগুরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম। তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্যে লড়াই করেছি এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কথা চিন্তা করে' দেখ্‌বেন।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে। স্বর্গের কি বিপদ আশঙ্কা করচেন?

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই।

বৃহস্পতি। নেই? সে কি কথা? তাহ'লে আমরা আছি কোথায়?

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আমাদের সংস্কারের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন্ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে ছায়া হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে, তা জান্‌তেও পারিনি।

কার্ত্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ সমস্ত অনুষ্ঠানই ত চল্‌চে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেচে। দিনশেষে সূর্য্যাস্তের সমারোহের মত, তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি ত জান দেব-সেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েচে যে, সকল প্রকার বিপদের ভয় পর্য্যন্ত তার চলে গেছে। দৈত্যেরা যে কত যুগ যুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কার্ত্তিকেয়। আপনার কথা যেন কিছু কিছু বুঝতে পারচি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগবামাত্রই যেমন বোঝা যায় স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্চে একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিলুম কিন্তু তবু এখনো সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কার্ত্তিকেয়। আমার কি রকম বোধ হচ্চে বলব? তূণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বল্লে, একবার তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। চেয়ে দেখি

শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ ত জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল, সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বল্‌চেন?

ইন্দ্র। পৃথিবীকে। মনে ত আছে একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই সত্য হয়ে উঠেছিল তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বল্‌ত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে?

কার্ত্তিকেয়। আর পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মানুষ এম্‌নি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে, যে সে আপনার শৌর্য্যকে আর বিশ্বাস করে না কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েচে তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারচে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কি?

ইন্দ্র। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগ সাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে

করেছিলুম, ভালই হয়েচে; ভেবেছিলুম এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন বোঝা যাচ্চে পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কার্ত্তিকেয়। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য স্বর্গের মধ্যেই জমে আস্‌ছে, বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেচে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত কিছু থেকে স্বর্গ বহুদূরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক্ আর দুর্গতিই হোক্ যাতেই চারদিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে, তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে যায়, তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলেয়ার আলো হয়ে উঠেছে—লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে, নির্ব্বাপনের শাস্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর। দেবলোক আপনাকে অতি বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেচে—সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মত মলিন মর্ত্ত্যের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধন

মোচন হবে। তার সেই স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টন বিদীর্ণ করবার জন্যেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেচে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি—মলিনের সঙ্গে পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তাহলে আপনি কি করতে চান?

ইন্দ্র। আমি পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই ত দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব। নক্ষত্র যেমন খসে পড়ে; তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে; আমি তেম্‌নি করে পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায়?

কার্ত্তিকেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করচে, ব্রাহ্মণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সেত আমার ইচ্ছার উপরে নেই—যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে, সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে'—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্ত্ত্যবাসী হয়ে মর্ত্ত্যের সাধনা করতে পারব।

কার্ত্তিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম, আজ আপনার কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সেই তন্বী শ্যামা ধরণী

সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে কি উৎসুক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। সেই ভীরুর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কি আনন্দ! সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কি গৌরব! সেই চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরীসুন্দরী কেমন করে ভুলে গিয়েছে যে সে রাণী! তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণ সমীরণে এই কথাটি রেখে আস্‌তে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান;—তাকে বেষ্টন করে ধরে যে সমুদ্র রয়েছে সেই ত স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদ-ক্রন্দনকেই ত সে মর্ত্ত্যে অনন্ত করে রেখেছে।

কার্ত্তিকেয়। দেবরাজ যদি অনুমতি করেন তাহলে আমরাও পৃথিবীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি।

কার্ত্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যনূতন লীলা বিস্তার করেচেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব? আমি যে বুঝতে পারচি আমাকে পৃথিবীর দরকার আছে, আমি নেই বলেই ত সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করচে, ধর্ম্মের জন্যে নয়।

বৃহস্পতি। আর আমি নেই বলেই ত মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা করচে, মুক্তির জন্যে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে যাবে আমি ত তারই উপায় করতে চলেচি— সময় হ'লেই তোমরা পরিণত ফলের মত আপন মাধুর্য্যভারে সহজেই মর্ত্ত্যে স্খলিত হয়ে পড়বে। সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কার্ত্তিকেয়। কখন টের পাব, মহেন্দ্র, যে আপনার সাধনা সার্থক হল?

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে? যখন জয়শঙ্খধ্বনিতে স্বর্গলোক কেঁপে উঠবে তখনি বুঝব যে—

ইন্দ্র। না, দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠবে না। স্বর্গের চোখে যখন করুণার অশ্রু গলে পড়বে তখনি জানবেন পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল।

কার্ত্তিকেয়। ততদিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধূলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই ত হ'ল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য্য সেখানে দরিদ্র বেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য্য সেখানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়স্তম্ভের ভিত্তি খনন করে। সম্ভব সেখানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মান্‌তে গিয়েই ভুল হয়, যা না দেখা দেয়, তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখতে হবে।

কার্ত্তিকেয়। কিন্তু সুররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ ম্লান হ'ল কেন?

বৃহস্পতি। মর্ত্ত্যে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনি আমাকে পীড়িত করচে। আজ আমি দুঃখেরই অভিসারে চলেছি—তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেছে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে—সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এতদিন পরে আজ আমার মনে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। আমি চল্লুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে। প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্ত্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে দাও, আমরা সেই খানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক্।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কার্ত্তিকেয়। বাহির কর, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির কর—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা কর।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ করে জানিয়ে দাও যে স্বর্গ পৃথিবীরই।

কার্ত্তিকেয়। যারা স্বর্গ কামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেচে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ—আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিকে পাবার পথ—

বৃহস্পতি। যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান।

পথিক হে, পথিক হে, ঐ যে চলে, ঐ যে চলে,
সঙ্গী তোমার দলে দলে।
অন্য মনে থাকি কোণে, চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে, পায়ের ধ্বনি আকাশ তলে।
পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে,
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই, তোমার চলা হৃদয় তলে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাটেল-বিল।

——:*:——

পাটেল-বিল সম্বন্ধে যে দেশব্যাপী আন্দোলন উঠেছে, তার ফলে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যে-ক'টি কথা উদয় হয়েছে, সেগুলি পরিষ্কার করে' লেখবার ইচ্ছা হতে এই প্রবন্ধ প্রসূত।

প্রথমেই বলে' রাখি আমি সে বিলের ধারাগুলি চোখে দেখিনি; শুধু কানে শুনে শুনে এইটুকু বুঝেছি যে, সেটি হচ্ছে অসবর্ণ হিন্দু-বিবাহকে আইনসিদ্ধ করবার একটি পাণ্ডুলিপি। তা'তেই যখন এত গোলযোগ উপস্থিত, তখন ইংরাজ-রাজ অসবর্ণ বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলে' আইন জারি করতে উদ্যত হলে না জানি কি হ'ত! অনুজ্ঞা এবং অনুমতির প্রভেদ কি এতই সূক্ষ্ম? বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ত বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণান্তে আইনসঙ্গত করে' গেছেন, কিন্তু তার ফলে হিন্দু-সমাজে ক'টা বিধবা-বিবাহ হয়েছে?—জাতিভেদবুদ্ধি ও পূর্ব্বসংস্কার আমাদের এতই মজ্জাগত যে, বাইরের নিষেধ রহিত হলেও, ভিতরের অপ্রবৃত্তি যে শীঘ্র প্রবৃত্তিতে পরিণত হবে, সে ভয়ও নেই, সে ভরসাও নেই!

তবে যে জনসাধারণে এই অনুমতির প্রস্তাবনায় এত বিচলিত হয়ে পড়েছে, তার কারণ, বিবাহসম্বন্ধই সমাজের মূলভিত্তি, তারই নিয়মে সমাজ "বিধৃতস্তিষ্ঠতি"। তাই বিবাহের প্রচলিত প্রথায় একটুও ঢিলে পড়বার কথা শুনলেই সামাজিক জীবের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল হয়ে ওঠে,—কার্য্যকারণ-জ্ঞান তখন আর ততটা টন্‌টনে থাকে না।

আমার মনে হয় বিবাহসম্বন্ধকে তিন দিক থেকে মিলিয়ে দেখলে

তবে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয়,—ধর্ম্মের দিক, সমাজের দিক এবং আইনের দিক। এই তিন দিক পরস্পরসম্বদ্ধ বলে'ই এ বিষয় সুস্পষ্ট আলোচনা বা ধারণা করা এত শক্ত। তার উপর একটা কবিত্বের দিক আছে, সেটা নাহয় এখন ছেড়েই দিলুম, কারণ হিন্দু-বিবাহে তাকে বড় একটা আমল দেওয়া হয় না। সেকালে স্বয়ম্বরা হত শুনেছি, কিন্তু এখন কবিত্ব বিত্তরাহুগ্রস্ত এবং রুচি শুচিবায়ুগ্রস্ত!

ইংরাজ-রাজ কেবল আইনের দিক থেকেই হিন্দু-বিবাহে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, তা' ভিন্ন আর কোন দিক থেকে তাঁরা এতে লিপ্ত হতে চানও না, পারেনও না। পাটেল-বিলের যখন বিচার হবে, তখন খুব সম্ভব দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক যেদিকে ঝোঁক দেবেন, তাঁরা সেই দিকেই রায় দেবেন। কিন্তু আমাদের ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমান, দেশ-কালপাত্র সবই এই সঙ্গে জড়িত; কাজেই আমরা প্রত্যেকে হয় এর স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ দলে ভর্ত্তি হতে বাধ্য। এবং তা' হতে হলেই আগে উভয় পক্ষ বুঝে দেখা দরকার। যদিও দলাদলিটা প্রায় না-বোঝার দরুণই হয়ে থাকে!

প্রতিপক্ষ বলেন—এ রকম কাজে অনুমতি দেওয়াও অন্যায়। কিন্তু কাজটা ভাল কি মন্দ, সমাজের পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গলজনক, সেই নিয়েই ত সমস্ত তর্ক। এবং এ তর্কের মীমাংসা জাতীয় প্রথা ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি উভয়ের সংযোগ হলে তবে সুসিদ্ধ হবে। অসবর্ণ বিবাহ সেকালের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা জানিনে। অগাধ শাস্ত্রসিন্ধুর অসংখ্য টীকাভাষ্য মন্থন করলে বোধহয় না মেলে হেন মত নেই। তবে গীতায় "বর্ণসঙ্কর''কে মানুষের দুর্দ্দশার চরম সীমা বলে যেরকম নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে, তা'তে অন্ততঃ সে

সময়ে অসবর্ণ বিবাহকে অবাঞ্ছনীয় মনে করত, এটুকু বোঝা যায়। আর সে ভাব আত্মাভিমানী জেতৃজাতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, যেখানে তারা বিজিত দেশজ জাতিকে হেয় মনে করে, এবং নিজেদের আভিজাত্য রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়। শ্বেতব্রাহ্মণ ইংরাজদেরও ত এই মনোভাব; এবং শ্বেতকৃষ্ণের বর্ণসঙ্কর পৃথিবীর কোন সমাজেই সমাদৃত নয়। একদিকে দেখি গীতার এই প্রতিকূলতা, আবার ওদিকে শুনি শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের বিধি, অথচ প্রতিলোম বিবাহের নিষেধ আছে। এই নানা মুনির নানা মতসঙ্কুল শাস্ত্রবিচার ছেড়ে একালে এলে দেখা যায় যে, লোকাচার অসবর্ণ বিবাহের প্রতিকূল; এবং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যে-ভাবে বিধিবদ্ধ, অসবর্ণ বিবাহ একেবারে তার মুলে কুঠারাঘাত করে। কারণ হিন্দুত্বের লক্ষণ আর যাই হোক, জাতিভেদ-প্রথা তার মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন কি, সে প্রথা লোপ পেলে—হিন্দুধর্ম্মের না হোক্—হিন্দুসমাজ বা হিঁদুয়ানীর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে কিনা সন্দেহ;—হিন্দুর ধর্ম্মে কর্ম্মে, আচারে অনুষ্ঠানে, মতে বিশ্বাসে জাতিভেদ এম্‌নি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যাঁরা বাহ্যিক বা আন্তরিকভাবে হিন্দু-সমাজভুক্ত থাকতে চান, তাঁরা যে প্রাণপণে হিঁদুয়ানীর এই শেষ খোঁটাটিকে ধরে' থাকতে চাবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। হিন্দুর ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, তার গৌরব অগৌরব সবই ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে লিপ্ত। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সবই ত শুনি ব্রাহ্মণের জন্য; অব্রাহ্মণে কি করে না করে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। জাতিভেদ যদি সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হয় ত ব্রাহ্মণত্বও লোপ পাবে। ব্রাহ্মণের প্রায় সব বিশেষত্ব নষ্ট হয়েও যে আজও হিন্দুসমাজ টিঁকে আছে, সে কেবল এই জাতিভেদ-প্রথার গুণে বা

দোষে। সুতরাং যাঁরা সনাতন হিন্দু-সমাজরক্ষার পক্ষপাতী, তাঁরা যে পাটেল-বিলের বিপক্ষ হবেন, সেত ধরা কথা।

ওদিকে যাঁরা সম্পূর্ণ হিন্দু-সমাজনিরপেক্ষ, তাঁদের পাটেল-বিলের পক্ষে হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। কারণ তাঁরা Act III of 1872 অনুসারে নিজেদের "অহিন্দু" বলে' অসবর্ণ বিবাহ স্বচ্ছন্দে করতে পারেন এবং করে'ও থাকেন। বরং এই কারণে একটু বিপক্ষ হতে পারেন যে, হিন্দুসমাজে থেকেই যদি অসবর্ণ বিবাহ করা যায় ত লোকের অহিন্দু হবার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে!

বাকী রইল সেই তৃতীয় দল, যাঁরা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সব আইনকানুনে আবদ্ধ থাকতে চান না, অথচ নিজেদের "অহিন্দু" বলতেও আপত্তি করেন। কারণ বলা বাহুল্য যে "হিন্দু" বলতে ধর্ম্ম, সমাজ এবং জাতি, এই সবই বোঝায়; এবং যাঁরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ আংশিকভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তাঁরাও ঐতিহাসিক হিন্দুজাতিভুক্ত নন বলতে নিতান্তই নারাজ। যতই স্বাধীনচেতা হও না কেন, মানুষ একলা নিজের পদযুগে মাত্র ভর করে' দাঁড়াতে পারে না; অথবা তার শরীরের পক্ষে সেই জঙ্গম খুঁটিদ্বয় যথেষ্ট নির্ভর হলেও, তার সর্ব্বভুক মনের পক্ষে ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানব্যাপী কাল এবং বিশ্বব্যাপী দেশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে নিজেকে অঙ্গীভূত বোধ করা বিশেষ আবশ্যক। আমার নিজের জানতঃ দু'টি তিনটি সম্বন্ধ কেবল এই "অহিন্দু" বলবার আপত্তির দরুণ ভেঙ্গে গেছে। প্রথম যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্ম বিবাহ-আইন পাশ করাতে চেয়েছিলেন, তখন বাধা না দিলে অন্ততঃ ব্রাহ্মদের পক্ষে এই পথ সুগম হয়ে যেত; কিন্তু তখনো

বোধহয় সময় হয় নি। তার পরে মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসুরও এই প্রকার আইন পাশ করাবার চেষ্টা বিফল হয়েছে। দেখা যাক্ এবার পাটেল মহোদয়ের এবং আমাদের অদৃষ্টে কি আছে। কাল পূর্ণ হলে অসাধ্যও সাধ্য হয়।

এই আইন পাশ হ'লে বলছিলুম সেই সঙ্কীর্ণ দলেরই সুবিধে হবে, যাঁরা "হিঁদু" না হয়েও হিন্দু থাকতে চান্। আদি ব্রাহ্মসমাজ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত হিন্দুসমাজের সঙ্গে প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধেই তাঁদের মতদ্বৈধ, আর সব বিষয়ে তাঁরা মোটামুটি একমত। যতদিন তাঁরা আচারে ব্যবহারে তাৎকালিক হিন্দুসমাজের বেশি বিরুদ্ধাচরণ না করবেন, ততদিন হিন্দুসমাজ তাঁদের বহিষ্কৃত করবার জন্য বেশি ব্যস্ত হবে না বোধহয়; কারণ হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক যে না পাওয়া যায়, তা' নয়। তাই এই মতভেদ কার্য্যতঃ তত পার্থক্য ঘটায় নি; একই পরিবারের এক মেয়ের হয়ত হিন্দুমতে, আর এক মেয়ের আদিব্রাহ্ম মতে বিয়ে হয়েছে, এমন দেখা গেছে। শেষোক্ত বিবাহস্থলে শালগ্রাম সাক্ষী থাকেন না এবং হোম বাদ দেওয়া হয়, তা' ভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই; তাই মিলেমিশে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। আদিসমাজ যেমন এই সাকার-নিরাকার পূজা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছেন, অথচ হিন্দু-জাতিভুক্ত থাকতে চেয়েছেন; পাটেল-পন্থারাও তেমনি জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেও হিন্দু-জাতিভুক্ত থাকতে চান। দুই দলের মিল এই যে, দু'জনেই হিন্দু-জাতিভুক্ত থাকতে চান; তফাৎ-এর মধ্যে দুটি ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করতে চান। এই মিলটুকুর জন্য তাঁরা

দু'জনেই সাধারণ সমাজে মিশে যেতে অক্ষম। তবে যদি জাতিভেদ প্রথার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজ সত্যসত্যই জন্মান্তরগ্রহণ করে, তাহলে আদি ও সাধারণে, পাটেল এবং অপাটেলে ক্রমশঃ কিছু প্রভেদ থাকবে কিনা, তা' অনুবীক্ষণসাপেক্ষ। দুই দলের মধ্যে আর একটি মিল এই যে, প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে তাঁরা অপ্রচলিত প্রাচীন হিন্দুত্বের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্ততঃ আদি সমাজ ত অতীতে ঠেলে গিয়ে উপনিষদ পর্য্যন্ত পৌঁচেছেন; তবে পাটেল পন্থীগণ মনুর দোহাই দিচ্ছেন কি না, ঠিক বলতে পারি নে।

দ্বন্দ্বটা কি শেষে হিন্দুজাতি এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়? আমি উচ্চৈঃস্বরে বলতে পারি যে "আমি হিন্দু"। ইংরাজ-রাজও তাঁর আইনের সীমানা পর্য্যন্ত আমার কথার সমর্থন করতে পারেন, এবং পেয়াদার বডিগার্ড দিয়ে আমার নাতির বিষয়ের অংশ পাহারা দিতে পারেন। কিন্তু তার বাইরে যে বিস্তৃত হিন্দুসমাজ পড়ে' আছে—যেখানে ইংরাজের প্রবেশ নিষেধ, যেখানে আমার আত্মীয়তা, যেখানে আমার কুটুম্বিতা, যেখানে আমার "শতসহস্র মঙ্গল বন্ধন" ও সুখদুঃখ জড়িত; সেখানকার সকলে যদি আমাদের নব-দম্পতিকে আদর করে' ঘরে তুলে না নেয়, হাসিমুখে বরণ না করে, —তাহলে কি শুষ্ক বিলের খড়খড়ানিতে বিশেষ কোন সান্ত্বনা হবে?—সমাজের হিসেবে ত বল্লুম আদিসমাজ একরকম তরে' গেছে; আইন হিসেবেও বোধহয় তরে' যাবে, যদি কখনো আদালতে বিচার হয়; কারণ ইংরাজ-আদালত বিবাহ অসিদ্ধ করতে কুণ্ঠিত। তবে তার জাত-ভাই পাটেল-বিল আরও দুর্গম পথের পথিক। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, আইন হিসেবে যদিও পাটেল-বিল তরে' যায়,

তবু সামাজিক হিসেবে যতদিন না তরবে, তা'কে সম্মানসহ উত্তীর্ণ বলতে পারা যাবে না। বিবাহের ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয় হওয়া চাই, এই বিল-অনুসারে বিবাহিত অসবর্ণ দম্পতিকে হিন্দুসমাজের আপনার লোক বলে' মেনে নেওয়া চাই, তবেই এই বিল সম্পূর্ণ সার্থক হবে। অবশ্য প্রথম থেকেই সে আশা করা যায় না, এবং সমাজের ভ্রূকুটির ভয়ে আমি কাউকে অসবর্ণ হিন্দু-বিবাহ থেকে নিরস্ত হতেও বলিনে। বোম্বাই প্রদেশে দেখেছি বিধবা-বিবাহকারীদের একরকম মহাপুরুষ বলে' লোকে গণ্য করে, এবং সকলের সঙ্গে সেই হিসেবে আলাপ করিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম পাটেল-বিবাহিতরাও বোধহয় এদেশে স্বনামধন্য হবেন। ক্রমে ক্রমে এইরকম বিয়ে লোকের সয়ে আসবে, তার পরে হিন্দুসমাজেও গ্রাহ্য হয়ে যাবে; তখন আর তা করায় কোন বাহাদুরী থাকবে না। ইতিমধ্যে যাঁরা নাম করতে চান, তাঁরা অগ্রসর হউন ;—অবশ্য আগে বিলটা পাস হয়ে যাক্ !

কে না জানে যে, সমাজ গঠন ও রক্ষার জন্য নিয়ম পরমাবশ্যক, এবং নিয়ম মানেই বাধা। শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য যে-পরিমাণ নিয়ম আবশ্যক, তা' কেউ ভেঙ্গে দিতে বলছে না। বলছি শুধু "জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, আচারে বিচারে বাধা"র লৌহ-কারাগারমুক্ত করে' হিন্দু-সমাজকে সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ফিরিয়ে দিতে, তাকে পৈতৃক সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, অহল্যাপাষাণীতে প্রাণসঞ্চার করতে। কিন্তু কোথায় সে দুর্ব্বাদলশ্যাম মোক্ষদ শ্রীরাম ?

কলিযুগে যে তিনি পাটেলরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাও বলিনে ; এবং এই বিল পাস হলেই যে আমরা এক লম্ফে উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ় হব, তাও মনে করিনে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত-

লক্ষ্মীর যে শতদলপদ্মাসীনা মহিমাময়ী মূর্ত্তি কল্পনাচক্ষে দেখতে পাই, এই নব-বিবাহপদ্ধতি তার একটি দল মাত্র। কিন্তু একটি একটি করে'ই দল খুলবে, দুইটি তিনটি করে'ই ক্রমে শত পূর্ণ হবে ; তাই একটির "পথ চাওয়াতেই আনন্দ"।

একটি দলে যেমন পদ্ম হয় না, তেমনি একটি লোকেও সমাজ হয় না, সেই ত মুস্কিল। একজনের মতে নতুন সমাজ গড়তে পারে বটে, যদি সে একাই একশো হয়। একে একে এমন অনেক মহাপুরুষই আমাদের পাশমুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এক একটি গ্রন্থি খুলেও দিয়ে গেছেন ; তবে এখনো অনেক বাকি। এ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই ধর্ম্মের নামে এই অসাধ্যসাধন করেছেন ; কিন্তু যেরকম দিনকাল পড়েছে, তাতে ভবিষ্যৎ-চোরা সে কাহিনী আর শুনবে বলে' ভরসা হয় না। এখন দেশ কতকটা সেই স্থান অধিকার করেছে ; 'বন্দে মাতরং' মন্ত্রে মরাগাঙ্গেও বান এসেছে। আগে নিজের আত্মার মুক্তির জন্য যে উৎসাহের প্রয়োগ হ'ত, তার কিয়ৎপরিমাণও দেশাত্মবোধে নিয়োজিত হলে, কালে দেশোদ্ধার হ'তে পারে। বাইরের চাপে, বিদেশের শিক্ষায় আমাদের কতকগুলো বাধা ভেঙ্গেছে, কতকপরিমাণ চৈতন্য জন্মেছে—এক হবার, স্বাধীন হবার, উন্নত হবার দিকে একটা তাড়না ও প্রেরণা এসেছে। বাকিটা কি নিজের ভিতর থেকে হবে না ? হিন্দুসমাজ কি বুঝবে না যে, ভেদের কাল গিয়েছে, সাম্যের দিন এসেছে ; কেউ আর অধীন থাকতে চায় না, কারণ "সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে"। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন রাজার কাছ থেকে স্বরাজ চাচ্ছি, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও, যে এতদিন মূক ছিল সে ভাষা শিখছে, যে বধির ছিল সে শুনতে পাচ্ছে, যে অন্ধ ছিল সে আলো দেখছে, যে পায়ের তলায়

পড়ে' ছিল সে উঠে বসতে চাচ্ছে; এই বেলা যদি উচ্চ জাতি পুরাতন কৃত্রিম ব্যবধান সরিয়ে ফেলে আপনি নেমে আসে ও সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে যায়, সাধারণের হিতের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মবিসর্জ্জন করে, অসার পদমান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ত ভাল,—তাদেরই পক্ষে ভাল; নইলে অচিরে তাদের মান ধুলোয় লুটবে, সেই সঙ্গে প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। এখনই ত তাই ঘটছে; এখনই ত হিন্দুসমাজ মৃতপ্রায়। কেবল বহিষ্করণ, কেবল তিরস্করণ, কেবল জাতিঃপাত ও দলাদলি করে' ভাল লোক, শিক্ষিত লোক, কৃতী লোককে বর্জ্জন করতে থাকলে, ক'দিন হিন্দুসমাজ টিঁকবে, কা'কে নিয়ে দশজনের মধ্যে একজন হবে?—সঙ্কীর্ণতা দূর করুক, কড়াক্কড় নিয়ম শিথিল করুক; কিসে হিন্দুয়ানীর বিশেষত্ব এবং মহত্ব তাই বিচারপূর্ব্বক রক্ষা করুক, যাতে তার ক্ষয়ক্ষতি, যা' কালের অনুপযোগী, উন্নতির বিরোধী, তাই বর্জ্জন করুক;—তবে ত জাত গেলেও জাতিরক্ষা হবে।

প্রতিপক্ষের প্রধান যুক্তির মধ্যে একটি এই যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করেন নি, তার কারণ তাঁরা জানতেন যে, ভিন্নজাতির বিবাহ সন্তানের অবনতির কারণ, এবং এ মত আজকালকারও বিজ্ঞানসম্মত। এ বিষয় বিশেষজ্ঞই মত দিতে সমর্থ, তবে বাজে লোকের সহজ বুদ্ধিতে এই উত্তর প্রথমেই মনে আসে যে, যখন বর্ণে বর্ণে প্রকৃত প্রভেদ ছিল, তখন একথা খাটলেও খাটতে পারত। কিন্তু একালে কুলজী ছাড়া যখন অধিকাংশ লোকেরই জাতিবাচক কোন প্রমাণ বা লক্ষণ নেই বল্লেই হয়, তখন এ কৃত্রিম প্রভেদ বজায় রাখবার বৃথা চেষ্টায় কেন স্বাভাবিক ঐক্য নষ্ট করি, এবং অকারণ অহঙ্কারের প্রশ্রয় দিই? বৈদ্যজাতি সঙ্কীর্ণ বর্ণ বলে'

কি কোন অংশে অপর উচ্চ জাতির চেয়ে হীন ? হতে পারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জাতিবৈষম্য বেশি প্রত্যক্ষ, কিন্তু বাঙলা দেশের সামান্য অভিজ্ঞতাই আমার সম্বল। অনেক ব্রাহ্মণ যেখানে বিদ্যাবিনয়-শূন্য, অনেক ক্ষত্রিয় যেখানে বলবীর্য্যহীন, অনেক বৈশ্য যেখানে বাণিজ্য-ব্যবসানভিজ্ঞ, এবং অনেক শূদ্র যেখানে উচ্চতর কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়,—সে অবস্থায় আর প্রাচীন ব্যবধানকে ঠেকো দিয়ে রাখবার কি কোন আবশ্যক বা অর্থ আছে ?—যেমন সগোত্র বিবাহ যেকালে নিষিদ্ধ হয়েছিল, তখন হয়ত এক পরিবারভুক্ত লোকের বিবাহ নিবারণের স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমান ছিল ; কিন্তু একালে এই অভাবপীড়িত অন্ন-চিন্তাক্লিষ্ট কন্যাদায়গ্রস্ত সমাজে কি তার মত নিরর্থক নির্ব্বোধ নিয়ম আর দুটি আছে ? অথচ এই কাল্পনিক অনুচিত বাধা দূর করবার জন্য আমরা কেউ বদ্ধপরিকর হইনে। আমার ত মনে হয় অসবর্ণ বিবাহের ঢের আগে সগোত্র বিবাহপ্রচলনের চেষ্টা করা উচিত। মৃত্যুর আগে কি আমরা এই সব "বাসাংসি জীর্ণানি" পরিত্যাগ করব না ?

আর একটি যুক্তি এই যে, যাঁরা অসবর্ণ বিবাহ করবেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া বড় শক্ত হবে। তা ত হবেই, সে ত তাঁরা জেনে বুঝেই করবেন। যে-কোন ব্যক্তি কোন নতুন হিতকর্ম্মে অগ্র-গামী হবেন, সমাজের কোন উন্নতির পথপ্রদর্শক হবেন, তাঁর কপালে ত দুঃখ আছেই। তবে অগ্রসর হন কেন ?—সেই সঙ্গে মহত্বের রাজ-টীকা এবং বীরত্বের জয়মালা জড়িত আছে বলে [illegible] যারা আসবে তাদের পথ সুগম হবে বলে'। বদলের মুখে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, সবই হবে ; কিন্তু [illegible] জায়গায় বসে' থাকা যায় না, তা' ভাবতে [illegible]

হয় না। ভাবতে শুধু হবে যে, এ পথে চলা উচিত কিনা, দেশের ও দশের পক্ষে ভাল কিনা। তারপরে কালে বিশৃঙ্খলার জায়গায় সুশৃঙ্খলা, অসুবিধার স্থানে সুবিধা আপনি প্রকাশ পাবে। নতুন ব্রাহ্মদের কি কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল ?—কিন্তু এখন ত হিন্দু ও ব্রাহ্ম অক্লেশে পাশাপাশি ঘর করছে।

আর একটি যুক্তি এই যে, এ বিল পাস হলে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে মনে করে' দেশের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হবে, এবং একজন দেশীলোক এই বিলের জনয়িতা মনে করে' স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী হবে। কিন্তু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ত করা হচ্ছে না। জোর করে' দেশের লোককে কিছু করতে ত বলা হচ্ছে না। শুনতে পাই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আইনের মূলে একটি প্রভেদ আছে ; সেটি হচ্ছে এই যে, পশ্চিমদেশে আইন গড়া রাজার কার্য্যের মধ্যে গণ্য, কিন্তু পূর্ব্বদেশে আইন গড়া ছিল প্রজার কার্য্যের মধ্যে গণ্য। এখন অবশ্য সে স্বাভাবিক ক্ষমতা আমাদের গেছে। ইংরাজ-রাজ এদেশে এসে কতকগুলি বিভাগে নিজের আইন জারি করতে বাধ্য হয়েছেন, নাহলে হয়ত শাসনতন্ত্রের ঐক্যরক্ষা দুঃসাধ্য হত। কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আইনে তাঁরা পারৎপক্ষে হস্তক্ষেপ করেন নি। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ যদি তাঁদের আইনে অবৈধ বলে' ধার্য্য হয়ে থাকে (কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি তাই হয়েছে) তাহলে পুনশ্চ তাঁদেরই আইন দ্বারা বৈধ করে' নেওয়া ভিন্ন উপায় কি ? যিনি একবার 'না' বলেছেন, তিনিই আবার 'হাঁ' বলবেন বৈত নয় !

আমাদের সমাজের যদি নিজের অবস্থা বুঝে নিজে ব্যবস্থা করবার সামর্থ্যই থাকবে, তবে আমরা ব্যবস্থাপত্রের জন্য রাজদ্বারে হাত পাতে

যাব কেন ? কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের নেতা কই, ব্যবস্থাপক সভা কই ? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বাভাবিক নেতা, গুরু ও চালক ; কিন্তু এখন ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সভা করেন শুধু অন্ধভাবে সমাজবন্ধন কস্‌বার জন্য, এবং অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পয়সার লোভে সবরকম ব্যবস্থাই দিতে প্রস্তুত। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের মত আমরা জন্মান্ধ নই, কিন্তু গান্ধারীর মত স্বেচ্ছান্ধ হওয়াই মনে করি পরম পুরুষার্থ। তা ছাড়া হিন্দুসমাজ এত বিপুল, জটিল ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, কোন এক দলের পক্ষে তাকে সমগ্রভাবে নড়ানোর চেষ্টা বৃথা শক্তির অপব্যয়। সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে যেমন এক মহা রাষ্ট্র হওয়া শক্ত, তেমনি সমগ্র হিন্দুসমাজকে একছত্রের অধীন্ করাও দুষ্কর ; স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেই দেশ এবং সমাজকে বিভক্ত করতে হবে, তবে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র বা United States হলেই ভাল। খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজেদের ভিতর থেকে নিজের উন্নতিচেষ্টা করাই প্রশস্ত, এবং কার্য্যতও তাই হচ্ছে বলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দুসমাজ এখনো মরে নি। ব্রাহ্মসমাজের উত্থান, একই জাতের ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের প্রচলন, নীচ জাতের অবমাননাবোধ ও উন্নতিচেষ্টা, বিবাহপণসম্বন্ধে আন্দোলন প্রভৃতি জীবনের লক্ষণ আশাজনক। জীবনী শক্তির প্রধান লক্ষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থানুকূল হবার চেষ্টাজনিত পরিবর্ত্তন। আমাদের যুবকবৃন্দই আমাদের ভবিষ্যতের প্রধান আশা, বল ও ভরসা। তাঁরা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে "standing with reluctant feet" ; বিদ্যালয়ের বিদেশী শিক্ষার স্বাধীনতার মন্ত্রের রেশ এখনো তাঁদের কানে বাজছে, জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য শরীরমন ছট্‌ফট্ করছে ;—কিন্তু কোন্‌দিকে যাবেন, কোন্ সাধনায় আপনার তরুণ শক্তি

নিয়োজিত করবেন ? চারদিকে বাধা, চারদিকে নিষেধ, চারদিকে জীবনযৌবনক্ষয়কারী চাপ। রাজনীতির উচ্ছ্বাস রাজদ্বারে পরাহত, সমাজ-সংস্কারের উদ্যম পরিবারে প্রতিহত, শিক্ষার উৎসাহ অন্নচেষ্টায় পরাভূত, জীবনের আনন্দ অকালচিন্তায় পরাস্ত। কিন্তু এই বিঘ্ন অতি-ক্রম করে'ই চলতে হবে,—এই তাঁদের অদৃষ্টলিপি, এই তাঁদের সাধনা। এই চাপ সরাতে হবে, এই বাধা ঠেলতে হবে, এই নিষেধ অগ্রাহ্য করতে হবে; অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যরূপ যে দুই দৈত্য আমাদের সোণার সংসার ছারখার করে' দিচ্ছে, তাদের দেশছাড়া করতে হবে। অথচ সে কাজ করতে হবে মুখের জোরে নয়, মনের জোরে; গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধির জোরে; ভিক্ষার জোরে নয়, শিক্ষার জোরে। শুধু হাত তুলে মত দেখালে চলবে না, সেই হাত কাজে লাগাতে হবে। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়, সংস্কার মানে বিকার নয়, শিক্ষা মানে পাখীপড়া নয়, এ কথা তাঁদের জীবনে প্রমাণ করতে হবে, তবে ত লোকে মানবে। "মোর জীবনে তোমার পরিচয়।" ভাব ও কাজের মধ্যে সেতু-বন্ধন,—এই হোক তাঁদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য। কাজ কঠিন, তবে অসাধ্য নয়,—যদি ব্রতের মত গ্রহণ করেন, যদি বীরের মত উদ্‌যাপন করেন। তার পরে যথাকালে, শুভদিনে শুভক্ষণে যখন তাঁদের শুভবিবাহ হবে, তখন তাঁরা যেন যথার্থ সহধর্ম্মিণী লাভ করেন, এই আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু সেজন্য যে তাঁর অসবর্ণিনী হওয়া একান্ত আবশ্যক, এমন কোন কথা নেই!—

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

একটা অসম্ভব গল্প।

—:*:—

চার বছরের বিয়ে-করা স্ত্রী রেবামিনি যখন আঠার বছর বয়সে সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ মারা গেল, তখন আমার মনে হ'ল যেন আমার হৃদয়-বীণায় যে-কটা তার ছিল, সে-কটা একেবারে পট্ পট্ করে' ছিঁড়ে গেল। দুঃখ অনুভব করবার সুখটাও আমার আর রইল না।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় শ্মশান থেকে ফিরে এলুম। মনে হ'ল কে আমার হৃদয়-বীণায় তারগুলো আবার চড়িয়ে দিয়েছে। আর সেখানে কে যেন সবগুলো তারে পূরবীর সুর বসিয়ে একটা দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে বিশাল ক্রন্দনে সকল বিশ্ব সকল চরাচর ডুবিয়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যার পাতলা আঁধার বিষাদ মেখে যেন বাদুড়ের পাখার মতো হ'য়ে উঠেছে। বাতাসে বাতাসে একটা ক্রন্দনের রোল ঘুরে ঘুরে আশ্রয়ের নিস্ফল সন্ধানে ফিরছে। এ জগতে তার কেউ নেই, কিছু নেই—আছে যেন একটা স্বপ্নের স্মৃতি; কিন্তু সে স্বপ্ন যেন আজ উধাও হ'য়ে চলে' গেছে—সৃষ্টির একান্ত বাইরে।

শোবার ঘরে ঢুকে' দরজা বন্ধ করে' দিলুম। এই সেই শোবার ঘর—এ আজ কত মিথ্যা। কিম্বা মিথ্যাও ত নয়, মিথ্যা হ'লেও ত বেঁচে যেতুম। এ যে সত্য মিথ্যার সেই মাঝখানটাতে, যেখানে সত্য আপনার অধিকার ছাড়তে চায় নি—আবার মিথ্যাও আপনার পূর্ণ দখল খুঁজে পায় না।

টেবিলের উপরে আলো জ্বলছিল। আল্‌নাতে নিত্য ব্যবহারের কোঁচান দুখানা সাড়ী শুঁড়ে শুঁড়ে জড়িয়ে ঝুলছে। টেবিলের উপরে "নৌকাডুবি" বইখানা যতদূর পড়া হয়েছে সেই খানটা একটা চুলের কাঁটা দিয়ে চিহ্নিত হ'য়ে নিতান্ত পরিত্যক্ত ভাবে পড়ে' আছে। জড়-বস্তুরও কি অনুভব করবার ক্ষমতা আছে? আমার ত সেদিন ঠিক সেই রকমই মনে হ'ল। সিঁদূরের কৌটাটি অর্দ্ধেক খোলা অবস্থায় একটা ব্র্যাকেটের উপরে পড়ে' রয়েছে। আমার অন্তর থেকে কণ্ঠের মধ্যে কি যেন একটা বড় ড্যালা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইচে। আমি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে' বিছানায় মুখ লুকিয়ে চার বছরের শিশুর মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলুম।

কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, যে-ক্ষতি পূরণ হবার কোন দিনই সম্ভাবনা নেই, সে ক্ষতিকে ধরে' মানুষ চিরকাল থাকে না। সে ক্ষতির যে দুঃখ, সে-দুঃখের বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর থেকে একটা সংগ্রাম আপনা হ'তেই আরম্ভ হ'য়ে যায়। তাই আমারও অন্তরে যে দুঃখ একদিন অতি স্পষ্ট ছিল অতি সত্য ছিল, তা কালের অব্যর্থ প্রলেপে ধীরে ধীরে আব্‌ছা হ'য়ে উঠতে লাগল। তারপর এমন একদিন এলো যখন দেখলুম যে রেবামিনির স্মৃতি আছে কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। আসলে যা রইল তা হচ্ছে অতীতকে নিয়ে একটা সেন্‌টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌।

আপনারা হয়ত বলবেন, যে-দুঃখ যে-ক্ষতি জীবনে এমন স্পষ্টতম ছিল, সে ক্ষতি সে দুঃখের এমন পরিণাম মানুষের পক্ষে লজ্জা জনক। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনাদের উপন্যাস বলতে বসি নি—যা সত্যিই ঘটেছে তাই বলছি।

সে যা হোক্, রেবামিনি মারা যাওয়ার মাস আষ্টেক পর

যখন মা আমায় আবার বিয়ে করবার জন্যে ধরে' বসলেন, সে সময়ে আমার অন্তরে বিয়ে করা সম্বন্ধে এমন একটা জোরের "না" ছিল না, যা সে-অনুরোধের বিরুদ্ধে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য আমার বিয়ে করবার আগ্রহ যে একটুও ছিল, তা নয়। তবে আমি বিয়ে করলে মা যে সুখী হবেন এটা জানতুম। সুতরাং যেটার সম্বন্ধে আমার নিজের মনে একটা প্রবল "না" ছিল না, অথচ যেটা করলে মা সুখী হবেন—মার সে অনুরোধে আমি "হাঁ" "না" কিছুই করলুম না। মা-ও 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ধরে নিয়ে আমার দ্বিতীয় গৃহিণীর সন্ধানে লাগলেন। বাঙলা দেশে আর যারই অভাব হোক্ না কেন, আঠার থেকে আশী বছর পর্য্যন্ত যে-কেউ বিয়ে করতে চাক্ না কেন, কারোরই মেয়ের অভাব হয় না। আর বিশেষত আমার বয়েস ত তখন সবে আটাশ। ফলে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চঞ্চলার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়-বার বিয়ে হ'য়ে গেল।

বাঙালীর সমাজে পুরুষ নারীর মধ্যে এমন একটা কঠিন যবনিকার ব্যবধান আছে, যাতে করে' বাঙালী তরুণ-তরুণী পরস্পরের কাছে যেমন রহস্যময় ও রহস্যময়ী, পৃথিবীর আর কোন দেশে তেমন নয়। বাঙলার নব-দম্পতীর মধ্যে এই যবনিকাটি কতকটা অপসারিত হয়—শুভ-দৃষ্টির সময়ে নয়, বাসর ঘরে নয়, বিয়ের সময়কার শত কোলা-হলের মধ্যে নয়—সেটা হয় তাদের প্রথম রজনীর নিরালা মিলনে—প্রথম রজনীর সম্ভাষণে। সেদিন দূর কাছে আসে, রহস্য উন্মুক্ত হ'য়ে দৃষ্টির অতি নিকটে আসে—যা এতদিন চোখে পর্য্যন্ত দেখা যায় নি, তা একেবারে স্পর্শের সামায় এসে পড়ে। সেই জন্যে এই রজনীটি বাঙালী তরুণ-তরুণীর পক্ষে আশায় আকাঙ্ক্ষায় কৌতুহলে একেবারে পরিপূর্ণ।

আমার পুরুষের প্রাণ নারীর জন্যে অবশ্য তেমন সজাগ ছিল না। কেননা সে প্রাণের তন্ত্রী নারীর স্পর্শে একবার বেজে উঠেছিল, সেখানে আর সেই একই কারণে নতুন উন্মাদনা স্থষ্টির সম্ভব ছিল না। কারণ, মানুষের জীবনে একই বিষয়ের অনুভব দ্বিতীয়বার তেমন তীব্র ও তেমন তীক্ষ্ণ হয় না। অজ্ঞাত যা, অপূর্ব্ব যা, তার সম্মোহন যতটা, জ্ঞাত যা দখলে এসেছে একবার যা জেনেছি, তার মাদকতা, ততটা নয়।

কিন্তু তাই বলে' ঐ যে একটি জীব যার সঙ্গে আমার চির-জীবনের সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে যে আমার কোনই কৌতূহল ছিল না, এটা যদি আপনারা মনে করেন, তবে আপনাদের পক্ষে মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিকেই অস্বীকার করা হবে। তাই সেদিন যখন রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে' পান চিবুতে চিবুতে শোবার ঘরে একখানা ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে একখানা বাঙলা মাসিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার গালাগালির বহরটা একবার নির্ণয় করতে ব্যাপৃত ছিলুম, তখন যখন বাহিরের বারান্দা থেকে মলের একটা সলজ্জ টিনি টিনি শব্দ আমার কানে এসে বাজল, তখন আমার মনটা "মোহমুদ্গরের" শ্লোক আওড়াবার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠল না। এমনি সময়ে এমনি অবস্থায় ওমনি মলের শব্দ আরও একদিন আমার শোবার ঘরের সামনে অমনি সলজ্জ হ'য়েই বেজেছিল; কিন্তু সেদিন ওই শব্দ শুনে আমার বুকের বাঁ পাশটা একেবারে অচেতন ছিল না, সেদিন ঐ মলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে একটা নূতন জগতের রুদ্ধ কবাট অর্গলমুক্ত হবার আয়োজন করছিল। কিন্তু আজ আমার ও-জগতের সকল গানই শোনা হয়ে গেছে, আজ

আবার নূতন একজন, যিনি গীত বহন করে' আমার হৃদয়ের দ্বারে আসছেন, জানি তাঁর সে গীতের সঙ্গে আমার সে শোনা গানের কোনই প্রভেদ থাকবে না—শব্দেরও নয়, অর্থেরও নয়, সুরেরও নয়—যদি কিছু প্রভেদ থাকে ত, সে একমাত্র তানের।

মলের শব্দ ধীরে ধীরে আমার শয়ন-কক্ষের দরজার পাশে এসে থামল, সঙ্গে সঙ্গে একটা সুগন্ধি কেশ-তৈলের মৃদু স্নিগ্ধ ও মিষ্ট গন্ধ আমার ঘরটার ভিতরে চারিয়ে গেল, আমার নির্জ্জীব ঘরটা যেন জেগে উঠল, আমিও সজাগ হয়ে ঈজি চেয়ারের উপরে উঠে বসলুম।

ঘরের দরজার পাশে মলের শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা আরম্ভ হ'য়ে গেল। বুঝলুম যে নববধূ একা আসেন নি। পরক্ষণে চঞ্চলাকে আমার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আমার ছোট বোন স্বর্ণ দুষ্টোমির হাসি হেসে বললে—"দাদা, এই রইল তোমার বউ, বুঝে পড়ে' নাও, যে লজ্জা মা গো মা!" সঙ্গে সঙ্গে আমার দরজাটাও বাহির থেকে সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল।

চঞ্চলার প্রতি আমার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ হবামাত্র আমার বুকের মধ্যে সজোরে কি একটা টক্ করে' উঠল। একটা আন্‌কোরা স্প্রিংকে দাবিয়ে রেখে চট্ করে' ছেড়ে দিলে সেটা যেমন লাফিয়ে ওঠে তেমনি করে' আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলুম। কে ও? কে ও? চঞ্চলা? না—না—ও তো রেবামিনি! এমনি প্রায় পাঁচ বছর আগে অমনি একখানি গোলাপী রঙের সাড়ী পরে' অমনি অবগুণ্ঠন টেনে অমনি ভঙ্গীতে অমনি করে' আমার শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। চঞ্চলা? না—না—ও যে একেবারে হুবহু রেবামিনি—আমারই মিনি। আমি দৌড়ে গিয়ে মিনিকে বুকে

তুলে নিলুম, তাকে বুকে করে' আলোর কাছে নিয়ে এলুম, একটানে মাথার ঘোম্‌টা ফেলে দিলুম, তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, না না, এ মিনি নয়, এ আর কেউ, আমি পাগলের মতো তৎক্ষণাৎ তাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দিলুম, এমনি করে' তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিলুম যে, চঞ্চলা তাল সাম্‌লাতে না পেরে একেবারে সজোরে টেবিলের উপরে পড়ে' গেল, সঙ্গে সঙ্গে আলোটা উল্‌টে পড়ে' দপ্‌ করে' নিভে গেল—আমি বাগানের দিককার দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে বাগানের একটা পাথরের বেঞ্চির উপরে বসে' পড়লুম। আমার ভিতরে এখন আগুন ছুটছে, শরীরের উপরে ঘাম ছুটছে। আমি তখন কে? শ্রীরামপুরের নবীন জমিদার শ্রীবিভূতিরঞ্জন রায়? না—আমি তখন একজন বদ্ধ পাগল, আমার আসল জায়গা হচ্ছে পাগ্‌লা-গারদে।

কেমন করে' কোথায় দিয়ে রাত কেটে গেল! যখন বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দেখলুম যে আমি তেমনি বেঞ্চির উপরে বসে' আছি, আর পূব আকাশে অন্ধকারের বুক চিরে আলো ফুটেছে। ভোরের হাওয়া বইতে সুরু করল, তার স্পর্শে আমার মাতাল মন কতকটা তাজা হ'য়ে উঠল। পূর্ব্বাকাশ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল। দিনের স্পষ্টতার মধ্যে রাত্রির ঘটনাটাকে একটা অতিদূর দুঃস্বপ্নের মতো প্রতীয়মান হ'তে লাগল, যেন সেটা আরব্য-উপন্যাসের একটা ছেঁড়া পাতা কোন ক্রমে উড়ে এসে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু আরব্য-উপন্যাসের ছেঁড়া পাতাই হোক্ আর দুঃস্বপ্নই হোক্, সে-রাত্রির কোন ঘটনা যে আমার মনের উপরে কোনই ছাপ রেখে

গেল না তা নয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম যে, মানুষের প্রতি-মুহুর্ত্তে যা তার স্পস্ট, সেইটেই তার মিথ্যা। মানুষের মগ্ন-চৈতন্যের যে সত্য সে সত্য তার প্রবুদ্ধ চৈতন্যের সহস্র চাঞ্চল্যের কাছে প্রতি নিমেষেই হার মানছে। কিন্তু যখন একটা কিছু ইঙ্গিতে একটা কিছু ইসারায় একটা কিছুকে নিমিত্ত করে' সেই মগ্ন-চৈতন্যের সত্য বাইরের মনে বেরিয়ে আসে তখন প্রবুদ্ধ চৈতন্যের হাজার চাঞ্চল্য পালাবার পথ পায় না। আমার সেদিন মনের পাতায় যে-একটা গভীর দাগ পড়েছিল এ দাগ আগে থাকলে মা আমার কিছুতেই দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে পারতেন না—এটা ঠিক অনুভব করলুম।

তার পরদিন রাত্রে যখন চঞ্চলাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণ এসে আমার ঘরের সামনে দাঁড়াল তখন দেখলুম স্বর্ণর মুখ চোখ থেকে সে দুষ্টোমির হাসি কোথায় চলে' গেছে, তার ঠোঁটদুটো কি যেন একটা অভিমানের আঘাতে কঠিন হ'য়ে উঠেছে, তার চোখ দুটো থেকে কি যেন একটা প্রশ্ন তীক্ষ্ণশরের মতো আমার পানে বেরিয়ে আসছে। স্বর্ণ বললে—"দাদা, তুমি আর যাকেই ফাঁকি দাও না কেন, আমার নতুন কাণ নতুন চোখ, নতুন মনকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমার বাগানের দিককার দরজায় আজ আমি বাহিরে থেকে শিকল এঁটে দিয়েছি—আর এ দরজারও তাই করব। যদ্দিন তুমি শিষ্ট হ'য়ে না ওঠো, তদ্দিন তুমি এমনি বন্দী অবস্থাতেই রাত কাটাবে।" স্বর্ণ চঞ্চলাকে ঘরের মধ্যে রেখে কবাট টেনে দিয়ে বাহিরের শিকলটা কড়ায় লাগিয়ে দিয়ে চলে' গেল।

অভাব্য যা, কল্পনারও অতীত যা, তাই যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে র আগে আসে তখন অসতর্ক মনে এমন একটা ওলোটপালোট

হয়ে যায় যে মানুষ তখন স্বভাবতই সংযম হারিয়ে বসে ; কিন্তু যে কল্পনাতীতের জন্যে মনকে প্রস্তুত করে' বসে' আছে তার কোন রকম অপ্রকৃতিস্থ হবার কারণ ঘটে না। তাই আমি সেদিন চঞ্চলাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। দেখলুম চঞ্চলার সঙ্গে রেবামিনির সাদৃশ্য আমার উন্মাদ দৃষ্টির ভ্রান্তি একটুও নয়। সেই একই দাঁড়াবার ভঙ্গী, একই দেহের গঠন, একই উচ্চতা—সেই সবই এক। সেদিন চঞ্চলা একখানা হাল্‌কা সবুজ রঙের সাড়ী পরেছিল। বুঝলুম চঞ্চলার রেবামিনির সাদৃশ্যের কারণ আর যাই হোক্ না কেন তা সাড়ীর রঙের সাদৃশ্য নয়। এ সাদৃশ্য হয় চঞ্চলার দেহে, নয় আমার মনে।

চঞ্চলা দাঁড়িয়েই রইল। আমি ভীষণ অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। আমি যে কি করব, আমার যে কি করা উচিত, সেটা আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমি যে অপরাধী, এ সত্য আমার মনের কাছে অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। গত রজনীর ঘটনার যে কোন কৈফিয়ত নেই কিম্বা থাকলেও সে কৈফিয়তটা যে আর যাকেই হোক্ চঞ্চলাকে দেবার মতো নয়, সেটা আমি জানতুম। যা হোক্ ও রকম অবস্থাটা যখন বেজায় অসহ্য হ'য়ে উঠল, তখন আমি নিতান্তই খাপছাড়া ভাবে বললুম—"চঞ্চলা এসো"।

চঞ্চলা অগ্রসর হ'ল, ধীরে ধীরে সঙ্কোচের সঙ্গে দ্বিধাজড়িত পদে। এ দ্বিধা নব-বধূর প্রথম সম্ভাষণের লজ্জা-প্রসূত নয়, এ দ্বিধা উদ্ভূত হয়েছিল তরুণ মনে আশাভঙ্গের যে নিষ্ঠুর আঘাত, সেই আঘাত থেকে।

আমি কিন্তু চঞ্চলার চলনটাই দেখতে লাগলুম। সে-চলা একেবারে হুবহু রেবামিনির চলনের মতো। রেবামিনি মৃত, একথা আমি যদি

না জানতুম তবে আমি হলফ করে' বলতে পারতুম যে, এ মিনি—মিনি—মিনি ছাড়া আর কেউ নয়।

চঞ্চলা আমার কাছে এসে দাঁড়ালে আমি তার মাথার অবগুণ্ঠন ফেলে দিলুম। না, সকল সাদৃশ্য সত্ত্বেও এ রেবামিনি নয়। চঞ্চলা আমার দিকে তাকিয়ে দেখল, আমিও তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বড় বড় কালো কালো চোখ দুটি থেকে—উঃ সে কি দৃষ্টি! আমার মনে হ'ল কে যেন আমার হৃদ্‌পিণ্ডের দল্‌দলে ভাজা রক্তমাংসের উপরে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক শপাং করে' বসিয়ে দিলে।

চঞ্চলার সে দৃষ্টি—সে-দৃষ্টিতে ভাষা ছিল, মিনতি ছিল, ছিল একটা জীবনের প্রাণপণে দাবিয়ে-রাখা ক্রন্দন—যে জীবনের সুখের একই মাত্র আশালতা, যে আশালতা ছিঁড়লে জীবনে আর কিছু ধরবার থাকে না। আমি অনুভব করলুম জল্লাদের সঙ্গে আমার কোনই প্রভেদ নেই। আমার ত কোন কৈফিয়ত নেই। আমি চঞ্চলাকে পাশে বসিয়ে আদর করতে লাগলুম। চঞ্চলার চোখ দু'টো ছল ছল করে' উঠল।

চঞ্চলার যে-হাতখানি নিয়ে আমি আদর করছিলুম সেই হাতখানার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল—আমি চম্‌কে উঠলুম। রেবামিনির হাতের প্রত্যেক রেখাটি আমার চেনা। দেখলুম এ হাত ঠিক রেবার হাত। হাতের গড়ন, আঙুলের গড়ন, নখ সব অবিকল রেবামিনির হাতের মতো। চঞ্চলার বাঁ-হাতখানি নিয়ে তা উল্‌টিয়ে দেখলুম তার পিঠে অনামিকা আঙুলের উপরে তিলটি পর্য্যন্ত স্বস্থান ভ্রষ্ট নয়। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে হাত দু'খানির দিকে চেয়ে রইলুম।

চঞ্চলা অতি মৃদু কণ্ঠে সঙ্কোচের সঙ্গে বল্‌লে—"কি দেখছ?" চঞ্চলাকে আমি উত্তরে ফাঁকি দিলুম। আমি বললুম—"আমার স্বভাব এমনি যে, আমার মানুষের হাতের সঙ্গেই ভালবাসা আগে হয়। তোমার হাত দুখানি অতি সুন্দর।" চঞ্চলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, তার ঠোঁট দু'খানিতে একটু মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত হ'তে চেয়ে চেয়ে মিলিয়ে গেল ; কারণ তার প্রাণ থেকে শঙ্কা বুঝি তখনও একেবারে অন্তর্হিত হয় নি। কিন্তু সে দিন সে রাত্রে আমার অন্তরে সব চাইতে যেটা গভীর দাগ কেটেছিল সেটা হচ্ছে আমার পানে চঞ্চলার প্রথম দৃষ্টি-টি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আমার অন্তরে যাই হোক্ না কেন চঞ্চলার যেন দুঃখের কারণ আমি না হই। চঞ্চলাকে সুখী করবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

স্বর্ণ তার শ্বশুর বাড়ী চলে' গেল, আমরা স্বামী স্ত্রীতে যেমন সবাই দিন কাটায় তেমনি দিন কাটাতে লাগলুম। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই আমার মনে একটা ভাব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে লাগল। সে ভাবকে আমি যতই ছাড়াতে চাই সে ভাব আমাকে ততই জড়িয়ে ধরতে লাগল। আমার সুখ সোয়াস্তি কোথায় উড়ে গেল। আমার ভিতর ও বাহির একটা বিরাট মিথ্যা সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এ মিথ্যা আমার চাইতে শক্তিমান। এ মিথ্যার হাত থেকে হায় আমার উদ্ধারের আর বুঝি উপায় নেই।

পলে পলে তিলে তিলে আমার মনে প্রাণে যেন আমার প্রত্যেক স্নায়ুতে স্নায়ুতে অতীতের একটি রহস্যময় অতি সূক্ষ্ম প্রভাব বিছিয়ে পড়তে লাগল যে প্রভাবের সামনে চঞ্চলার আস্তত্ব, চঞ্চলার স্বাতন্ত্র্য,

আমার কাছে প্রতিদিনে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। ঐ প্রভাবের মধ্যে আমার সুখ ছিল, বেদনা ছিল, আমার বিদ্রোহ ছিল আবার আনন্দও ছিল। অতীতের অস্পষ্টতার কাছেই বর্ত্তমানের স্পষ্টতা প্রতি নিমেষে হার মানতে লাগল।

আমি আদর করতুম—কাকে? চঞ্চলাকে? না—সে আদর যেন কোন্ অদৃশ্য লোকের কোন অদৃশ্য-শরীরী জীব এসে দাবী করে' কুড়িয়ে নিয়ে যেত, সে আদর চঞ্চলার শরীরের উপরেই থেকে যেত —তার অন্তরে ত পৌঁছিত না, সে আদর করবার সময় ত আমার চঞ্চলাকে মোটেই মনে পড়ত না—মনে পড়ত রেবামিনিকে, তার প্রতিদিনের কথাগুলিকে, তার বিশেষ বিশেষ দিনের অভিমান-গুলিকে; তার সোহাগ আদর হাস্য পরিহাস, এই সব একত্র হ'য়ে দল বেঁধে এসে আমার মনের উপরে পড়ে' সেখান থেকে অতি স্পষ্ট অতি বর্ত্তমান চঞ্চলাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখত—ঠিক আমি যখন চঞ্চলাকে নিয়ে আদর করতে বসতুম। হায়! এর বিরুদ্ধে আমি কেমন করে' লড়াই করব।

কিন্তু আর যাকেই হোক্ না কেন বাইরের মিথ্যা আচরণ দিয়ে আপনার জনকে চিরকাল ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে দুটি মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়ীতে রয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই হয়ত যাদের বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে, বিশেষত যে দুজনের অন্তত একজনও আর একজনের অতি আপনার অতি অন্তরতম হবার জন্যে ব্যগ্র—এমন যে দুটি মানুষ—এদের পরস্পরের মনের সঙ্গে এমনি একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যায় যাতে করে' সে দুটো মন বাইরের মিথ্যা আচরণে কিছুতেই প্রতারিত হয়

না। বাইরের সকল অনুষ্ঠানকে কাটিয়ে এদের এক জনের মনে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

তাই চঞ্চলা এটা স্পষ্ট করে' না জানলেও এ অনুভবটা বোধ করতে তার বিশেষ বিলম্ব হ'ল না যে, আমার অন্তরাত্মা তার অন্তরাত্মাকে মোটেই বরণ করে' নিতে পারে নি, একান্ত সামীপ্য সত্বেও আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন একটা বাধা এমন একটা ব্যবধান আছে যা কি করলে ভাঙ্গে কি করলে ঘোচে তা তারও জানা ছিল না— আমারও জানা ছিল না, আর তা ভাঙ্গবার আমার ইচ্ছাও ছিল না— শক্তিও ছিল না।

ধীরে ধীরে চঞ্চলা সম্বন্ধে আমার মনে দুটো ভাব বাসা বাঁধল, দুটো পরস্পরের ঘোর বিরোধী! একটা তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, আর একটা তার বিরুদ্ধে ঠিক্ তেমনি প্রবল বিদ্রোহ। চঞ্চলার যেটুকু মিনির মতো, তার দেহের ভঙ্গিটি, তার হাত দুখানি—তাই ছিল আমার প্রতিদিনের সম্বল। তার দুখানি হাত আমি যখন ধরে' থাকতুম, তখন কি একটা মাদকতায় আমার চিত্ত মন ভরে' উঠত, কি একটা স্বপ্নে আমার সমস্ত বর্ত্তমান মুছে যেত, রেবামিনির চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার একটা সূক্ষ্ম সান্নিধ্য আমি বোধ করতুম— আর সেই সময় একটা গভীর শান্তিময় তৃপ্তিতে আমার অন্তরাত্মা পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত, যেন এ জগতে আর আমার কিছুই করবার বাকি নেই, ভগবানের দেওয়া এই জীবনের সকল ঋণই যেন আমার শোধ হ'য়ে গেছে, জীবনের শেষ কথাটি যেন আমার বলা হ'য়ে গেছে। কিন্তু যখন চঞ্চলার মুখের দিকে আমার নজর পড়ত, তখন আমার সে স্বপ্নের জগত মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গিয়ে তার বিরাট অমৃতত্ব

আমায় দেখিয়ে দিত। ঐ মুখখানাই ত যত নষ্টের মূল। হায়! ঐ মুখখানা যদি মিনির হ'ত! ধীরে ধীরে চঞ্চলার মুখের প্রতি একটা অতি রুদ্র অবজ্ঞা আমার মনকে প্রাণকে চিত্তকে বিষময় করে' তুলল। চঞ্চলাকে আমি ছাড়তে পারতুম না—কিন্তু সে ত চঞ্চলার জন্যে নয়।

কিন্তু আমার ঐ মনের ভাব চঞ্চলার মনে গিয়ে আঘাত করতে কিছুমাত্র দেরী করল না। চঞ্চলা আর আমার কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে চাইত না। আমিও তা কোনদিন খুলতে বলতুম না বা খুলতুম না। কোন অধিকারে?—এমনি করে' দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যেতে লাগল, সদা-অবগুণ্ঠনবতী চঞ্চলাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা বিদ্যুতের ঝলক উঠত— এ চঞ্চলা? না রেবামিনি?—

আপনাদের মনে কোনদিন বিদ্রোহের ভাব জেগেছে? বিদ্রোহ— সংসারের উপরে স্বষ্টির উপরে ভগবানের উপরে। যেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই ঠিক চলছে না—এর আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সব উল্টো, এর সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেবল একটা বিশৃঙ্খলার জটলা। এখানে কারো বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই, হৃদয় নেই, দয়া নেই, করুণা নেই, কিছুই নেই—আছে কেবল নিষ্ঠুর মরুভূমির ধূ ধূ ধূসর তপ্ত বালির চোখজ্বালা-করা শুভ্রতা। কিন্তু কেন? কারণ ঐ যে প্রশ্ন— এ চঞ্চলা, না রেবামিনি? এর উত্তর একটা বিরাট মিথ্যা।

আমার প্রতিদিনের নিষ্ঠুর অত্যাচার তার অন্তরাত্মার বিরাট অপমান সম্বল করে' চঞ্চলা শুকিয়ে উঠতে লাগল। এ থেকে বুঝি তার মুক্তি নেই, সে মন্ত্রমুগ্ধ বিহঙ্গিনীর মতো ধীরে ধীরে বুঝি মরণের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলল, আর সেই সঙ্গে মিনির জন্যে আমার

রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগল। এই রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষার কতকটা তৃপ্তির জন্য আমার ছিল দরকার চঞ্চলাকে। ক্রমে ক্রমে আমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ঘুচে গেল, চঞ্চলা যে একটি জীব, তার যে একটা পৃথক জীবন আছে, যে জীবনে সুখ দুঃখ বোধ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তা আমি ভুলে গেলুম। চঞ্চলার দিনগুলো একটা অন্তহীন দুঃখের ভিতর দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগল। হায়! এর থেকে তার মুক্তি কিসে হবে? কবে হবে?—

এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। একদিন রাত্রে মিনিকে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম যে, মিনি আমার বিছানার পাশে এসে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে আমায় বলছে—"এই দেখ আমি আবার এসেছি, তুমি কি ঘুমিয়েই থাকবে?" আমার ঘুম তখনই ভেঙ্গে গেল। দেখলুম কেবল অন্ধকার, আর আমার পাশে একটা অতি মৃদু কান্নার শব্দ। চঞ্চলা কাঁদছিল।

হায়! আমি চঞ্চলাকে কি বলে' সান্ত্বনা দেব। সে যে হবে ঘোর মিথ্যা। আমার মুখের কথা কি তার প্রাণে লাগবে। আমার অন্তরাত্মায় যার চিহ্নমাত্র নেই, তারি ফাঁকা মুখের কথায় কি তার অন্তরাত্মায় শান্তি ঢেলে দেবে? আমি জানতুম তা দেবে না। তাই আমি কিছুই বলতে পারলুম না। কি জানি কত রাত চঞ্চলা এই রকম কেঁদে কাটিয়েছে!

এমন সময় মা আমার কবাটে আঘাত করে' ডাকলেন। আমি জেগেই ছিলুম, উত্তর দিলে মা বললেন—"দেখত কার মোটর এসে আমাদের বাড়ীর গেটের কাছে এসে লাগল।"

মোটরের শব্দটা আমারও কানে এসে লেগেছিল কিন্তু আমি সে-দিকে তত মনোযোগ দিই নি। যখন মা বললেন যে, সেটা আমাদেরই বাড়ীর গেটের কাছে এসে লেগেছে তখন আমি তাতাড়াড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বেরিয়ে পড়লুম।

বাইরে গিয়ে দেখলুম আমার শ্বশুর বাড়ীর—চঞ্চলার বাপের বাড়ীর—মোটর, সোফরের হাতে এক চিঠি। চিঠি পড়ে' জানলুম যে চঞ্চলার বাবা অত্যন্ত পীড়িত, এখন যায় যায় অবস্থা, ডাক্তারের মতে আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ, চঞ্চলাকে দেখবার জন্যে তিনি ব্যাকুল, কেবলই চঞ্চলাকে ডাকছেন, চঞ্চলাকে ফিরতী মোটরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জরুরি অনুরোধ।

আমি তাড়াতাড়ি মা'কে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে, চঞ্চলার গায়ে একটা শাল জড়িয়ে দিয়ে দু'জনে গিয়ে মোটরে চড়লুম। মোটর ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

ভোর হয় হয়—হ্যারিসন রোডের গ্যাসের বাতিগুলো কেবল নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মোটর আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটে চঞ্চলার বাপের বাড়ীর সামনে গিয়ে লাগল। মোটর থামার সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যালক অমূল্য এসে চঞ্চলাকে নিয়ে গেল, আমি বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে লাগলুম।

পাঁচ মিনিটও হয় নি, তখন উপরে বাড়ীর ভিতরে একটা চাঞ্চল্যের আভাস পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যের উত্তেজিত কণ্ঠ আমাকে ডাকলে—"বিভূতি বাবু, বিভূতি বাবু, একবার উপরে আসুন"। আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম।

যে ঘরে রোগী ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম, দেখলুম চঞ্চলা অবগুণ্ঠন-হীনা রোগীর শয্যার পাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। রোগী বিছানার উপরে উঠে বসেছে। তার শীর্ণ মুখমণ্ডলে কোটরগত চোখ-দুটো কেবল যেন কোন অদৃশ্যলোকের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আলোকের সম্পাতে জ্বল্ জ্বল্ করছে। আমি ঢুকতেই রোগী হতাশ কণ্ঠে বললেন, "এ কাকে নিয়ে এলে বাবা, এ ত আমার চঞ্চলা নয়।"

আমি আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম—ওঃ কি দেখলুম !!!

মুহূর্ত্তে—বোধ হয় এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশের এক অংশ সময়ের জন্যে আমার ধমনীতে ধমনীতে সমস্ত রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেল, তার পর-মুহূর্ত্তে সেই রক্ত-প্রবাহ আবার আমার সর্ব্বাঙ্গে ছেয়ে গিয়ে আমাকে উন্মাদের মতো করে' তুলল, ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের মতো আমি চক্ষের পলকে গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমার বুকের উপরে চেপে ধরলুম। কি একটা বিজয়-গর্ব্বে আমার সমস্ত অন্তর উথলে-ওঠা সাগর-বারির মতো স্ফীত হয়ে উঠল, আমি রোগীর দিকে চেয়ে এক হাত তুলে যেন আমার সম্মুখীন মৃত্যুর অসীম শক্তিকে লক্ষ্য করে' চ্যালেঞ্জের স্বরে চেঁচিয়ে বলে' উঠলুম—না এ আপনার মেয়ে চঞ্চলা নয়—এ আমার স্ত্রী রেবামিনি"।

মরণাহত রোগী বিছানার উপরে ঢলে পড়ল। আমি সে দিন আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে প্রথম চুম্বন করলুম।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সামাজিক সাহিত্য

—:*:—
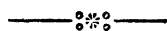
কোনো এক সময়ে হবুচন্দ্র রাজার রাজধানীতে অত্যন্ত সন্দেহ জনক অবস্থায় দুটি লোক গ্রেপ্তার হয়েছিল। তারা নাকি দিনে দুপুরে রাজা এবং মন্ত্রী দু'জনার চোখের সামনেই রাজবাড়ীর পুরাতন পুকুরটি চুরি করবার মৎলবে সিঁদ কাটছিল! যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত হবু-গবুর সতর্কতায় সে সব ফেঁসে গিয়েছিল;—এবং যা ঘটেছিল তা অভিজ্ঞ পাঠকের অগোচর নেই।

বর্ত্তমানে আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের আসরেও নাকি ঠিক অগ্নি-ধারা একদল সিঁদেলের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের লক্ষ্য নাকি আমাদের 'সনাতন সমাজ'; কথাটা আশঙ্কা-জনক সন্দেহ নেই, তবে ভরসা এই যে, এ ক্ষেত্রেও হবু-গবু যথেষ্ট বিনিদ্র এবং আশানুরূপ সতর্ক। হবু-গবুর এই বনিয়াদি সতর্কতা আর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ফলে কিছু দিন থেকে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ আমাদের সমাজের স্বেচ্ছা-সেবক সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হ'তে চলেছে। এখন সাহিত্য-সেবকগণের লক্ষ্য হয়েছে সমাজ-সংস্কার, আর সমাজ-পতি মহাশয়দের কাজ হয়েছে সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্য আর সমাজের একটা সহজ সমাহার খুব স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়; কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে যখন উক্ত সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনীভূত এবং ব্যতীহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন আবার নতুন করে

সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্ণয় আর সমাজের চৌহদ্দি নির্দ্দেশ নিতান্তই আবশ্যক।—নতুবা অদূর ভবিষ্যতে উভয়েরই শ্রীহীন হয়ে পড়বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সাহিত্য-সমালোচনার সময় আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, ও-বস্তু সমাজ-কোষে উপ্ত এবং অঙ্কুরিত হ'লেও ওর ফুল এবং ফল আকাশেই ফুটে থাকে।—তথাকথিত সমাজের মাটী আঁকড়ে যার মন পড়ে আছে, সাহিত্যের সুতার এবং সুগন্ধ থেকে সে যে চিরদিনই বঞ্চিত থাকবে! বেল পাকলে কাকের কি? তবুও যে যখন তখন সমাজের তরফ থেকে সাহিত্যের উদ্দেশে লোষ্ট্র-বর্ষণ হয়ে থাকে তাতে ত আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। অম্নি করেই ত ইতর প্রাণী থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অহরহ প্রতিপন্ন হচ্ছে। না-মরে ভূত হবার শক্তি ত ঈশ্বর আর কোন জানোয়ারকেই দেন নি। ও-যে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষেরই সামাজিক উত্তরাধিকার!—আশার চাইতে মানুষের আশঙ্কাই বেশি। এই আশঙ্কার বশে অভিভূত হয়েই ত সাহিত্যের ফুলের ঘায়ে আমাদের মূর্চ্ছার উপক্রম হয়; আর এই আশঙ্কার উদ্বেগে উত্তেজিত হয়েই ত প্রতি মুহূর্ত্তে কাঁচা-সাহিত্যের ডাঁসা-ফলের আকস্মিক পতনে সমাজের অপঘাত সম্ভাবনায় আমরা অধীর হ'য়ে উঠি!

আশঙ্কায় দিশে-হারা হয়ে আমরা ভুলে যাই যে, জনগণের ঐকান্তিক মানস ছাড়া সাহিত্যের ফলে পাক ধরে না; আর, সমাজের আন্তরিক আহ্বান ছাড়া সাহিত্যের ফল ভূমি স্পর্শ করে না। বঙ্কিম চন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" বাঙালীর অন্তর স্পর্শ করেছে, তাঁর পরলোক গমনেরও বহুবর্ষ পরে। আর, বলাই বাহুল্য যে, 'বসুমতী'র সুলভ

সংস্করণের বহুল প্রচার তার কারণ নয়। কালের আবর্ত্তনে বাঙালী যখন বহুবর্ষ সঞ্চিত জড়তা দূরে ফেলে দিয়ে, নূতন আশার আলোকে স্নাত পুলকিত হয়ে, নূতন ব্রতে দীক্ষিত হবার আশায় উৎসুক উন্মুখ উদগ্র হয়ে উঠেছিল, তখনই ত তারা নতুন করে ঋষিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল।—তখনই ত দেশব্রতের বীজ-মন্ত্র "বন্দেমাতরম্" ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিল।

এ কথা যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই খাটে, তা নয়। রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে' স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সবাইকেই আমরা আজ নবতর ভাবে পেয়েছি। আমাদের মনের কোণে সনাতন জড়তার ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়ে যে অনাদৃত সপ্তস্বরা পড়ে' ছিল, কালের টানে তার তারে তারে যে আজ স্বর যোজনা হয়ে গেছে, তাই না তাঁদের মনের অনুরণন, তাঁদের বাণীর প্রতিধ্বনি আজ আমাদের কাছে এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এম্নি করে চিরদিনই সমাজ সাহিত্য থেকে প্রয়োজন এবং প্রয়াস অনুযায়ী ভাব আহরণ করে আপনাকে সুস্থ পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ করেছে। কিন্তু তাই বলে কি সমাজের প্রয়োজন খুঁটিয়ে, সমাজের বায়নায়, সমাজের তাগিদে কখনো সাহিত্য গড়ে উঠেছে? আমার বিশ্বাস এমন ধারা "সামাজিক-সাহিত্য" গড়বার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। পাখার বাতাসে নৌকার পালে হাওয়া লাগে না, তার জন্যে চাই স্বভাব-দত্ত মুক্তপবন। প্রতিভার দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে আত্ম-সমাহিত সাহিত্যিক যে কল্পলোকের সৃষ্টি করেন বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতার মাপ কাটিতে তা যতই কেন নিরর্থক প্রমাণিত হোক না, ভবিষ্য-সমাজের সেই হবে পাথেয়।

(২)

সমসাময়িক সমাজের পথ্য হিসাবে বর্ত্তমান সাহিত্যকে বিচার এবং প্রচার করবার মত ভুল আর কিছুই হ'তে পারে না। সাহিত্য-আলোচনায় সেই ভুল আমরা নিয়ত কর্চ্ছি। রুগ্ন সমাজের দুর্ব্বল পাকস্থলীর দিকে দৃষ্টি রেখে কখনো আমরা তার জন্যে রুটির ব্যবস্থা কর্চ্ছি, কখনো আবার তার আশু বলাধানের জন্যে অথবা তার রুচি পরিবর্ত্তন কল্পে লুচি সাধছি। সমাজ শরীরের 'পরে আমাদের এ সব সাহিত্যিক পরীক্ষা যে খুব কার্য্যকরী হচ্ছে এমনটি সন্দেহ করবার কোনো হেতু ত আমাদের চোখে পড়ে না। আমাদের বিশ্বাস, সমাজ সম্বন্ধে অতটা সচেতন হয়ে যা রচনা করা যায়, তা সাময়িক সামাজিক সন্দর্ভ হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের পদগৌরব তার ভাগ্যে জোটে না।

এ কথার প্রতিবাদ স্বরূপ বাঙলা ইংরাজী নানা দেশীয় নানা সাহিত্য মন্থন করে অনেক নজিরই অনেকে হয়ত এনে হাজির করতে পারেন। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে আমার তথাকথিত "সামাজিক-সাহিত্যের" বিস্তর প্রভেদ! চাঁদের আলোর সাথে চাঁদির ঔজ্জ্বল্যের কি কোনো সাদৃশ্য সম্ভব? প্রতিভাশালী সাহিত্য-রসিক চরিত্র সৃষ্টির পারিপার্শ্বিক হিসেবে যখন সমাজ-চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর বিশ্লেষণের পরদায় পরদায় তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতে একটা অনায়ত্তের আভাস, একটা অনাগতের আহ্বান, একটা নবতর বিধানের ইঙ্গিত, স্বতই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই যে স্বাভাবিক সত্যানুভূতি এবং তাহার অতীব সহজ বিকাশ, এই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ; এই হচ্ছে তার চাঁদের আলো!

সমালোচ্য সামাজিক সাহিত্যে এই বস্তুটির একান্তই অভাব।

দেশটা অত্যন্ত রকমের স্বাত্ত্বিক ভাবাপন্ন বলেই হয়ত অনেকে এই প্রাণবিহীনতাটাকে গাম্ভীর্য্য বলে' ধরে নিয়ে যথারীতি এবং যথাস্থানে পূজা এবং দক্ষিণাদি দিয়ে থাকেন! এইজন্যেই হয়ত "দৈনিকে" যার আলোচনা হওয়া উচিত, আমরা "মাসিকে" তার সম্বর্দ্ধনা করি; আর "মাসিকে" যা চুকে গেলেই হ'ত, আমরা আবার তার আট আনা, এক টাকা, পাঁচসিকা, সাতসিকা সংস্করণে ঘর আলো করি। এম্নি করে আমাদের সাহিত্যের ধারের চেয়ে তার ভার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওষুধের নামে খোঁজ নেই, অনুপানের হাঙ্গামায় অস্থির।

(৩)

নৌকয় বসে বসে গুণের দড়াদড়ি ধরে প্রাণপণ টানাটানি করলেও নৌকার গতিশীল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই!—আছে মাস্তুল এবং গুণের গতাসু হবার পরিপূর্ণ আশঙ্কা। সাহিত্যিক যদি নিজের মনকে সমাজের অতীত অনধিগত সুরে বেঁধে নিতে না পারেন তবে সাহিত্যের শিব গড়তে না যাওয়াই তাঁর পক্ষে বিধেয়। কারণ তাতে করে' খুব সম্ভব সমাজের কল্যাণ হবে; কিন্তু সাহিত্যের অবমাননা হবেই।

মনুষ্য-সভ্যতার চরম পরিণতি, আর তার বিকাশের স্বাভাবিক ধারা সাহিত্যিকের চক্ষে যে আকারে প্রতিভাত হবে, সেই হবে তাঁর সমাজ। তাঁর সমস্ত সামাজিক প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা, নতি এবং রুচির ঝোঁক হবে সেই দিকে। তার চেয়ে ছোটো, তার চেয়ে সঙ্কীর্ণ কোন সমাজের বিধি নিষেধ তাঁর মনেই আসবে না—সাহিত্য-

সেবার সমাহিত অবস্থায়। সমাজের দোষগুণ সম্বন্ধে সাহিত্য-সেবী অজ্ঞ থাকবেন এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা কেবল চাই—ও সবেতে তিনি থাকবেন সম্পূর্ণ অনাচ্ছন্ন।

সাহিত্যিকের প্রতিভা যদি সুস্থ এবং অবিকৃত থাকে তবে তাঁর রচনা, তাঁর সৃষ্টি সামাজিক পাপ এবং মিথ্যাকে স্বভাবতই তিরস্কৃত করবে। সে জন্যে তাঁর দিক থেকে অধিকন্তু কোনো চেষ্টার আর সমাজের তরফ থেকে উদ্দীপনা বা উৎসাহের কোনো প্রয়োজনই হবে না। সৃষ্টির আনন্দ আর প্রকাশের উত্তেজনাই হবে সাহিত্যের চিরন্তন প্রেরণা। তার চেয়ে সঙ্কীর্ণতর কোনো উদ্দেশ্যেই লেখকের সাহিত্য-প্রতিভাকে নিঃশেষে উৎসারিত করতে পারবে না।

সাহিত্য থেকে দেশ-কালোপযোগী ভাব এবং শক্তি সংগ্রহ করা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য; কিন্তু সমাজের হিতকল্পে দেশ-কালোপযোগী সাহিত্যের আশা এবং আমদানীর চেষ্টা গাভীর বাঁটে দরকার-মাফিক দুধের পরিবর্ত্তে দই, ক্ষীর, ছানা, মাখনের প্রত্যাশার মতই অসঙ্গত। এবম্বিধ অসঙ্গত আশার বশবর্ত্তী হয়ে সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা কখনো হতাশ, কখনো বা উত্তেজিত এবং নিতান্ত কদাচিত পরিতুষ্ট হয়ে থাকি।

দরকারের মূর্ত্তি এবং মাত্রা প্রত্যেকেরই আমাদের স্বতন্ত্র, কাজেই তার মাপকাটিতে সাহিত্য মেপে সন্তোষজনক কোনো সাধারণ-মীমাংসায় উপনীত হবার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। আর, এ ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠকের দরকারের দ্বন্দ্ব চিরদিনই থাকবে। অন্তত তার পরিপূর্ণ মিলন চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণের মতই সাম্বাৎসরিক এবং স্মরণীয় ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে।

কিন্তু তা' ত নয়! পাঠকের সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি না পাওয়া হলে ত সাহিত্যিকের সাধনাই নিস্ফল! দরকার অদরকারের খোসা-ভূষি দূরে ফেলে লেখকের অন্তরতম মানুষটি যখন পাঠকের কাছে এসে সমপ্রণতার দাবী করে' হাত বাড়িয়ে দেয়, কেবল তখনই না সব সংস্কারের অভিমান ভুলে গিয়ে, সব সমাজ এবং সম্প্রদায়ের জাল ভেদ করে পাঠক তার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে!

মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত যে মৌলিক মিল, সেইটেই হচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্ব। সাহিত্যের যত আবেদন এবং আমন্ত্রণ সবই তার কাছে। সমাজ আর সামাজিক বিধি নিষেধ হয়েছে, তার ধড়া-চূড়া এবং চাপরাশ। দেশ এবং কালভেদে ওদের রং এবং ঢং এর বিস্তর তারতম্য হয়ে থাকে। উক্ত ধড়া-চূড়ার রিপুকর্ম্ম অথবা চাপরাশের পিতলের পরিমার্জ্জনা সাহিত্যিকের কাজ নয়। মনুষ্যত্বের রহস্যের 'পরেই হয়েছে সাহিত্যের সত্যিকার প্রতিষ্ঠান। মানুষকে সবদিক দিয়ে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সজাগ এবং সপ্রতিভ করাই সাহিত্যের লক্ষ্য। সাহিত্যকে সমাজের আশ্রিত অথবা সমাজের অভিমুখীন করবার চেষ্টা অনেকটা মুক্ত বিহঙ্গকে আবার ডিমের ভিতরে বসাবার আশার মতই বিপজ্জনক! মনুষ্যত্বের মুখচেয়ে এমন ধারা অমানুষিক প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

আর্য্যামি।

(১)

আমাদের আদিম আর্য্য প্রপিতামহেরা ধরাপৃষ্ঠের ঠিক কোন্ জায়গা থেকে যাত্রারম্ভ করে' যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন, সে প্রশ্নের একটা নিশ্চিত জবাব দেওয়া শক্ত। তাঁরা কি মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম দিকটায় ভেড়া চরাতেন, না নরওয়ের উত্তর-মাথায় মাছ শীকার করতেন, এ তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নি। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যব তাঁরা সকলে মিলে নিঃসন্দেহই খেতেন, তবে তা তাঁদের চাষ করে'-পাওয়া, না ইউফ্রেটিসের তীরের বুনো যব, সে বিষয়েও মহা মতভেদ রয়েছে। তার পর তাঁদের সবারি মাথার প্রস্থের একশ গুণকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যে কখনই পঁচাত্তরের বেশী হ'ত না, একথা আর এখন কোনও পণ্ডিতই হলপ নিয়ে বলতে রাজী নন। বরং শোনা যাচ্ছে যে, যেমন আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণেরা সবাই এক আর্য্যবংশাবতংস হ'লেও তাঁদের চেহারায় এ মিলটা ধরার জো নেই, কেননা কেউ কটা কেউ কৃষ্ণ, কারও মাথা গোল কারও চেপ্টা, তেমনি আদিম আর্য্যদের মধ্যেও চেহারার এই গরমিলের দিকেই প্রমাণের পাল্লাটা নাকি বেশি ভারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কি একদল কালাপাহাড়ি পণ্ডিত এরি মধ্যে বলতে সুরু করেছেন যে, আর্য্য বলে' কোনও একটা বিশিষ্ট জাত, অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট জাত যাকে ঐ এক নামে ডাকার কোনও বস্তুগত কারণ আছে, কোনও দিনই কোনও-

খানে ছিল না। ওটা একটা ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের মানসিক সৃষ্টি, 'ওয়ার্কিং হাইপথিসিস্'।

যেমন গতিক দেখা যাচ্ছে, তাতে করে' প্রাচীন ও আদিম আর্য্য-জাতির অদৃষ্টে কি আছে বলা কঠিন। আসছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁরা বিধাতার সৃষ্টি বলে' কায়েম হয়েও বসতে পারেন, আবার মানুষের কল্পনা বলে' বাস্তব পদার্থের লিষ্টি থেকে তাঁদের নামও কাটা যেতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আর্য্য-জাতির কপালে যা-ই ঘটুক, তাঁরা বস্তু হ'য়ে চেপেই বসুন, আর অবস্তু হয়ে' উড়েই যান, 'আর্য্যামি' বস্তুটির তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। যারা মনে করে, কারণ না থাকলেই আর তার কার্য্য থাকে না, তারা না পড়েছে দর্শনশাস্ত্র, না আছে তাদের লৌকিক জ্ঞান। 'নিমিত্ত' কারণ যে একটা কারণ, একথা আরিষ্টটল্ থেকে অন্নভট্ট পর্য্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এবং ও-কারণটি নিজে ধ্বংশ হ'লেও তার কার্য্য ধ্বংশ হয় না। যেমন নিজের বোনা কাপড়খানির পূর্ব্বেই তাঁতি বেচারীর জীবনান্ত ঘটতে কিছুই আটক নেই। আর পুঁথি ছেড়ে সংসারের দিকে চেয়ে দেখলেও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ চোখে পড়বে। যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু 'পাব্লিসিটি বোর্ড' চলছে; জর্ম্মাণ ভীতি ঘুচে গেল অথচ 'রিফর্ম্ম স্কীম' নিয়ে আমাদের তর্ক শেষ হয় নি; এমন কি বিলাতের কলের মজুরেরা যেমন যুদ্ধের মধ্যে দুবেলা পেটপুরে খেয়েছে, যুদ্ধের পরেও তেমনি চলুক বলে' হাঙ্গাম উপস্থিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃত গোড়ার কথা এই যে, 'আর্য্যামির' সঙ্গে 'আর্য্যের' আসলে কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আর্য্যজাতি পৃথিবীতে যতই

প্রাচীন হ'ন না কেন, 'আর্য্যামি' জিনিষটি যে মনুষ্য-সমাজে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। ব্যুৎপত্তি দিয়ে বস্তুনির্ণয়ের চেষ্টা করে শুধু এক বৈয়াকরণ; এবং ও-জাতটি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। 'আর্য্যামি হ'ল মানুষের সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ, বিলাতী পণ্ডিতদের মতে যাতে ইতর প্রাণী থেকে মানুষ তফাত, অর্থাৎ তার 'সেল্‌ফ্‌ কন্‌শাস্‌নেস্‌'; আর দেশীতত্ত্বজ্ঞদের মতে যার সম্পূর্ণ বিনাশ, অথবা যা একই কথা—চরম বিকাশই হচ্ছে পরামুক্তির পথ, অর্থাৎ অহংজ্ঞান। সমাজতত্ত্ববেত্তারা বলেন, মানুষ যে পরের মধ্যে নিজের সাদৃশ্য দেখে, তাতেই সে অপরের সঙ্গে সমাজ বেঁধে ঘর করতে পারে। এই সাদৃশ্যবোধ হ'ল সমাজবন্ধনের একটা পোক্ত শিকল। কিন্তু সবাই জানে ভিন্ন জিনিষের মধ্যে সাদৃশ্যজ্ঞানটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। সূক্ষ্মবুদ্ধির কাজ হচ্ছে একই রকম জিনিষের মধ্য থেকে তফাত বের করা। সুতরাং মানুষ যখন সূক্ষ্মবুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছে, তখন তার বুদ্ধির স্বাভাবিক ঝোঁকটা হ'ল পরের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য নিয়ে খুসি না থেকে, এই মিলের মধ্যে অমিল কোন্ কোন্ জায়গায় তাই খুঁজে বের করার দিকে। আর এ খোঁজে কাকেও ব্যর্থ হ'তে হয় না। কেননা একে ত লাইবনিজ প্রমাণই করে' গেছেন যে, সংসারে দু'টি বস্তুর ঠিক এক রকম হবার কোনও জো-ই নেই; আর লাইবনিজ ছিলেন একজন দিগ্‌গজ গণিতজ্ঞ লোক। তার পর সবাই নিজকে জানে সাক্ষাৎ ভাবে, অন্য সকলকে পরোক্ষে। আমার বুদ্ধি আমার কাছে স্বপ্রকাশ, অন্যের বুদ্ধি আছে কি নেই, সেটা অনুমানের কথা। কাজেই আমি যে অন্য সকলের চেয়েই ভিন্ন রকমের, এবং মোটের

উপর এ রকমটি আর হয় না, এ জ্ঞান যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। নিজের সম্বন্ধে এই মর্ম্মগত বোধটা লোকে যখন প্রকাশ করে' ফেলে, তখন তার নাম হয় 'অহঙ্কার', দ্বিতীয় ভাগ থেকে বেদান্তগ্রন্থ পর্য্যন্ত সবাই যার একটানা নিন্দা করেন। আর এ ভাবটি যখন একটা দলকে ধরে' প্রকাশ হয়, তখন সেই বস্তুটিই হ'ল 'আর্য্যামি'। কেবল দলের প্রকারভেদে নামের রকমভেদ ঘটে, যেমন আভিজাত্য, ব্রাহ্মণত্ব, পেট্রিয়টিজম্, অ্যাংলো-স্যাক্সনত্ব ইত্যাদি। এবং ভাট, চারণ, কবি, ঐতিহাসিক সকলে মিলে মানুষের সভ্যতার সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত এর জয়গান গেয়ে আসছে।

সংসারে এমন সব সরলবুদ্ধির লোক'ও আছে যারা প্রশ্ন করে' বসে ব্যক্তির পক্ষে যেটা দোষের, সমাজ বা জাতি, অর্থাৎ ব্যক্তিসমষ্টির পক্ষে সেইটিরই বর্দ্ধিত সংস্করণ বা 'এন্‌লার্জড্ এডিশন্' কেন প্রসংশার?— অবশ্য এর সোজা উত্তর এই যে, ব্যক্তি আর জাতি এক নয়, কেননা যদি তা হ'ত, তা হ'লে ও-দুয়ের নাম এক না হ'য়ে, ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন! উক্তরূপ প্রশ্নকর্ত্তাদের পাণ্ডিত্যের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই; না হ'লে জর্ম্মাণ, অজর্ম্মাণ সব রকম পণ্ডিতের প্রাচীন নতুন নানা মত তুলে এ-ও দেখান যেত যে, জাতি বা 'ষ্টেট' জিনিষটা মোটেই ব্যক্তির সমষ্টি নয়। কেননা ও-নিজেই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার একটা নিজস্ব গুণ, ইচ্ছা, অনুভূতি আছে, যা জাতি বা ষ্টেটের লোকদের গুণ, ইচ্ছা ও অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র, মোটেই তার সমষ্টি নয়। অর্থাৎ দেশের সব লোক দরিদ্র হ'লেও দেশটা ধনী হতে কোন আটক নেই। আর এ কথা যে ঠিক, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোককেই তা স্বীকার করতে হবে। এই সব সূক্ষ্ম অথচ প্রকাণ্ড তত্ত্ব যাদের বুদ্ধির অগম্য তাদের জন্য

একটা সহজ ছোট উত্তর দেওয়া যাচ্ছে। কারু নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করাটা যে, সমাজে নিন্দার কথা, তার কারণ ঐ এক অহং-এর খোঁচা আর সকল অহং-এর গায়ে লেগে তাদের ব্যথিত করে' তোলে। কিন্তু একটা গোটা দলকে ধরে' যখন এটি প্রকাশ হয়, তখন দোষটা আর থাকে না। এবং এতে দলের সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশ্য এক দলের অহং বোধটা অন্য আর এক দলের গায়ে লাগেই লাগে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা আমাদের যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি, নিষেধ, সে সবি হ'ল ছোট হোক বড় হোক কোনও একটা দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে লক্ষ্য করে'। এক দলের সঙ্গে আর এক দলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এ সব কোনও কিছুরই লক্ষ্য নয়। সেই জন্য লোকের সঙ্গে কথায় ও কাজে যে লোকের ভদ্রতার সীমা নেই, সেই লোকই একটা সমস্ত জাতির সম্বন্ধে কথায় বা ব্যবহারে কোনও রকম ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। যে লোক জীবনে কাকেও কোনও দিন কড়া কথা বলে নি, সেও দল বেঁধে একটা গোটা দেশকে পেষণে ও শোষণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

আধুনিক য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে "ইণ্টারন্যাশানাল ল" বলে' যে আপোষি ব্যবহারনীতির চলতি আছে, সকলেই জানে যে, তার গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের যে সব নিয়ম কানুন গড়ে' উঠেছে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যবহারে সেই গুলিকে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ডাচ্ পণ্ডিত হ্যুগো গ্রোসিয়াস্‌কে এই আন্তর্জাতিক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলা চলে। এ সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র আলোচনা করেছেন তিনিই জানেন যে, রোমান ব্যবহার-

শাস্ত্রে লোক ব্যবহারের যে নিয়মগুলি সর্ব্বসাধারণ, সুতরাং স্বাভাবিক বলে' গণ্য হয়েছিল, গ্রোসিয়াস সেই গুলিকেই তাঁর মৈত্রীবিগ্রহ সংহিতার ভিত্তি করেছিলেন। ব্যক্তির নীতিকে সমষ্টির রীতি করে' তোলার এই চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে, ১৯১৪ সালে তার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, এবং ১৯১৮ সালেই তার শেষ হয়েছে এমন মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

একটা অবান্তর কথা দিয়ে 'আর্য্যামির' এই উৎপত্তি পর্ব্বের অধ্যায় শেষ করা যাক্। ইংরেজ-দার্শনিক হব্‌স্ গ্রোসিয়াসেরই সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, আদিতে মনুষ্য সমাজ রাষ্ট্রবদ্ধ ছিল না। এবং কাজেই পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মও চলতি ছিল না। সে ছিল একটা নিত্য বিগ্রহ বিবাদের যুগ, যখন প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু, এবং সবারই হাত তখন সবারই বিরুদ্ধে তোলা থাকত। এই ভয়ানক দুরবস্থাটা মোচন করবার জন্যই সবাই মিলে একটা "ষ্টেট" গড়ে' তার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে, এবং "ষ্টেট" পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের আইন-কানুন বেঁধে দিয়ে বৈষম্যের জায়গায় শান্তি এনেছে। বহু পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন এবং এখনও করছেন যে, হব্‌সের এই কল্পনাটা একেবারে অনৈতিহাসিক। মানুষ কোনও দিনই সমাজ ছাড়া ছিল না, এবং কোনও রাষ্ট্র-গড়ার মজলিসের প্রসিডিং, কি পাথরে কি তামায়, এ পর্য্যন্ত কোনও পুরাতত্ত্ববিদই আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু একটা সন্দেহ মনে না-এসে যায় না। মানুষের আদিম অবস্থার এই যে কল্পনাটা, সেটা হব্‌স্ নিয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ থেকে। অর্থাৎ গ্রোসিয়াস

চেয়েছিলেন, লোক ব্যবহারের নীতি দিয়ে এই সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করতে, আর হব্‌স্‌ কল্পনা করেছিলেন, এই নীতি নিয়ম প্রচলনের পূর্ব্বে লোকের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধেরই মত। পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে গ্রোসিয়াসের বিখ্যাত পুঁথির ছাব্বিশ বছর পরে হব্‌সের 'লিভিয়াথন' প্রকাশিত হয়।

(২)

আর্য্যামির জন্মরহস্যটা একবার প্রকাশ হ'লে তার জীবন-চরিতের হেরফেরগুলো বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

বড় হোক, ছোট হোক একটা দলের নাম দিয়ে নাকি এ জিনিষটিকে চালাতে হয়, তাই এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে অল্পবিস্তর মোটা রকম বাহ্যিক লক্ষণের উপরেই দাঁড় করান ছাড়া উপায় থাকে না। গায়ের চামড়ার রং, মাথার খুলির মাপ, সাগরবিশেষের পশ্চিম পারে কি পর্ব্বতবিশেষের উত্তর ধারে নিবাস স্থান, খাবার জিনিষে নাইট্রোজেনের প্রাচুর্য্য কি স্নেহ-পদার্থের আধিক্য, পূর্ব্বপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে' বর্শা চালাতেন কি মাটীতে দাঁড়িয়ে তীর ছুড়তেন, এই রকম যা হোক কিছু একটার উপরেই এক একটা প্রকাণ্ড অভিমানের ইমারত গড়ে' তুলতে হয়। অবশ্য এই চর্ম্মাস্থি-বিদ্যা, ভৌগলিক-তথ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার এর প্রত্যেকটিরই 'ইনুয়েণ্ডো' বা ইঙ্গিত হচ্ছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর এক একটি লম্বা ফর্দ্দ। এ সব লক্ষণের সঙ্গে এ সব গুণের কোনও রকম "অন্যথা সিদ্ধিশূন্য" বা নিত্যসম্বন্ধ আছে কিনা সে সন্দেহে আর্য্যামির অভিমানকে কখনও সঙ্কুচিত হতে হয় না।

কেননা লক্ষণগুলি হ'ল বাহ্যিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, আর গুণগুলি হ'ল নিগূঢ় অর্থাৎ আনুমানিক। প্রত্যক্ষ নিয়ে তর্ক চলে না, আর তর্কের ভূমিই হ'ল অনুমান। এবং তর্ক জিনিষটার সুবিধা এই যে, এ ব্যাপারে পরাজয় নির্ভর করে বিপক্ষের শক্তির উপর নয়, নিজের ইচ্ছার উপরে। নিজে স্বীকার না করলে তর্কে হার হয়েছে, এ অবশ্য কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কেননা সেইটিই হবে আবার একটা তর্কের বিষয়।

ব্যক্তির অহঙ্কারের চেয়ে সমষ্টির অহঙ্কারের একটা শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, একা একা যা নিয়ে কোনও রকমেই অহঙ্কার করা চলে না, দল বেঁধে তাকেই একটা দুর্জ্জয় অহঙ্কারের কারণ করে' তোলা যায়। এক যুগের ফরাসীরা সে যুগের ইংরেজদের বুদ্ধি-সুদ্ধিতে বিশেষ মুগ্ধ না হয়ে, তাদের নাম দিয়েছিল 'জন বুল্'। আজ ইংলণ্ডের খবরের কাগজ লেখকেরা এই নামটাকেই একটা উৎকট জাতীয় অভিমান প্রকাশের রাস্তা করে' তুলেছে। এ জাতির বুদ্ধি যে একটু মোটা বলে' বোধ হয়, তার কারণ এ বুদ্ধি হাল্‌কা নয়, গুরুতর রকমের ভারী; এতে যে বেশি ঢেউ খেলে না, এর অতলস্পর্শ গভীরতাই হ'ল তার কারণ; এ জাত যে চট্ করে' একটা 'থিওরী' কি 'আইডিয়েল' নিয়ে মেতে ওঠে না তার কারণ এদের স্থির 'প্র্যাক্‌টিকাল' বুদ্ধি; ফরাসির মত এদের সাম্য ও স্বাধীনতা একদিনে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, কারণ নজীরের পর নজীর ধরে' ক্রমশ এর আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে, সেইজন্য গতিটা একটু মন্থর। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 'জনবুলত্বের' এত গুণব্যাখ্যান সত্ত্বেও কোনও ইংরেজ এটা স্বীকার করতে রাজী হবে কিনা, তার নিজের বুদ্ধিটা আপাতদৃষ্টিতেও একটু মোটা, যতই গুরুত্ব এবং গভীরতা সে

দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ হোক না কেন। অর্থাৎ 'জনবুলত্বের' উপর জাতীয় অভিমান অনায়াসে দাঁড় করান যায়, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষে ওটাকে নিয়ে অহঙ্কার দেখান একটু শক্ত। বোধ হয় ঠিক এই কারণেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতাগুলিকে লজ্জা দিয়ে বিদায় করবার প্রবন্ধে, গানে, বক্তৃতায় যে সব চেষ্টা হয়েছে, তাতে তেমন আশানুরূপ ফল দেখা যায় নাই। কেননা লজ্জা জিনিষটা মানুষে পায় কোনও কারণে দল থেকে তফাৎ হ'য়ে পড়তে হ'লে। সুতরাং সবাই মিলে দল বেঁধে লজ্জা পাওয়াটা বড় একটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বরং জাতীয়-জীবনের অবস্থা দেখে সবাই মিলে যে লজ্জা পাওয়ার চেষ্টা করছি এই ব্যাপারটিকেই একটা অহঙ্কারের কারণ করে' তোলা কিছুই কঠিন নয়।

(৩)

'আর্য্যামি' যত রকমের আছে, বলা বাহুল্য, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে জন্মগত 'আর্য্যামি'। এর কারণও খুব স্পষ্ট। জন্মকে ভিত করে' 'আর্য্যামির' অহঙ্কার দাঁড় করানো যেমন সহজ, এর শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্দ্ধাটাও হয় তেমনি গগনস্পর্শী। জন্মের উপর যে জীবের গুণাগুণ নির্ভর করে তা ঘোড়ার বংশে যখন ঘোড়া আর গরুর বংশে গরুই জন্মাচ্ছে তখন অস্বীকার করবার জো নেই। আর এ ভেদটা যে কেবল পৃথক জাতীয় ভেদ নয় স্বজাতীয় ভেদও বটে সে কথা নবীন লেখক হাউষ্টন চেম্বারলেইন ও প্রাচীন ঋষি বসিষ্ঠ (১) দু'জনেই তেজী ঘোড়ার

(১) "কুলাপদেশেন হয়োঽপি পূজ্য—
তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি॥" (বসিষ্ঠ-সংহিতা।)

উঁচু বংশের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জন্মের উপর শ্রেষ্ঠতার দাবীকে ভিত্তিহীন বলে' সরাসরি অগ্রাহ্য করা চলে না, এবং এ দাবী উপস্থিত করতেও এক জন্মান ছাড়া আর কিছুই অপরিহার্য্য নয়। কোনও বিশেষ বংশের সঙ্গে বিশেষ গুণের যোগাযোগ আছে কিনা সে তর্ক তোলা যায় বটে, কিন্তু এর মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা না থাকাতে কারও কোনও ভয়ের কারণ নেই। বর্ত্তমান বংশধরদের মধ্যে গুণটা না থাকলেই যে সে গুণ বংশে নেই এটা একেবারেই প্রমাণ হয় না। কেননা বর্ত্তমানে হয়ত ওটা 'লেটেণ্ট' ভাবে রয়েছে, ভবিষ্যবংশীয়দের মধ্যে ঠিক ফুটে বেরুবে! 'অ্যাটেভিজম' যে একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ত ডারুইনের পুঁথিতেই রয়েছে! 'জার্ম্‌ প্ল্যাস্‌ম্‌' জিনিষটি যে অমর, সে তথ্য বাইস-ম্যানই প্রমাণ করে' গেছেন!

আর এই সহজ দাবীটির বহরই বা কি বিরাট। এ যে শ্রেষ্ঠত্ব, এ মিশে রয়েছে একেবারে রক্তের সঙ্গে, তৈজস-নাড়ীর অণুতে অণুতে। যার সঙ্গে সে রক্তের সম্পর্ক নেই, সে সারা জীবন তপস্যাতেও এর কাছে ঘেঁসতে পারবে না। অথচ এই দুর্লভ মহত্ব যারা পেয়েছে তারা পেয়েছে একবারে বিনা আয়াসে; মিতাক্ষরা বংশের ছেলের মত কেবলমাত্র জন্মের জোরে ও জন্মের সঙ্গে। একে লাভ করতেও যেমন আয়াস নেই, বজায় রাখতেও তেমনি কষ্ট নেই। কেননা এ শ্রেষ্ঠত্বকে ঝেড়েও ফেলা যায় না, এর নষ্ট হবারও ভয় নেই। সহজ কথায় জন্মগত আর্য্যামিটি হচ্ছে দল বেঁধে প্রতিভা ও আরও কিছু উপরির দাবী। কেননা প্রতিভারও উত্তরাধিকার নেই।

এ কথা বোধ হয় আর না বললেও চলে যে, যে মিত্রি-বংশের গৌরব ও নয়নজোড়ের বাবুয়ানা............থেকে আরম্ভ করে' কুলীনত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজত্ব, শ্বেতচর্ম্মত্ব এবং অবশেষে আর্য্যত্ব পর্য্যন্ত সবই হ'ল জন্মগত আর্য্যামিরই প্রকারভেদ। এর প্রতিটিই একটা না একটা আস্ত দলের পক্ষে অসাধারণত্বের দাবী। অবশ্য কোন দল ছোট, কোনটি মাঝারি, কোনটি অতি প্রকাণ্ড। কিন্তু সর্ব্বত্রই দলের লোকদের পরস্পর সম্বন্ধ হচ্ছে সপিণ্ড সম্বন্ধ, হয় বস্তুগত্যা, নয় কল্পিত। তবে এ সপিণ্ডত্বের সাত পুরুষে নিবৃত্তি হয় না। দরকার হলে একে ব্রহ্মার মুখ পর্য্যন্ত, কি আদি আর্য্যভূমির আদিম আর্য্য-দম্পতি পর্য্যন্ত অনায়াসে টেনে নেওয়া চলে। এবং যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বোধ হয় এর একটাকে আর একটার চেয়ে বড় বেশি অপ্রামাণ্য বলতে সাহসী হবেন না।

(৪)

জন্মগত আর্য্যামি এ পর্য্যন্ত যত রকমের দল ধরে' প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় দল হ'ল আর্য্যত্বের দল। আর্য্যামি ও আর্য্যত্ব দুটি যে এক জিনিষ নয়, দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই প্রকারবিশেষ মাত্র, এতক্ষণের আলোচনায় এ কথাটি নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে; সুতরাং এর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই 'আর্য্যামি'বিশেষের দু'-একটি বিশেষত্বের আলোচনা না করলেই নয়। কেননা 'আর্য্যামি'র এই বিরাট প্রকাশটিকে একবার ধারণা করতে পারলেই আর্য্যামির স্বরূপ বুঝতে আর কিছু বাকী থাকবে না।

এই আর্য্যামির ছোটখাট দাবীটি কতকটা এই রকমের :— পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যত সব জাতির আবির্ভাব হয়েছে, আর্য্যজাতি যে তাদের মধ্যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা নয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব একবারে অতুলনীয়। আর্য্যেতর কোনও জাতির সঙ্গে শরীরে কি মনে তার কোনও তুলনাই চলে না। আদিকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতার যা কিছু সৃষ্টি তা সবই হয়েছে আর্য্যজাতির কোনও না কোনও শাখার হাত দিয়ে। অন্য সব জাতির সামান্য যা দান, তা সফল ও সার্থক হয়েছে, কেবল আর্য্য-মহারাজ তা গ্রহণ করে' নিজস্ব করেছেন বলে'। এ জাতির যা আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ তাই হ'ল সদাচার, সদ্ধর্ম্ম, শিষ্ট সমাজ, আর এর বাইরে সবই 'অনার্য্য' ও 'বারবারিক'। সুতরাং "পৃথিবীর আধিপত্যে আর্য্যজাতির যে দাবী, সে খাঁটি ন্যায়ের দাবী। গ্রীক-আর্য্য অ্যারিষ্টটল বলেছেন যে হঠাৎ যদি পৃথিবীতে একদল লোকের আবির্ভাব হয়, যারা কেবল শরীরের আয়তনে ও গড়নে দেবতাদের মত আর সব মানুষের চেয়ে তফাৎ ও শ্রেষ্ঠ তবে সবাই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করবে যে, আর সমস্ত লোকের উপর তাদের আধিপত্যের ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। এবং যদি কেবল সামান্য দেহের সম্বন্ধেই এ কথা ঠিক হয়, তবে মনে যারা অসাধারণ সাধারণ লোকের উপর তাদের আধিপত্যের অধিকারটা কত বেশি!" এই কথাটাই খুব অল্পের মধ্যে প্রকাশ করে' তিনি বলেছেন যে, 'এক জাতির লোক স্বভাবতই স্বাধীন, আর এক জাতি লোকের স্বভাবই দাসত্ব।' এই হচ্ছে সার সত্য। কেননা ী ন ত জিনিষটা মনুষ্যত্বের সামান্য ধর্ম্ম নয় যে সব মানুষেরই তাতে কোনও অধিকার আছে; কারণ এ ত খুব স্পষ্ট যে, সে অধিকার নির্ভর করে

স্বাধীনতার ক্ষমতার উপর যার ভিত্তি হ'ল দেহের ও মনের শক্তি। এ কথা খুব নির্ভয়েই বলা চলে যে, অনেক জাতির লোক রয়েছে স্বাধীনতার কল্পনাও যাদের অজ্ঞাত। সেইজন্য দাসত্ব কি প্রভুত্ব দুই অবস্থাই তাদের সমান। যতটুকু উন্নতি তাদের সম্ভব, অবস্থাভেদে তার কোনও প্রভেদ ঘটে না। ঈহুদি, চীনা, সেমিটিক ও অর্দ্ধসেমিটিক জাতিগুলি এর দৃষ্টান্ত।"

উপরের বর্ণনায় আর্য্যজাতির আধিপত্য-দাবীর অংশটা, অর্থাৎ এ ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাটি, প্রসিদ্ধ লেখক হাউষ্টন চেম্বারলেইনের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে' দিয়েছি। চেম্বারলেইন জাতিতে ইংরেজ, শিক্ষায় জার্ম্মান; এবং তাঁর পুঁথি রচনা করেছেন জার্ম্মানভাষায়। যাঁরা চেম্বারলেইন-এর মতামতের খুব সদয় সমালোচক নন তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হাতের কলম হ'ল সোনার কাঠি। বস্তুত সে কলম যে সলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাসের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তাঁর গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা থেকে যে রসজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ, শ্রদ্ধা ও ঘৃণা, অনুরাগ ও বিদ্বেষের তীব্র আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে অল্প-বিস্তর চোখ না-ঝলসে যায় না। কিন্তু আর্য্যজাতির পক্ষে এই যে সর্ব্বাধিপত্যের দাবী, যা তাঁর পুঁথিতে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বারবার উপস্থিত করা হয়েছে, এর কদর্য্যতা ও ভীষণতা চেম্বারলেইন-এর কলমের কালিতেও একটুকও ঢাকা পরে নি।

কেননা এর পাণ্ডিত্যের পোষাক আর যুক্তির মুখোস খুলে ফেললে যা বেরিয়ে পরে, সে হচ্ছে আদিম নগ্ন বর্ব্বরতা, যা নিজের

দলের বাইরে কাকেও শত্রু ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে না। এবং হয় মৃত্যু নয় দাসত্ব এ ছাড়া সে শত্রুতার আর কোনও অবসানও কল্পনা করতে পারে না। হয় ত মানুষের ইতিহাসে এমন একদিন ছিল যখন সমস্ত জাতি মানুষের দল, কি আর্য্য কি অনার্য্য, এই মনোভাব নিয়েই প্রতিবেশী অন্য সব দলের উপর চোট করত। এবং এও সম্ভব যে এই নির্ম্মম বিরোধের উষ্ণ রক্তের স্পর্শেই মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে; তার সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যবহারে প্রাণ ও গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই যে আদিম ভয় ও বিদ্বেষ, লোভ ও নিষ্ঠুরতা, এ হ'ল প্রকৃতির অদম্য ও অন্ধ শক্তিরই রূপান্তর। এ তর্ক করে না, যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের দোহাই পাড়ে না, সুন্দরবনের বাঘের মত শিকার দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। দামোদরের বন্যার ধ্বংশলীলার মত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রমাণে এরও কোনও বিচার চলে না। কিন্তু যখনি তর্ক করে', যুক্তি দিয়ে, ন্যায়-ধর্ম্মের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে' জাতির উপর জাতির আধিপত্যকে, দলের সঙ্গে দলের শত্রুতাকে খাড়া রাখতে হয় তখনি বুঝতে হবে যে, সে জাতি প্রকৃতির গোড়ার ধাপ ছাড়িয়ে উঠেছে। কারণ সে জাতির কাছে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়েছে যে জাতির সঙ্গে জাতির, দলের সঙ্গে দলের এক শত্রুতার সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ সম্ভব, এবং সেই সম্বন্ধই নিত্য ও ঘনিষ্ঠ। এ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ধর্ম্মকেই ধর্ম্মের বিচারে আশ্রয় করলে ধর্ম্মও এখন তাকে বিচার করবে। প্রস্তাবনা ও প্রথম অঙ্ককে সমস্ত নাটকের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টানতে চেষ্টা করলে কাব্যের সৌন্দর্য্য তাতে কেবল আঘাতই পাবে।

মানুষের সভ্যতায় আর্য্যজাতির দান অনেক, হয়ত অপূর্ব্ব ও

অতুলনীয়। কিন্তু মানুষের উপর তার আর্য্যামির আঘাতও কম প্রচণ্ড নয়। আর্য্য-রোম অনার্য্য-কার্থেজকে একবারে ধূলা না করে' তৃপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অন্য একটা সভ্যতাকে একবারে ধ্বংশ না করে' নিজের সভ্যতাকে বজায় রাখবার কোনও পথ সে খুঁজে পায় নি। যে হিন্দু আর্য্য ওষধি ও বনস্পতিতে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করেছে, 'দস্যু' ও 'রাক্ষসের' প্রাণের উপর সেও কোনও মায়া দেখাই নি। আধুনিক য়ুরোপীয় আর্য্য দুটি মহাদেশ থেকে সেখানকার অনার্য্য অধিবাসীদের একেবারে মুছে ফেলেছে, এবং আর একটা মহাদেশ থেকেও মুছে ফেলবার চেষ্টায় আছে। এ চেষ্টার সমর্থনে যুক্তির অবশ্য অভাব নেই। এই উচ্ছেদ ও ধ্বংশ না হ'লে যে আধুনিক আর্য্যসভ্যতার গৌরব, তার বিকাশই হতে পারত না। এই গরীয়সী সভ্যতাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়াই হ'ল ধর্ম্ম। এবং যাদের রক্তের মধ্যে এই সভ্যতা রয়েছে তাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া এর অন্য কোনও উপায় নেই। তাতে যদি অন্য সব জাতিকে পৃথিবী ছেড়ে গিয়েও এর যায়গা করে' দিতে হয় মানব-জাতির পক্ষে সেও মঙ্গল। লক্ষ্মণের কাছে অগস্ত্য-ঋষির পরিচয় দিতে রামচন্দ্র তাঁকে 'পুণ্যকর্ম্মা' বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা তাঁর ত্রাসে দক্ষিণদিকে "রাক্ষসেরা" পা বাড়াতে সাহস না করায় সে দিকটা "লোকদের" বাসের উপযুক্ত হয়েছে। এবং এ যুক্তির উত্তর দেওয়াও কঠিন। কেননা যা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে যা ঘটে নি তাকে ওজনে তোলা চলে না। বর্ত্তমান আর্য্যসভ্যতা না গড়ে উঠলে আর্য্য-অনার্য্য মিশাল সভ্যতা কি রকমের হ'ত, কি তেমন কোনও সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারত কি না এ তর্ক এখন তোলা একবারেই নিস্ফল,

কারণ এর কোনও রকম মীমাংসার সুদূর সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের উপর আধিপত্য ও উচ্ছেদের দাবীটা যে কত অচল, মানুষের সভ্যতার গোটা ইতিহাসটাই তার প্রমাণ। এ দাবীর গোড়ার কল্পনা হ'ল এই যে, যে জাতি একবার বড় হয়ে উঠেছে সে চিরকালই বড় থাকবে, এবং আর কেউ বড় হয়ে উঠতে পারবে না। অথচ যে সব জাতির পর জাতি এতকাল ধরে' মানুষের সভ্যতাকে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত গড়ে তুলেছে তাদের কেউ কারও বংশধর নয়। আজই কি হঠাৎ মানুষের সভ্যতায় এই ধ্বংশ ও সৃষ্টির লীলা থেমে গেল! অথচ চিরকালই ত যে মাথায় উঠেছে সেই মনে করেছে সে একেবারে অচ্যুত। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জাতির পতন হলেও তার যে কেন সেটা ঘটবে না তার কারণ খুঁজে বের করতে কারও কখনও কষ্ট হয় নি। প্রতিদিন জীব যম-মন্দিরে যাচ্ছে দেখেও অমরত্বের কল্পনা আশ্চর্য্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও বেশি আশ্চর্য্য এই কল্পনা যে, যারা বেঁচে আছে তারা যে কেবল অমর হবে তা নয়, কিন্তু আর নতুন কারও জন্মও হবে না।

(৫)

আর্য্যত্বের 'আর্য্যামি' এতক্ষণ যা বর্ণনা করেছি সে হ'ল তার একটা মাত্র দিক। কেননা ব্রহ্মের যেমন দুইরূপ, এ আর্য্যামিরও তেমনি দুই মূর্ত্তি ; সগুণ ও নির্গুণ, ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয়। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানে এর প্রথমটির বিকাশ হয়েছে য়ুরোপের আর্য্য-সমাজে, দ্বিতীয়টির পূর্ণ-প্রকাশ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে। পশ্চিম শাখাটি দাবী

করছে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব; তার ক্রিয়ার দাপটে আর সকলের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া এক রকম রুদ্ধ। আর পূবের শাখাটি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং", "অপ্রাণ" ও "অমন"। সকলেই জানে যে সগুণত্বের সিঁড়ি দিয়েই নির্গুণত্বে পৌঁছিতে হয়। ভারতীয় আর্য্যেরাও অবিশ্যি তাই করেছেন। ক্রিয়াশীলত্বের সিঁড়ি দিয়ে নিষ্ক্রিয়ত্বের ছাদে এসে পৌঁচেছেন। এটা যে চরম পরমার্থের অবস্থা তাতে সন্দেহ নেই, কেননা 'একরূপে অবস্থিত যে অর্থ' তাই হ'ল পরমার্থ। যাঁরা এ অবস্থা থেকে ভারতের আর্য্য-সমাজকে আবার সচল অবস্থায় নিতে চান তাঁরা 'ইভলিউশনের' গতিবিধির কোনও খবরই রাখেন না।

যা হোক, আর্য্যামির এই সগুণ ও নির্গুণ প্রকাশের মধ্যে একটি আন্তরিক মিল রয়েছে, কেননা এ দুই হ'লেও মূলে এক। সে মিলটি হচ্ছে যে, দুয়ের পথই বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন 'ছুঁৎমার্গ', বাইরের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করা। তবে পশ্চিমের, ওদের পথ হ'ল আর সবাইকে তাড়ান, আমাদের কৌশল হ'ল সবার কাছ থেকে পালান। শেষ পর্য্যন্ত কোনটায় বেশি ফল হয় বলা কঠিন।

মানুষে মানুষে চরিত্র ও মনের শক্তির যে তফাৎ, জাতির সঙ্গে জাতির সে তফাতের চেষ্টার কোনও অর্থ আছে কি না, এবং থাকলে সেটা ঠিক কোথায় সে তর্ক না হয় নাই তোলা গেল। মেনে নেওয়া যাক, এ তফাৎ আছে। কিন্তু প্রভেদমাত্রই উঁচু নীচুর সম্বন্ধ নয়, এবং বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কাজের পরিমাণও একটা জাতির শক্তিসামর্থ্যের শেষ প্রমাণ নয়। কেননা মানুষের ইতিহাস কিছু শেষ হয়ে যায় নি যে, এখনি লাইন টেনে হিসাব নিকাশ আরম্ভ করা যেতে পারে। আজ

যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও প্রবল, তারা ট্যাসিটাসের জর্ম্মাণেরই বংশধর। তখন দাঁড়ি টেনেছিলেন বলে' ট্যাসিটাসের ঠিকে যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে এখন দাঁড়ি টেনে ষ্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন-এর ঠিকই বা শুদ্ধ হবার সম্ভাবনা কোথায়! আর শ্রেষ্ঠত্ব, তার অর্থ যাই হোক, যদি প্রভুত্বের নিয়োগপত্র হয়, তবে তার শেষ কোথায়? আর্য্যত্ব এমন কি য়ুরোপীয় আর্য্যত্বের সীমায় এসেই বা তার গতি রোধ হবে কেন? শ্রেষ্ঠের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতমের দাবী কেনই বা না চলবে! কেননা, 'আর্য্যামি' ভেদেরি মন্ত্র, মৈত্রীর বন্ধন নয়। শোনা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরেই ফ্রান্সের নৃ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রুশিয়ানরা মোটেই আর্য্যজাতির লোক নয়, তারা য়ুরোপের প্রস্তর যুগের অধিবাসিদের একবারে অবিমিশ্র বংশধর। এবং সে যুগের যে সব মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের যে মাথার সব চেয়ে আশ্চর্য্যজনক মিল, সে হচ্ছে প্রিন্স বিসমার্কের মাথা।

মানুষের সভ্যতা যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁরা সবাই অসাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনও বিশেষ বংশ, কুল বা জাতি থেকে তাঁরা আসেন নি। এবং নিজের বংশ, কুল বা জাতির সঙ্গে তাদের যে মিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিল পরস্পরের সঙ্গে। প্রকৃতির এই যে ইঙ্গিত, এই হ'ল মানুষের মিলনের সত্য পথের ইঙ্গিত। বংশ, কুল, জাতি কিছুই অসত্য নয়, কিন্তু সে সত্য হ'ল ব্যবহারিক। এরা কাজ চালাবার উপায়, কিন্তু মৈত্রীর সম্বন্ধ কাজের সম্বন্ধ নয়। এই কাজ চালাবার দলকে ধরে' মানুষের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেননা দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধ সব সময়েই থাকবে কাজের সম্বন্ধ, সে 'অ্যালায়েন্স'ই হোক, 'আঁতাত'ই হোক, আর 'লীগ অব নেশন'ই,

হোক। তাতে শান্তি আসতে পারে কিন্তু মৈত্রী আসবে না। কেননা মৈত্রীর জন্য চাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, দলের সঙ্গে দলের আদান প্রদান নয়। এবং সে কেবল তখনই সম্ভব, যখন বংশ, জাতি, রাষ্ট্রের প্রাচীর মানুষের চেয়েও উঁচু হয়ে' উঠে দৃষ্টিকে বাধা না দেয়; যখন নামরূপের মায়া যা এক, তাকে বহু করে' দেখানোর কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

সম্পাদকের নিবেদন।

—:o:—

"সবুজ পত্রে"র বয়েস আজ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হল। গত তিন বৎসর সবুজ পত্রকে টিঁকিয়ে রাখা যে আমার পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার হয়নি, তা "সবুজ পত্রে"র গ্রাহকমাত্রই জানেন।

মাসের পর মাস ধার্য্য তারিখে আমি পাঠক-সমাজের নিকট এ পত্র পেশ করে উঠতে পারি নি। এর প্রধান কারণ, কি "সবুজ পত্রে"র সম্পাদক কি লেখক কেউ সাহিত্য ব্যবসায়ী নন, সকলেই অন্য কাজের কাজী। এঁদের সকলকেই, অবসর মত লেখায় হাত দিতে হয় এবং বলা বাহুল্য সে অবসর এঁদের কারও ভাগ্যে নিত্য নিয়মিত জোটে না। কাজেই "সবুজ পত্র" যথাসময়ে দেখা দেয় না।

তারপর, "সবুজ পত্র" নিয়মিত প্রকাশ করবার দায়ীত্ব এক সম্পাদক ছাড়া আর কারও নেই। এ দায়ীত্ব-জ্ঞান আমার অবশ্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু শুধু জ্ঞান থাকলে কি হবে, সে জ্ঞান অনুসারে কাজ করবার শক্তি আমার নেই। লেখা সম্বন্ধে আমি মোটেই ক্ষীপ্র-হস্ত নই, আমি ধীরে লিখি এবং ধরে লিখি, এবং তার পর যদি হাতে সময় থাকে ত, সে লেখা আমি কাটি, ছাঁটি, মাজি, ঘসি, এক কথায় চৌকোশ এবং চৌরস করতে চেষ্টা করি। এবং এই কাটছাঁট করবার সময় আমার হাতে নিত্য থাকে না বলে, আমার যখন তখন কলম ধরতে প্রবৃত্তি হয় না, ফলে "সবুজ পত্রে"র আবির্ভাব মুলতবি থেকে যায়।

পাঠক বলতে পারেন যে, এ অবস্থায় "সবুজ পত্র" বন্ধ করে' দেওয়াই শ্রেয়। এ কথা ঠিক এবং সেইজন্য আমিও মনস্থ করেছিলুম যে, অতঃপর "সবুজ পত্র" বন্ধ করে' দেব। এ সংকল্পের আরও একটি কারণ আছে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এই যুদ্ধের প্রসাদে একদিকে যেমন সাহিত্যের আদর কমে এসেছে, অপরদিকে তেমনি কাগজ কালি প্রভৃতির দর বেড়ে গিয়েছে। ফলে গত তিন বৎসর ধরে, "সবুজ পত্রে"র জন্য আমাকে যথেষ্ট অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। বছরের পর বছর এতটা লোকসান দেওয়া আমার অবস্থায় কুলোয় না। আশা ছিল, এই যুদ্ধের অবসানে কাগজের বাজার পড়ে' যাবে, কিন্তু বস্তুগত্যা সে বাজার ক্রমে চড়েই যাচ্ছে। সুতরাং লেখার দিক থেকেই দেখি আর টাকার দিক থেকেই দেখি, দু'দিক থেকেই "সবুজ পত্র" চালাবার উৎসাহ আমার নিতান্ত কমে এসেছিল।

এ সব কারণ সত্ত্বেও "সবুজ পত্র"কে অন্তত আর এক বৎসরের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে যে প্রস্তুত হয়েছি, তার কারণ এ পত্রের প্রতি যাঁদের অনুরাগ আছে, দেখতে পাই তাঁদের সকলের মতেই আজকের দিনে, "সবুজ পত্র" বন্ধ করে' দেওয়াটা সঙ্গত নয়। এবং আমার বিশ্বাস "সবুজ পত্রে"র অধিকাংশ গ্রাহকও এই মতে সায় দেবেন। অতএব গ্রাহক-সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা প্রত্যেকেই যদি আর একটি করে টাকা অর্থদণ্ড দিতে স্বীকৃত হন, তাহ'লে আমার ঘাড় থেকে ব্যয়ভার অনেকটা নেমে যাবে। আশা করি এ প্রস্তাবে "সবুজ পত্রের" কোন গ্রাহকই অসম্মত হবেন না। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।